Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ১ম সংখ্যা।
১লা মাঘ, শনিবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
15th. January, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

মা, নববিধানের মা, নবশিশু শ্রীকেশবের মা, বিশ্ব-মানব [illegible] সবার জীবন্ত নব নব রূপধারিণী মা তুমি। [illegible] তব নববিধানে আবার নব উৎসবের দ্বার [illegible]। জীবনের উৎস উৎসারিত করিবার [illegible] তুমি উৎসব লইয়া আবির্ভূত হইলে। মৃত্যুর [illegible] সম্পাদন কর। মৃত মানবকে, মৃত [illegible], মৃত ধর্ম্মকে, মৃত শাস্ত্রকে, মৃত অনুষ্ঠানকে পুনর্জ্জীবন, নব জীবন দিবার জন্যই তোমার নববিধান। এ বিধানে মৃত্যু থাকিবে না; মৃত মন্ত্র, জীবনবিহীন ধর্ম্ম, নির্জ্জীব মৃত [illegible] উৎসবে আমাদের মৃত জীবনকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া, আরও উৎসারিত ও [illegible]লোকে প্রবাহিত করিবার জন্য, তুমি এই উৎসবের দ্বার খুলিয়াছ। পৃথিবীর দেবালয়কে নবদেবালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে। তোমার [illegible] আবির্ভাবে ইহা পূর্ণ। [illegible] তিরোহিত করিয়া, তোমার প্রত্যক্ষ [illegible] করিলে। সমস্ত ভক্তবৃন্দের সমাগম এখানে, সকল তীর্থের মিলন এখানে। সর্ব্ব-শাস্ত্রের সমন্বয়ে, [illegible] জীবনবেদ [illegible] করিবার জন্য, এই মহা [illegible] প্রতিষ্ঠা করিলে। প্রাচীনের প্রতি নবীনের কৃতজ্ঞতা ভক্তি উদ্দীপন করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ-প্রবর্ত্তক রাজর্ষি রাম-মোহনকে স্মরণ ও বরণ করাইলে। আর্য্যঋষিপ্রতিম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণে প্রণত করিলে। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় যে তোমার বিধান নববিধান, বিশ্বমানবের ঐক্য-বন্ধন ও পরিত্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলে। প্রাচীন ভারত নববিধানের জন্মভূমি বলিয়া, স্বদেশানুরাগ ও রাজভক্তির সমন্বয় সাধন করাইলে। গৃহধর্ম্মই পরমধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ইহাও তুমি নববিধানে বিশ্বাস করাইলে। শিশুর ভিতর নবশিশুদর্শনে স্বর্গের আদর্শ অনুসরণ করাইলে। ভৃত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভৃত্যের ভৃত্যত্বসাধন, দীন দুঃখীর [illegible] তোমার দর্শন করিয়া দীনসেবা ও দীনের দীন হইতে শিখাইলে। মহাজনগণের সমন্বয় জীবনে দর্শন, উপকারিগণের উপকার স্বীকার, বিরোধিগণের চরণে ক্ষমা-শিক্ষা, আমি আমার নির্ব্বাণে চিত্তশুদ্ধিসাধন ও পরি-[illegible] জীবনলাভ দ্বারায়, যাহাতে আত্মায় আত্মস্থ হইয়া আমরা তোমার আকৃতি-যোগে নববিধানের [illegible]-স্রোতে উৎসবে উপনীত হইতে পারি, তাহারি জন্য তোমার এই মহা আয়োজন। বিশেষভাবে এই নববর্ষে নবজন্মের শতবর্ষ বক্ষে ধারণ করিয়া তুমি আসিয়াছ। তাই তোমার [illegible] শ্রীকেশবচন্দ্রের দৈহিক মহাপ্রয়াণ

আমাদিগের দৈহিক জীবনের চিরমরণ সমাধান করিয়া, শ্রীকেশবচন্দ্রের উজ্জীবনে আমাদেরও স্বতন্ত্র আমি আমার ভস্ম করিবার মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ব্রহ্মানলে পুড়ে আমাদের প্রতিজনের আমি আমার চিরতরে ভস্ম হয়; এবং যথার্থ ব্রহ্মানন্দের অঙ্গে গাঁথা হয়ে, আমরা যেন শ্রীকেশবের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকি। "মা, সত্য সত্য কর দল পরিবার, সাক্ষী নববিধানে তো[illegible] কারো না রয় আমি আমার, শ্রীকেশবে একাকার।" [illegible] এবং তদ্দ্বারা আমরা যেন নবজন্মশতবার্ষিকী সাধনার উপযুক্ত হইতে পারি এবং নববিধানে নবজন্মলাভে বিশ্বমানব পরিবার সনে মহাযোগে একাকার হইতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

একেশ্বরবাদ, একেশ্বরবিশ্বাস, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে নববিধান-জীবন

মহামহোৎসবের দ্বার আত্মযোগ-সাধনায় পরমাত্মা পরব্রহ্মের আরতি করিয়া আজ উদ্ঘাটিত হইল। নিরাকার ব্রহ্ম-নিরূপণ প্রাচীন বিধান। পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে নিরাকার ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তির পূজা পৌরাণিক বিধান। নিরাকার ব্রহ্মের বাহ্যানুষ্ঠানে পূজা আরতি নবযুগধর্ম্মবিধান।

জ্ঞানে ব্রহ্মনিরূপণ একেশ্বরবাদ। বিশ্বাসে নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। জীবনে ব্রহ্মদর্শন-শ্রবণে সর্ব্বধর্ম্মসাধনা, আত্মায় পরমাত্মায় যোগসাধন, ভক্তি বিশ্বাসে কার্য্যমনোবাক্যে ব্রহ্মের আদেশ অনুসরণে দৈহিক জীবনে পরিবর্ত্তিত জীবনলাভ, স্ত্রী পরিবার সংসার সহযোগে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মজীবন যাপন, চরিত্রে জীবনে কার্য্যে আচরণে আত্মস্থ হইয়া ব্রহ্মগত জীবন যাপন এবং দলে বলে বিশ্বমানবকে লইয়া এক সদল অখণ্ড মানবত্ব-প্রদর্শন ইহাই নববিধান। মত এক, বিশ্বাস এক, কার্য্যে জীবনে আচরণে তাহা দেখান—ইহাই নূতন।

সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, জ্ঞানযোগে বিচার নিষ্পন্ন করিয়া, রাজর্ষি রামমোহন পৌত্তলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করিলেন, ইহাকে দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহা যে বিধাতার বিধান, তাহা তাঁহার জ্ঞানে উপলব্ধ হয় নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই জ্ঞান-বিচার-সঙ্গত মত বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া, অপৌত্তলিকভাবে বৈদিক অনুষ্ঠানে নিরাকারের আরাধনা প্রবর্ত্তন করিলেন। যদিও পবিত্রাত্মার প্রেরণায় উভয়ে, ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্মপিতা, ব্রহ্ম-সাধনাকে পৌরাণিক ভারতে পুনরুদ্ধার করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই, ইহা যে বিধাতার বিধান, আত্মযোগে তাহা উপলব্ধিও করেন নাই, ঘোষণাও করেন নাই। বেদান্তত্ত্ব ব্রহ্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মের ধর্ম্ম বা "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া প্রচার করিলেন।

ব্রাহ্মের ধর্ম্ম, যিনি ব্রাহ্ম হইবেন, তিনি তাহা পালন ও বিশ্বাস করিতে পারেন। যিনি ব্রাহ্ম নন, তিনি তাহা কেনই বা পালন করিবেন, কেমনে বা করিতে পারিবেন? কিন্তু বিশ্ববিধাতা চান যে, মানবগণ মাত্রেই এক অদ্বৈত ঈশ্বরকে, যে যে ভাবে, যে যে নামে, যে যে শাস্ত্র অনুসারে, যে যে প্রকার অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন বিচিত্র সাধনায় সাধন করিয়া, সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন গণ্ডীতে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে এক অদ্বৈত ধর্ম্মবিধানের ক্রোড়ে আনয়ন করিবেন, এক অখণ্ড পরিবার গঠন করিবেন। তাহারই জন্য সেই অদ্বৈত পরমাত্মা পরব্রহ্ম বিধাতৃরূপে, সন্তানবৎসলা মাতৃরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রেরিত করিয়া, এক মানবাধারে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-সাধনা জীবনে মূর্ত্তিমান করিলেন। দার্শনিক একেশ্বরবাদ, বৈদান্তিক অধ্যাত্মসাধনা, এবং পৌরাণিক, এসলামিক, ইহুদীয়, খ্রীষ্টীয়, পারসিক, শিখ এবং বৈষ্ণবীয় সমুদায় ধর্ম্মবিশ্বাস একীভূত করিলেন; বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, ললিতবিস্তার আদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র এক জীবনবেদে পরিণত করিলেন; ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, জনক, নানক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পাপী সাধু সকলকে অখণ্ড জীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া, নববিধানের নবশিশু শ্রীকেশবচন্দ্রকে বিশ্বমানবরূপে স্বয়ং গঠন করিলেন।

নববিধান কেবল সমন্বয়বাদ নহে, ইহা বিধাতার বিধান। মানবের মত, মানবের পথ কোন মানব গ্রহণ করিতে পারে, কেহ গ্রহণ নাও করিতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিধাতার যাহা বিধান, তাহা বিশ্বরাজ্যের আইনের ন্যায়, আজ্ঞার ন্যায় প্রত্যেককে মানিতেই হইবে। ইহাতে মানবের ইচ্ছা রুচি, বিচার বুদ্ধি দ্বারা বাদসাদ দিয়া লওয়া চলে না, চলিবে না।

শ্রীকেশবচন্দ্র বিধাতারই হস্তের যন্ত্ররূপে, নিজ আমিত্ব স্বামিত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বলিদানকরিলেন বলিয়াই, নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবনে গঠিত হইয়াছেন। নিজ পুরুষকারবলে কেশবচন্দ্র কেশবচন্দ্র নহেন, ব্রহ্মকৃপা-সিদ্ধ সদল অখণ্ড বিশ্বমানব তিনি।

তাই তিনি স্পষ্টরূপে অহংকার ও বিনয়ের সহিত বলিলেন, "যে সদল ও অখণ্ড, কেহ কি তাহাকে বিদল করিতে পারে? আমাকে কেহ ছাড়িতে পারে না, ছাড়ুক, শুকাইবে; কেহ বাঁচিতে পারিবে না। মাধবী াকে বৃক্ষ জড়াইয়া। ইঁহারাও যা, আমিও তা, আমিও যা, ইঁহারাও তা। ইঁহারা আমার যোগে আশ্রিত।"

এই মর্ম্মভেদী মহাবাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাহাতে তাঁহার সহিত আমরা সমযোগে, সমবিশ্বাসে, সমসাধনায় এক জীবন, এক অখণ্ড মানব হইতে পারি, তাহারই জন্য এই মহোৎসবে আমরা আকাঙ্ক্ষিত হই; এবং তদ্দারা জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, নব মানবজন্ম লাভের জন্য, সর্ব্বমানব সনে প্রস্তুত হই এবং বিশ্ববিধাতার নব-বিধানের প্রকৃত রাজভক্ত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান

জ্ঞানের আধার জ্ঞানদাতা স্বয়ং গুরু হইয়া যাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহারই নাম জ্ঞান। মনের চিন্তা দ্বারায় আমরা তাহা ধারণা করি এবং মনোবিজ্ঞান দ্বারায় তাহার তত্ত্ব আলোচনা করি। তাহা যখন বিজ্ঞান-যোগে বাহ্যতঃ কার্য্যে সমাধান করি, তাহাই পদার্থবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের দ্বারায় নিষ্পন্ন সত্য যখন কার্য্যতঃ জীবনের সাধনায় সমাধান করি, তাহাই ধর্ম্মবিজ্ঞান। নববিধান এই ধর্ম্মবিজ্ঞানের বিধান। ইনি কেবল মনোবিজ্ঞানের দ্বারায় তত্ত্বনিরূপণে তুষ্ট হন না। কিন্তু ধর্ম্মসাধন বিজ্ঞান-যোগে জীবনে চরিত্রে সমাধান করিয়া কার্য্যতঃ আচরণ করেন। এই জন্য এই বিধান বিজ্ঞানের বিধান। ইহার ভিতর সকল বিজ্ঞানই সমন্বিত এবং আদৃত। ধর্ম্ম যখন ভাব মাত্র হয়, তখন ধর্ম্মে এবং বিজ্ঞানে বিসম্বাদ হয়। কিন্তু ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতেই নববিধান আবির্ভূত। এই জন্য নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র আদর্শ-চরিত্রের উক্তিতে বলেন, "আমি বিজ্ঞানকে ঈশ্বরালোক বিশ্বাস করি এবং যাহা কিছু বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, তাহাকে আমি ঘৃণা বলিয়া করি।" বিজ্ঞানরাজ্যে সম্পূর্ণ নব আবিষ্কার যেমন সর্ব্বত্র আদৃত এবং গৃহীত হয়, ধর্ম্মবিজ্ঞানেও নববিধান সম্পূর্ণ নব আবিষ্কৃত সত্য এবং সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ইহা যে বিধাতার বিধান।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও সমাজমঙ্গল

নব্যভারতের নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই; তাই কালের গণনায় আমাদের দেশের স্থান কোথায়, নির্দ্দেশ করা শক্ত। দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) একস্থলে বলিয়াছিলেন, "যদি উনবিংশ শতাব্দী দেখিতে চাও, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন কর, যদি অষ্টাদশ শতাব্দী দেখিতে চাও, চীন দেশে যাও এবং যদি মধ্যযুগ দেখিতে চাও, তবে ভারতবর্ষের দিকে তাকাও।" রাসেলের চিন্তাধারা তত্ত্বের দিক দিয়া যতই অগভীর হউক, তিনি বিশ্বজীবের পরম-হিতকামী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার চিত্ত কখনও প্রতীচ্য-বিদ্বেষ-দোষে দুষ্ট নয়। তাই তাঁহার এই মতকে এক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের একদেশদর্শিতা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কেন না একথা ঠিক, আমাদের দেহটা কোনও রূপে আসিয়া নবযুগে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু আমাদের মনটা অনেকাংশে মধ্যযুগেই পড়িয়া আছে। আমাদের দুর্ব্বিসহ দৈন্য, অজ্ঞতা ও অবসাদ একথার সাক্ষ্য দেয়। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান আমাদের দেশকে মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে নবযুগের দিব্যালোকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কেশবচন্দ্রের জনহিতকামনাপ্রসূত নব নব প্রচেষ্টা, আমাদের দেশের নবজাগরণের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর, তিনি এই কলিকাতা নগরীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাই আগামী বৎসর তাঁহার জন্মোৎসবের শতবার্ষিকীর আয়োজন চলিতেছে। এ সময় তাঁহার বহুমুখী আলোচনার একান্ত প্রয়োজন।

তিনি একাধারে পরমভাগবত ধর্ম্মবীর ও লোকশিক্ষক ছিলেন। আজকাল জাতীয় যে সকল গভীর সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, ইহার অনেকগুলির সমাধানে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পবিত্রতালাভ, সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিস্তার, মাদকতানিবারণ, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতিভেদের করালগ্রাস হইতে দেশকে মুক্তিদান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসাধন, সকল ধর্ম্মকে গ্রহণ ও সকল সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্যস্থাপন প্রভৃতি গুরু-তর কার্য্যের ভার তিনি বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধনার সংঘাতে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিতর পড়িয়া আমরা অনেকে দিশাহারা হইয়াছি। অনেকে মনে করেন যে, King Canuteএর মত আমরা প্রতীচ্য সাধনা ও সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিলেই উহা অপসারিত হইবে; আবার অত্যুগ্র নব্যপন্থীরা মনে করিতে পারেন, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির ভিতর গ্রহণযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই—এদেশকে সর্ব্ববিষয়ে বিদেশীয় ভাবাপন্ন না করিলে দেশের দুর্গতির অবসান হইবে না।

কেশবচন্দ্র একদেশদর্শী এই দ্বিবিধ পথই পরিত্যাগ করিয়া, ধীর-পাদবিক্ষেপে বিশ্বমানবের মহান্ ঐক্যের পথে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি এদেশীয় সর্ব্বোত্তম শাস্ত্রের সঙ্গে, স্বীয় বিচার বুদ্ধি ও বিবেকের সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা যে এ দেশের প্রাণের কথা, তাহা হয়তো বুঝিবার এখনও সময় হয় নাই। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা চৈত্তগুরুর প্রাধান্য স্বীকার করিতেন—বাহিরে যত গুরুই থাকুন না কেন, চিত্তে যে গুরু সদা জাগ্রত [illegible], তাঁহার অবহেলা করিলে বিভ্রান্ত হইতেই হইবে। নি[illegible] বিচার বুদ্ধি ও বিবেকের ভিতর যে চিত্তগুরু অহর্নিশ উপদেশ দিতেছেন—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই কেশবের মূলমন্ত্র ছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যুবক কেশবচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে, তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া, সস্নেহে ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় এদেশে যে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুকলেজ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—এই কলেজের শিক্ষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত, অজ্ঞেয়বাদ, সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতা প্রভৃতিও সুশিক্ষার বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। চারিদিকের এই নিরীশ্বরবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। বিধাতৃপ্রদত্ত আস্তিক্যবুদ্ধি ও নীতির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তাঁহাকে অমিতবলশালী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহে যুবকদিকের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়, কলুটোলার সান্ধ্যবিদ্যালয়, গুডউইল ফ্রাটারনিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সময়োপযোগী নিবেদন (Tracts of the times) নামে কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত করিতে থাকেন। ইহার প্রথম খানার নাম ছিল, "নব্যবঙ্গ, এগুলি তোমাদেরই জন্য"। এই ১২।১৩ খানা পুস্তিকাতে তিনি নীতিধর্ম্মের ভিত্তি, অন্তঃপ্রেরণা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ নিবন্ধ ছাপাইয়া চারিদিকে বিতরণ করেন। এগুলি আমাদিগকে জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্টের (Fichte) জার্ম্মাণ জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতে লিখিত পত্রাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে দেশে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং নূতন এক নৈতিক হাওয়া প্রবাহিত হয়। স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি দেশনায়কেরা ব্রহ্মানন্দের নৈতিক আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং অল্পাধিক পরিমাণে উঁহাদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

কেশবচন্দ্র মাদকতার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। আজ যে দেশব্যাপী পানদোষ-নিবারণের চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহার ভিতর ব্রহ্মানন্দের ভাব বিশেষরূপে কাজ করিতেছে। এদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় পানদোষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই কার্য্যে কেশবচন্দ্রও নিজের শক্তি ও সময় নিয়োগ করেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Indian Reform Association প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মাদকতা-নিবারণ উহার এক বিশিষ্ট কার্য্যরূপে গ্রহণ করেন। এই সময় 'মদ না গরল' নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকাতেও এই কুপ্রথার দিকে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশে এই সময় অনেকগুলি Temperance Society প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবের উদ্যোগে বাঙ্গলার অগ্রণী ১৩২০০ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক আবেদন তৎকালীন রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হয়। Lord North Brook এর শাসনকালে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় এবং ১৮৭৩ সনে Excise Act পাস হইয়া মাদকতার প্রসার বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হয়।

স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে কেশবচন্দ্র দেশে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, কেবল তাহাতেই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইহা অনেকেরই হয়তো জানা নাই যে, নব্যবঙ্গের স্ত্রীজাতির অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথমে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। আজ যে দেশে হিন্দু মহিলারা মুক্ত হাওয়াতে ও আলোতে খানিকটা চলাফিরা করিতেছেন—ইহার মূলেও কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টা হইয়াছে। অনেকে হয়তো এ প্রথার পক্ষপাতী নন, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না, জীবনসংগ্রামে মেয়েরা পুরুষদিগের সাহায্যকারিণী না হইলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হওয়ার দিন, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, বিপুলবাধা অতিক্রম করিয়া, কলুটোলার পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীকে লইয়া যে দিন কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের স্ত্রীজাতির অবরোধ-নিবারণের অধ্যায়ের এক বিশেষ ঘটনা।

বিধবাবিবাহের আন্দোলনেও কেশবচন্দ্র সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন। তাই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করেন, কেশবচন্দ্র তাহাতে সাগ্রহে যোগ দিয়া ছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে একটী বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত করিয়া অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

লোকশিক্ষার জন্য কেশব যে সব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কথাই আজ কিছু বলা হচ্ছে। তিনি মহিলাদের শিক্ষার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্রাহ্মিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মালস্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলের কার্য্যবিবরণীতে দেখিতে পাই, ইহার বাৎসরিক পারিতোষিক সভায় তৎকালীন Viceroyও একাধিকবার উপস্থিত হইয়া কার্য্যের প্রশংসা করিয়া-

ছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজই এখন প্রথম শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া, কেশবচন্দ্রের বাসগৃহ কমলকুটীরে বর্ত্তমানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই স্থলে কেশবের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ভিতর এখনও মতভেদ আছে; ইউরোপ ও আমেরিকার বহুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই। আবার জাপানে দেখিতে পাই—অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে গৃহলক্ষ্মী ও মাতৃত্বের আদর্শেই গঠন করা ইহাদের উদ্দেশ্য। কেশবচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে চিরদিনই শ্রদ্ধা করিতেন; তাই যে শিক্ষা ও দীক্ষায় স্ত্রীজাতির ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিতে পারে, তিনি এরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না—স্ত্রীজাতির শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার নামান্তর না হইয়া, যাহাতে নারীজাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করিয়া তোলে, তিনি সেই শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এবিষয়ে যাহা বিজ্ঞান-সম্মত, তাহাই বিধাতার অভিপ্রেত বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সমস্যা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের এক শ্রেষ্ঠ কাজ, আমাদের দেশের প্রচলিত জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহগুলি আইন-সম্মত কিনা, এবিষয়ে সন্দেহ ছিল। কেশবচন্দ্র তৎকালীন Advocate General-এর মত লইয়া জানিলেন, এগুলি আইনসিদ্ধ বিবাহ নহে। তাই তিনি একটী ব্রাহ্মবিবাহ আইনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইহার জন্য তিনি Viceroy Lord Lawrence-এর সঙ্গে প্রথম বাঁকিপুরে সাক্ষাৎ করেন। Lord Lawrence এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শিমলা সহরে তাঁহাকে আহ্বান করেন। এবং ঐ বৎসর ১০ই সেপ্টেম্বর Sir Henry Maine বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহা Native Marriage Act নামে আইনে পরিণত হয়। ইহাই পরবর্ত্তী কালে যথাক্রমে Civil Marriage Act ও Special Marriage Act নামে কথিত হয়। ইহা নব্যভারতের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে একটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিধান। ইহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, পাত্রের বয়স ১৮ বৎসর ও পাত্রীর বয়স ১৪ বৎসরের কম হইবে না। ইহা দ্বারা বাল্যবিবাহ নিবারিত, অসবর্ণবিবাহ ও বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় এবং বহুবিবাহ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয়। এই ব্যাপক আইন আমাদের সমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া, সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে এক বিপুল সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহার জন্য আমরা কেশবচন্দ্রের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। এই আইন পাস হওয়ার অর্দ্ধ শতাব্দীর পর, Dr. Hari Sing Gour ও Dewan Bahadur Harbilas Sarda প্রভৃতি এইরূপ আইন হিন্দুসমাজের নিতান্ত উপযোগী বলিয়া মনে করিতেছেন এবং এই সংশোধিত আইন দ্বারা জাতিভেদবর্জ্জিত এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। এ বিষয়ে নবযুগে কেশবচন্দ্র সমাজের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক, সন্দেহ নাই, এই সকল নানা সৎকার্য্যের জন্য হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেশবচন্দ্রকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা দৃশ্য মানুষকে যদি মানুষ বলিয়া সম্মান দিতে না পারি, তবে অদৃশ্য দেবতাকে [illegible] দান করিব কি প্রকারে? কবি ব্রহ্মানন্দের ভাবে ভাবাবি[illegible] হইয়া একদিন গাহিয়াছিলেন :—

"জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ-জাতি।
এক পৃথিবীর স্তন্যে পালিত
একই রবী শশী মোদের সাথী।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে,
আসল মানুষ প্রকট হয়।
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ,
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।"

শ্রীখড়গসিংহ ঘোষ।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলভিত্তি

(৩)

কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী

১৮৫৭ সনে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ঐ সনেই ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয়ে স্থিতি করিবার সময়ে, সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন ঘটে। ইতিপূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র তাঁহাদের পিতৃকুলের গুরুদেবের সমীপে দীক্ষাগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া, মহা তেজস্বিতা-সহকারে বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এ ঘটনা দ্বারা তিনি দেবেন্দ্রনাথের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এবারে উভয়ে মিলিয়া নবভাবে বিধাতার মনোনীত কার্য্যক্ষেত্রে অকুতোভয়ের সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৮৬০ সনে কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আমরা শুধু তাহার দুইখানির বিষয়েই কিছু উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি :—(১) Religion of Love (২) Signs of the Times। প্রথমটিতে বলা হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক, উদারতা ইহার বিশেষত্ব, প্রেমই ইহার জীবনের উৎস। ইহা কোন সম্প্রদায়ের বা কোন যুগের অথবা কোন দেশের ধর্ম্ম নহে। ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। ইহা মানব-

জাতির সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের সকল জাতিকে একত্র করিয়া মিলাইতে চায়। সাম্প্রদায়িকতা মানবের মত ও ভাবকে এবং বিশ্বাসকে সংকীর্ণ করিয়া তোলে, পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য জন্মাইয়া দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবাত্মাকে প্রসারিত করে এবং উপলব্ধিকে বৃহত্তরভাবে সম্প্রসারিত করিয়া তোলে। সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ও ভাবের বিপরীত। একমাত্র প্রীতিই ধর্ম্মের উ[illegible]। সকলকে একত্র করা এবং পরস্পরকে পৃথক না করি[illegible]মিলিত করা, সর্ব্বসাধারণকে একীভূত করা, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অ[illegible]রূপে বিভক্ত না করিয়া সকলকেই আকর্ষণ করা, কাহাকেও পরিত্যাগ না করা, কাহাকেও শত্রু না ভাবিয়া ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। প্রীতি, মিলন এবং শান্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের রক্ষা কবচ। বিশ্বপ্রীতিই ইহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত বিশ্বই ব্রাহ্মের গৃহ। মানবজাতিই ইহার পরিবার এবং ঈশ্বর ইহার পিতা। আহা! ব্রাহ্মধর্ম্ম, তুমি স্বর্গ হইতে আগত ও সুমিষ্ট; তুমি তোমার প্রেম ও শান্তির নিশান উড়াইয়া দাও এবং সমস্ত জাতি ও দেশকে ভ্রাতৃভাবে পবিত্র বন্ধনে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেল। তোমার রাজ্য দিন দিন সমস্ত জগতে বিস্তৃত হউক। সমস্ত জগৎ একত্র হইয়া এককণ্ঠে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করুক। "ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্বই" জাতীয় সংগীত হউক।

কেশবচন্দ্র ১৮৬০ সনে তাঁহার রচিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভিত্তি" নামক পুস্তিকাতেও লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন প্রেরিত ধর্ম্মগ্রন্থের উপরে সংস্থাপিত নহে। ইহা ঈশ্বরের বাণীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহার মূলভিত্তি মানবের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিহিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহজ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা সহজজ্ঞানজনিত সত্তা ও বিশ্বজনীন। ইহা জ্ঞানী মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের ভিতরেই বিরাজিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ও অনন্তকালব্যাপী। এই বিশ্বজগৎ এক সুবিস্তৃত মন্দির, প্রকৃতি ইহার প্রবীণ পুরোহিত। মানব মাত্রেই, কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি পর্ণকুটিরবাসী, অথবা কি সম্রাট, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ইউরোপীয়, কিংবা ভারতবাসী, কি প্রথম শতাব্দীর লোক, বা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, সকলেরই তাঁহাদের পিতার গৃহে প্রবেশের অধিকার আছে এবং বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত পূজা করিবার অধিকার আছে। তোমরা কি বিশ্বাস করিতে পার যে, যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ঈশ্বর কেবল তাঁহাদের নিকটেই নিজকে প্রকাশ করেন?" এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৬সনে যে শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতির সহকারিতায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মূল উপাদান নিহিত রহিয়াছে; এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৩০সনে ট্রাষ্টডিড রচনা করতঃ ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৮৬০ সনে কেশবচন্দ্র "Signs of Times" বলিয়া যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বাধীনতা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ভাব রহিয়াছে। ১৮৮৩ সনে তাঁহার জীবনবেদে যে "স্বাধীনতা" বিষয়টি বলিয়াছিলেন, তাহা এই যুগধর্ম্মের লক্ষণেই প্রথম পরিব্যক্ত হইয়াছিল।

১৮৬২ সনের ১১ই মাঘ, আদি সমাজ হইতে কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা, বলিতে কি সমস্ত পৃথিবীকে এক করিবে এবং ইহাই সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে। ইহার পরিবর্ত্তী সময়েও কেশবচন্দ্র এই ভাবের উক্তি তাঁহার নানা বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল উক্তিতে বিশ্বাস করিয়াই পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই সমস্ত ভারতের ধর্ম্ম হইবে, এমন কি পৃথিবীর ধর্ম্মও হইতে পারে। স্বনামপ্রসিদ্ধ মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার আত্মচরিতে বা (Nation-makingএ) ২।৩ স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে।

১৮৬৩ সনের ১৮ই এপ্রিল, "Brahmo Somaj Vindicated" বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "বেদের অভ্রান্তবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশ্বজনীন ও স্বাভাবিক সত্য সকলের নিকটেই প্রকাশিত হয়। ইহাতে এসিয়া বা ইউরোপের বলিয়া কোন কথা উঠিতে পারে না। ইহা বেদ, কি বাইবেল, কি কোরাণ, বা অন্য কোন গ্রন্থের একচেটিয়া বস্তু নহে। ইহা তোমার আমার সকলের।" ১৮৬৬সনে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলস্থ উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ আদি সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। ১৮৬৫ সনের ১১ই মাঘ আদি সমাজের বেদী হইতে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইয়াছিল। ১৮৬৬সনের ৫ই মে কেশবচন্দ্র "Jesus Christ, Europe and As-ia" নামক সর্ব্বপ্রথম একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। উহাতে জগতের যাবতীয় মহাপুরুষদিগকেই ব্রাহ্মসমাজ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা নানাভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৬৮ সনে কেশবচন্দ্র টাউনহলে "Regenerating Faith" বক্তৃতায়ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নানাকথা বলিবার পরে বলিয়াছিলেন। যে সরল বিশ্বাসের ভিতর দিয়া ঈশ্বর তাঁহার পরিত্রাণপ্রদশক্তি দ্বারা প্রতি জাতির ও প্রতি মানবের হৃদয়ে স্বর্গরাজ্য ফুটাইয়া তুলেন; এবং তাহাতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৯সনে ২৩শে জানুয়ারী কেশবচন্দ্র টাউনহলে "Future Church" নামক বক্তৃতায়, জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম কি আকারে ও কি আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা অতি বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত জগতে একই ধর্ম্ম যাবতীয় নরনারী দ্বারা স্বীকৃত হইবে। জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে এক ঈশ্বরেরই পূজা করিবে। সকল জাতিই পিতার গৃহে অবস্থিতি করিবে। তথাপি প্রত্যেক জাতিই

তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতঃ স্বাধীন কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। সেখানে সকলেরই ভাবে ঐক্য থাকিবে, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে (Unity of spirit, but diversity of Forms)। এক শরীর, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এক বিশালায়তন সম্প্রদায়, কিন্তু তাহার প্রতিজনেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ক্রিয়াশীল হইবে। ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় গিরীশচন্দ্র নাগ মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য। তিনি তাঁহার প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে কেশবচন্দ্রের এই "Future Church" বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার ঐ বক্তৃতায় ভবিষ্যতের ধর্ম্মসমাজ (Church) কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন। জগতের ধর্মশাস্ত্রসমূহ যে সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মত লইয়া, একে অন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছে এবং যে সকল বিরুদ্ধ মত ও ভাব হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি জাতিকে এতকাল পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নই রাখিয়াছে, তত্তাবৎ নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত খণ্ডিত হইয়া, কি উপায়ে মিলনের দিকে সকলেই উন্মুখীন হইতে পারেন, সে বিষয়ে বলিতে গিয়া কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন যে, শুধু ধর্ম্মমণ্ডলীগুলির হৃদয়ের ও মনোভাবের একত্বের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যতে সংকীর্ণতা দূরীভূত হইয়া, ক্রমশঃ নূতন আলোকবর্ত্তিকার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ লোক-সমক্ষে প্রকাশিত হইবে। সহস্র সহস্র প্রকারের পৌত্ত-লিকতা এবং জড় বস্তুর পূজা অর্চনা, প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্বের আরোপ করতঃ তাহার পূজা, সর্ব্ব প্রকারের অদ্বৈতবাদ, মানুষকে দেবতাজ্ঞানে তাহার অর্চনা বন্দনা পভৃতি শুধু ভ্রম বলিয়া নহে, পরম ঈশ্বরের মহিমা ও পরাক্রমের বিঘ্নকর বলিয়া পরিত্যক্ত ও দূরে অপসারিত হইবে। যখন মানবজাতি ঈশ্বরকেই স্রষ্টা, পাতা ও পিতা জানিয়া একমাত্র তাঁহাকেই ভালবাসিবে, তখন আপনা হইতেই এক নূতন ভাবের আত্মীয়তা সাধিত এবং মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধর্ম্মের নামে আর বিরোধ থাকিবে না; যে সমস্ত মলিনতা, তিক্ততা ও ঘৃণা ধর্ম্মে ধর্ম্মে পার্থক্য রাখিয়া আসিতেছে, সে সমস্ত অপসারিত হইবে। জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মমন্দিরে একমাত্র ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বই আদর্শ হইবে। ধনী ও দরিদ্র, সবল ও দুর্ব্বল, জ্ঞানী ও মূর্খ, সকলেই ঈশ্বরের ঐ মহা মিলনমন্দিরে অবস্থিতি করিবে। জনসমাজ উন্নত ও উদার হইয়া পৃথিবীতে শান্তি এবং মানবজাতিতে মানব-জাতিতে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম জগতের সকল জাতির সাধারণ ধর্ম্ম হইবে; কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাব রক্ষিত হইবে। ইংরাজ জাতি কখনও জার্ম্মাণ জাতি, জার্ম্মাণ জাতি কখনও ইংরেজ জাতি হইবে না। ফরাসী জাতি যেমন স্বকীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিবে, ভারতবর্ষও তেমনি তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষাকরতঃ স্বীয় জাতীয়তা পূর্ণভাবেই রক্ষা করিবে। এই ভাবেই ভবিষ্যতে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান, আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি যেমন তাহাদের নিজ নিজ সুরে, নিজ নিজ যন্ত্রে একমাত্র পরমেশ্বরেরই মহিমা ও পরাক্রমদ্যোতক সংগীত গাহিবে, ভারতও তেমনি নিজের জাতীয়ভাবে জাতীয় ভাষায় একমাত্র তাঁহারই মহিমা ও পরাক্রম প্রকাশ করিবে। হারমোনিয়ামে যেমন বিভিন্ন নানাস্বর থাকিলেও, বাজাইবার সময় সকলের এক অপূর্ব্ব মিলনে একমাত্র সুরই নিনাদিত হয়, তেমনি ভাবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্ব[illegible]ত ধ্বনিসকল একই ধ্বনি বলিয়া বোধগম্য হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নববিধানে শ্রীদরবার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাই রামচন্দ্র সিংহ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। তার আগে লাহোরে চাকুরী করিতেন এবং পরিবার লইয়া প্রবাসে থাকিতেন। শ্রীআচার্য্যদেব যখন ভারতাশ্রম সংস্থাপন করে-ছিলেন, তখন ভাই রামচন্দ্র ধর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত পরিবার পরিজন সকলকে কলিকাতায় ভারতাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরে যখন কমলকুটীর, শান্তিকুটীর, মঙ্গলবাড়ী প্রস্তুত হয়, তার কতকদিন পূর্ব্বেই ভাই রামচন্দ্র সিংহ প্রচারে আপনার জীবন সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা দুটী ভাইয়ে মঙ্গলবাড়ীতে জায়গা লইয়া বাড়ী করিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রচার করিয়া, প্রচারক-পরিবারের সেবক হইয়া, নিজ মঙ্গলবাড়ীতে বাস করে-ছিলেন। কখনও কোথাও যেতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ মঙ্গলবাড়ী ও কমলকুটীর তাঁর প্রিয় স্থান ছিল। শ্রীদরবারে মিলিত থেকে আপন কর্ত্তব্য সাধন করেছেন। শেষ জীবনে ভাই রামচন্দ্র অসুস্থ হয়ে শারীরিক কষ্ট পেয়েছিলেন, তবুও ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, বিশ্বাসীর অটল নিষ্ঠা দেখিয়ে, তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ধন্য প্রেরিতজীবন।

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের জীবনখানি শৈশবকাল হতেই ছিল বৈরাগ্যপ্রধান। তখন হইতেই সংসারে মতি ছিল না। মধ্যে মধ্যে তিনি যোগে মগ্ন থাকিতেন। অতি অল্প বয়স হইতেই মাছ মাংস ইত্যাদি আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করেন। শুনিয়াছি, শ্রীআচার্য্যদেব একবার বলেছিলেন, উপদেশ দিবেন যাঁরা, তাঁদের মুখে পেঁয়াজ রসুনের গন্ধটা পাওয়া ভাল নয়। শ্রীআচার্য্যদেব তো বড় একটা কাহাকেও আদেশ করতেন না, ঐ প্রকারে বলিতেন। ভাই কেদারনাথ জীবনে কখনও এবং পেঁয়াজাদি খান নাই, তিনি ওসকলকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন চেষ্টা করিলেও খাইতে পারিতেন না। ওসকলের কোন প্রকার সংস্রব তাঁহার সহ্য হইত না। তিনি ১৬ বৎসর বা তৎসমকাল

হইতেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম হইলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত নববিধানের আদর্শানুযায়ী সংসারে ধর্ম্মসাধন করে, ভাই কেদারনাথ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকেশবের কাছে ধরা দিলেন। তখন থেকে তিনি শেষের সব জীবন বৈরাগ্যপ্রধান হয়ে প্রচারব্রতে সমর্পণ করেছিলেন। সংসার পরিবার সন্তান সন্ততির সকল ভার আমাদের কাকাবাবু ভাই [illegible]স্তিচন্দ্র মিত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তো ভোর থেকে [illegible] পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের কাছে থাকিতেন, অর্থাৎ কুটিরে রন্ধন, গাছতলায় ভোজন, মিশন অফিসে কাগজ পত্রিকা, পুস্তকের কাজ, ছাপাখানার কাজ ইত্যাদি সকল প্রকার কাজ সম্পন্ন করে, আবার সন্ধ্যায় আচার্য্যদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া, রাত্রি ১২টা বা ১টা এমন সময় গৃহে পৌঁছিতেন। সংসারের কোন খবরই লইতেন না, যাহা কিছু বলিতেন, তাহা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য। লাহোর অঞ্চলে ও নানা স্থানে প্রচারে যান এবং কলিকাতায় থাকাকালীন বাড়ী বাড়ী সকাল ও সন্ধ্যায় উপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। তিনি শান্তভাবে সকল কার্য্য সমাধান করিতেন, এজন্য শ্রীআচার্য্যদেব তাঁহার নাম শান্তসাধক রাখিয়াছিলেন। জীবনের কাজ সুন্দর ভাবে সাঙ্গ হলে, ভাই কেদারনাথ গোবরডাঙ্গার মঙ্গলালয়ে শান্তিলাভ করে ও সকলকে তাহা দান করে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণ এক অভিনব দৃশ্য, তাহা সকলকে মোহিত করেছিল। কত বৎসর হয়ে গেছে, তিনি অনন্ত আনন্দের সেই নববৃন্দাবন শ্রীদরবারে বসে আছেন। এই সকল প্রেরিত ভাইদের নাম-লেখা স্থান নবদেবালয়ে শ্রীআচার্য্যদেবের বেদীর তিন দিকে স্থাপিত আছে।

ভাই কালীশঙ্কর দাস বড় কবিরাজ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি। অনেকদিন তিনি স্বদেশে কবিরাজী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে, শুধু পরিবার নয়, অনেক দরিদ্রদিগকে নানা ভাবে প্রতিপালন ও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীআচার্য্যদেবের কাছে এসে প্রেরিতদলে মিলিত হলেন। কিছুদিন কার্য্যক্ষেত্রে প্রচার ইত্যাদি করার পরে তিনি শয্যাগত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাহার পর নিজ গৃহেতেই অবস্থান করিয়া লেখাপড়ার কার্য্য করিতেন। আবার কখনও প্রেরিত ভাইগণ বিশেষ কিছু থাকিলে, ভাই কালীশঙ্করের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা ও উপাসনাদি করিতেন। ভাই কালীশঙ্কর অনেক সুন্দর গান রচনা করেন। বসিয়া শুইয়া ভগবানের শ্রীদরবারের কাজ যতটুকু পারিতেন করিতেন। যখন প্রথমে আসেন, ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের মঙ্গলবাড়ীতে থাকিতে লাগিলেন। পরে ভাই রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্রের মঙ্গলপাড়ার বাড়ীর অংশ কিনিয়া, তাহা দ্বিতলে পরিণত করিয়া, তাহাতেই সপরিবারে চিরদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁর সমাধি সেখানে স্থাপন করা হইয়াছে। ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সন্তানগণ সহ সেখানে আছেন।

সেবিকা হেমলতা চন্দ

—•—

অভিভাষণ

(পাটনার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মহিলাশাখার সভানেত্রী ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর প্রেরিত অভিভাষণ)

প্রাণে বড়ই আশা ছিল, আজ আপনাদের এই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানের দিনে, আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি পাইব।

কিন্তু তাহা হইল না, রোগ আসিয়া নূতন করিয়া ভগ্ন দেহকে আবার ভাঙ্গিয়া দিল। নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অক্ষম হইলাম। আপনাদের এই পঞ্চদশ অধিবেশন সর্ব্বতোভাবে সফলতা লাভ করুক, এই প্রার্থনা করি।

আজ বহু ভক্ত ও মনীষিবৃন্দ এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়াছেন—তাঁহাদের নিকট হইতে কত নূতন তত্ত্ব, কত নূতন বাণী শুনিবেন ও বলিবেন।

আমারও আশা ছিল, সেই তত্ত্বালোচনায় যোগদানের মহা সৌভাগ্যটুকুও আমার ভাগ্যে ঘটিবে। কিন্তু প্রাণের আশা অপূর্ণই রহিয়া গেল।

আপনাদের কাছে বলিবার মত আমার আর কিই বা আছে? তবে প্রাণের দু'চারটী কথা, জীবনপথে চলিতে চলিতে যাহা আহরণ করিয়াছি, তাহাই আজ আপনাদের নিকটে নিবেদন করিব।

আজ এই নূতন যুগে, নব জাগরণের দিনে, অতীতের দিকে তাকাইলে কত পরিবর্ত্তনই না দেখিতে পাই—সুদূর অতীত যুগ আমাদের নিকটে প্রাণহীন অবহেলিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বর্ত্তমান যুগকে বুঝিতে গেলে, আমাদের দূরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে। প্রত্যেক জাতির একটী নিজস্ব সাধনা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে; সেই সাধনা, সেই বৈশিষ্ট্য নানারূপ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অথবা জাতীয় সমস্যার ভিতর দিয়াও আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে। অতীতকে একেবারে বিস্মরণ করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া, শুধুই বর্ত্তমান প্রগতি-স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া চলিলে চলিবে না। অগ্রগামী গতির সঙ্গে সঙ্গে, যাহা কিছু নিজস্ব, তাহাই সম্বল করিয়া, সঙ্গে রাখিয়া, নব নব ভাব আহরণ করিতে করিতে পূর্ণোদ্যমে পথ চলিব। অতীত ও বর্ত্তমান এই দুয়ের সমস্যার মাঝে আজ আমরা দাঁড়াইয়াছি। একদিকে পুরাতন যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞান, বংশানুবংশপ্রচলিত প্রতিষ্ঠান, রুচি ভাবের সমাবেশ—আর সম্মুখে নূতন নূতন সংস্কার ও পুরাতনভাবরুচিবিদ্রোহী নূতনত্বের বিকাশ। ইহারি সমস্যা-সমাধান আজ আমাদের নিকটে একটী জটিল প্রশ্ন বলিয়া প্রতীত হইয়াছে।

আমি আজিও নিজেকে সেই বহু পুরাতন পূর্ব্বশতাব্দীর জীব বলিয়া পরিচয় দিই—হয়তো নব্য সম্প্রদায়ের সহিত তেমন করিয়া সকল বিষয় মিলাইতে বা মিশাইতে পারিব না।

আবার নব্য সম্প্রদায়কেও একেবারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা সম্ভব বা উচিত নয়। প্রগতি-বাদের স্রোতে স্রোতে সকলকেই চলিতে ও ভাসিতে হইবে—"পরিত্যাজ্য" বলিয়া কোন কথা, তাই বলিয়া মনের কোণে স্থান দেওয়া চলে না। বৃদ্ধ ও বাল্যের মিলন চাই।

ভারতনারীর সম্পদ্ অতীতের গর্ভে সঞ্চিত; সে সব ঐশ্বর্য্যের কথা কেমন করিয়া বিস্মৃত হই? তাই ভারতবাসীর যাহা কিছু সম্বল, যাহা কিছু গৌরব—তার নারীত্বের, তার পুরুষত্বের মহত্ব, তাহারি নিজস্ব সম্পদ! শেষে আমাদের প্রতি মানবের শিরা উপশিরাতে রক্তমাংসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত; তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলা একেবারেই অসম্ভব।

তাই বলি - সেই নিজস্ব নিজত্বটুকু বজায় রাখিয়া, যাহা কিছু আদর্শনীয়, তাহা সংগ্রহ করিতে করিতে, ভারতের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতে করিতে, জীবনের গতির তালে তালে চলিলে আর কিসের ভয়? কিসের সংশয়? আমরা যখন নিজেদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া শুধু বাহিরের বস্তু আহরণে ব্যস্ত হই—তখনি আমরা সমগ্র জাতিকে আহত করি। তাই আমাদের কর্ত্তব্য—জাতীয়তা বজায় রাখিয়া, কথায় কর্ম্মে এক হইয়া—ধর্ম্মপথে থাকিয়া, যদি আমরা ঐকতানে তান মিলাইয়া কঠোর কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি, তবে আমাদের চির বিজয় সুনিশ্চিত। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—"মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মোন্নতি হইত এবং আমাদের দেশের লোকেরা যদি ধর্ম্মের জীবন্ত সত্য সকল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে স্বদেশ-হিতৈষণা শুধু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-রচনায় বদ্ধ থাকিত না, কার্য্যে পরিণত হইত।"

ভারতের সম্বন্ধে কোন কথা ভাবিতে গেলে ও বলিতে গেলে, প্রথমেই মনে পড়ে তার ধর্ম্মের কথা—এই ঋষিপ্রধান দার্শনিকের দেশে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কোন কর্ম্মে অগ্রসর হইতে গেলেই, মনে হয়, যেন বিফলতা লাভ করিতে যাইতেছি। তাই ধর্ম্মবিধানের দ্বারা সমগ্র ভারতকে, বিশ্ববাসীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এক বিরাট মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা। আমাদের সৌভাগ্য যে, আজ বর্ত্তমানে মানবজাতি সেই সাধনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র ছিলেন অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, আতিভাস্বিক ঋষি। তাই তাঁর মহৎ জীবনে ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার, অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে যে জাগরণ আসিয়াছিল, তাহা তিনি পূর্ণ করিতে কোন প্রকার বাধাকেই বাধা মনে করেন নাই—ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার মত প্রকাশ করিয়া ভারতের ঘরে ঘরে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক মহামিলনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই মহাঋষির জীবনালোচনায় বলিয়াছেন—শ্রীকেশবের জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম, ঋষিগণ যেভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব ও প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন শ্রীকেশবও সেইভাবে প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া, স্বদেশী ও বিদেশী সকল সাধু মহাজনদিগের জীবনে তাঁহার প্রকাশ ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই তিনি সেই বিশ্ব ভুবনে প্রকাশিত ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধুদিগকে গ্রহণ করিলেন—এইরূপ স্বদেশের ও বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্ম্মের ও ধর্ম্মসাধনার এক উচ্চতর প্রশস্ততর স্তরে, সার্ব্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ও সাধনার বিশেষত্ব বুঝিলাম। স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম — "এই প্রশস্ততর সার্ব্বভৌমিক স্তরকেই তিনি নববিধান বলিয়াছেন।"

আমার পিতৃদেবের অনেক দৃষ্টান্তের মাঝে একটী দৃষ্টান্ত ছিল—কোন জাতির স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি না হইলে—সেই জাতি কোনদিনও উন্নত বা বিজয়ী হইতে পারে না; তাই তিনি ভারতের নারীজাতির উন্নতিকল্পে ও তাহার ধর্ম্মসংস্কারের জন্য তাঁহার আজীবন সাধনা উৎসর্গ করিলেন। আজ সেই মহা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, এই নব প্রগতির দিনে, এই নব জাগরণের দিনে আমিও বলিতে চাই যে,—কোন দেশের কোন সমাজ ও জাতিই বড় হইতে পারে না—যদি না সেই জাতির নারী-সম্প্রদায় শিক্ষিতা হন। আমাদের দেশে সব থেকে প্রয়োজনীয় কথা হ'লো শিক্ষা—বিশেষ করিয়া নারীশিক্ষা। শিক্ষা বিস্তারিত না হইলে নারীজাতি আপনাদের অভাব অভিযোগ ও তাহার প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পাইবে না। নিজের অভাব নিজে বুঝিতে না পারিলে ও তাহার প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলে, অপরে তাহা করিতে পারে না। নারীর মাতৃত্ব, নারীর স্নেহ, নারীর ভালবাসা ও তাহার সেবা যত্ন, পুরুষকে প্রকৃত পুরুষ করিয়া তোলে। নারী স্রষ্টা, কাজেই পুরুষের পুরুষত্বকে জাগরিত করিয়া তুলিতে হইলে, চাই নারীর সাহায্য ও প্রেরণা। আজ জাতির এই দুরবস্থার দিনে, আমাদেরি কাছে যে প্রধান সমস্যা উপস্থিত, সেই সমস্যা হইতেছে, আমরা নারীজাতি কি ভাবে, কোন পথে অগ্রসর হইয়া, জগতের এই বিবর্ত্তনের দিনে, আমরা নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ উন্নত স্তরে আরোহণ করিতে পারি? এইখানেই আমাদের সমস্যা। আমার ধারণায় এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে, আমাদের শিক্ষা, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের সহযোগিতা ও মন ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টার উপর।

প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যক ব্যবস্থায় পরিণত করিতে না পারিলে চলিতে পারে না; এ বিষয়ে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিকট আর একটী অনুরোধ এই যে, নারীর শিক্ষার মাঝে স্বাতন্ত্র্য যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ছোট ছোট বালিকারাই কালক্রমে সুমাতা ও সুগৃহিণী হইবেন। কাজে কাজেই তাহারা যাহাতে মায়ের মত মা ও গৃহিণীর মত গৃহিণী হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে

আপনারা যদি গ্রন্থাদি নির্ব্বাচন ও প্রণয়ন সম্বন্ধে নীরব থাকেন, তাহা হইলে সকল উদ্দেশ্যই বিফল হইবে।

তারপরে ব্যায়াম সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমাদের মেয়েরা যাহাতে শিক্ষার মাঝে আনন্দ পায়, স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হয়, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঘরে মেয়েদের উপযোগী সহজ ব্যায়াম-বিষয়ক পুস্তকাদির প্রচলন হওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা নিজেরাই গৃহের মাঝেও শরীরের চর্চ্চা করিতে পারে। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যায়ামাগার যা[illegible] সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। যে সব গৃহকর্ম্মে শারীরিক উৎকর্ষ হয়, সেই সকল কর্ম্মে তাহারা যেন উৎসাহ প্রাপ্ত হয়।

ভগ্নীগণ! আজ এই নারী-জাগরণের দিনে আমাদের এতগুলি কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। যদি আমরা পূর্ণ উদ্যমে আন্তরিক সচেষ্ট হইয়া, নিজেদের এই নারীসম্প্রদায়কে জাগাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, এই ভারতের স্ত্রীজাতি আদর্শে, কর্ম্মে, গুণে, বিদ্যায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর নারী-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়া হইবেন।

আজ চারিদিকে নারী-জাগরণের সাড়া দেখিতে পাইয়াছি; তাই আজ সকলের কাণে কাণে ঘরে ঘরে আমরা গাহিয়া চলিব, —"জাগ মাতঃ—জাগ কন্যা—জাগ নারী, জাগ সহোদরা!"

সর্ব্বান্তঃকরণে পরম পিতার নিকট প্রার্থনা জানাই—ভারতের নারীজাতি যেন পৃথিবীর মাঝে প্রকৃত নারী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং আদর্শ বলিয়া সম্মানিত হয়।

সকলের শেষের কথা এই যে,—গার্হস্থ্য, স্বাস্থ্যনীতি, শিশুদের শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থরচনার দ্বারা সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিবার জন্য, আজ আমাদের নারী-সম্প্রদায়ের ব্রতী হওয়া উচিত এবং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসী, ইহুদী, সর্ব্বজাতির মহিলা-সমাজের সহিত ঐক্যসূত্রে, মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অতীতদিনের উদাহরণ সেই গৌরবকে বিস্মৃত না হইয়া—একই স্বার্থে একই সাথে আমাদের পথ চলিতে হইবে। তবেই আমরা আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব।

অসহনীয় অসুস্থতার নিপীড়নে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ এইখানেই আপনাদিগকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলাম। আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ গ্রহণ করিবেন না এবং লেখার ভিতর যাহা ত্রুটী আছে, ক্ষমা করিবেন। নানা অসুস্থতার গ্লানির মাঝে লিখিত—তাই সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশে অক্ষম। আপনারা নিজগুণে সেসব মুছিয়া লইবেন—আশা করি, আগামী বারে আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইব। আপনারা আমার আন্তরিক প্রীতি, ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন। (আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত)

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১০ই জানুয়ারী, (২৬শে পৌষ), বালীগঞ্জে ২১২ ডোভার রোডে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস গুপ্তের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৬নং বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেনে, স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় বসুর পত্নী শ্রীমতী শোভনা বসু, বৎসরাধিকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া, স্বামী, একমাত্র পুত্রসন্তান ও আত্মজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, পরমজননীর শান্তিক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। গত ১লা জানুয়ারী, তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে স্বামী নববিধানপ্রচার ভাণ্ডারে ২০৲, সাধন আশ্রমে ২০৲, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, আদিব্রাহ্মসমাজে ৫৲ এবং শোভনাট্রাষ্টফণ্ডরূপে সম্মিলন সমাজে প্রথম দফায় ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৯ই জানুয়ারী, রবিবার, হাওড়া বাঁটরায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি লেনে, স্বর্গীয় বসন্তকুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক গম্ভীর-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ডাঃ সত্যানন্দ রায় শ্লোকাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন, এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ অনুষ্ঠানাংশ সম্পন্ন করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংগীত করেন। জ্যেষ্ঠজামাতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাস পরলোকগত পূজনীয় শ্বশুরদেবের সংক্ষিপ্ত সুন্দর জীবনী পাঠ করিলে, মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ দীনেশকুমার দাস কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমতী বিধাননন্দিনী মজুমদার বসন্তবাবুর বৈবাহিক শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার প্রেরিত প্রার্থনা পাঠ করেন। বন্ধুবান্ধব অনেকেই উপস্থিত হইয়া পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ২০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, নববিধান প্রচার আশ্রম ২০৲, বাঁটরা অনাথবন্ধু সমিতি ২০৲, বাঁটরা সাধারণ পুস্তকাগার ১০৲, করোনেশান বালিকা-বিদ্যালয় ১০৲, হাওড়া উচ্চ ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয় ১০৲, আদি ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, কলিকাতা কমিসমিতি ১০৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ৫৲, বালকদিগের রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় ৫৲, ভবানীপুর সম্মিলনসমাজ ৫৲, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, বাঁশি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, পুরী ব্রহ্মানন্দ আশ্রম

ও বাগনান আশ্রম ১০৲, বাঁটরা নৈশ বিদ্যালয় ৫৲, মেট্রোপলিটান ক্লাব হাওড়া ৫৲, স্থানীয় অভাবগ্রস্ত পরিবারবর্গের জন্য কাপড় ও দরিদ্রদের জন্য মিষ্টান্নাদি ১০০৲ ও বাবতীয় ভোজ্য দ্রব্যাদি ৩ প্রস্থ।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে স্নেহক্রোড়ে নিত্য শান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা জানুয়ারী (১৭ই পৌষ), বালীগঞ্জে, ২১৭নং রাসবিহারী এভেনিউতে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ দেব উপাসনা করেন। বাঁকিপুরে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দের গৃহে ডাঃ পরেশনাথ চাটার্জি উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে ২৲ ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ১৲ প্রচারভাণ্ডারে এবং শ্রীমতী বনলতা দে মাঘোৎসবে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অদ্য হাওড়ায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, স্বর্গীয় বসন্তকুমার দাসের পিতৃদেব স্বর্গীয় জয়কালী দাসের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

২রা জানুয়ারী (১৮ই পৌষ) ১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউতে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ললিতমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী (২৪শে পৌষ), ব্রহ্মানন্দ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে প্রাতে ৯টায় উপাসনা হয়; ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৬টায় এলবার্ট হলে স্মৃতিসভা হয়। আগামীবারে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অদ্য সন্ধ্যায় ৯নং রামমোহন রায় রোডে, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাসের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভাই নগেন্দ্রনাথ বানার্জির পুত্রবধূ স্বর্গীয়া খোকার সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

ভাগলপুর সংবাদ—গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে ভাগলপুরে শ্রীযুক্তা অকিঞ্চনবালা বসুর গৃহে, খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিরোধানদিনে, ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে বিশেষ অধিবেশনে, একটী সংগীতের পর শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা লিখিত কেশব-চরিতের পরিশিষ্ট হইতে পাঠ করিয়া বিশেষ কয়েকটি ভাব ব্যাখ্যা করিয়া প্রার্থনা করেন। সংগীতের পর অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

গত ৯ই জানুয়ারী প্রাতে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জির সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার গৃহে, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন। ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ শ্রদ্ধাভক্তিসহ যোগদান করেন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ১৯শে নবেম্বর, ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনে কেশবাশ্রমে, ২৯শে নবেম্বর আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় করুণাচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে কেশবাশ্রমে সমাধিপার্শ্বে, ৩০শে নবেম্বর কেশবাশ্রমে সমাধিপার্শ্বে মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের একমাসপূর্ণ দিনে, ১২ই ডিসেম্বর শ্রীমান্ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের [illegible] উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে, ২০শে ডিসেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় মহারাজা স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের পঞ্চদশ বার্ষিক সাম্বৎসরিক দিনে, ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীঈশার জন্মদিন উপলক্ষে এবং ২৮শে ডিসেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে পুনঃ ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনা হয়। ২৯শে নবেম্বর ব্রহ্মানন্দকন্যা শ্রীমতী সুজাতা সেন এবং অন্যান্য দিনে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

পাটনায় স্মৃতি-বার্ষিকী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ৫৪তম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে গত শনিবার (৮ই জানুয়ারী) সন্ধ্যায় বি এন কলেজে এক সভা হয়। ডাঃ দ্বারিকানাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের আদর্শ ও কর্ম্মধারার আলোচনা করেন। অধ্যাপক পি, কে, সেন বলেন যে, কেশবচন্দ্র আজ বাঁচিয়া থাকিলে বর্ত্তমান জগতের হিংসা, দ্বেষ দূর করিতে পারিতেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁহার মতে কেশবচন্দ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। মিঃ ঈশ্বরী সহায় বলেন যে, কেশবচন্দ্র নব্যভারতের স্রষ্টাদের অন্যতম। রেঃ এইচ ব্রিজেস বলেন যে, যদিও কেশবচন্দ্র ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতি আজও বহু ভারতবাসীর মনে জাগরূক রহিয়াছে। মিঃ কে বি শ্রীবাস্তব ও মিঃ ডি এন সেনও বক্তৃতা দেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

কমমূল্যে পুস্তক বিক্রয়

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও মাঘোৎসব উপলক্ষে, ১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) হইতে ২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত কমমূল্যে পুস্তক বিক্রয় হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব।

আহ্বান।

"অনন্তের মহামহোৎসবে, মাত ভাই জগবাসিগণ।
মিশে এক সুরে, এক প্রাণে, অনন্তের মহাগানে,
করি জীবন-সঙ্গীতের সম্মিলন।"

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৪৪, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷০টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, রবিবার—সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে উৎসবের আহ্বান।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷০টায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশানবরণ।

৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রাতে ৯টায় মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজীতে উপাসনা। অপরাহ্নে বিডন স্কোয়ারে উৎসবের আহ্বান।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, বুধবার—সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে যুব-উৎসব।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬৷০টায় স্মৃতিসভা। অপরাহ্নে হরিশ পার্কে উৎসবের আহ্বান।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, শুক্রবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৯টায় আর্য্যনারীসমাজের ও ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব। সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, শনিবার—প্রাতে ৯টায় ১৪৮নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে কেশব একাডেমী স্কুলে উৎসব। সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে বিধানমূরলী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭৷০টায় কীর্ত্তন, ৮৷০টায় উপাসনা; মধ্যাহ্ন ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫৷০টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬৷০টায় উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, সোমবার—নগরসঙ্কীর্ত্তন; প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং অপরাহ্ন ৩৷০টায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে।

১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রাতে ৮৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, বুধবার—নববিধান-ঘোষণার দিন; প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধান-বিশ্বাসীদিগের সম্মিলন ;—সভানেত্রী মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী।

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীদরবারের উৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬৷০টায় শ্রীদরবারের বার্ষিক সভা।

১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, শুক্রবার—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, অপরাহ্ন ৫টায় প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ন ৪৷০টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, বালকবালিকাসম্মিলন ও পুরস্কার-বিতরণ। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণপত্র-প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)—প্রাতে ৯টায় ১২।১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে "অনাথ আশ্রমে" উৎসব।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, রবিবার—উদ্যান-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷০টায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে শান্তিবাচন।

১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

ভক্তির অঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন,

ভক্তির অঞ্জলিরূপে এই মহোৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ, ১০০সি, পার্ক ষ্ট্রীট ঠিকানায় ডঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধের নামে, যিনি যাহা পাঠাইবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ৮ই ও ৯ই মাঘ ঝুলি ধরা হইবে।

নিবেদন।

মফঃস্বল হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন' তাঁহারা কে কখন আসিবেন, তাহা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধকে জানাইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৯৫, কেশবচন্দ্র সেন, ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১লা জানুয়ারী, ১৯৩৮।

বিনীত—
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

৭৩ ভাগ। ২য় সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ, রবিবার, ১৩৩৪ সাল, ১৮৫৯শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
30th. January, 1938 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, উৎসবদায়িনী জননী, ধন্য তুমি। আবার তুমি অপার করুণাগুণে আমাদিগকে উৎসব সম্ভোগ করিতে দিলে। তোমার স্বর্গে তুমি নিত্য উৎসব করিতেছ। পৃথিবীতে তাহারই প্রবাহ যখন প্রবাহিত কর, তখনই আমরা উৎসব-সম্ভোগে ধন্য হই। বিজ্ঞান বলেন, পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে কখনও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, কখনও তাহা হইতে দূরে পড়ে। যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবীতে সূর্য্যের প্রখর তেজ সম্ভূত হয়, প্রবলবেগে আকাশের বাতাস ঝড়ের আকারে বহিতে থাকে, কখনও বা মুষলধারে বারিবর্ষণ হয়। উৎসবও তেমনি। উৎসবে পৃথিবী স্বর্গের নিকটবর্ত্তী হয়, কিম্বা স্বর্গ ধরায় অবতীর্ণ হয়। স্বর্গের জননী তুমি, স্বর্গের দেবদেবীদিগকে লইয়া আমাদের এই ধরায় আসিয়া দেখা দিলে। তোমারই কৃপাগুণে আমরা স্বর্গের দেবদেবীগণের পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হইলাম। লোকে যেমন বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, তোমার এবং তোমার দেব-[illegible]দিগণের সঙ্গলাভে এই উৎসবে আমরা স্বর্গবাসের সৌভাগ্য পাইলাম। এবারকার উৎসবে [illegible]ভাবে তুমি জীবন্ত মাতৃরূপে দেখা দিলে। তোমার আরতি করিয়া, লাবণ্যময়ী মা, তোমার উজ্জ্বল জ্যোতি ও প্রেমরূপখানি প্রত্যক্ষ দেখিয়া ধন্য হলাম। আবার তোমার রূপের প্রতিভা তোমার সন্তানগণের মুখেও দেখিলাম। তোমার স্বর্গস্থ সন্তানগণ তোমার এক এক খানি স্বরূপের প্রতিমা। আবার তোমার আলোর প্রভাবে সংসারের কালো ছেলে মেয়েদের মুখও কেমন ভাল হয়, তাহাও তুমি দেখাইলে। ধন্য মা, তুমি এবার, সকল বিশ্বমানবের সহিত এক অখণ্ডে মানবরূপে নববিধানে যে নবশিশু শ্রীকেশবকে গঠন করিয়াছ, তাহা ভাল করে দেখাইলে। তুমি আমাদিগকে যে মানবাদর্শে জীবনে গঠন করিতে চাও, তাহাও হৃদয়পটে অঙ্কিত করিলে। এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমারই কৃপাগুণে এই আদর্শজীবনলাভে ধন্য হইতে পারি। তুমি যেমন জীবন্ত, তোমার সন্তানও চিরজীবিত। তুমি তাঁহাকে স্বহস্তে গঠন করিয়াছ। সন্তান মানুষ করা মায়েরই কাজ, তবে তো আমাদিগকে মানুষ করার ভার তোমারই হাতে। উৎসবে যদি আমাদিগকে আনিলে এবং স্বর্গের ছবি দেখাইলে, মানবজীবনের আদর্শ প্রতিফলিত করিলে, তবে আমাদের জীবনেও তাহা চির প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের হাতে আর আমাদের জীবন রাখিও না। তুমি জীবন্ত মা হয়েছ, এবং জীবন্ত বিশ্বমানবের রূপে আমাদিগকেও

একাঙ্গ করিয়া, তোমার মানুষ করিয়া লও। সকল মানুষ এক মানুষের মত মানুষ হইয়া, মানবজীবনের সার্থকতা-লাভে যেন ধন্য হইতে পারি। তুমিও তাহাই করিতে যেমন চাহিতেছ, তেমনি তোমার শ্রীকেশবকেও আমাদের ধর্ম্মবন্ধু এবং নববিধান-সাধনের সহায়রূপে পাঠাইয়াছ, ইহা যেন পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারি। তোমার কৃপায় এবং কেশবের সঙ্গ সহায়তায়, যেন আমাদের জীবনে তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

জীবন্ত মা, জীবন্ত সন্তান

জীবন্ত যে সত্তা, তাহা ক্রিয়াশীল। মৃত যে, সে নিষ্ক্রিয়। জীবনের লক্ষণ ক্রিয়াশীলতা। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রমাণ তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলে, জীব-জন্মে এবং নিত্য নিত্য নব নব জীবন-প্রবাহে ও শক্তি-প্রকাশে লক্ষিত হয়। যে বীজে জীবনীশক্তি আছে, তাহা হইতেই অঙ্কুর উদ্গত হয়। যাহাতে তাহা নাই, তাহা মৃত। মৃত বীজ অঙ্কুরিত হয় না। জীবন হইতেই জীবন উদ্ভূত হয়। জীবন্ত মাই জীবন্ত সন্তান প্রসব করেন।

জীবন্ত ঈশ্বরই জীবন্ত মানব-সকলকে জীবন দান করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানও আবিষ্কার করিতেছেন, এক জীবনীশক্তি সমুদয় বিশ্বময় জীব-জগতে এবং সর্ব্ব পদার্থে তাঁহার জীবন সঞ্চার করিয়া, জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। তাই জীবন্ত মার জীবন্ত সন্তান। তাই নববিধান জীবনের বিধান, ইহা জীবন্ত মার জীবন্ত বিধান।

ঈশ্বর যদিও চির জীবন্ত এবং চির জাগ্রত, জড়বুদ্ধি মানব তাহার মনের কল্পনায় সেই জীবন্ত ঈশ্বরকেও মৃত নিষ্ক্রিয় বা নিজ হাতের পুতুল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে আপনারাই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে; এই জন্য এখন মানুষের হাতে পড়িয়া, ঈশ্বর হয় মৃৎ-পুত্তলিকায় বা পুস্তকে বা বিচার-সিদ্ধান্তে বা দার্শনিক তত্ত্বে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু নববিধানে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবন্ত মাতৃরূপে প্রকট হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবে সকল ধর্ম্মকে, সকল সম্প্রদায়কে, সকল সাধু মহাজনকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং মানবজগৎকে নব জাগরণ দান করিয়াছেন; তাই নববিধানে তিনি যেমন জীবন্ত, নববিধান-প্রবর্ত্তকরূপে যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিও চিরজীবিত। নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্র এখন অবশ্যই জড়দেহমুক্ত হইয়া আত্মিক জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি আত্মালোকে অমরাত্মা-রূপে যে চিরজীবিত হইয়া রহিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। নিরাকার পরমাত্মা জড়াকারে দৃশ্যমান হন না, কিন্তু তিনি চিন্ময়রূপে চির জীবন্ত এবং জাগ্রত, ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি; তাই নিত্য তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা করি এবং তাঁহার সহিত যোগ-সমাধানে আমরাও নব নব জীবনলাভে ধন্য হই। তাঁহাকে যদি মাতৃরূপে প্রকট বলিয়া বিশ্বাস করি, মাতৃ-আত্মা সন্তান-আত্মার সহিত চির যোগে যুক্ত, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। মা কখনও সন্তান ছাড়া নন। মা যেখানে, সন্তান সেখানে।

তাই ইহলোকস্থ বা পরলোকস্থ সকল আত্মাই অমরাত্মা; মা যেখানে, তাঁহারাও সেখানে, ইহা বিশ্বাস-চক্ষে দর্শন করিতে হইবে। কেশবচন্দ্র বলিলেন, পরলোককে ঘরে আনিয়াছি। যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সে পরলোক দর্শন করে।

সেই ভাবে যখনই আমরা নববিধানের মাকে উপাসনায় দর্শন করি, নববিধান-মূর্তিমান মানবও যে অচ্ছেদ্য যোগে মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইবে। সসন্তানে মাতৃপূজা নববিধানের বিশেষ পূজা। এ বিধানে কেবল ঈশ্বরের পূজা হয় না। বাতাস ছাড়া আকাশ যেমন কল্পনা মাত্র, তেমনি ভক্তসন্তান ছাড়া ভগবানের পূজাও কল্পনা।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিখিয়াছি, তাই আমাদের উপাসনা ব্যক্তিগত হইয়া ক্রমে জীবনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে যেমন ঈশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমন ভ্রাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ব্রহ্মের সহিত যোগ-সমাধান প্রাচীন বিধান। নববিধানে যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগ-সমাধান, তেমনি ঈশ্বরের সন্তান মানবের সহিত যোগ-সমাধান যুগপৎ করিতে হইবে, নতুবা নববিধানের পরিত্রাণ লাভ হইবে না। এইজন্য কেশবচন্দ্র বলিলেন, "কেবল ঈশ্বরের উপাসনায় হইবে না, ব্রহ্মখণ্ডরূপে মানব ভাইকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা তাহা করিতে

পারিতেছি না বলিয়াই পরিবার হইতেছে না, দল হইতেছে না।

নববিধানে ভ্রাতৃত্বের প্রতিনিধিরূপে নববিধানজননী শ্রীকেশবচন্দ্রকে প্রেরণ করিয়াছেন ও গঠন করিয়াছেন। যদি আমরা নববিধান-জননীর পূজা করি, তবে নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্রকেও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা আমাদের পূর্ণ নববিধান সাধনা হইবে না, আমাদের উপাসনা আংশিক উপাসনা হইবে। যদি আমরা নববিধানের পরিত্রাণ চাই, কেশবচন্দ্রকে ছাড়িয়া আমাদের মাতৃপূজা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে? ছেলে ফেলিয়া মাতো একা দেখা দেবেন না; তাই তাঁহার বিধান বলিয়া ইহা অবশ্য মানিতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে বিধান প্রবর্ত্তকদিগকে মধ্যবর্ত্তী অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া, সেই সব ধর্ম্মসম্প্রদায় ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন; তাই পাছে বর্ত্তমান বিধান-প্রবর্ত্তক সেই ভাবে ঈশ্বরের অবতার বা গুরু হইয়া পড়েন, এই ভয়ে ব্রাহ্মসমাজ আতঙ্কিত। কিন্তু বিধাতার বিধান মানব-প্রবর্ত্তকের দ্বারাই যখন প্রবর্ত্তিত এবং ঘোষিত হয়, তখন বিধাতার অভিপ্রায় বলিয়া না মানিলে চলিবে কেন। শ্রীকেশবচন্দ্র যাহাতে ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত না হন, তাহার পথ তিনি চিরতরে বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের ভাই এবং বন্ধু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং আমাদের ধর্ম্মসাধনের সমযোগী আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। জীবন্ত মার কোলে জীবন্ত ভাই রূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহিত সমযোগে নববিধান-সাধনায় নববিধানপরিবার এবং নববিধানদলগঠনে যেন সক্ষম হই।

তাঁহাকে গ্রহণ করার সাধনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমাকে বুদ্ধির খাঁড়া দিয়া কাটিও না, কল্পনার একটা কেশব খাড়া করিও না, জল ছাড়া মাছ লইও না।" অর্থাৎ জীবনের জীবন মাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে আমরা যেন গ্রহণ না করি, বুদ্ধি খাঁড়া দিয়া কাটিয়া মৃত কল্পিত কেশব যেন আমরা গ্রহণ না করি। জীবন্ত সজীব কেশব, নববিধানে মূর্ত্তিমান কেশব, পূর্ণ মানবত্বের আদর্শের দিকে প্রগতিশীল কেশব নিত্য মার বক্ষস্থ, ইহা বিশ্বাস করিয়া, জীবন্ত মার পূজায় জীবন্ত কেশবজীবনলাভে আমরাও যেন নববিধান-মূর্ত্তিমান হই।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

যন্ত্রে যন্ত্রে মিলন

"মন আপনি বুঝিতে পারে, কখন যন্ত্র শিথিল অথবা বিকল হয়, এবং কখন ইহার মিল হয়। চৌদ্দখানি যন্ত্র চলিতেছে, তন্মধ্যে আমরাও একখানি যন্ত্র। সমুদয়ের সঙ্গে আমাদিগের যোগ হইয়াছে কিনা, আমাদের নিজের বিবেকই তাহা বলিয়া দেয়। সুস্বর হইতেছে, না অমিল হইতেছে, বিবেক-কর্ণ তাহা বুঝিতে পারে। যাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-যন্ত্র ঘুরিতেছে, আমরাও তাঁহারই হস্তের যন্ত্র। সমুদয়ই যন্ত্রগুলিকে একত্র করিয়া তিনি একখানি প্রকাণ্ড যন্ত্র বাজাইতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোটী ভক্ত একত্রে গান করিলেও একটী স্বর হয়। যদি বল, অমুক বিদেশী ঋষির সঙ্গে কিরূপে আমার মিল হইবে, কারণ তিনি ম্লেচ্ছ, তাহা হইলে তোমার নিজের বিবেক-কর্ণই বলিয়া দিবে, বিশ্বযন্ত্রের সঙ্গে যখন তুমি সুর মিলাইয়া লইতে পার নাই, তখন তোমার কিছুই হয় নাই; তুমি শান্তিধামে যাইবার উপযুক্ত নহ। যতদিন পৃথিবীর একটী লোকের সঙ্গেও তোমার অমিল থাকিবে, ততদিন সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। অতএব কাহারও সঙ্গে বিরোধ রাখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মসাধন অথবা ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইবেন, তাঁহারা যে পৃথিবীতে কীর্ত্তি এবং স্বর্গে মোক্ষ লাভ করিবেন মনে করেন, তাঁহাদিগের এই দুইয়ের কোন আশাই পূর্ণ হইবে না।"

জীবন-বীণা ঈশ্বরকে বাজাইতে দাও

"বিশ্বযন্ত্র এক দিকে, আমি আর এক দিকে। সংসারের সঙ্গেও মিল হইল না, ধর্ম্মরাজ্যের সঙ্গেও মিল হইল না। আজ স্বর্গের দেবতারা এক সুরে গান করিলেন, আমার কিছুতেই উঁহাদিগের সঙ্গে মিল হইল না। আর একদিন হয় ত এমনই মিল হইল যে, বোধ হইল, যেন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে এক জন ঋষি স্তব করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার স্তব মিলিয়া গেল। বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে গূঢ়ভাবে এই ঐক্য, অভিন্নতা সুশৃঙ্খলা, মাধুর্য্য রহিয়াছে; তাঁহার নিকটে আমরা সকলেই একখানি যন্ত্র। অতএব প্রত্যেক ব্রহ্মসাধককে দেখিতে হইবে, পৃথিবীতে কতদূর সেই প্রেম পরিবার হইল। ফাঁকি দিয়া একাকী মোক্ষধামে যাইবে, কেহই ভ্রমেও এরূপ মনে করিও না। পৃথিবীতে কিসে এই স্বর্গধাম আসে, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। বিবেক-কর্ণে শুন, বিশ্বযন্ত্রের সঙ্গে তোমাদিগের মিলন হইয়াছে কি না। ব্রহ্মের বড় সাধ, সকলকে একত্র করিয়া তিনি বাজান। ঈশ্বর যদি বীণা বাজাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, অবাধে তাঁহাকে বাজাইতে দাও। ইহাতে তোমাদিগেরও মোক্ষধাম লাভ হইবে, এবং ব্রহ্মও তাঁহার বীণা-যন্ত্র হইতে আশ্চর্য্য সুমধুর স্বর বাহির করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিবেন।" (কেশব)

স্বর্গীয় বসন্তকুমার দাস

(৯ই জানুয়ারী, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আজ আমরা যে পরলোকস্থ আত্মার প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবার জন্য সমবেত হয়েছি, তিনি আমাদের কাহারও পিতা, কাহারও পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তজ্জন্য তাঁর জীবনের, বিশেষতঃ প্রথম বয়সের, সব কথা আমরা জানি না; তবে আমরা যতটুকু জানি বা শুনেছি, তার কিছু বলবার চেষ্টা করিব।

তিনি ১২৭১ সালে, ১৪ই অগ্রহায়ণ, হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে, তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ওভারসিয়ারি পাশ করেন। এই সময় তাঁর বিবাহ হয়। ওভারসিয়ারি পাশ করে, তিনি আসামের পি, ডবলিউ, ডিতে চাকুরী লন। আসামের সুদূর মণিপুরে ও নাগা হিল্ অঞ্চলে তখন বনজঙ্গল কেটে ও পাহাড়ের উপর দিয়ে নতুন রাস্তা তৈয়ারী হচ্ছিল; তাঁকে সেই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। তখন ঐ সকল স্থান দুর্গম ছিল এবং ভীষণ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যানীপূর্ণ ছিল। রেলওয়ে ষ্টেশন হতে ১০।১৫দিন ঘোড়া কিম্বা ডুলি করে যেতে হত। পাছে অভিভাবকগণ বাধা দেন, সেজন্য তিনি গোপনে ঐ চাকরি যোগাড় করেন, এবং প্রথমে একা, পরে আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবীকে বালিকা অবস্থায় নিয়ে গিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। এখন অবশ্য যুবকদিগের মধ্যে নানাদিকে সাড়া পড়ে গিয়াছে, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একজন ২২।২৩ বৎসর বয়সের বাঙ্গালী যুবকের সেই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে গমন করা কিরূপ দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক, তাহা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করছেন।

কার্য্যোপলক্ষে তাঁকে একা ঘোড়ায় করে বনমধ্যে যাতায়াত করতে হত। শুনা যায়, সে সময় তাঁকে বহুবার বাঘের মুখে পড়তে হয়েছে, এবং একবার সর্পদংশনে তাঁর প্রাণহানির সম্ভাবনাও হয়েছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়কুমার যে বীর হৃদয় ও অসীম সাহসের পরিচয় উত্তরকালে দিয়েছিলেন, তার বীজ যে এই নির্ভীক পিতার নিকট হতে এসেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

১৫।১৬ বৎসর আসামে কাটিয়ে, শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে, তিনি পি, ডবলিউ, ডির চাকুরী ত্যাগ করে, হাওড়ায় চলে আসেন। কিছুদিন পরে তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরি লন, এবং অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত ঐ কাজই করেন। তাঁর কর্ম্মকুশলতা, সততা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য হাওড়াবাসী ইতরভদ্র সকলেরই তিনি অতি প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই তাঁকে নানাদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতেন।

পিতামহ পুণ্যাত্মা সাধু হরকালী দাস মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে সন্তানগণ ও পরিবারস্থ সকলে কিরূপ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তা অনেকেই জানেন। তাঁর মধ্যম পুত্র, আমাদের পিতৃদেবের অন্নপ্রাশনের সময় হতেই তাঁহার গৃহে ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হয়। সাধু ভক্তগণের সমাগমে ও মধুর ব্রহ্মনামে সে গৃহের আবহাওয়া অতি পবিত্র ও সুন্দর হয়েছিল, সেই পূত আবহাওয়ার ভিতর বর্দ্ধিত হয়ে সন্তানগণের হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা জেগেছিল এবং তাঁরা এক উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করেছিলেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় দেখা যেত, ভক্ত হরকালী শান্ত সমাহিত হয়ে বসে আছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকুমার সুমিষ্টকণ্ঠে "নাথ, তুমি সর্ব্বস্ব আমার" "হরি হে এ দেহে আজ সদা বর্ত্তমান" গান করছেন, মধ্যম বসন্তকুমার, কনিষ্ঠ শরৎকুমার, কন্যাগণ, পৌত্র পৌত্রীগণ স্থির ভাবে যোগ দিচ্ছেন, সে দৃশ্য সত্যই স্বর্গীয়! আমাদের পিতৃদেবের মধ্যে যে সত্যপ্রিয়তা, সততা ও উচ্চভাব সমূহের সমাবেশ আমরা পেতাম, তাহা যে সেই পবিত্র আবহাওয়ায় উপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়েছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়।

বাবা প্রকৃতির ও সৌন্দর্য্যের একজন উপাসক ছিলেন। গাছ, ফুল, পাখী তিনি খুব ভালবাসতেন। প্রকৃতির শোভা সম্পদের ভিতর তিনি যে অপার আনন্দ পেতেন, তাহাই, বোধ হয়, যৌবনে তাঁকে আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে, সুদূর আসামের জঙ্গলে থাকতে সক্ষম করেছিল। কর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র অবসর সময়ে তিনি গাছপালার ভিতর ডুবে থাকতেন, নানা দেশবিদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সংগ্রহ করতেও তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। শেষ বয়সে দার্জ্জিলিং ও রাঁচিতে তাঁর দিনগুলো খুব আনন্দে যে কাটিত, তা বুঝতে পারা যেত। দেখা যেত, যখন দ্বিপ্রহরে সকলে বিশ্রাম করছেন, তিনি বাগানে ঘুরে ঘুরে কোন গাছে কি ফুল ফুটল দেখছেন ও অনিমেষনয়নে তার দিকে চেয়ে আছেন।

তাঁর হৃদয় ছিল খুব কোমল। কোন দুঃখের কাহিনী শুনলে তাঁর চোখ দিয়ে দরদরধারে অশ্রু প্রবাহিত হত। কেহ কোন অভাব জানালে, তিনি যথাসাধ্য তা দূর করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর দান ছিল অতি গোপন। তাঁর প্রকৃতি শিশুসুলভ সরল ছিল। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশতেন। অনেক অল্পবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বন্ধুভাবে গল্প করতেন এবং তাঁরাও সর্ব্বদা তাঁর কাছে এসে কিম্বা একসঙ্গে বেড়িয়ে আনন্দ অনুভব করতেন।

১৯৩৩ সনে আমাদের স্নেহময়ী জননীর পরলোকগমনে তিনি প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পান; পরে ১৯৩৫সনে কৃতী পুত্র বিনয়কুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তিনি উহা অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করেন। তারপর হতেই তিনি ওপারে গিয়ে প্রিয় আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদ্গ্রীব হন। কথাবার্ত্তায় বোঝা যেত, তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন।

গত ১লা ডিসেম্বর, রাঁচিতে অবস্থানকালে তাঁর পায়ে একটী ঘা দেখা দেয় ও তজ্জন্য জ্বর হতে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে তাঁকে ঢাকায় আনা হয়। ঘা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে ও জীবনীশক্তির হ্রাস হতে থাকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ডাক এসেছে। আশ্চর্য্যরূপ ধীর ও স্থির ভাবে তিনি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। কোন দিন কষ্টের কথা প্রকাশ করেন নি। যখনই কেহ জিজ্ঞাসা করেছেন, "কেমন আছেন," সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছেন, "ভাল আছি"। সর্ব্বদাই হাত জোড় করে বুকে ও কপালে রাখতেন। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে যাবার চেষ্টা করতেন। অবশেষে ২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার প্রত্যুষে প্রায় ৫—৪৫মিঃ সময়, তিনি সেই পরমজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করলেন। তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর হয়েছিল।

দয়াময়ি মা! তুমি আমাদের পিতাকে তুলে নিলে, আমরা নিজেদের কত অসহায় ও দুর্ব্বল মনে করছি। কিন্তু তুমি পিতার পিতা হয়ে সর্ব্বদাই আমাদের কাছে কাছে রয়েছ। তুমি নিজ হাতে যে বেদনা দিলে, তা সহ্য করবার শক্তি তুমিই আমাদের দাও। আর তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের পিতা যে উচ্চ আদর্শ রেখে গেছেন, সেই আদর্শ অনুযায়ী আমরা নিজ জীবন যেন গঠন করতে পারি।

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দাস।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

মহাপুরুষেরা আসেন তখন, যখনম ানবসমাজে দেখা দেয় অবসন্নতা, হীনতা ও ধর্ম্মের অধঃপতন। তাঁহারা আসেন দুর্ব্বার গতিতে—সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া। তাঁহারা উদ্গীরণ করেন বিদ্রোহের সুর—যাহা মানবের চলার পথের সমস্ত জঞ্জাল অপসারিত করিয়া দেয়। অসীম তাঁহাদের আত্মার স্বাধীনতা, দুরন্ত অগ্নিশিখার মত তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জ।

কেশবও ছিলেন এই জাতীয় মহাপুরুষ। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন দুর্নিবারবেগে ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছিল, তখন হঠাৎ রামমোহন আসিয়া তাহার রাশ ধরিয়া ফেলেন। তিনি ভারতের বুকে যে হোমানল প্রজ্বলিত করিলেন, তাহারই উগ্র আলোক ভারতবর্ষকে দিল পথ দেখাইয়া। তাঁহার পর যিনি হইলেন সেই হোমানলের অগ্নিহোত্রী, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। কিন্তু শক্তিশালী দুইটী প্রতিভা কখনই একযোগে কার্য্য করিতে পারে না। তাই অচিরেই ব্রহ্মানন্দ ও মহর্ষির মধ্যে আদর্শের সংঘাত বাধে এবং ফলে কেশবচন্দ্র জন্ম দিলেন "নববিধান সমাজের" এবং দেবেন্দ্রনাথ জন্ম দিলেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজের"। কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের সৌহার্দ্দ্য ও সম্প্রীতি ছিল চিরদিন অটুট।

বাল্যকালেই কেশবচন্দ্রের মনে ভগবৎপ্রেমের বন্যা বহে। এই আকুলতাই তাঁহাকে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনায় নিয়োজিত করে। জীবনের প্রভাতেই যে প্রেরণায় তাঁহার অন্তর উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, যে অগ্নিময় তাঁহার জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্বতঃ ধ্বনিত হইয়াছিল ভগবানের প্রত্যাদেশস্বরূপে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "God himself told me this, no book, no teacher, but God himself in the secret recesses of my heart. God spoke to me in unspeakable language, and gave me the secret of spiritual life, and that was 'prayer'.........."

এই প্রার্থনাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। যখনই জীবন সমস্যা-সঙ্কুল হইয়া উঠিত, দৈন্য, সংশয় আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত, তখনই আকুল অন্তরে তিনি প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনায় ছিল পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও অসাধারণ ভক্তির সংমিশ্রণ। তাই অন্তরে তিনি লাভ করিতেন ভগবানের প্রত্যাদেশ —যাহা তাঁহার সমস্ত জটিলতাকে দূর করিয়া জীবনকে পরিচালিত করিত সহজগতিতে। বস্তুতঃ বিশ্বাসই ব্রহ্মদর্শনের মূলীভূত কারণ। "faith is perpetual progress heavenward. ......The maturity of faith is love, for love completeth the union which faith begineth." কেশবচন্দ্র ছিলেন এই বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতীক।

কেশবচন্দ্রের অন্তরে ভগবদুপলব্ধি ছিল প্রত্যক্ষ, এবং অখণ্ড পরমাত্মার সহিত ঘটিয়াছিল তাঁহার নিবিড় মিলন। বিরাটের সংস্পর্শে সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, মলিনতা ও সর্ব্বপ্রকার অধীনতা অতিক্রম করিয়া, তাঁহার চিত্ত পৌঁছিল অসীমত্বে। তাই সংকীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই কারণে তিনি নিখিল মানবকে দেশ ও ধর্ম্মের গণ্ডী দ্বারা বিভক্ত করিয়া দেখিতে পারিলেন না—সকলেই এক অখণ্ড মানবাত্মারূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল। তাই যীশু খৃষ্ট, মোহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কনফুসিয়স্, জরথুস্ত্র সকলেই তাঁহার নিকট সমান ভক্তি পাইলেন এবং বিশ্বমানবকে সমভাবে দিলেন প্রেমালিঙ্গন। এই সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী। তিনি নিজেই বলিয়াছেন:—

"The new faith is absolutely synthetical. Its life is in unity above everything else. It values synthesis above analysis, one above many. As a member of the universal theistic church, I have protested against all manner of sectarian antipathy and unbrotherliness, and advocated the

unification of all churches and sects in the love of one true God"

এই সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিতে গিয়া একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতা বা Sectariarism শুধু আধ্যাত্মিক জগৎ কেন, বিজ্ঞানও তাহা সমর্থন করে না। বিজ্ঞানেরও গোড়ার কথা একত্ব—"One only without a second" কিন্তু বা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ বিজ্ঞান দেশকালক্রমে বিভিন্ন নয়। প্রাচ্যের জ্যোতিষ এক প্রকার এবং প্রতীচ্যের জ্যোতিষ আর এক প্রকার হইতে পারে না। ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্র, ইউরোপের অঙ্কশাস্ত্র, চৈনিক অঙ্কশাস্ত্র - অঙ্কশাস্ত্রের এইরূপ বিভাগ চলিতে পারে না। জাপানের ভূতত্ত্ব বা প্রাণিতত্ত্ব ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্ব বা প্রাণিতত্ত্ব হইতে পৃথক নয়। সত্য যাহা, তাহা দেশ বা কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়—তাহা সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের। ভগবান যদি হন একমেবাদ্বিতীয়ম্, তবে ধর্ম্মও হইবে এক। "If God is one, His church must be one." বাহ্যদৃষ্টিতে অসংখ্য ধর্ম্মমতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া গেলেও মূলতঃ সকল ধর্ম্মই এক চিরন্তন সত্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেকটী ধর্ম্মমত এবং সমাজ যেন এক একটী বাদ্যযন্ত্র। প্রত্যেকটীর বিভিন্ন সুর হইলেও, উহাদের ঐক্যসাধন করিয়া বাজাইলে, উহারা আমাদিগকে আনন্দই প্রদান করে। ঐক্যতান বাদন আমাদের কর্ণের পীড়াদায়ক নহে, বরং তৃপ্তিকর। তাই কেশবচন্দ্র সকল ধর্ম্মমতকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন এক আদর্শ ও অভিনব সমাজের প্রতিষ্ঠা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের জন্য কেশবচন্দ্রের উদ্যম অতুলনীয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয়েরই নিকট শিক্ষণীয় বস্তু আছে এবং শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে বাধা। কেশবচন্দ্রের অবদান বঙ্গদেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছে। বঙ্গভাষায় তাঁহার দান অসামান্য। সদ্যমুক্তা ভাষা-জননীর কর্কশ, লাবণ্যহীন দেহে সর্ব্বপ্রথম করেন লালিত্যের সঞ্চার। বাঙ্গলার নারীজাগরণও কেশবচন্দ্রের কাছে চির ঋণী। কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সমাজের এবং পরিবারের ভ্রূকুটী ও নির্য্যাতনকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির করিয়াছিলেন। নারীজাতির জন্য তাঁহার পরিশ্রম উপেক্ষণীয় নহে।

কেশবচন্দ্র বিশ্বের এক বিস্ময়কর বস্তু। তিনি চুম্বকের মত মানবমাত্রকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাই রাজ-রাণী হইতে দীনতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন সেন।

ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান

এলবার্টহলে বিরাট জনসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

(বিশিষ্ট বক্তাদের বক্তৃতা)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ৫৪তম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে গত শনিবার (৮ই জানুয়ারী) সন্ধ্যায় এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটী উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর অধ্যাপক ডি, এন, সেন প্রার্থনা করেন।

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার বয়স যখন খুব অল্প, সেই সময় কলিকাতা টাউন হলে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কেশব সেন চাহিয়াছিলেন জগৎকে, এখন সমগ্র জগৎ কেশবচন্দ্র সেনের মত মনীষীদের চায়। হিন্দুর মন্দিরে, মুসলমানের মসজিদে, খ্রীষ্টানের গির্জ্জায়, সমগ্র ভারতবর্ষে তাহারা চায় কেশব সেনের মত লোকের আবির্ভাব, যাঁহারা এই শাশ্বত সত্য ঘোষণা করিবেন যে, ঘৃণার চেয়ে প্রেম বড়, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি বড়, বিচ্ছেদ অপেক্ষা মিলন অধিকতর কাম্য; তাঁহারা ঘোষণা করিবেন যে, যে ঈশ্বর শান্তি এবং সদিচ্ছার প্রতীক, সেই ঈশ্বর ইতালী, জার্ম্মাণী এবং জাপানের ঈশ্বরের চেয়ে শক্তিমান।

ডাঃ পি, কে, সেন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৮৪খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলিয়াছিলেন যে, মরণের পর এখন তিনি যেভাবে বাঁচিয়া থাকিবেন, বহুদিন বাঁচিয়া থাকিলে এভাবে জীবিত থাকিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। হয়ত ইহা তখন স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হইত, কিন্তু ইহা এখন বেদবাক্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবন এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এতবড় সত্য আর কখনও বলা হয় নাই। মৃত্যুর এই ৫৪ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, প্রতিদিনই তিনি ভারতবাসীর অন্তরে নিকট হইতে নিকটতর হইতে চলিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি যাহা বলিতেন অথবা করিতেন, অল্প কয়েকজন ভক্ত শিষ্য ছাড়া ভারতের নরনারী তাহার অনুসরণ করিতেন না এবং সেই সময় লোকে তাঁহাকে ভুল বুঝিত। এখন অগণিত নরনারী তাহার মর্ম্মার্থ অনুভব করিতেছে।

একজন ইংরাজ কেশব সেনকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহারা কিভাবে তাঁহাকে স্মরণ করেন, মিঃ ডবলিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাহার বর্ণনা করেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন,—কেশবচন্দ্র সেন জগতের নিকট বাঙ্গলার গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার তথা ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, শতবর্ষ

পূর্ব্বে অথবা তার পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত ঝড় ঝঞ্ঝা, কত ঘাত প্রতিঘাতের সহিত তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিয়া ভারতের উন্নততর জীবনের সূচনা করিতে হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, কেশবচন্দ্র শুধু বাঙ্গলা ও ভারতের নহেন, সমগ্র বিশ্বের সবল প্রাণশক্তি ছিলেন। যখন আমরা মনে করি যে, কেশবচন্দ্র অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন—মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান—তখন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে, অতীতের সমস্ত মনীষীর ন্যায় তাঁহারও অমিতশক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কেন? কারণ, আরও কিছুকাল যদি তাঁহা থাকিত, তবে যে বিপ্লবের সৃষ্টি ইহা করিয়াছিল, তাহার চেয়েও বড় বিপ্লব দেখা যাইত। গত শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে এমন তিন জন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তদানীন্তন সামাজিক রীতিনীতি ভাল মনে করেন নাই এবং তজ্জন্য সামাজিক রীতি-নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ তিনজন মনীষী আমাদের মধ্যে পাইয়াছি। প্রথম রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তৃতীয় কেশবচন্দ্র সেন। তিনটি শ্রেণীতে আমরা মানবজাতিকে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম মানব এবং অতি মানব। কেশবচন্দ্র ছিলেন অতি মানব। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে দীপালি উৎসবের সময় আমি একদিন মথুরার বিশ্রামঘাটে দাঁড়াইয়া সম্মুখে যমুনা-বক্ষে অগণিত দীপালোক ভাসিতে দেখিয়াছিলাম। মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে সেই আলোর অর্ঘ্য দেওয়া হয়। আজ বাঙ্গালাদেশে আমরা সেইরূপ সম্মিলিত অর্ঘ্য দিব কেশবচন্দ্রের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে, যিনি একদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ কেশবচন্দ্র সেনকে বজ্রাগ্নির সহিত তুলনা করেন। বজ্রাগ্নি যেমন অল্পকালের জন্য বিশ্বকে আলোকিত করিয়া বিশ্বজনের মনের উপর চিরস্থায়ী দাগ বসাইয়া যায়—কেশবচন্দ্রও সেইরূপ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের মনের উপর চিরস্থায়ী আসন স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ বি, সি, ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন।

ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা সুচারু দেবী, মিসেস এন, সি, সেন, মিসেস এস, সি, রায়, অধ্যাপক ষ্টাটন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, ডাঃ বি, সি, ঘোষ, অধ্যাপক পি, সি, মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন, অধ্যাপক ডি, এন, সেন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

("আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলভিত্তি

(৩)

কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী

১৮৭০ সনে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি ভারতে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ ইংলণ্ডের বহু সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার ঐ সেই ১৮৬৬ সনের Jesus Christ : Europe and Assia, The Great Man, Regenerating Faith, Inspiration এবং the Future Church প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি ঠিক ঠিক সময়েই বিলাতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের নানাশ্রেণীর ব্যক্তিগণ ঐ সকল বক্তৃতা পড়িয়া, বক্তৃতার নূতন আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, তাঁহাকে যথোচিতভাবে অভ্যর্থনা করিবার যথাযোগ্য আয়োজন হইয়াছিল। আমরা এখানে তাঁহার বিলাতের নানাবিষয়ের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিব না, শুধু তিনি যে ২০শে জুলাই বুধবার রাত্রি ৭টার সময়ে গ্রেট কুইন ষ্ট্রীটে "ফ্রি মেসন হলে" 'Theistic Association' গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, একটি সভাতে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, এখানে শুধু তাহারই কিছু কিছু অংশের অনুবাদ প্রদান করিতে অভিলাষী। ঐ সভাতে ইংলণ্ডের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বহুতর অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন; এমন কি, আমেরিকারও প্রতিনিধিস্বরূপ কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, যাবতীয় একেশ্বরবাদিগণের এমন একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে, যেখানে আমাদিগের সকলের ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, একটি সাধারণ সূত্র বা উদ্দেশ্য লইয়া আমরা মিলিতে পারি। The object of the proposed society will appear from the following resolutions passed at the meeting :—

"(১ম) That in the opinion of this meeting, it is desirable to form a society to unite men notwith-standing any difference in their religious creeds, in a common effort to attain and diffuse purity of spiritual life by :—

I. Investigation religious truths.
II. Cultivating devotional feelings.
III. Furthering practical morality.
১। ধর্ম্মবিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে অনুসন্ধান।
২। আধ্যাত্মিক ভাবগুলির আলোচনা।
৩। ব্যবহারিক জীবনে নৈতিক উন্নতি সাধন।

(২য়) That in the opinion of this meetting, it is desirable that this society should correspond without delay with the similar societies in india, America, Germany, France or else where, assuring them of our sympathy and fellowship."

এই সমিতির অভিপ্রায় এই যে, "ইহা এখন সকলেরই বাঞ্ছনীয় যে, মানবমণ্ডলীতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ধর্ম্মবিষয়ে নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সকলে একত্র মিলিতভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে এক সত্য নির্দ্ধারণ দ্বারা এবং আত্মিক (আধ্যাত্মিক) বিষয়ের আলোচনা ও আদান প্রদান দ্বারা এবং নৈতিক কার্য্যাবলীর চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে এক গতিশীল ও কর্ম্মশীল মণ্ডলী করিবার প্রচেষ্টা করা এবং সভার অভিমত এই যে, অচিরে ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের এই শ্রেণীর যাবতীয় সভাসমিতির সহিত আমাদিগের প্রাণের সহানুভূতি ও একাত্মতাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়, এজন্য চিঠিপত্র ব্যবহারের দ্বারা ইহার সূচনা করা।"

এই সভাতে কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন যে,—"পৃথিবীর যাবতীয় জাতির ও সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক সহযোগিতা ও সম্মিলনের জন্য আমি দৃঢ়সংকল্প। জগতের যাবতীয় জাতির ও সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক মতভেদ থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু নরনারীনির্ব্বিশেষে সকলেই ধর্ম্মের নামে ও ঈশ্বরের নামে সংগ্রাম করিবে, ইহাই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইতেছে যে, মানবজাতিকে একত্র বাঁধিয়া রাখিবে, সকলকেই ঈশ্বরের সঙ্গেই বাঁধিয়া দিবে। কিন্তু যদি দেখিতে পাই যে, মানুষ ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে শান্তিসংস্থাপনের পরিবর্ত্তে এবং মানুষের শুভবুদ্ধির প্রসারণের বিরুদ্ধে, বিপরীত ভাবের অনুষ্ঠান করিতেছে, তখন সকলেরই একপ্রাণ হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিতে হইবে এবং তীব্রস্বরে বলিতে হইবে যে, ধর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত মহান্ উদ্দেশ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। আমার দেখিয়া প্রাণ ব্যথিত হয় যে, আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি নিজেদের মধ্যেই পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহারা মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়কে শত্রুভাবে বিদ্বেষচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা ভারতে খ্রীষ্টের নামে পরিচিত, তাঁহাদেরও অনেকে হিন্দুদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা কখনও খৃষ্টের ধর্ম্ম নহে। মতের সংকীর্ণতা হইতেই হৃদয়ের সংকীর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দুদের আর পরিত্রাণের উপায় নাই। যদি ঈশ্বর আমাদের সকলের এক পিতা হন, তবে তাঁহার সত্যের অধিকারী আমরা সকলেই। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে আমরা ভাই। এসিয়া, ইউরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতি সকলেই তাঁহার সৃষ্ট। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী নির্ব্বিশেষে ঈশ্বর সকলেরই পিতা, ইহা যদি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি, তবে পৃথিবী হইতে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী মুছিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা সকলেই চারিদিকেই দেখিতেছি যে, সকল সম্প্রদায়ই ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। সকলেই সত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি সমগ্র ধর্ম্ম বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ধর্ম্মের নানাদিক আছে, কিন্তু প্রত্যেক জাতিই অনেক সময়ে ধর্ম্মের একদিক মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা এজন্য একদিক মাত্রই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দু যেমন তাঁহাদের নিজের বিশিষ্টতা দেখাইয়া থাকেন, খৃষ্টান ও মুসলমানও তেমনি ভাবে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রথম শতাব্দীর লোকেরা তাঁহাদের সময়ে যেরূপ আবেষ্টনের ভিতরে থাকিতেন, তেমনি ভাবেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখাইতেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত সভ্যতার আলোকে আলোকিত প্রবুদ্ধ মানবসমাজ তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিকে স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া দেখাইবারই কথা। যদি আমরা ধর্ম্মজীবনের উদারতা ও পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে চাই, তবে আর আমরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যানের ভাব পরিত্যাগ না করিয়া পারি না। আমরা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককেই আলিঙ্গন করিতে পারি। সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগকেই সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সম্মানার্হ শাস্ত্রসমূহকে অর্থাৎ বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সহিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি। যদিও ইহাতে সম্পূর্ণভাবে না হউক, তবু, যে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ও সত্য ঈশ্বরের ভিতরে চির বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্তাবতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের অবস্থায় আসিতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি এবং মানবজাতির প্রতি খাঁটী থাকিতে হইলে, জগতের নানা অংশে নানা সময়ে যে সকল ব্যক্তিগণ সাধুভাবে ধর্ম্মজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সম্মান দেখাইতে হইবে। ইংলণ্ডের খৃষ্টান জাতি ভারতের হিন্দুজাতিকে হিদেন (Hithen) বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না। আবার পক্ষান্তরে হিন্দু জাতিও খৃষ্টানদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারেন না। সকলেই প্রেমের দিক দিয়ে পরস্পরকে ভাই বলিয়া ভালবাসিবেন। এই যে সমিতি সংগঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ইহার ভিতরে ভবিষ্যতের এই অপূর্ব্ব প্রেমের মিলনের ছবির প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিবে, ইহা ভাবিয়া আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমি অনুভব করিতেছি যে, আধুনিক যুগের লোকদিগের চক্ষু প্রকৃত ধর্ম্মের উদারতার প্রতি ফুটিয়া উঠিবে। বহু শতাব্দীর গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করতঃ ঈশ্বরের সমীপে খাঁটি হইবার আকাঙ্ক্ষায়, সর্ব্ব প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম্মের জন্য নিপীড়ন দূর করিবার প্রয়াস দ্বারা, মানবের স্বাধীনতা ও শান্তি ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে, ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ হইতে পূর্ণ একেশ্বরবাদ প্রচার দ্বারাই, মানবের ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। খৃষ্টান জাতি তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত আমাদের ভারতের

দিকে প্রসারিত করুন, এবং আসিয়াও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার অভিমুখে বিস্তার করুন। এই সভায় যে প্রস্তাব উপস্থিত হইতেছে, আমি বিশ্বাস করি, এখন তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার সময়ে সকলের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সমুদায় জাতি ও সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক জাতি গঠিত হউক। ইংলণ্ড ভারতের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রয়াসী হউন; এবং আমাদের হিন্দু জাতিও, হিন্দুর গণ্ডীর বাহিরে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের দিকে প্রেমবাহু প্রসারিত করুন। যদি তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মতে পরস্পর একমত না হইতে পারেন, তথাপি তাঁহারা সকলকেই ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। জগতের সকলকে একমতে আনয়ন করা অসম্ভব ব্যাপার। যাঁহারা এজন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হউক। আসুন, আমরা ঘোষণা করি যে, মতের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা স্বীয় স্বীয় অধিকার অব্যাহত রাখিয়া, সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারি, সকলকে গ্রহণ করিতে পারি, আমাদের সহানুভূতির আদান প্রদান করিতে পারি। এখানে আরও একটি বিষয় আমাদিগের লক্ষ্য করিবার আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে সকল সাধু মহাজন আসিয়া, তাঁহাদের জীবনের বহুমূল্য উচ্চ সাধনাবলী, মহৎ বাক্যাবলী ও আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণপ্রান্তে আমাদিগকে বসিতে হইবে। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, গ্রীক, রোমান, যে কোন প্রাচীনকালের ধার্ম্মিকেরা মানবজাতিকে ধর্ম, নীতি ও সমাজের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের নিকট হইতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে চির জীবন্ত সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। আজ এখানে যাঁহারা এই সমিতি গঠন করিতে একত্র হইয়াছি, সকলেই ঐ সকল মহান্ ব্যক্তিগণের সমীপে গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিব। আমরা তাঁহাদিগকে, ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে, আমাদিগের পথপ্রদর্শক বলিয়া, তাঁহাদের নিকটে অবনত হইব। তাঁহাদিগের জীবনের মহৎ দৃষ্টান্তই আমাদিগকে আজ এই সমিতি-সংগঠনে উদ্বুদ্ধ ও বদ্ধপর করিয়াছে। আজ আমি আপনাদিগের সমক্ষে যে সকল গৌরবজনক ভাবের বিষয় উপস্থিত করিলাম, তাহা একমাত্র ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি এদেশে বা ভিন্ন দেশে অথবা আমার নিজের দেশে যতক্ষণ কার্য্য করিতে সক্ষম থাকিব, আমি ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, কেবল ভারতের বিভিন্ন জাতিকে একত্র করিতে চেষ্টা করিব এমন নহে, জগতের যাবতীয় জাতিকে মিলিত করিয়া এক বিশাল মানবজাতি হইবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই ঘোষণা করিব। বিধাতা সেদিন নিকটবর্ত্তী করুন, যে সৌভাগ্যের দিনে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

এই বলিয়া কেশবচন্দ্র এই ২য় প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিলেন :—

"That in the opinion of this meeting, it is desirable that this society should correspond without delay with the similar societies in India, America, Germany, France and else where, assuring them of our sympathy and fellowship."

এখন আমরা বলিতে চাই যে, এই ১৮৭০ সনে ২০শে জুলাই লণ্ডন নগরে যে এক মহাসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, উহাই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সর্ব্বপ্রথম পরিদৃশ্যমান অঙ্কুরিত অবস্থা। রাজা রামমোহন রায়ের ট্রাষ্টডীডে যাহা Potentiallyরূপে অবস্থিত ছিল, ১৮৭০ সন হইতে ১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত এই ২৩ বৎসর কালের মধ্যে, নানা বিভিন্ন জাতির সমবেত চেষ্টার ফলে, তাহা ১৮৯৩ সনে আমেরিকার চিকাগো নগরে একটি প্রস্ফুটিত প্রতিষ্ঠানরূপে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহার পরে আমরা দেখাইব যে, ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে, কেশবচন্দ্র এদেশে প্রতিবৎসর ইহার বিষয়ে যাহা যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ তিনি ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে 'Asia's Message to Europe' নামক বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ডের ও ভারতের বক্তৃতাগুলির প্রভাব লণ্ডনে খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের এবং পারস্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের উপরে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহারও দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নববর্ষের প্রার্থনা

তুমি হরি পিতামাতা মঙ্গল-নিদান,
তোমারে লভিয়ে জীব পায় পরিত্রাণ।
আশীষ মাগিয়া লই নূতন বরষে,
সাধনায় লভি সিদ্ধি মনের হরষে।
যাদের বেসেছি ভাল তাহাদের তরে,
দিবানিশি চক্ষে মোর অশ্রুজল ঝরে;
তাদের কল্যাণ যাচি, নূতন জীবন,
লভিয়া দুর্জ্জয় শক্তি হ'ক বলবান।
শরীর সবল হ'ক মন তেজোময়,
আত্মা সচেতন হ'ক তোমাতে তন্ময়।
তোমাকে ভজিয়া যেন হই মৃত্যুঞ্জয়,
দেহেতে অদেহী হয়ে হই আত্মময়।
ভেদজ্ঞান ভুলি যাব তোমারে পাইয়ে,
নদী জলধিতে মিশে রব এক হয়ে।
মস্তক পরশি পিতা কর আশীর্ব্বাদ,
নূতন জীবনে মম পূর্ণ হ'ক সাধ।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় ব্রজকুমার নিয়োগীর আত্মজীবন

(আরম্ভিত ও অসমাপ্ত জীবনীর দুই পৃষ্ঠা)

"ইংরাজী ১৮৮৩ সনের শেষভাগে কলিকাতায় এক সুবৃহৎ Exhibition হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার পিতৃদেব কলিকাতায় আইসেন এবং আমার কাকাও (স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী) গয়া হইতে কলিকাতায় আইসেন। এই সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বাবা এবং কাকা কমলকুটীরে গেলেন, আমাকেও সঙ্গে লইলেন। আমরা সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ভক্তমণ্ডলী গভীর উপাসনায় নিমগ্ন। উপাসনা শেষ হইবার পর, সেই মহাপ্রেমিক কান্তিচন্দ্র আমাদিগকে গভীর আলিঙ্গনদানে অভ্যর্থনা করিলেন। কান্তিচন্দ্রের সে মধুর অভ্যর্থনা স্বর্গের ব্যাপার, তাহার কথা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্যের নিকট লইয়া গেলেন, আমরা ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। কান্তিচন্দ্র আমাদিগের পরিচয় দিয়া দিলেন। ডাক্তারদিগের উপদেশ মত তাঁহার সেই সময়ে বিছানা হইতে উঠা বা কথা কওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। সেই যে তেজঃপূর্ণ ভক্তিমাখান অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাতে আমার পিতা ও পিতৃব্য তো মুগ্ধ হইলেনই, আমি বালক হইয়াও সে মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ঠিক সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে আসিলেন। চিকিৎসকদিগের নিষেধ সত্ত্বেও, মহর্ষিকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে নিবারণ করিতে করিতেই উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলেন। সে স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা আমি আর কি বর্ণনা করিব। জগতে এরূপ অপূর্ব্ব মিলন খুব কমই ঘটে।

"এই সময়ে কাকা প্রায় প্রতিদিনই কমলকুটীরে যাতায়াত করিতেন। ৮ই জানুয়ারী আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের দিনেও তিনি শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। আমি কমলকুটীরে যাইতে পারি নাই, কিন্তু বিডন ষ্ট্রীটে দৌড়িয়া গিয়া ভক্তের সেই দিব্য সুন্দর মূর্ত্তি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম।"

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী।

—•—

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব

প্রস্তুতির কার্য্যবিবরণী

পুরাতন বর্ষান্তে তোপধ্বনি করিয়া যাই ১২টা বাজিল, নবদেবালয়ের উপর নববিধানের নিশান উত্তোলন করিয়া, নববর্ষারম্ভের ঘোষণা হইল।

এবারকার নববর্ষ শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মের শততম বর্ষ বক্ষে ধারণ করিয়া সমাগত হইল। তাই অদ্যকার দিন হইতে যেমন নববিধানের মহামহোৎসবের প্রস্তুতিক সাধনা আরম্ভ হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী মহাযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হইবারও আহ্বান আসিল।

১লা জানুয়ারী, প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তনান্তে নবদেবালয়ের দ্বারে কয়েকটী ভাই ও ভগ্নী মিলিত হইয়া, মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে প্রবেশসূচক গান গাহিতে গাহিতে, নবদেবালয়ে প্রবেশ করা হইল। আচার্য্যপুত্র ভ্রাতা সরলচন্দ্র সেন শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের ভাবে প্রণোদিত হইয়া, নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা আবৃত্তি করিলেন।

বেলা ৯টার সময় পরিবারস্থ ও দলস্থ ভাই ভগ্নীগণ সমবেত হইলে, নববর্ষের প্রারম্ভিক উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এবং ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ সেন রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্মরণ-বিষয়ক শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের, উপদেশ আবৃত্তি করেন ও সংগীত করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী সুধা দেবীও দু'একটী সংগীত করেন।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্যদেবের বাণী পাঠ করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রার্থনা করেন। ধর্ম্ম-পিতামহের ব্রহ্মবাদ এবং ধর্ম্মপিতার আর্য্য ঋষিভাবে ব্রহ্মোপাসনা-সাধন নববিধানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া, যাহাতে আমরা তাঁহাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হইতে পারি এবং শ্রীকেশবের সহিত, যাঁহার কাছ থেকে যাহা পাই, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হই এবং কাহারও সহিত মতভেদ থাকিলেও, আমরা যেন বিচার করিয়া, যাহা সত্য, তাহা গ্রহণে বঞ্চিত না হই, ইহাই প্রার্থনার সার।

২রা জানুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ প্রাতে উপাসনা করেন এবং সেবিকা হেমন্তকুমারী শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নববিধান-বিষয়ক বাণী আবৃত্তি করেন। প্রাচীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া বিধাতা এই নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিধান পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বিধানকে এবং সকল ভক্তকে নব জীবন দান করিতে সমাগত। ইহা সমুদায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদাভেদ বিনাশ করিয়া, সকল মানবকে এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব এবং মানবত্ব দিতে অবতীর্ণ। ইহা কেবল জ্ঞান-বিচার-সিদ্ধ দার্শনিক মতবাদ নয়। তাই ইহা জীবনের

সাধনায় নিষ্পন্ন করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধান-মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। তাই তাঁহার সহিত বিধাতা আমাদিগকে ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধে সংবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস করিয়া, যেন আমরা তাঁহার সহিত এবং নববিধান-প্রেরিতগণের সহিত সমযোগী হইয়া নববিধান জীবনে সাধন ও সপ্রমাণ করিতে পারি। এই সর্ব্বসমন্বয় ধর্ম্ম যে সমগ্র মানবের পরিত্রাণের জন্ত বিধাতা কর্ত্তৃক নববিধানরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা শ্রীকেশবচন্দ্রই বিধাতার আদেশে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে প্রত্যাদিষ্ট নববিধান-প্রবর্ত্তক মহাবিশ্বমানব বলিয়া গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ যেন করিতে পারি।

অদ্য শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে অপরাহ্নে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

৩রা জানুয়ারী, নবদেবালয়ে জন্মভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্মরণ বিষয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সেবিকা হেমন্তকুমারী আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। রাজভক্তি এবং স্বদেশানুরাগের সমন্বয় সাধন করিয়া, শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন মাতৃভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করতঃ, নববিধানধনে ভারতকে ধনী করিবার জন্ত ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার সহিত সমযোগে ভারতের কল্যাণ এবং নববিধানের জয় সর্ব্বথা প্রার্থনা করি। ভারত যেন নববিধান-ভারত হয় এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলনে, রাজা প্রজার সদ্ভাবসংস্থাপনে ভারত ধন্ত হয়।

—•—

পুণ্যাশ্রমের কার্য্যবিবরণী।

(এপ্রিল ১৯৩৩—ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র নাম সম্বল করিয়া, তাঁহার অনন্ত করুণা স্মরণ করিয়া, আমাদের পুণ্যাশ্রম ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই অসীম কৃপায়, নানা বাধাবিঘ্ন বিপদ্ পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া, এই কয় বৎসরে ইহার ক্ষুদ্রজীবনের কার্য্য যথাসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন ইহাতে থাকিয়া ন্যূনাধিক ২৪।২৫টি দরিদ্র বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে এই বাড়ীটিতে নিতান্ত স্থানাভাব হওয়াতে, অনেক মেয়েকে নিতান্ত দুঃখের সহিত ফিরাইয়া দিতে হইতেছে। দয়াময় ভগবানের অপার করুণায় যদি এই পুণ্যাশ্রমের জন্ত নিজের একটি ভাল বাড়ী পাওয়া যায়, তবেই ইহা স্থায়ী হইতে পারে ও ক্রমে আরও বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে। যদি ইহার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলে মিলিয়া, ইহার উন্নতি-সাধনকল্পে, অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু বিশেষ চেষ্টা করেন, তবে বড়ই উপকার করা হয়। বালিগঞ্জবালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, সেক্রেটারী ও হেডমিষ্ট্রেস বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া, গরিব মেয়েদের হাফ ফ্রীতে পড়িতে দিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন; সে জন্ত আমরা তাঁহাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আছি। মেয়েদের গান বাজনা শিখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, একটি নূতন হারমনিয়ম কেনা হইয়াছে ও একজন শিক্ষয়িত্রী রাখা হইয়াছে, তিনি গান বাজনা ও কিছু কিছু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। সেলাই ও চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতি আর এক জন শিখাইতেছেন। মেয়েদের দেখাশুনার জন্ত একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন, তিনি বিশেষ ভাবে মেয়েদের আদর যত্ন করেন, খাওয়া দাওয়ার বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন, দেখাশুনা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তিনি সব মেয়েদের লইয়া একত্র মিলিত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বসুখদাতা ভগবানের চরণতলে বসিয়া, গান, প্রার্থনা এবং ধর্ম্মপুস্তক ও সাধু-জীবনচরিত পাঠ করেন।

এখন করুণাময়ী বিশ্বজননীর চরণে অবনতমস্তকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বার বার প্রণাম করি এবং যাঁহারা দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ ও সাহায্যদানে এই পুণ্যাশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গত বৎসরে কর্পোরেসন হইতে ৫০৲ টাকা চাঁদা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং এ বৎসর আরও কিছু বেশী সাহায্য পাইবার আশা করিতেছি। এই সাহায্যের জন্ত তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে শত শত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইহার মধ্যে পুণ্যাশ্রম কমিটির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে। পুণ্যাশ্রম কমিটীতে এখন শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ সভানেত্রী হইয়াছেন। আর কয়েক জন নূতন মেম্বর হইয়াছেন।

পুণ্যাশ্রমের ১৯৩৩ সনের এপ্রেল হইতে ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ বৎসর ৯ মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এককালীন দাতাগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, শ্রীমতী চারুবালা বানার্জ্জি স্বামীর পুণ্যস্মৃতিতে ১০৲, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস গুপ্তের স্ত্রী ৫৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে ৫৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুণ্যস্মৃতিতে ১০৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে ৪৲, লাহোরের চিন্তাহরণ বাবুর স্ত্রী ২৲, লাহোরের স্বর্গীয় ডাঃ কৃপাসুন্দর বসুর পুণ্যস্মৃতিতে ১৫৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাসের শ্বশুর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিতে ২৲, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেনের পুণ্যস্মৃতিতে ৫৲, স্বর্গীয় হরিনাথ চাটার্জ্জির পুণ্যস্মৃতিতে ১০৲, লাহোরের শ্রীমতী নীলিমা দেবী ৫৲, মিঃ নীলমণি সেনাপতি, আই সি এস, স্ত্রীর পুণ্যস্মৃতিতে ৫৲, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলীর আর এক পুত্রের বিবাহে ১০৲ শ্রীযুক্ত এন্ কে বোস ১৫৲, মোট ১২৩৲ টাকা।

মাসিকদানের দাতাগণের নাম :—

শ্রীমতী কমলা সেন ৫৫০৲, শ্রীমতী সুশীলা মুখার্জ্জী ৫৬১৲

শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা ঘোস ৫৬৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস ২৮৫৲, শ্রীমতী সুধা দাস১৮০৲, শ্রীমতী প্রফুল্ল হালদার ২৪৫৲, ভগ্নীসমিতি ১১০৲, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ ২৬৲, শ্রীমতী সুধা সেন ৫১৲, শ্রীমতী কিরণময়ী সেন ২৫৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জী ২৫৲, শ্রীমতী বাণী ও প্রতিভা চাটার্জ্জী ২৫৲, শ্রীমতী মল্লিকা বীর২৫৲, শ্রীমতী তরুবালা সেন ১৮৲, শ্রীমতী স্নেহলতা দাস ১৩৲, শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোস ৬৲, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় ৫২৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ ৫২৲, শ্রীযুক্ত ডাঃ চারুচন্দ্র চাটার্জ্জী ১৬৲, শ্রীযুক্ত সূর্য্য-কুমার নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৮৲, শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ ৫৲, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র বানার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত বিরাট মণ্ডল ৫৲, শ্রীমতী অনসূয়া মুখার্জ্জি ৪০৲, শ্রীমতী মদনকুমারী দেবী ২০৲, শ্রীমতী অমলা দেবী ৭৲. শ্রীমতী বেলা দেবী ৭৲, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী গুপ্ত ১৬৲, শ্রীমতী তন্ময়ী গুপ্ত ৪৲, শ্রীমতী স্মৃতিকণা সেন ৪৲, শ্রীমতী মনোরমা দত্ত ৪৲, শ্রীমতী হৈমবতী চাটার্জ্জি ৬৲, শ্রীমতী সুধা দত্ত ৩৲, শ্রীমতী চিন্ময়ী বসু ৫৲, শ্রীমতী সরলা সেন ৪৲, শ্রীমতী সুষমা ঘোষ ২৲, শ্রীমতী লাবণ্য বসু ২৲, শ্রীমতী সুনীতিবালা বসু ৪৲, শ্রীমতী অরুণা সান্যাল ২৲, একজন হিতৈষী ৫৲, মোট ২৯৯৯৲ টাকা।

আয়:—

কর্পোরেসনের চাঁদা ৫০০৲, এককালীন দান ১২৩, মাসিক চাঁদা ২৯৯৯৲, মেয়েদের চাঁদা ১৮৪৭৲, মোট আয় ৫৪৬৯৲।

মোট আয় ৫৪৬৯৲—মোট ব্যয় ৫৪৫১৲—১৮৲ টাকা হস্তে স্থিতি।

বিল্ডিং ফণ্ডের জন্য :—

রেঙ্গুনের এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ২০০৲, বিসর্জ্জন অভিনয় করিয়া প্রাপ্ত ৫০০৲ টাকা। এই ৭০০৲ টাকার ক্যাস সার্টি-ফিকেট কেনা হইয়াছে।

১৯৩৩ সনের এপ্রেল হইতে ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর অবধি যাহা পাওয়া গিয়াছে, মাথায় করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কোনও ভুল ভ্রান্তি, দোষ ত্রুটি থাকিলে দয়া করিয়া সকলে ক্ষমা করিলে সুখী হইব।

শ্রীসরলা দাস
সম্পাদিকা।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৫ই জানুয়ারী, শিশুসেবার দিনে, নব-দেবালয়ে সন্ধ্যার সময়, শ্রীমতী সুধা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সুধা দেবী প্রার্থনা করেন। প্রেমসংঘের শিশুগণকে লইয়া সংগীত করেন। অদ্য শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিকের পরলোকগত শিশু ধ্রুবের জন্ম দিন স্মরণেও বিশেষ উপাসনা হয়।

শুভবিবাহ—গত ৩রা মাঘ, (১৭ই জানুয়ারী), যশোহর-নিবাসী স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ডাঃ বিবেকমোহন সেনের সহিত, ডাঃ চৈতন্যপ্রকাশ ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অঞ্জলির শুভবিবাহ ৩নং লাউডন্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৬ই জানুয়ারী, ডাক্তার আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে পরিবারবর্গকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

।—গত ৯ই মাঘ, দিনব্যাপী উৎসবে, ব্রহ্মমন্দিরে, স্বর্গীয় গজেন্দ্রনারায়ণের পৌত্র, শ্রীযুক্ত বিকাশেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র নববংহিতামতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান্ নব দীক্ষিতদিগকে শুভাশীষ দান করুন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী), রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়, ৮০বৎসর বয়সে, সন্ন্যাসরোগে, প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিত, সিটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ অগ্রণী ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রের সৌন্দর্য্যে আদর্শ শিক্ষকরূপে আজীবন শিক্ষা-দানকার্য্যে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জীবনা-দর্শ ছাত্র ও শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে এবং ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অমর হইয়া থাকুক। ভগবান্ তাঁহার অমর আত্মাকে উন্নত লোকে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই জানুয়ারী, নববিধান-প্রচার-ট্রাষ্ট ফণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধাস্পদ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ৬ই জানুয়ারী, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের পত্নী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ নন্দনের গৃহে ও তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ নন্দনের গৃহস্থিত সমাধিতলে উপাসনা হয়। উভয় গৃহেই ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ৬ই জানুয়ারী, স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সাম্বৎসরিক দিনে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন।

গত ২০শে জানুয়ারী (৬ই মাঘ), আচার্য্যদেবের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন্।

গত ২২শে জানুয়ারী (৮ই মাঘ), স্বর্গগত ভাই মহিমচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, নবদেবালয়ে উপাসনাদ হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন—গত ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে, ১১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে, সাম্বৎসরিক সংবাদমধ্যে, ৩১ লাইনে প্রকাশিত "শোভা" নামের পরিবর্ত্তে "আভাময়ী" নাম হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
13th. February, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, তুমি আমাদিগকে তোমার নববিধান দিয়া ধন্য করিলে; কিন্তু তোমার নববিধান যে কি, তাহা আমরা পূর্ণভাবে ধারণা করিতে পারিতেছি কি? প্রাচীন বিধান আমাদের রক্ত মাংসে, হাড় মজ্জায় এতই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে যে, কিছুতেই আমরা তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। প্রাচীন বিধানের আবদ্ধ ভাব, সংস্কার আমাদের মনকে এতই অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে, তোমার নববিধানের ভিতরে আসিয়াও, সেই পুরাতন মতে সাধন, ভজন, উপাসনা সকলি করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। নববিধানের প্রকৃত শিক্ষাই যেন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে না। নববিধান যে তোমার বিধান, তুমি স্বয়ং গুরু হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দাও। পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন গুরু, পুরাতন মত, পুরাতন জ্ঞান অনুসরণ করিয়া, আমরা কেমন করিয়া তোমার নববিধান শিখিব, তোমার নববিধানের মর্ম্ম বুঝিব? আমরা প্রাচীন ধর্ম্মের জ্ঞান-প্রধান পুরুষকারের সাধনায় অভ্যস্ত বলিয়াই, এ ধর্ম্মের মর্ম্ম যেন আমাদের প্রাণে স্পর্শই করিতেছে না। নব-বিধানে তুমি যে বিধাতা হইয়া, কেমন স্বয়ং এই ধর্ম্ম বিধান করিয়াছ এবং মা হইয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবনের গঠনভার স্বহস্তে লইয়াছ, ইহা কৈ তেমন বিশ্বাস করিতেছি? আমরা, নিজে সাধ্য সাধনা না করিলে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠিত হইবে না, এই সংস্কারে আমাদের ধর্ম্মভার আমাদের নিজ হস্তে রাখিয়াছি। পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তোমার হাতে জীবনের ভার ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। আমরা নববিধানে ভিতর আসিয়াও, এই জন্যই বিশেষভাবে তোমার নববিধানের ভিতর প্রবেশাধিকার পাইতেছি না। আমাদের এই পৌরুষ ও জ্ঞানাভিমান তুমি একেবারে নির্ব্বাণ কর। তুমি যেমন শ্রীকেশবকে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রকারে আমিত্বশূন্য করিয়া, তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে বলিলে, তাই তিনি প্রার্থনা করিলেন এবং চির দীনশিষ্য শিশু হইয়া তোমার হাতে গঠিত হইলেন, নববিধান-মূর্ত্তিমান হইলেন, আমাদিগকেও তেমনি করিয়া গঠন কর। নববিধান বর্ত্তমান নবযুগে যে সর্ব্বমানবের একমাত্র পরিত্রাণের বিধান, তাহাতে আমাদিগকে পূর্ণবিশ্বাসী কর। এ বিধানে মানুষের হাতে কিছুই নাই, তুমি জীবন্ত মা হয়ে আমাদের জীবনের ভার সকলই লইয়াছ, ইহা বিশ্বাস করিতে দাও; এবং তুমি স্বয়ং যেমন আমাদিগকে নববিধানে আনিয়াছ, তেমনি নববিধানের জীবনাদর্শে গঠন করিয়া, শ্রীকেশব-চন্দ্রকেও আমাদের দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মবন্ধু, সহায় এবং অগ্রজ

ভাই রূপে প্রেরণ করিয়াছ, তাহাও বিশ্বাস করিতে দাও। মা হইয়া তুমি যেমন সন্তান ছাড়া কখনও থাক না, তেমনি তোমার সন্তানকে ছাড়িয়াও আমরা তোমাকে কেবল চাহিলে, কেমনে তোমাকে পাইব? এ বিধান তোমার প্রেমের বিধান। সসন্তানে তুমি আমাদিগকে এ প্রেমের বিধান-সাধনে ও জীবনে আচরণে শিক্ষা দাও। সপরিবারে, সদলে, সমস্ত বিশ্বমানব সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম সাধনে, যাহাতে তোমার এই নববিধানের উপযুক্ত হইতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

বিশ্বমানব কেশবের জন্মশতবার্ষিকী সাধন

শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী-সম্পাদনে সাড়া পড়িয়াছে। এই শতবার্ষিকী মহাযজ্ঞ কি ভাবে সম্পাদিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই মহাযজ্ঞসম্পাদনে প্রস্তাবনা করিতেছেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবন বহুমুখীন। তাঁহার যে যে ভাব যাঁহার প্রাণে যে ভাবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তিনি তাঁহাকে সেইভাবে সম্মান দিতে যে চাহিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

কিন্তু বাস্তবিক এই মহাযজ্ঞ যথাযথরূপে কি ভাবে সম্পাদন করিলে, নববিধানের বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং শ্রীকেশবচন্দ্রেরও আত্মা প্রীত হইবেন, আমাদের তাহাই চিন্তা এবং প্রার্থনার বিষয় হওয়া উচিত নয় কি? শ্রীকেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিলেন, "আত্মপরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না। ইঁহারা বলিতে পারিলেন না, কে আমি, কি আমি। যদি বলিতে পারিতেন, এত বিবাদ বিসম্বাদ থাকিত না।"

এই বিষয়টি গভীরভাবে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী সাধারণে যে যে ভাবে বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারায় সম্পাদন করিতে চান, তাহা করুন; তাহাতে আমরা যথাসাধ্য উৎসাহ ও যোগ দান করিব। কিন্তু নববিধানবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা তাঁহার দাবী, তাহা যদি আমরা মিটাইতে না পারি এবং তজ্জন্য বিশেষ সাধন গ্রহণ না করি, তাহা হইলে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা কি বলিব?

যদি তাঁহার আত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হয়, তাহা হইলে আমরাই বা নববিধানের লোক বলিয়া কেমনে পরিচয় দিতে পারিব? সত্যই কেশবচন্দ্র যে কে এবং কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যেও যে সম্পূর্ণ অভিন্ন মত, তাহা কি আমরা বলিতে পারি? তিনি অভিযোগ করিয়া বলিলেন, "মিছামিছি একটা কেশব খাড়া করিও না। বুদ্ধি খাঁড়া দিয়া আমাকে কাটিও না। আমার নাক কাণ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিও না। কেহ আমার ভক্তির ভাগ কেহ আমার যোগের ভাগ, কেহ আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইলে চলিবে না।"

সত্যই কি আমরা কেশবচন্দ্রের বহুমুখীন জীবনের অংশবিশেষ লইয়াই আত্মতৃপ্তি বোধ করিতেছি না? বুদ্ধি-বিচার-যোগে আমরা তাঁহার খণ্ড ভাব লইতেছি বলিয়াই, আমাদের মধ্যে এত ভিন্নতা ও বিবাদ। বাস্তবিক জ্ঞান-বিচারে এবং কেবল নিজের মনগড়া মতে কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে যথার্থ সম্মানিত করা হইবে না। তাই তিনি বলিলেন, "প্রেমের হরি, যদি ইঁহারা পাঁচপথে না গিয়া এক পথে যান, তবে বুঝাইতে পারি, যা কিছু না বুঝিয়াছেন।" এই উক্তির গভীর মর্ম্ম আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। বিচার-বুদ্ধি যেখানে, পাঁচ মত, পাঁচ পথ সেখানে হইবেই হইবে। কিন্তু বিধান যেখানে, এক বিধাতা, এক আদেশ, একবিধি সেখানে। তাই যদি আমরা এক বিধাতার বিধান মানি, এক পবিত্রাত্মার আলোক বা প্রত্যাদেশ আমাদের জীবনের পরিচালক হয়, তবে আমাদের যত মত, তত পথ বা এক এক জনের এক এক মত হইতে পারে না। তাই ঐক্যমত বা মতের অভিন্নতা নববিধানের সাধন। তাহাই অখণ্ড কেশবজীবন-গ্রহণ। এই জন্যই তিনি বলিলেন, "ইঁহারা একজনকে বন্ধু করিয়া লইয়া যান।" একজন প্রত্যেকের বন্ধু হইলেই, আমরাও পরস্পর একমতাবলম্বী বা একজন হইব, এবং নববিধান বা কেশবচন্দ্রকেও আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া লইব না। কেশবচন্দ্রের জীবন সদল অখণ্ড জীবন; তাঁহাকে লইতে হইলে, সকলকে সমন্বয়ভাবে লইতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূর্ত্তিমান চরিত্ররূপে নববিধানের বিধাতা কর্ত্তৃক গঠিত। যদি আমরা নববিধানে বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, ধর্ম্মে যাহা নববিধান, জীবনে তাহা মূর্ত্তিমান কেশবচন্দ্র। নববিধানের সমন্বয়-

ধর্ম কেবল মানববুদ্ধির উদ্ভাবিততত্ত্ব বলিয়া লোক উড়াইয়া দিবে, যদি না আমরা জীবন ও সাধন দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি যে, "কেশব-চরিত্র, পরম পবিত্র, মূর্ত্তিমান নববিধান।" কেন না, তিনি এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বিধান জীবনে আচরণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াই, নববিধানাচার্য্যরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ইহা স্বীকার না করিলে, কেমন করিয়াই বা তাঁহার জীবনাদর্শ অনুসরণ করা হইবে, এবং কেমন করিয়াই বা আমরা নববিধানের মানুষ হইতে পারিব? ইহা যে বিধাতার বিধান, এবং তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ বা তাঁহার অনুসরণ কেবল বুদ্ধি-বিচার-যোগে হইবে না। এই জন্য তিনি বলিলেন, "জল মাছের আধার; জলে আদত মাছ রেখে, সব শুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও, এই ভাইদের কাছে প্রার্থনা।" অর্থাৎ জীবন্ত ঈশ্বরের বক্ষস্থ জানিয়া, মার ভিতর দিয়া, জীবন্ত কেশবকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে লইলে হইবে না; কেন না, জল ছাড়া হইলে মাছ যেমন মৃত হয়, তেমনি মা ছাড়া কেশব মৃত। এই জন্য কেশব প্রার্থনায় বলিলেন,— "এই জীবন-সরোবরের জীবমীনকে নিয়ে যাও। মীনকে কেটো না—ভক্তমীন তোমাদের দাস হয়ে সরোবরে খেলা করিবে। একটা দৃষ্টান্ত বুকের ভিতর নিয়ে যাও। হরি, ইঁহারা, যা আমি, তাই নিয়ে যান। জীবন শুদ্ধ যেন ভাইদের ভিতর মিশি। তাঁহাদের হৃদয়-সরোবরএ মীন খেলা করিবে। ভাইদের বুকের ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মীন খেলা করিবে, বাড়িবে। বৃহৎ ভারতসাগরে, এসিয় সাগরে, সমস্ত দেশের, সমস্ত ভাইয়ের, সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে। মা দেবী, দাও আমায় স্থান। বুঝিয়ে দাও, আমি কোথায় থাকিব। সব ভাই এক হয়ে, শেষে এক মাছ হয়ে, ভক্তির সাগরে, আনন্দসাগরে, ব্রহ্মের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব।"

কি গভীর আমাদের দায়িত্ব, তাহা যেন আমরা অনুভব করিতে পারি। এইজন্যই নববিধানজননী আমাদিগকে নববিধানে ডাকিয়া আনিয়াছেন, আমরা নিজেরা কেহ ত আসি নাই, মা তাঁর নিজ কৃপাগুণে যে আমাদিগকে এই নববিধানে আনিয়াছেন। এবার শ্রীকেশব-ধনে ধনী করিয়াছেন, আমরা কি অস্বীকার করিতে পারি? যে নববিধান পৃথিবীব্যাপী হইবে, যে কেশব বিশ্বমানব-জীবন-সরোবরে খেলা করিবেন, সেই বিধান এবং সেই কেশবের সঙ্গ আমরা সশরীরে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমরা যদি কেবল বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে রাখিয়া তাঁহাকে মৃত হইতে দিই, কি ঘোর অপরাধে আমরা অপরাধী হইব। জীবন্ত মার জীবন্ত কেশবকে জীবনসরোবরে রাখিয়া, যেন আমরা জগতে সেই সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ মানবাদর্শ সঞ্চার করিতে পারি, মা আশীর্ব্বাদ করুন। কেশবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসবে তাঁর সাধ যেন পূর্ণ হয়, ইহার জন্য যেন আমরা সাধন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

মূর্ত্তিপূজা

নিরাকারা জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী। নিরাকারকে ব্যক্তি-রূপে দর্শনের প্রচেষ্টায় মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত। শক্তিকে ব্যক্তিরূপে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক। বাইবেলেও কথিত আছে "Unless the word is made flesh no man sees." জ্ঞান মূর্ত্তিমতী না হইলে, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু জ্ঞানের মূর্ত্তি জড় মূর্ত্তি নয়। আমাদের জ্ঞান বিশেষ-ভাবে তিনটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত এবং চরিতার্থ হয়। দর্শন-শক্তি, শ্রবণশক্তি এবং বাক্‌শক্তি এই ত্রিশক্তির দ্বারায় আমাদের জ্ঞান মূর্ত্তি ধারণ করে। বাহিরে যাহা কিছু আমরা দর্শন করি, বাহিরে যে শব্দ আমরা শ্রবণ করি, রসনায় আমরা যে বাক্য উচ্চারণ করি, তাহার দ্বারাই আমাদের জ্ঞানদেবীর পূজা করা হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানদেবী সরস্বতীর বাহ্য মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করা বাস্তবিক তাঁহার মূর্ত্তিপূজা নয়। আমরা চক্ষে যাহা দেখি, তাহাতেই যদি আমরা চিন্ময়ী সরস্বতীর জ্ঞান-কৌশল দেখিতে পাই, শ্রবণে আমরা যাহা শুনি, তাহাতেই যদি আমরা তাঁহার বীণাবাণী শুনিতে পাই, এবং রসনায় আমরা যাহা উচ্চারণ করি, তাহাতেই যদি তাঁহার সত্যবাণী বা বেদবাণী হয়, তাহা হইলেই সরস্বতীর প্রকৃত মূর্ত্তিপূজা হইল। এই ভাবে যদি অন্তরে সরস্বতীর মূর্ত্তিপূজা হয়, তাহা নিশ্চয়ই জড়পূজা নহে।

ব্রাহ্মসমাজের মিলন

নববিধান চিরমিলনের বিধান। সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বদেশ, সর্ব্ব জাতি, সর্ব্বসম্প্রদায়কে সমন্বয়ভাবে মিলন বিধান করিতেই নব-বিধান সমাগত। এই মিলন কেবল মাত্র প্রেম দ্বারাই সংসাধিত

হইবে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে বিভিন্নতা আসিয়া মত এবং বিশ্বাসে পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তাহার মিলন সংস্থাপন করাই নববিধানের এক বিশেষ সাধন। তাই নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখাকেই অখণ্ড নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। একবার নগরসংকীর্ত্তন উপলক্ষে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে গিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, মন্দিরে প্রবেশ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হন, দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি ভক্তি-প্রেমার্দ্রচিত্তে মন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন। ফিরিয়া আসিয়া বলেন, যদি উঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেন, চোদ্দ আনা মিলন হইয়া যাইত। যাহা হউক, ও মন্দির আমার মা'র হইবেই হইবে। দেহমুক্তির কয়েক দিন পূর্ব্বে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি "ভাই শিবনাথ" বলিয়া সাশ্রুলোচনে গদগদভাবে প্রেমালিঙ্গন দেন। তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষাই ব্রাহ্মসমাজের মিলন। তবে তিনি বলিয়াছেন—"পেছিয়ে না গেলে যে মিলন হয় না। পেছিয়ে যাই কি করে? এযে শতদ্রু-স্রোত।" বাস্তবিক নববিধান অনন্ত উন্নতির বিধান। সেই স্রোতে গা ভাসান না দিলে, প্রকৃত মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? মিলন করিতে আমরা পশ্চাদ্‌গমন না করিয়া, যদি অনন্তের প্রেমস্রোতে গা ভাসান দিতে পারি, তবে নববিধানের মহাসাগরে অবশ্যই মিলন হইবে।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য

একদা নেপোলিয়ানের একটী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্রকে এমন শিক্ষা দিন, যেন তিনি ভবিষ্যতে আপনার স্থান অধিকার করিতে পারেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র নেপোলিয়ান সগর্ব্বে এবং দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন:—"Replace Napoleon, Napoleon cannot be replaced. I am the child of the circumstances." সেইরূপ আমরাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, শ্রীকেশবচন্দ্রও সমগ্র জাতির ভাবসমূহের একটী পরিস্ফুট মহাভাব বা বিকশিত অবস্থা। যখন পৃথিবীতে বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং যখন যে যে জাতীয় ভাবের মহান্দোলন দেশে প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেই সেই ভাবের মহাপুরুষ জাতির মুখপাত্র হইয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। মধ্য যুগে গুরু নানক, শ্রীচৈতন্যদেব এবং গুরুগোবিন্দ ও শিবাজী যেমন জাতীয় বিশেষ বিশেষ অবস্থা-সম্ভূত মহাপুরুষ, সেইরূপ ইউরোপেও লুথার, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি তদ্দেশীয় অবস্থা-প্রসূত মহাপুরুষ। শ্রীকেশবচন্দ্রও সেইরূপ দেশের অবস্থা-সম্ভূত একজন মহামানব।

শ্রীকেশবচন্দ্র অন্তর্দৃষ্টিযোগে দর্শন করিলেন যে, তিনি বিধাতা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া, বিশেষ কর্ম্মভার লইয়া, ভারতে তথা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন যে, "I am a singular man, I am not as ordinary men are." এরূপ দৃঢ়তার সহিত আত্মপরিচয় ঘোষণা করিতে বর্ত্তমান যুগে আর কাহাকেও শুনি নাই। তিনি যে বিশেষ কর্ম্মভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; তাই তিনি বলিলেন যে, "I am commissioned by God to preach certain truths." তিনি বলিলেন, "When I am once excited you will hear burning words, I will then speak with powers, I will certainly crush into atoms the most impregnable strongholds of errors." যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় সাক্ষ্যদান করিবেন যে, তিনি যখন বক্তৃতা করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তাঁহার প্রত্যেক বাক্য এক একটী জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত অস্থিমাংস ভেদ করিয়া নরনারীর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত—সেই জীবন্ত প্রাণময়ী ভাষা দেশে নূতন বিশ্বাসের স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছে—অসাড় ও মৃতকল্প জাতির প্রাণে নবজাগরণের উদ্বোধন করিয়াছে—নরনারীর প্রাণে নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার সেই জীবন্ত অমরবাণী কত ধনীর সন্তানকে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী করিয়াছে—কত নূতন কর্ম্মিসঙ্ঘ রচনা করিয়াছে—দেশের ও দশের সেবার জন্ম কত লোককে উৎসাহের প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন এবং বিষয় সম্পদ্ পরিহার করিয়া কত সাধুপ্রকৃতি মানবকে নব ধর্ম্মের নূতন বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্ম দারিদ্র্যের জলন্ত অগ্নিতে আত্মদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আজও সে বাণী যদিও নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ, তথাপি এখনও ভারতের আকাশে বাতাসে তাহা বিচরণ করিতেছে, জাতির প্রাণে নূতন শিক্ষা, সাধনা, সভ্যতা, ধর্ম্মনীতি ও দেশহিতৈষণার নব চেতনা জাগাইয়া দিতেছে। তাঁহার জীবনের এই সকল মহা কীর্ত্তির গৌরব তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন না, সকল কর্ম্ম ব্রহ্মকে উৎসর্গ করিলেন। তিনি আত্মগৌরব অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "It is not my force, my power which then makes me speak but the Lord's."—"ইহা আমার শক্তি নয়, ইহা ব্রহ্মবাণীর শক্তি।" সেই অজেয় অপরাজিত বৈদ্যুতিক শক্তি নানাকর্ম্মের ভিতর রূপ গ্রহণ করিয়া, পুরাতন পৃথিবীকে নূতন করিয়া গঠন করিতেছে, জাতির উদ্ধারের জন্ম নানাদিকে কার্য্য করিতেছে, এবং দেশে ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মদর্শনের ভিতর আমরা নূতনত্ব দেখিতে পাই। সকল বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া, অথবা নির্জ্জন গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া, কঠোর তপস্যা-যোগে ব্রহ্মদর্শন সাধন করেন নাই।

তিনি দৈনন্দিন কার্য্যের ভিতর, জীবনের তাবৎ কর্ত্তব্যের মধ্যে, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ভিতর, লোক-চরিত্রের নানা ভাব ও বিকাশের মধ্যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করিতেন। একদিন টাউনহলে তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন,—"If God is I should like to see Him just here." অর্থাৎ "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে এইখানেই আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।" তাঁহার বিশ্বাসী চক্ষু পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ ভেদ করিয়া, প্রাণস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ দর্শন করিতেন। নদ নদী, আকাশ পাহাড়, চন্দ্র সূর্য্য, তাবৎ পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিতেন এবং ব্রহ্মের পরিষ্কার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইতেন। আমাদের নিকট যাহা নির্জীব, তাঁহার নিকট তাহা সজীব, আমাদের নিকট যাহা নির্ব্বাক্, তাঁহার নিকট তাহা সবাক্ বলিয়া বোধ হইত।

প্রাচীন ঋষিগণ গিরি-শিখরে তপোভূমি নির্ম্মাণ করিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোর হইয়া পৃথিবীর অতীত হইলেন। ভারতে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু পৃথিবীর সহিত সকল যোগ ছিন্ন হওয়ায়, পৃথিবীর সহিত তপোভূমির একটী ভেদরেখা সৃষ্টি হইল। এখানকার দুঃখ বিপদ ও বেদনার হাহাকার তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিত না। অনাথ বালকবালিকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন এবং নিরাশ্রয় বিধবার মর্ম্মবেদনা তাঁহাদের চিত্তকে চঞ্চল করিত না। কোন নৈসর্গিক দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ভূকম্পের ভীষণ প্রলয় তপোভূমির শান্তি নষ্ট করিত না; কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এই নিম্নভূমিকেই তাঁহার সাধনার মহাতীর্থে পরিণত করিলেন—ক্ষুধার্থকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, রোগক্লিষ্ট নরনারীর পার্শ্বে বসিয়া সেবার পবিত্র সাধনাকে তাঁহার অর্চ্চনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন। অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা, পতিতকে উদ্ধার করা, নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া মাতৃজাতির প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতি জনহিতকার্য্যকে ধর্ম্মের সহায়রূপে গ্রহণ করিলেন। অর্চ্চনা ও সেবার পারস্পরিক মহাযোগের ভিতর এই পৃথিবীকেই ধর্ম্মসাধনার শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। তিনি জড়, জীব, মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতি কার্য্যকে শ্রীভগবানের বাহ্য প্রকাশ জানিয়া, সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিলেন।

কালকে আমরা যেমন ভাগ করিতে পারি না, একটী শতাব্দীকে তাহার পরবর্ত্তী শতাব্দী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না; ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একই মহাকালের অন্তর্গত সেইরূপ তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মবিধানকে পূর্ব্বোত্তর যোগের ভিতর অঙ্গাঙ্গীভূত এক মহাধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রত্যেক মহাপুরুষকে ব্রহ্মের ক্রমবিকাশ এক একটী বিশিষ্ট মহাভাবরূপে গ্রহণ করিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মবিধান, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল মহাপুরুষ একই মহাসত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, অথচ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংগ্রথিত ও এক অন্যের পূর্ণতা-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ইহাই তাঁহার মহাধর্ম্মসমন্বয় বা নূতন বিধান।

যুগযুগান্তর হইতে জড়বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতান্তর চলিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মে বৈজ্ঞানিকদের স্থান নাই; পরস্পর বিবদমান মতান্তরের ভিতর যে মতদ্বৈধ চলিয়া আসিতেছে, শ্রীকেশবচন্দ্র তাহার নিরাকরণ করিলেন। তিনি বলিলেন:—"I am a scientist. I am for all science physical, mental and moral for a full acceptance of the phenomena and laws of nature. I honour Huxley and Darwin and all other men who by their skill are qualified to evolve the latent meaning of the Universe. All science is religion and all religion is science. There is as much science in prayer as in the Locomotive Engine, there is as much science in inspiration as in the Microscope and the telegraphic wires."

তিনি একদিকে যেমন সাধক ছিলেন, সেইরূপ তিনি অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে ভগবানের প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের উজ্জ্বল স্পর্শ অনুভব করিতেন। তিনি একদিকে যেমন অনাসক্ত বৈরাগী ছিলেন, অন্যদিকে অক্লান্ত ও উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। একদিকে যেমন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ছিলেন, অন্যদিকে ধ্যানপরায়ণ যোগী ছিলেন। একদিকে যেমন ধর্ম্ম-সংস্কারক ছিলেন, অন্যদিকে সমাজসংস্কারক ছিলেন। তিনি যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের একখানি অঙ্গাঙ্গীভূত জীবন্ত মূর্ত্তি। তাঁহার ভক্তি সকর্ম্মক—ভক্তির জীবন্ত প্রেরণায় তিনি অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন—ভক্তি বাহিরে রূপ গ্রহণ করিল—কত পূজার মন্দির, কত সাধন-কানন, কত ব্রহ্মবিদ্যালয়, কত নীতি-বিদ্যালয়, কত পাঠাগার, কত নৈশ-বিদ্যালয়, এক একটী করিয়া সদ্যোজাত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিল—দেশের ভিতর শোভা ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল। নূতন সংগীত ও সাহিত্যের নব ধারা দেশে প্রবাহিত হইল—যুবকদিগের চরিত্রে সুনীতির নব উদ্বোধনে, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, আচরণ, শিক্ষা ও সাধনা নবরূপ ধারণ করিল। দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মৃতকল্প জাতির ভিতর নূতন প্রাণ সঞ্চার করিলেন।

তাঁহার জীবনে আর একটী বিশেষ কথা এই যে, তিনি একটী অখণ্ড সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ব্রাহ্মণ শূদ্র, যবন ম্লেচ্ছ, আর্য্য অনার্য্য, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় ও নর নারী-নির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার ঘোষণা করিলেন। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মজগতে ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবদান।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন সঙ্গীত

(ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে, রায় সাহেব রাজেন্দ্রকিশোর গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত এবং ১০ই জানুয়ারী, ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে স্মৃতিসভায় গীত)

বাগেশ্রী, তাল—আড়াঠেকা

মায়ের কোলে শুয়ে বসে ভুঞ্জিয়ে সুখ নব নব,
দুঃখিনী ভারত মাকে ভুলেছ কি হে কেশব !
পাপ-ধর্ম্মান্ধতানলে, হিংসা দ্বেষ হলাহলে,
নিয়ত মরিছে জ্বলে ভারত-সন্তান সব।
ভারতভাগ্য-বিধাতা, তাই তোমায় পাঠালেন হেথা,
ঘুচাতে এ ধর্ম্মগ্লানি দিয়ে ধর্ম্ম অভিনব ;
এ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, বহুত্বের মধ্যে একত্ব,
গতি এক, গম্য এক, এক হতেই সবার উদ্ভব।
এ মহামিলন-গীতি, সর্ব্ব ধর্ম্মে সম প্রীতি,
শিখাইতে সর্ব্বজনে স্বর্গের নিয়োগ তব ;
এ নিয়োগ করিতে পালন, কর পুনঃ আগমন,
নিভাও বিদ্বেষ-বহ্নি সুশীতল স্পর্শে তব।

—•—

ভক্তি-অর্ঘ্য

(নববিধান-ঘোষণার দিন)

অগ্নিমন্ত্রে লয়ে দীক্ষা, অগ্নিময়ী বাণী—
রূপায়িত করেছিল যেই চিত্রখানি,
তোমার অন্তর তারে করি মূর্ত্তিমান,
ঘোষিলে জলদমন্ত্রে—শ্রীনববিধান !
ধর্ম্ম যবে হয়েছিল অচলায়তন—
পথ আর মত মাত্র—সঞ্চারি জীবন
করিলে সৃজনশীল তারে চলমান,
দাঁড়ালে নির্ভীক বীর, করি মুক্তিস্নান !
বিভিন্ন ধর্ম্মেতে আছে মিলন মহান্,
বহুরে একত্র করি যেবা ঐক্যতান
শুনালে জগতে, তুমি পরম বিস্ময়
স্বাতন্ত্র্যে সাধিলে ঐক্য - ধর্ম্মসমন্বয় !
ধন্য হবে তব নামে এই পুণ্যধাম,
লহ, দেব—ভক্তি-অর্ঘ্য—ভক্তের প্রণাম !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

নমস্কার

(বেলগাছিয়া ভিলায়, ৬ই ফেব্রুয়ারী উদ্যান-সম্মিলন উপলক্ষে)

আনন্দ অমৃত ভরা তোমারি এ উৎসব মাঝে,
দীন হীন রিক্ত নিঃস্বে দিলে ডাক সুমধুরস্বরে।
ঘর পর করি এক, বিয়োগ-বেদনা রাখি' দূরে,
মিলনের সভাতলে সাজাইলে অপরূপ সাজে।
রূপ রস সুধা হাসি সুর গান প্রেম ভালোবাসা
নিমেষে বুঝায়ে দিলে, জানাইলে তুমি আর আমি ;
ক্ষুদ্র প্রাণে, ক্ষুদ্র মনে বৃহত্তের জাগাইয়া আশা,
ছন্দে গন্ধে মাতাইলে নিসর্গের কল্পলোকে নামি।
কত এলো, কত গেলো, তৃপ্ত হলো ভূমানন্দ লভি',
উপাসনা অনুভূতি জীবনেরে করিল মহান্।
প্রকৃতির পাঠশালে বেদান্তের তুলি মহাতান,
পলকে লুকালে কোথা নয়ন জুড়ানো চারু ছবি ?
আমি যে কাঁদিয়া মরি, কোথা তুমি এসো একবার—
সিন্ধু মাঝে বিন্দু হোক্, লহ দেব শত নমস্কার।

শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।
২০ নং রজনীগুপ্ত রো, কলিকাতা।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

(অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক রচিত এবং ১০ই মাঘ, নগরকীর্ত্তনে গীত)

তেওট

মথিয়া কালের সিন্ধু, উঠিল না সুধাবিন্দু,
ঘুচিলনা আর্ত্তের ক্রন্দন ;
রাগদ্বেষ-হলাহলে, বিশ্ব-বিরোধানলে
নাশে সৃষ্টি—রক্ষ নারায়ণ ! (রাখ রাখ রাখ হে—নৈলে যায় যে)

লোফা

চারিদিকে ধর্ম্মগ্লানি শুধু অত্যাচার।
শক্তিমদমত্ত জীব আনে হাহাকার।
(কি হবে কি হবে হে—ধরা যায় রসাতলে)
স্বার্থের সংগ্রামে দেখ প্রচণ্ড অন্যায়,
(সর্ব্বদর্শী তুমি যে গো)
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।
(দেখ দেখ হে—চারিদিকে ধর্ম্মগ্লানি)
জাগেনা বিবেক কারো অন্যায় রোধিতে,
(কবে জাগিবে হে)
দুর্ব্বলে চাহিছে শুধু দলিতে বধিতে।
(সব ভেঙ্গে যে গেল—সর্ব্বহারা পথে কাঁদে)

একতালা

এই যে জগৎ-দৃশ্য !—একি লীলা অভিনয় !

শক্তি-গর্ব্ব-মত্ত, যাহারা উন্মত্ত, তারা খুঁজে শুধু আত্মজয় !

(গর্ব্বে অন্ধ হয়ে)

বিশ্ব কুরুক্ষেত্রে আজি (বাজাও শঙ্খ—পাঞ্চজন্য) নিরস্ত্র সারথি,

শুনাও মানবে নববিধান-ভারতী !

(শুনাও, শুনাও সবে—যেমন শুনায়েছিলে—বিরোধের চেয়ে

মিলন ভালো, শুনাও সবে—সংগ্রাম হতে

শান্তি ভালো, শুনাও সবে—শক্তির চেয়ে

ভক্তি যে বড়, শুনাও সবে)

কাল ধলো হোক, সবি এক লোক,

সব দেহে এক রক্ত বয়।   (অভেদ ভবে)

এসেছে গিয়েছে কত (দেশে দেশে কালে কালে) যুগ-অবতার,

প্রচারিয়া যুগবাণী শুভ সমাচার ;

(তা ভুলেছে লোকে, শক্তি-মদে মত্ত হয়ে—

নীতিধর্ম্ম দয়ামায়া সব ভাসায়ে দিয়ে—

বুদ্ধিবিবেক হারায়ে তারা দম্ভে নাচে)

তাই পশুবলে, যায় রসাতলে,

যা'ছিল ধরার সুধাময় ! (দানবী লীলায়)

ঝাঁপতাল

তাই কি কাঙ্গাল সাজে,   জনগণমন মাঝে,

এলে নেমে কাঙ্গালের হরি ; (জনগণে জাগাইতে)

দলিত দুর্গত জনে,   লয়ে বক্ষে সযতনে,

শূন্য প্রাণ দাও পূর্ণ করি। (মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্রে)

রাজরাজ একি ছল,   তোমার চোখেতে জল,

পূর্ণানন্দ—ব্যথায় চঞ্চল ! (ব্যথার ব্যথী হ'য়ে এলে)

দেখিয়া ধরার দুখ,   ভেঙ্গেছে তোমার বুক,

ন্যায়-ধর্ম্ম দেখি হতবল। (দর্পহারী এলে নিজে)

হাতে ধরে দীন জনে,   ফি'রতেছ সঙ্গোপনে,

স্বর্গরাজ্য আনিবে ভূতলে ; (নর-নারায়ণ-রূপে)

হবে সাম্য প্রতিষ্ঠিত,   নবধর্ম্ম সংস্থাপিত,

ধরা হবে শান্ত—শান্তিজলে।

(সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে) (ভেদাভেদ রবেনাক)

খয়রা

নিঃস্ব যাহারা বিশ্বে তাহারা আনিবে নূতন প্রাণ,

(গড়িবে বিশ্ব নূতন করে—আত্মপর ভেদ ভুলে)

সকল ভ্রান্তি সকল ক্লান্তি হবে তবে অবসান। (ব্রহ্মকৃপাবলে)

বিরোধ বিবাদ শক্তি প্রমাদ পাবেনা সেথায় ঠাঁই,

(ভক্তজনে বোঝাবে সেথা—ভক্তি যেথা, সেথা ভেদ নাই)

এক প্রাণমন যত ভাইবোন, ভেদ নাই, ভেদ নাই।

(এক পরিবারে)

গাহিব আবার নূতন করিয়া মহামিলনের গান,

(তেমি তেমি তেমি করে—কেশবের মত ভক্তদলে)

করিব প্রমাণ নূতন বিধান যুগধর্ম্ম বর্ত্তমান।

(চিরযুগের তরে)

জয়যাত্রার পথে তাই আজি ছুটে চল কিবা ভয়,

(ঐ দেখ্‌রে শুধু নয়ন মেলে—সমন্বয়ের পুণ্যতীর্থ)

গাহিব নির্ভয়ে সবে এক হ'য়ে নবধর্ম্মের জয়।

(জয় ! জয়) (সর্ব্বদেশে কালে)

খ্যামটা

চল্ ছুটে চল্, চল্ ছুটে চল্, বোল্ হরিবোল বলে ;

ভয়ে যেথায় আধ্‌মরারা ভাস্‌ছে নয়নজলে !

(মাভৈঃরবে জাগাও তাদের, শঙ্কাহরণ মায়ের নামে)

চারিদিকের অন্ধকারে, পথে যারা চলতে নারে,

দেখাও তাদের আঙ্গুল দিয়ে ঐ যে আলো জ্বলে !

(সকল আঁধার দূরে গেলরে—মায়ের হাতের আলো জ্বলে)

শক্তি-বিকার কাট্‌লে পরে, দেখ্‌বে সবাই ভক্তিভরে,

সেই আলোকে নয়ন রেখে আসবে দলে দলে !

(আজকে যারা দূরে আছে)

ভাই বলে ভাই টান্‌বে বুকে, এক হবে সব দুঃখে সুখে,

এদেশ ওদেশ মিলবে শেষে মায়ের পদতলে !

(এযে নবযুগের নববিধি)

ঠুংরি

হোক্ পৃথ্বী শান্তিধাম, ধন্য হোক্ তব নাম,

নবধর্ম্মে হোক্ বিশ্বজয় ; (ধর্ম্মদ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে)

হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ,   শক্তিদম্ভ হোক চূর্ণ,

হোক বিশ্ব নবদেবালয় ! (সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে)

হোক্ সত্য প্রতিষ্ঠিত,   হোক্ ব্রত জনহিত,

হোক্ দূর ভবে ভুল ভ্রান্তি ; (অহংকার ঘুচে গিয়ে)

হোক্ নববৃন্দাবন,   হোক্ শান্তি-নিকেতন,

এই ভিক্ষা—শান্তি, শান্তি, শান্তি ! (গাহি তব জয়গান)

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব

প্রস্তুতির কার্য্যবিবরণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪ঠা জানুয়ারী, "গৃহ-সাধনের দিন"—নববিধান গৃহধর্ম্মবিধান ; গৃহধর্ম্মসাধন বিনা এ বিধান সাধন হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের সাধকগণ গৃহ সংসার পাপের আগার মনে করিয়া, গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্যাবলম্বনে বনবাসে বা গিরিগুহায় ধর্ম্মসাধন করিতেন ; এবং তাহা না হইলে, পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন হয় না, ইহাই তাঁহাদের সংস্কার ছিল। গৃহস্থগণ "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ বলিয়া মানিতেন।

কিন্তু নববিধান বলেন, "গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন, পবিত্র তীর্থ এ সংসার তপোবন"। ইহা বিশ্বাস করিয়া, সংসার বিধাতার প্রিয় নিকেতন বলিয়া জানিয়া, পূর্ণধর্ম্ম সাধন এখানেই করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। নির্লিপ্ত নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালনই প্রকৃত সংসার-সাধন। নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র গৃহস্থ-বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বনে এবং যুগলব্রতসাধনে সংসারে থাকিয়াই, সর্ব্বধর্ম্ম-সাধনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই উৎসবের প্রারম্ভে, আমরা যাহাতে গৃহকে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মসাধনের তীর্থরূপে গ্রহণ করিয়া, উৎসবের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারি, উপাসনা-যোগে ইহাই অনুভূত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন এবং কোন বন্ধু আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন।

৫ই জানুয়ারী, "শিশু-সেবার দিন"—গৃহসাধনে, গৃহিণীর প্রতি শ্রদ্ধাদান যেমন, শিশুর সঙ্গে স্বর্গের নিদর্শনদর্শন তেমনই। গৃহকে স্বর্গনিকেতন রূপে যদি আমরা দর্শন করিতে চাই, শিশুর মতন এমন সহায় আর আমাদের কে? শ্রীঈশা তাই বলিলেন, "শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও। কারণ ঈদৃশ জনেরই স্বর্গরাজ্য। তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া শিশুর ন্যায় না হও, স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাইবেনা।" বাস্তবিক, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক শিশুর মত স্বর্গীয় বস্তু আর পৃথিবীতে কে? ইহাদের স্পর্শে, চুম্বনে ও আলিঙ্গনে যথার্থই, স্বর্গীয় ভাব সহজেই প্রাণে লাভ হয়। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। মঙ্গলপাড়ার কয়েকটী শিশুকেও কিছু কিছু মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। অপরাহ্নে শান্তিকুটিরে বিশেষ ভাবে শিশুদের উৎসব হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী রমা দেবীর বিশেষ উদ্যোগে অনেকগুলি নববিধানপরিবারের বালকবালিকার সমাগম হয়। তাহাদিগকে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকে আনন্দিত করা হয় এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী প্রার্থনা করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং শিশুরাই সংগীত করে।

৬ই জানুয়ারী, "ভৃত্য-সেবার দিন"—সেবাসাধন নববিধানের বিশেষ সাধন। ভৃত্যগণ সেবা-সাধনের শিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ-ভাবে প্রেরিত। আপনার ঘরবাড়ী ছাড়িয়া, পরের বাড়ীতে থাকিয়া, কেমন করিয়া প্রভুর সেবা করিতে হয়, ভৃত্যগণ সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষা-গুরু। এই ভাবে যাহাতে আমরা ভৃত্যদিগকে আদর করিতে পারি, এই দিন বিশেষভাবে সেই জন্ত নির্দ্দিষ্ট। তা ছাড়া ভৃত্যদের প্রতি আমাদের যে আদর ও স্নেহ করা উচিত এবং তাহাদের কল্যাণের জন্ত আমাদের সর্ব্বদা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ইহাও বিশেষভাবে উপাসনায় উপলব্ধ হয়। এই দিন আবার নববিধান-প্রেরিত সেবক প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের পর-লোকগমনের দিন। তাই তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণও উপাসনা-যোগে সম্পাদিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ পাঠাদি করেন।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন এবং কোন বন্ধুর সাহায্যে আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে ভাই অক্ষয়কুমারের উদ্যোগে ভৃত্য-সেবা হয়।

৭ই জানুয়ারী, "দীনসেবার দিন"। দীন দরিদ্রদিগকে যাঁহারা সাহায্য করেন, তাহাদিগকে তাঁহারা হেয় বা নীচ মনে করিয়া থাকেন। ঈশ্বর বলেন, 'যে দরিদ্রকে দেয়, সে আমাকে দেয়।' আমাদের দয়াবৃত্তিসাধনের সহায়তা জন্তই দীন দরিদ্রগণ ঈশ্বর-প্রেরিত, ইহা মনে করিয়া যদি আমরা দয়া সাধন করি, যথার্থই কৃতার্থতা লাভ করি। বিশেষভাবে তাহাদের পদতলে বসিয়া আমরা দীনতা শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারি। উপাসনায় ইহাই উপলব্ধ হয়। ভাই প্রিয়নাথ নবদেবালয়ে প্রাতে উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রার্থনাদি করেন। রাত্রে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের মহাপ্রয়াণ-প্রকোষ্ঠে ভাই প্রিয়নাথ, ভ্রাতা সরলচন্দ্র, এবং ভাই প্রিয়নাথের সহধর্ম্মিণী ধ্যানাদিতে রাত্রি যাপন করেন।

৮ই জানুয়ারী, নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ-দিন। প্রত্যূষে ৬টার সময় প্রয়াণ-প্রকোষ্ঠে, খাটের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সমস্বরে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করা হয়। সত্যই যেন, সেই মহাপ্রয়াণ দিনে, আচার্য্যের সুরে সুর মিলাইয়া সমস্ত প্রেরিতগণ তাঁহার খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া যে প্রাণগতভাবে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করেন, আজও আত্মিকভাবে সেই সুরের মিলন অন্তরে অনুভূত হইল। ঠিক এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একদল বন্ধু ঊষাকীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধি-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে চলিয়া গেলেন।

বেলা ৯টার সময় নবদেবালয়ে, মহাস্বর্গারোহণ-সাধনোপাসনা ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পাদিত হয়। মানবের পুনরুত্থানের জন্তই, বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্র এই মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া মার কোলে নব জীবনে আজ পুনরুত্থিত হইলেন। শ্রীকেশব সকল মানবকে আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া, আমাদিগকেও তাঁহার অঙ্গে গাঁথিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কেন আর এই দেহপুরবাসে পতিত হইয়া থাকিব? মা যদি দেহকে পুনরুত্থান দান করিলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা কেন পড়িয়া থাকিব? মা আজ আমি আমার স্বতন্ত্র জড় কায়া ছায়া ভস্ম করিয়া, কেশব-অঙ্গে, কেশব-সঙ্গে, সকলকে নবজীবনে সপরিবারে সদলে পুনরুত্থিত করিয়া নিন্। থাকব না আর আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রামে প্রাণ-কেশবকে ছেড়ে। আগে সেই রাখালদল যেমন প্রাণ-কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই, তেমনি আমরাও আজ শ্রীকেশবের সঙ্গে এক হয়ে মার কোলে পুনরুত্থিত হই; এবং শ্রীকেশবের নব জন্মের শতবার্ষিকীসাধনে সকল বিশ্বমানব-সঙ্গে নবজন্মলাভের জন্ত প্রস্তুত হই। এই মর্ম্মে আরাধনা প্রার্থনাদি হয়। ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ শাস্ত্রপাঠাদি করেন। ভ্রাতা

সরলচন্দ্র সেন মাতৃদেবীর প্রার্থনা ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের যোগের প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করেন। শ্রীমতী সুচারু দেবী প্রাণের উচ্ছ্বাসে উপাসনান্তে প্রার্থনা করেন। প্রেম-সঙ্ঘের শিশুগণ মধুর কণ্ঠে সুধা দেবীর নেতৃত্বে দুইটি সুন্দর সংকীর্ত্তন করেন। ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও ভ্রাতা সমীরচন্দ্র দত্ত সময়োপযোগী সংগীত করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় আলবার্টহলে, মহতী স্মৃতিতর্পণসভা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৬ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯ই জানুয়ারী, মহাজনগণের দিন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নবদেবালয়ে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও প্রার্থনাদি হয়।

১০ই জানুয়ারী, জনহিতৈষিগণের দিন। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ধর্ম্মের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মধনে ধনী করিলেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ ও বরণ অনুসরণ করিলাম; অদ্য তাঁহাদিগকে বরণ করি, তাঁহাদের অনুসরণ করি, যাঁহারা কর্ম্মযোগে যোগী হইয়া জগতের জন্য আত্মদান করিলেন। অদ্য সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

১১ই জানুয়ারী, উপকারীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সাধনের দিন। নবদেবালয়ে প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন; সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও প্রার্থনা হয়। উপকারিগণের দয়ার উপরই আমাদের জীবন নির্ভর করে। আমাদের পরম জননীর ন্যায় উপকারী আর আমাদের কে? তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে যত উপকারিগণ আমাদের নানাপ্রকারে উপকার করিয়া, আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। স্বর্গের দেবদেবীগণ হইতে পৃথিবীস্থ পিতামাতা, রাজা, রাজপ্রতিনিধি, শিক্ষক, চিকিৎসক, উপদেষ্টা, ধর্ম্মাচার্য্য, অর্থদাতা এবং বন্ধুবান্ধব সেবক সকলেরই নিকট আমরা অশেষ প্রকারে উপকৃত। বিশেষ ভাবে আমাদের আচার্য্য এবং প্রেরিতগণ ও দানশীল অভিভাবকগণের ঋণ স্মরণ করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁহাদের চরণে প্রণত হই। আমরা যেন কাহারও উপকার বিস্মৃত না হই।

১২ই জানুয়ারী, বিরোধিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্মরণের দিন। উপকারী বন্ধুগণ যেমন পরমজননীর প্রতিনিধিরূপে আমাদের কল্যাণ করেন, যাঁহারা আমাদের বিরোধী কিম্বা আমাদিগকে বিরোধী মনে করেন, তাঁহারাও কল্যাণ করেন। তাঁদের প্রতি যাহাতে আমরা কৃতজ্ঞ হই এবং ক্ষমা সাধন করিতে পারি, তাহারই জন্য অদ্যকার দিনের বিশেষ সাধন। বিরোধিগণ আমাদের দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দিয়া, কতই আমাদিগকে শিক্ষা দান করেন ও উপকার করেন। তাঁহাদের ভিতরেও যাহাতে আমরা ন্যায়বান বিচারপতিকে দর্শন করিতে পারি এবং তাঁহাদের বিরোধিতার জন্য ক্ষমা সাধন করিয়া বিনয়ে অবনত হইতে পারি, ইহাই বিশেষ ভাবে এই দিনে সাধন হয়। নববিধানের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদিগের জন্যও বিধান-জননীর নিকট বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। তাঁহাদিগকেও যাহাতে আমরা ভ্রাতৃভাবে ভালবাসিতে পারি, তাহার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। ক্ষমা-সাধনের জন্য এই দিন বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট। আমরা যদি আমাদিগের বিরোধীদিগকে ক্ষমা করিতে না পারি, কেমন করিয়া আমাদের অপরাধের জন্য মার নিকটে আমরা ক্ষমা পাইব, ইহাই বিশেষরূপে উপাসনাদিতে উপলব্ধ হয়। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রার্থনা ও পাঠাদি হয়।

১৩ই জানুয়ারী, আত্মার জন্য। এই দিন বিশেষভাবে যাহাতে আমরা আত্মায় আত্মস্থ হইয়া উৎসবে প্রবেশাধিকার পাইতে পারি, তাহারই জন্য প্রার্থনাদি হয়। নববিধান পবিত্র আত্মার বিধান। যদি আমরা আত্মানুভূতি লাভ করিতে না পারি, কেমন করিয়া আমরা স্বর্গের দেবাত্মাদিগের সহিত উৎসব-সম্ভোগের অধিকারী হইব? এইজন্য এই দিন আত্মদর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী পাঠাদি করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রার্থনা হয় এবং বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন।

১৪ই জানুয়ারী, চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধি বিনা উৎসব-সাধনের অধিকার লাভ হয় না। আর যেমন হিন্দু সাধকগণ গঙ্গাস্নান এবং সাগর-স্নান করিয়া পাপ ধৌত করিবার জন্য সাধনে নিরত, আমরাও পবিত্রাত্মা ব্রহ্মসাগরে অবগাহন করিয়া, যাহাতে পূর্ব্বকৃত সমুদায় পাপ ধৌত করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারি, ইহাই বিশেষভাবে প্রার্থনা হয়। নবদেবালয়ে প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী মণিকা দেবী শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। শ্রীমতী সুধা দেবী সদলে সংগীত করেন।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলভিত্তি

(৪)

(পরিশিষ্ট)

পূর্ব্ববারে আমরা দেখাইয়াছি যে, কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ সনেই কলিকাতার মেডিকেল কলেজের থিয়েটার হলে "Jesus Christ; Europe and Asia" নামক সর্ব্বপ্রথম একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্ত্তী সময়েও "Great Men", "Regenerating Faith." পরে ১৮৬৯ সনে "The Future Church"

নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়া, ১৮৭০ সনে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অসাম্প্রদায়িকতা, মতের উদারতা এবং সময়োপযোগী নানাভাব-বিমিশ্রিত নূতন নূতন বিষয়ে কথাগুলি দ্বারা ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যে মহা উদার ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচের ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

Sir John Bowring (স্যার জন্ বাউরিং) কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে থাকিবার সময়েই একটি সভায় তিনি সভাতে আসিবার পূর্ব্বে একটি কবিতা লিখিয়া আনিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমেই ঐ কবিতাটি পাঠ করেন। ঐ কবিতাই এই :—

"Tell us, when shall all men gather
In one vast cathedral hall,
Worshipping a common Father,
Leading, guiding, loving all ?
World's the circle, God the centre,
Where nor war nor hate shall enter ;
All that severs man unheeding,
All that links and fuses blending,
All from heavenly founts proceeding,
All to heavenly issues tending ;
Good supplanting evil ; gladness
Scattering every shade of sadness."

"আমাদিগকে বলিয়া দাও যে, কবে জগতের সমগ্র মানবজাতি এক সুপ্রশস্ত ধর্ম্মমন্দিরে একত্র হইবে, এবং যিনি আমাদিগের সকলকে পরিচালিত ও পথপ্রদর্শন করেন এবং ভালবাসেন, তাঁহার পূজা অর্চনার নিমিত্ত একত্র হইবে ? জগৎ এক সুবিস্তৃত পরিধি এবং ঈশ্বর ইহার কেন্দ্র, যেখানে বিবাদ, বিসম্বাদ ও ঘৃণা প্রবেশ করিতে পারে না, এবং যাহ যাহা মানুষকে মানুষ হইতে উপেক্ষার সহিত পৃথক করিয়া দেয়, তাহাও যেখানে থাকিতে পারে না ; কিন্তু, যাহা নানা বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও মিলাইয়া দেয় ও যাহা যাহা স্বর্গীয় উৎস হইতে নিয়ত উৎসারিত হইতেছে এবং স্বর্গীয় বিধি ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ত সংরক্ষিত হইতেছে, যেখানে সাধুতা দ্বারা অসাধুতা স্থানচ্যুত হইতেছে, এবং আনন্দ যেখানে সর্ব্বপ্রকারের নিরানন্দকে দূর করিয়া দিতেছে।" দেখুন, এই কবিতাটিতে কেমন নববিধানের বা সর্ব্বসমন্বয়ের সারমর্ম্ম মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, কেশবচন্দ্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) ঘোষণা করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধাতার বিধান। পৃথিবীতে শান্তি-সংস্থাপনের নিমিত্তই বিধাতা ইহাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা সমস্ত পৃথিবীর জন্যই আসিয়াছে। ইহা জগতে নূতন আলো প্রদর্শন করিবে। সর্ব্বদেশীয় মানব মাত্রেই আমাদের ভাই, ইহা প্রদর্শন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা। ইহা মিলন, শান্তি ও ঐক্য প্রদর্শন করিবে। সমস্ত মানবজাতি মিলিতভাবে এক পরিবার হইবে। কলহ ও অনৈক্য বিদূরিত হইবে। সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ভিতর কলহ থাকিবে না, জাতিভেদ থাকিবে না। জ্ঞানী ও মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেই বুঝিবে যে, ঈশ্বর আমাদিগের সকলের ভিতরেই আছেন। ঈশ্বরই পিতা, তিনিই পরিত্রাতা, তিনিই আমাদিগকে পাপ পরিত্যাগ করিতে বলেন, তিনিই আমাদিগকে মানবসেবায় প্রবৃত্ত করেন, সত্যপ্রিয় হইতে শিক্ষা দেন, প্রবৃত্তি-দমনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেন, নরনারীদিগকে পবিত্রভাবে দেখিতে বলেন, এবং অপবিত্র চিন্তা হইতে দূরে থাকিতে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেন। ঈশ্বরই আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তা, শিক্ষক ও গুরু।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর, কেশবচন্দ্র উপদেশে বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্তকালস্থায়ী ও অত্যন্ত উদার। ইহা কোন দেশেতে, সময়ে, অথবা কোন পুস্তকে অথবা বিশেষ কোন মনুষ্যে আবদ্ধ নহে। কিন্তু হিন্দু, কি মুসলমান, অথবা খ্রীষ্টান কোন সম্প্রদায়েরই অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই জাতিগত ব্যবধান তুলিয়া দিবে ও জগতের সকল জাতি ও বর্ণকে সম্মিলিত করিবে। সাম্প্রদায়িকতার প্রাধান্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাহার কোন স্থান নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবজাতির আত্মকৃত সম্পত্তি। ঈশ্বর আমাদিগের ভিতরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদিগের আত্মাকে শিক্ষাদান করিতেছেন। ঈশ্বরই আমাদিগের গুরু ও নেতা। তিনিই আমাদিগের শাস্ত্র। এজন্য আমরা অন্য কোন গুরু বা নেতা অথবা শাস্ত্র গ্রহণ করিতে পারি না। যথাসময়ে ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাঠাইয়াছেন। এই ঐশ্বরিক ধর্ম্ম হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের প্রভেদ উঠাইয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মকেই আপনার ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। নিশ্চয়ই এ ধর্ম্ম একদিন জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র টাউন হলে 'ভারতে স্বর্গীয় আলোক নিরীক্ষণ কর,' (Behold the Light of Heaven in India) বক্তৃতাতে, এ ধর্ম্ম যে একটি নূতন বিধান, তাহা নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বশেষ বক্তৃতা "ইউরোপের প্রতি এসিয়ার নিবেদন" (Asia's message to Europe) প্রদান করেন। ইহাতে তিনি জগতের সকল জাতিকে লক্ষ্য করিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, "এস আমরা এক ঈশ্বর, এক সমাজ ও এক সত্যে আবদ্ধ হই, সমস্ত মানবজাতিকে এক করিয়া ফেলি ; বহু জাতি, বহু সম্প্রদায়, বহু মতের মধ্যেও একতা সম্ভব, ইহা আমরা সপ্রমাণ করিয়া দেই। সকলে মিলিত হইয়া একটি শরীর হও। আমি আমার সম্মুখে সেই জাতি-সম্মিলনের ব্যাপারটি দেখিতে পাইতেছি, যাহা একদিন অতি সুন্দর একতা সম্পাদন করিবে, এবং শত

প্রকারের শত্রুতা বিনাশ করিবে। ইউরোপ আমাদিগের জন্য যে কল্যাণ করিয়াছেন, যে সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উপকার সাধন করিয়াছেন, সে সকলের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আমি এসিয়ার পক্ষসমর্থক সন্তান। এসিয়ার দুঃখ আমার দুঃখ, তাহার আনন্দ আমার আনন্দ। এই আমার ওষ্ঠাধর এসিয়ার পক্ষ চিরদিনই সমর্থন করিবেই করিবে। বিশ্বস্ত অনুগত দাসের ও অনুগত পুত্রের ন্যায় আমি আমার পিতৃভূমির সেবা করিব। এসিয়া কি প্রধান প্রধান ঋষি ও মহাজনদিগের জন্মভূমি নহে? পৃথিবীর পক্ষে কি ইহা সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থল নহে? যাঁহাদিগের পদপ্রান্তে পৃথিবী ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা সকলে এসিয়ার ভিতরেই জন্মধারণ করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে সকল ধর্ম্ম কোটি কোটী লোককে জীবন ও পরিত্রাণ প্রদান করিয়াছে, সে সকল এই পবিত্র এসিয়া-ভূমিতেই অভ্যুদিত হইয়াছিল। আমার নিকটে এসিয়ার ধূলি স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও মূল্যবান। পৃথিবীতে যত সম্প্রদায় আছে, এসিয়া তাঁহাদের গৃহ। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই এই এসিয়াকেই সাধারণ গৃহ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা ইউরোপকে বলি, এস, আমরা এক ঈশ্বর, এক সমাজ ও এক সত্যে আবদ্ধ হই। সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক করিয়া ফেলি।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো মহাসমিতিতে যখন শ্রদ্ধের নেতাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্বভাবদত্ত জলদগম্ভীর-স্বরে বলিতেছিলেন যে, "আমার মাষ্টার ও আমার বন্ধু কেশবচন্দ্র সেন ১০ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার টাউন হলে দাঁড়াইয়ে 'Asia's message to Europe' বক্তৃতার উপরোক্ত বাক্যগুলি ঘোষণা করিয়াছিলেন", তখন সহস্র সহস্র নরনারী উচ্চ করতালি দ্বারা তাঁহাদের হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহামিলনের ১০ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতের একজন এমন সব কথা বলিয়াছিলেন শুনিয়া, তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সংবাদ।

উদ্যান-সম্মিলন—গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, বেলগাছিয়া ভিলায়, নববিধানসমাজ ও সাধারণব্রাহ্মসমাজ সম্মিলিত ভাবে উদ্যানসম্মিলনোৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। উভয় সমাজের যুবক বন্ধুগণ যথোচিত যত্ন, পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রেমভক্তি-সহকারে উৎসবটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেড় সহস্রাধিক বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা সমবেত হইয়া, একত্র ভজন, ভোজন, খেলা ধূলা, আলাপ প্রসঙ্গ, আদর আপ্যায়নে প্রাণে প্রাণে মধুরতর মিলন সম্ভোগ করিয়াছেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন। তাঁর উপাসনাও নববিধানের মিলনের ভাবে অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইরূপ মিলনোৎসব যত হয়, ততই ভাল।

উৎসব—গত ৮ই পৌষ, (২৩শে ডিসেম্বর), হইতে ১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত উল্‌টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব এবং গত ৪ঠা পৌষ হইতে ১৩ই পৌষ পর্য্যন্ত মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে এবার উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ৩৬ডি যতীন দাস রোডে, অমরাগড়ীর স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার রায়ের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় পাঠ ও বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং বিধবাপত্নীর লিখিত প্রার্থনাও আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে পত্নী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী, সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গগত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সাম্বৎসরিক দিনে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ এবং মঙ্গলপাড়ার সমাধিতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী আনন্দদায়িনী চট্টোপাধ্যায় প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

স্বর্গীয় কালীপদ দাসের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, সিঁথিতে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার দাসের গৃহে, ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে উপাসনা হয়। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে সংগীত ও কীর্ত্তন করেন।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, (২২শে মাঘ), শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, ১০।২ পটুয়া টোলা লেনে, চট্টগ্রামের আশাকুটীরের পিতামাতা স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাস ও স্বর্গীয়া ইচ্ছাময়ী দেবীর সাম্বৎসরিক স্মৃতিতে, তাঁহাদের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত বিভূরঞ্জন দাস গুপ্তের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন দাস গুপ্ত ব্যাকুলভাবে বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চারুবালা বানার্জি চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে মাঘ, (৭ই ফেব্রুয়ারী), আলিপুরে ২২নং নিউ রোডে, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বানার্জির সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পত্নী শ্রীমতী চারুবালা দেবী এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা ও ভগ্নীসমিতিতে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ৬৫।১ হ্যারিসন রোডে, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের প্রথম সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে

পুত্র প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা এবং দৌহিত্রী শ্রীমতী সুহাসি ঘোষ ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲ টাকা দান করেন।

কোচবিহার-সংবাদ—অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে, ৯ই মাঘ, রবিবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। ১০ই মাঘ, প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিপার্শ্বে উপাসনা। ১১ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব; প্রাতে ৭॥টায় হইতে সংগীত ও কীর্ত্তন এবং তৎপরে উপাসনা, উপাসনান্তে প্রীতিভোজন; সন্ধ্যা ৫॥০ ঘটিকা হইতে পাঠ ও আলোচনা এবং সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। ১২ই মাঘ, প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা ও শান্তিবাচন। প্রতিদিনের উপাসনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

কৃষ্ণনগর-সংবাদ—অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে গত ১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, বুধবার সন্ধ্যা ৬॥টার সময় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনের সভাপতিত্বে, স্থানীয় রামগোপাল টাউন হলে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলনে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস, মৌলবী জহুরদ্দিন, অধ্যাপক বিনায়ক সান্ন্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

চট্টগ্রামের সংবাদ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ৮২তম সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আগমন করায়, বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। বুধবার ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় "আরতি" হইয়া উৎসব আরম্ভ হয়। "প্রণাম করি মা তব চরণে" এই সঙ্গীতটী সকলে সমস্বরে গান করার পর, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস শ্রীমৎ আচার্য্যের আরতির সুমধুর প্রার্থনা পাঠ করেন এবং নিজেও প্রার্থনা করেন। ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যাত্রামোহন হলে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ "দেহ মনের স্বাস্থ্য" বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর "ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার দিন" প্রাতে ডাঃ ঘোষ মন্দিরে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ডাঃ ঘোষের সভাপতিত্বে মণ্ডলীর বার্ষিক সভা হয়। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে ডাক্তার ঘোষ উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় মন্দিরে "বিবিধবিধান" বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। ২৬শে ডিসেম্বর "সমস্তদিনব্যাপী উৎসব", প্রাতে ডাঃ ঘোষ সুমিষ্ট উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত, এম এ গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, সন্ধ্যায় ডাঃ ঘোষ উপাসনা করেন। ২৭শে ডিসেম্বর শান্তিবাচন—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সুশাঙ্ককুমার চৌধুরী সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। দুই সমাজের প্রায় সকলেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

প্রেরিত পত্র

"নববিধান কেন জয়যুক্ত হইতেছে না ?"

সম্পাদকীয় স্তম্ভে ১লা শ্রাবণ, ১৩৩২ সালের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সংখ্যায় উক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, সম্পাদক ভালই করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। যে বিষাদের কালিমা বহন করিয়া সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষাদের ছায়া নববিধানের প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং আপনার প্রার্থনার ভিতরে ব্যক্ত করিয়াছেন, "অল্পবিশ্বাসীরাই কি কেবল পৃথিবীতে কাজ করিবে, আর হাত দুলাইয়া বেড়াইবে, আর তোমার ভক্তবৃন্দ কি কালনিদ্রায় অচেতন থাকিবেন ? এখনও পর্য্যন্ত আমরা প্রবলতর হইতেছি না, পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছি।" সঙ্গে সঙ্গে এ প্রার্থনাও করিয়াছেন—"আমরা কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসরাজ্য স্থাপন করিব। 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন' আমরা সকলে এই উৎসাহের সহিত বলিয়া, এই মন্ত্র সাধন করিয়া তোমার শান্তিরাজ্য স্থাপন করিব। সকলে প্রবল পরাক্রমে উৎসাহী হইব, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর।"

ব্রহ্মানন্দ আপনার জীবনে ও সমুদায় উক্তিতে ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, জগতে বিশ্বাসরাজ্য স্থাপিত হবে; কিন্তু ইহাও প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এক বিশ্বাসী দল আস্তে আস্তে গঠিত হবে এবং তাঁদের প্রচার ও আধিপত্য সমস্ত মানবমণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়া নববিধান জয়যুক্ত হবে এবং প্রকৃত বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করিবে। কোন ব্যক্তিসমষ্টি বা স্থানবিশেষে ইহা আবদ্ধ থাকিবে না। ইহা যদি সত্য না হয়, তবে নববিধান যুগধর্ম্ম বা এ কালের বিধান হওয়া কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। অবস্থা বা স্থানবিশেষে এই বিশ্বাসী দল জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আপনাদের কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পৃথক পৃথক আকারে সম্পাদন করিতে পারেন, কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন থাকিবে। যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিচ্ছেন এবং নববিধান বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস লোকের নিকটে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন ও নিজের কর্ম্ম ও সাধনার দ্বারা বিশ্বাসী দল গড়িবার চেষ্টা কচ্ছেন, হতে পারে, এ দল হয় ভেঙ্গে যাবে, কিম্বা ব্যক্তি বিশেষ জগতের বিশ্বাসী দলের সঙ্গে যোগ দেবেন; কিন্তু যুগধর্ম্ম আপনার প্রভাববলে ও ভগবানের আশীর্ব্বাদে জগতে নূতন করে বিশ্বাস রাজ্য স্থাপন করিয়া জয়যুক্ত হবে। কার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে। যুগধর্ম্ম আপনার দল গঠিত করিতেছে।

তাই বলতে হয়, সম্পাদক মহাশয় বোধ হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধেই লিখেছেন, যাঁরা সমস্ত জেনে শুনে বুঝেও এগুতে পাচ্ছেন না এবং অপরকেও দলে আনতে পাচ্ছেন না। এ অতি বিষম সমস্যা এবং যার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। এ সম্বন্ধে কেহ যদি কিছু লেখেন, তবে বড় ভাল হয়। এ অধীনের এ বিষয়ে কিছু নিবেদন থাকতে পারে, পরে চেষ্টা করা যাইবে। ইতি—

বাঁকা, ভাগলপুর। শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। } ১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
28th. February, 1938 { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

হে পরব্রহ্ম! তুমি নববিধানে নবশিশুপ্রসবিনী, উচ্ছ্বসিতপ্রেমোন্মাদিনী আনন্দময়ী মা হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। তুমি এখন আর কেবল সত্তা মাত্র নও। এই যে ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি নিরাকার সত্তা, কিন্তু সমস্ত বিশ্বাকারে তুমি দর্শন দিতেছ। তোমার মাতৃবক্ষ মহাপ্রেমে উচ্ছ্বসিত। তোমার প্রেম হইতেই তুমি বিশ্ব সৃজন করিয়াছ এবং তোমার প্রেমাধার প্রেমের পাত্র মানব-সন্তান। তাই তুমি সসন্তানে সদাই বিদ্যমান। আকাশে যখন বাতাস প্রবাহিত হয়, যখন তাহা আবার জলে পরিণত হয়, তখন নিরাকার বাতাস সাকার বৃষ্টির আকারে সকলকেই সিঞ্চিত এবং অভিষিক্ত করে। তেমনই বর্ত্তমান যুগে তোমার প্রেমের বর্ষায় ভাসাইয়া দিবার জন্য তুমি এই নবযুগে নববিধান লইয়া সকলকে নবজীবনে সিঞ্চিত এবং অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ। এখন আর সেই আগেকার মত ব্রহ্মনিরূপণ করিবার জন্য সংসার ছাড়িয়া বনে বা গিরি-কন্দরে যাইতে হয় না। তুমি তোমার প্রেমের বর্ষা লইয়া সমস্ত বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছ। আবার একা তুমি নও। সসন্তানে আসিয়া যত মানবসন্তান-সন্ততি নরনারীকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার জন্য, সংসারে ঘরকন্না বাঁধিয়া দিয়া, সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের ভিতরে তোমার স্পর্শ দিতেছ। এবং তোমার সন্তান দ্বারাও, সকল সন্তান সন্ততিকে তুমি যে ভালবাস, তুমি যে বড্ড ভালো মা, তুমি যে কালোছেলেকেও ভালোবাসো, তাহারও সাক্ষ্য দান করাইতেছ। আর কি পৃথিবী তোমা থেকে দূরে পলায়ন করিতে পারে? আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইলে যেমন পৃথিবীর নিম্নভূমিস্থ ক্ষুদ্র নদীতেও জোয়ার হয়, উজান বহিয়া যায়, তেমনই তোমার এবং তোমার কেশব-চন্দ্র আশাচন্দ্রের আকর্ষণে সকল জীবন-নদীকে উজান বহাইয়া লইবে। আর কোন জীবন শুষ্ক বালুকাময় হইয়া থাকিতে দিবে না। কেন না এখন তুমি যে মানব-ধর্ম্মের স্বয়ং প্রবাহ হইয়া, সকলকে তোমারই দিকে প্রবাহিত করিবে, ইহাই সংকল্প করিয়াছ। তোমার এ নববিধানে আমরা বিশ্বাস করিয়া, তোমার নবশিশুদল-ভুক্ত হইয়া, যাহাতে তোমার কৃপাস্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর; এবং তোমার নব-ভক্তের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, যেন সমস্ত বিশ্বমানব-জীবন নবজীবন লাভে ধন্য হয়, তুমি দয়া করিয়া এমন বিধান কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

কেশচন্দ্রের জন্মে জগতের কি লাভ হইল ?

শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী আগত। তাঁহার জন্মে জগতের কি লাভ হইল, ইহা অনুধাবন করা, বোধ হয়, এখন অপ্রাসঙ্গিক নহে। যুগে যুগে বিধাতা এক এক মহাজন প্রেরণ করিয়া, এক এক ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকেশবচন্দ্র নিজকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবতারগণের শ্রেণীভুক্ত করেন নাই; এবং অপর দিকে সাধারণ পাপী মানবের সর্দ্দার বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তবে পাপী মানব কেমন করিয়া পরিবর্ত্তিত জীবনলাভে ঈশা গৌরাঙ্গের মত হইতে পারে, তাহারও আদর্শ দেখাইতে তিনি যে আসিয়াছেন, তাহাও বলিতে তিনি ভীত হন নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রথম হইতে স্বাভাবিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তিনি কখনও কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা ধর্ম্মসাধনে অবলম্বন করেন নাই, কিংবা তাহা অবলম্বন করিতে কিছুতেই প্রশ্রয় দেন নাই। স্বভাবই মানবের ধর্ম্ম—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রধান সাধনা। সহজ আত্মবোধে এবং আত্মজ্ঞানে তিনি ধর্ম্মসাধনা আরম্ভ করেন। শিশুমাত্রেই যেমন জন্মলাভ করিয়াই ক্রন্দন করিতে শিখে এবং সেই ক্রন্দন হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর মনের এবং মানবত্বের পুষ্টিলাভ হয়, ঠিক তেমনই সহজে তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মজীবনের উষাকালে দৈববাণী আসে, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করিলে সকলই পাইবে।"

"তোমার বইও নাই, কিছুই নাই, তুমি কেবল প্রার্থনা কর।" তাই তিনি সেই দৈববাণীতে সহজে বিশ্বাস করিয়া এবং অটল বিশ্বাসে তাহাই অবলম্বন করিয়া, জীবনের যাহা কিছু উচ্চ ধর্ম্মসংস্থান এবং বিশ্বমানবের সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ যে আদর্শ জীবন, তাহা লাভ করেন। তিনি অধিক শাস্ত্রাধ্যয়নও করেন নাই, কিংবা কোনও মানুষ গুরুর পা ধরিয়া টানাটানি করেন নাই, কোন কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য সাধনারও অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করেন নাই। সহজে আত্মজ্ঞানে বিবেকের বাণীতে যখন যাহা সত্য উপলব্ধ হইয়াছে, কিম্বা যে সাধনা অবলম্বনের আদেশ অনুভূত হইয়াছে, জীবন্ত ঈশ্বর-গুরুর প্রেরণা বিশ্বাস করিয়া, তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারাই এ মানবজীবনে যে উচ্চ ধর্ম্ম লভনীয়, তাহাই লাভ করিয়াছেন।

স্বভাবের অনুসরণ করিয়া যে মানবধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ লাভ করা যায়, কেশবচন্দ্র বর্ত্তমান যুগে তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়, অনাহার বা বায়ু ভক্ষণ করিতে হয়, বা স্ত্রী সন্তান সন্ততিদিগের সংস্রব হইতে দূরে পলায়ন করিতে হয়, কিংবা অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন, গুরুকরণ, কষ্টসাধ্য যোগসাধন ইত্যাদি না করিলে যে ধর্ম্ম হয় না, এই সংস্কার যে নিতান্ত অসার ও ভ্রমাত্মক, শ্রীকেশবচন্দ্র জীবন দ্বারায় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি গৃহে থাকিয়াই, স্ত্রী পুত্র পরিবার দাসদাসী ধন মান বিষয় সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইয়াই, উচ্চ যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সাধনসমন্বয়ের আদর্শ পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন :—

> "গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন।
> সংসার তীর্থ বিধাতার প্রিয় নিকেতন।"

এ সংসারের প্রত্যেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সাধনকেই বিধাতার ইচ্ছাপালন বিশ্বাস করিয়া, তিনি তাহা সাধন করিয়াছেন। যথার্থই তিনি সংসারে থাকিয়াও, নির্লিপ্ত নিষ্কাম বৈরাগ্য অবলম্বনে, জনক ঋষির ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন। ইহা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও শুধু যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার কাছে গেলেও যে নিরাকার ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা বার বার সকলকে বলিয়াছেন। যাহা আপাততঃ সাধারণ লোকে অসম্ভব মনে করে, তাহা তিনি জীবন্তরূপে সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এই জন্য সংসারে থাকিয়া যাঁহারা ধর্ম্মসাধন অসম্ভব মনে করেন, তাঁহাদিগকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তিনি ঈশ্বর-নিয়োজিত।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষা লাভ করেন নাই; কিন্তু তিনি আত্মশিক্ষার দ্বারা এমনই উচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, তখনকার ভাইস চ্যান্সেলার মুক্তকণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারীদিগকে বলিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের ন্যায় মানুষ তৈরী করাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ। তিনি অধিক শাস্ত্র আলোচনা না করিয়াও, যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদ্য শাস্ত্রতত্ত্ব অপেক্ষাও ন্যূন নহে। তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা

করেন নাই, কিন্তু এমনই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রও সে ভাষা-শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট যাইতেন। ইংরাজীতেও তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি এমনই ছিল যে, ইংলিশম্যানের সম্পাদকও তাঁহার 'সিসিরোনিয়ান স্পীচ' বলিয়া প্রশংসা করিতেন এবং অন্য সম্পাদকও বলিয়াছেন, "when Keshub speaks world hears." ইংলণ্ডেরও মনীষিগণ তাঁহার বাগ্মিতায় তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্ম সকল মৃতপ্রায় সংস্কার ও বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্রে বা শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীকেশবচন্দ্র প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-প্রেরণায় সে সকলকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদিগকে পুনরুদ্ধার করেন এবং সমুদয় ধর্ম্ম, শাস্ত্র, সাধু, মহাজন ও সকল সাধনা সমন্বয় করিয়া, তাহা নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ ও আচরণ দ্বারা, জগৎকে এক নবজীবনলাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা যে বিধাতার নবযুগের নববিধান, তাহা জীবন্ত-ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে ঘোষণা করিয়াছেন।

ধর্ম্মসমন্বয় তাঁহার নিকট কেবল দার্শনিক মত নয়, তাহা যে জীবনে প্রামাণ্য, তাহা তিনি সাধনার দ্বারায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে কেবল বিবাদের স্থল ছিল। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল। সাধারণ সংসারী মানবের পক্ষে তাহা এক প্রকার অসাধ্য সাধন হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকেশবচন্দ্র তাহার মিলন সংস্থাপন করিলেন এবং জীবনে তাহা সাধন করিয়া দেখাইলেন যে, সকল ধর্ম্মই মানবমাত্রেরই অনুসরণীয়। এইরূপে সর্ব্বমানবের ধর্ম্মমিলনে নূতন পথ খুলিয়া দিলেন।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ইহা ইতিপূর্ব্বে কেবল ধর্ম্মমত মাত্র ছিল। শ্রীকেশবচন্দ্র সাধনার দ্বারা তাহার পূর্ণ সত্যতা সপ্রমাণ করিলেন। ঈশ্বর বিভিন্ন নামে বা অভিধানে পূজিত হইলেও, তিনি যেমন একই, তেমনই সমস্ত মানবজাতি কেবল ঈশ্বরের সম্পর্কে ভাই ভাই নয়, কিন্তু একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে এক অখণ্ড মানব কিংবা এক পরিবার, ইহাই তিনি জীবনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বাস্তবিক কেশবচন্দ্র সমস্ত জগতের সকল প্রকার বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া মহান্ শান্তি সংস্থাপনের জন্য আসিয়াছেন। ঈশ্বর-সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান বিচার এবং পুরুষকার অবলম্বনে কত প্রকারই ভ্রান্ত মত এখনও জগতে প্রচলিত। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকেও পূর্ণ ঈশ্বরের অবতার-বোধে বিভিন্ন সম্প্রদায় পূজা করিতেছেন। শ্রীকেশবচন্দ্র জীবন্ত ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায় ও তাঁহার বাণী শোনা যায়, এবং তাঁহার পরিচালনায় সংসারের প্রত্যেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করা যায়, তাহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঈশ্বর শাস্ত্রে বা কল্পনায় বা মূর্ত্তিতে নিবদ্ধ নহেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেকের জীবনের জীবনরূপে জীবন্ত ভাবে বিহার করিতেছেন ও প্রতিজনকে স্বাধীনভাবে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে দেখিতে ও শুনিতে শিখাইতেছেন, ইহা কেশব সপ্রমাণ করিলেন। তাই ব্রহ্ম-উপাসনার এক নূতন প্রণালী তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

এই উপাসনা অবলম্বনে যে সর্ব্বাঙ্গীন সাধন হয়, তাহা জীবনের দ্বারা দেখাইয়াছেন। উদ্বোধন, আরাধনা, ব্রহ্মারতি, ধ্যান, যোগসাধন, নামস্মরণ, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তন ও নিশান-বরণ একাধারে সমাবেশ করিয়া, এই নব সাধন-প্রণালী কেশবচন্দ্র জগৎকে দান করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, 'তুমি' বলিয়া সম্বোধনের পথ দেখাইয়াছেন। সাধু মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বর-বোধে পূজা নিতান্ত ভ্রান্তি বলিয়া শ্রীকেশব প্রমাণ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক যুগে, এক এক জাতির মধ্যে, এক এক বিশেষ সত্য-সাধনার প্রবর্ত্তকরূপে সেই একই অদ্বিতীয় ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। অনন্ত চিন্ময় ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া, মানবসন্তানদিগকে তাঁহার বিভিন্ন চরিত্রের আদর্শ দেখাইবার জন্য, এক এক মানবকে আদর্শরূপে গঠন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা কেহই পূর্ণ ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপের এক এক ভাব ও আদর্শ দেখাইবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত। এই ভাবে ইঁহাদিগকে গ্রহণ ও ইঁহাদের আদর্শ অনুসরণ, প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র এই সকল সাধু ভক্তদিগের চরিত্র আত্মজীবনে গ্রহণ এবং পরিধান করিয়া, সর্ব্বধর্ম্মাদর্শ জীবনে সমন্বয় করিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি সকল জগতের পাপী নরনারীকে আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে সহানুভূতি-যোগে গ্রহণ করিলেন, তেমনই আবার জগতের মহামানব ধর্ম্মাচার্য্যদিগকেও আত্মস্থ করিয়া, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এক অখণ্ড মানবের বা বিশ্বমানবের মূর্ত্তিমান আদর্শ হইলেন।

তাই শ্রীকেশবের জন্মে সর্ব্বাবয়বপূর্ণ মানবত্বের জীবন্ত

আদর্শ পৃথিবী লাভ করিল। তিনি কেবল ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইলেন না, কিন্তু ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সত্য, শাস্ত্র, সেবা, প্রীতি, সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সকল প্রকার কর্ত্তব্যে সমন্বয়সংসাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। পরলোক বা জন্মান্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে ভ্রম ছিল; শ্রীকেশব তাহার নিরাকরণ করিলেন। এ মানবাত্মা এ দেহ-প্রবাসে শিক্ষা ও সাধনের জন্য প্রেরিত, ইহা চির উন্নতিশীল এবং অমর। সুতরাং দেহান্তে এ আত্মা আর দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারেনা, ইহা নিত্য অমরত্বের পথে প্রগত হইবে এবং ইহলোকের পাপ পুণ্যের জন্য ইহ পরলোকে দণ্ডনীয় বা পুরস্কৃত হইবে। পরলোকগত অমরাত্মাগণ নিত্য নিরাকার ব্রহ্মে অধিবাস ইহলোকে যেমন করিতেছেন, পরলোকেও করিবেন। ব্রহ্মের ভিতর দিয়াই পরলোকগত অমর আত্মাদের সঙ্গে আত্মিক যোগ হইতে পারে, ইহাও কেশবচন্দ্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই ভাবে পরলোকগত অমর সাধু ভক্তদিগের সঙ্গসাধন তীর্থসমাগম-রূপে সাধন করিয়া, তিনি ব্রহ্মযোগের ন্যায় সাধু-সমাগমযোগসাধন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কর্ম্মসাধনার সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। স্বদেশানুরাগ ও রাজভক্তির সমন্বয়সাধন তাঁহার এক বিশেষ শিক্ষা। ভারত এবং ইংলণ্ডের মিলনে পূর্ব্ব পশ্চিমের মহামিলন সংসাধিত হইবে এবং ক্রমে সমগ্র জগৎ এক মহান মানব-প্রেম-পরিবারে মিলিত হইবে, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রচেষ্টা। ভাব-ধর্ম্মসাধনের কেশব পক্ষপাতী ছিলেন না। নীতি এবং চরিত্রের দ্বারায় জীবনে ধর্ম্মসাধনই কেশবচন্দ্রের বিশেষ সাধন। জ্ঞানের প্রসারতা, প্রেমের উদারতা, চরিত্রের বিশুদ্ধতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নির্ভীক স্বাধীনতা, ঐকান্তিক দীনতা, শিশুর সরলতা, ভক্তির উন্মত্ততা, মহাযোগের গভীরতা, এবং সর্ব্বমানবের সহিত একাত্মতাই শ্রীকেশবের ধর্ম্মজীবনের বিশেষত্ব।

তাঁহার সাধনের মূলমন্ত্র, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একমাত্র সরল প্রার্থনা; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমিত্বহীন হইয়া, পাপের সম্ভাবনায় আপনাকে পাপী জানিয়া, সবার নিকটে দীন শিষ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া, স্বাভাবিক সরল শিশুর অন্তরে সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দর্শন ও নির্ভর করিয়া, তাঁহার হস্তে গঠিত ও পরিচালিত হইবার আকাঙ্ক্ষা, কেশবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র এক নব বার্ত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকে মানব-জন্মে "দ্বিজত্ব" বিধান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং জীবনের জীবন হইয়া, নিত্য নব নব জীবনে তাঁহাকে গঠন করিলেন। ইহা সজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া, জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও তাঁহার বাণী নব নব ভাবে শুনিলেন। মানবাত্মা নব নব উন্নতির সোপানে কিরূপে সমুন্নত হয়, তাহা জীবনে প্রমাণ করিলেন। তাঁহার নিকট তাই সকলই নিত্য নূতন। সকল প্রকার পুরাতন পরিহার করিয়া সর্ব্বত্র নূতনত্বেরই প্রকাশ দর্শন করিলেন। যাহা কিছু পুরাতন ছিল, পুরাতন বিধান, পুরাতন সাধন, পুরাতন অনুষ্ঠান, পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন মন্ত্র, সকলই পরিহার করিয়া, পরিবর্ত্তিত করিয়া, নব নব ভাবে নব নব রূপে জগৎকে নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিলেন। এই সমুদয় নূতনত্বের একত্বের সমাবেশই নববিধান। জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার কাছে সকলই জীবন্ত হইল, কিছু মৃত রহিল না। ঈশ্বরকে যেমন নিত্য জীবন্ত তিনি দেখিলেন, তেমনি বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসে সাধু ভক্ত মহাপুরুষ এবং পর-লোকগত অমরাত্মাগণ সকলেই সেই জীবন্ত ঈশ্বরের মধ্যে জীবন্ত-রূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত। ভূত এবং ভবিষ্যৎ সকলই নববিধানে বর্ত্তমান হইল।

—•—

সম্পর্ক-নিরূপণ

এক ব্রহ্মই উপাস্য এবং সর্ব্বমূলাধার। তিনি বিধাতা ও বিধানকর্ত্তা। তাঁহারই পবিত্র আত্মার বাণী সর্ব্বসমন্বয়কারী নবযুগধর্ম্ম নববিধান। ধর্ম্মে যাহা নববিধান, তাহা ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে মূর্ত্তিমান শ্রীকেশব। সর্ব্বজনে একজন এ কেশবজীবন। পাঁচজনের একত্বসমাধান নববিধানের শ্রীদরবার। আচরণে ও কার্য্যে নববিধানের সাক্ষ্যদান করিতে পরিবার ও দল নির্দ্দিষ্ট। এক সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে যেমন চন্দ্রমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র-দল নিরাকার বৈজ্ঞানিক সূত্রে গ্রথিত, তেমনি এই সকল এক বিধাতার চক্রে বিধানের প্রেম সূত্রে গ্রথিত ও পরিচালিত। এই সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, যেন আমরা স্ব স্ব নিয়োজিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি এবং এক বিধাতার পরিচালনায় পরিচালিত হইয়া নববিধানকে গৌরবান্বিত করিতে পারি।

অন্তরে বাহিরে

অন্তরে মা, বাহিরে ভাই। মা যেমন সন্তান ছাড়া থাকেন না, মাতৃসন্তানও ভাই ছাড়া থাকেন না। মা যিনি, সন্তান-প্রসবিনী তিনি। যাঁর সন্তান হয় নাই, তিনি মা হতে পারেন না। আবার মা যাঁহাদের সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগে ভাই ভাই হইলেন। তাই বিধাতার যুগধর্ম্ম-বিধানে সন্তান ছাড়া মা কল্পনা-মাত্র। তাই মাকে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহার সন্তানকে স্বীকার করিতে হইবে এবং সন্তানকে স্বীকার করিতে হইলে ভাইকেও গ্রহণ করিতে হইবে। মা এবং ভাই, বিধাতা এবং বিধান, অন্তরের বাণী এবং পরিবার ও দলের প্রেম ও শাসন আমাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং বিধান-পথে পরিচালিত করিবে।

—•—

স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়

ঢাকা নববিধানসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য ভাই দুর্গানাথ রায় তাঁহার পবিত্র নববিধানক্ষেত্রের বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও পার্থিব জীবনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, অমরধামে পরমজননীর অমৃতক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এবারে প্রকাশ করিবার স্থানাভাব ও সময়াভাব। এই অল্প সময়ের মধ্যে এবার তাঁহার পবিত্র জীবনের যাহা কিছু সম্ভব হইল, প্রকাশ করা গেল।

শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে বিশিষ্ট কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনের আরম্ভেই পাঠ্যজীবন শেষ করিয়া, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ নববিধানসমাজের আচার্য্য ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহিত মিলিত হন। ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহকারী প্রচারকরূপে যাঁহারা মনোনীত হইয়া বঙ্গচন্দ্রের সহিত দাসমণ্ডলীভুক্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়। নববিধানের দেবতা ইঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান সমাজের সংগীতাচার্য্যের পদে নিয়োগ দান করেন এবং সেই পদোচিত গুণে ইঁহাকে ভূষিত করেন। দলের নেতার প্রতি আনুগত্য এই দাসমণ্ডলীর বিশেষত্ব ছিল। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথের জীবনে বিনয় ও আনুগত্যের, এবং হৃদয়ের কোমলতা ও মধুরতার ভাব যথেষ্ট ছিল। তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন, তাহার প্রতি দৃঢ়তাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ঢাকা নববিধান সমাজে সংগীতের কার্য্য করাই তাঁহার জীবনের বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ব্রত ছিল। তাঁহার স্বর সুমিষ্ট ছিল, সংগীত-রচনার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। প্রতিদিন দেবালয়ের দৈনিক উপাসনায় ও প্রার্থনায় ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্রের যে ভাব স্ফুরিত হইত, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ তখন তখনই তাহা সরল সুমিষ্ট সঙ্গীতে পরিণত করিয়া গাহিতেন। দেবালয় ও ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় এবং বিশেষ উৎসবাদি ও অনুষ্ঠানমূলক ব্যাপারে তাঁহার দ্বারা এইরূপ বহু সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। ঢাকার 'বিধান সঙ্গীত' নামক সংগীতগ্রন্থ এই সকল সংগীতের সমষ্টি। ভাষার সরলতায়, ভাবের মধুরতায় ও ঈশ্বরের স্বরূপের এবং গুণাবলীর অভিব্যক্তির উজ্জ্বলতায় এই সকল সঙ্গীত সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে।

তাঁহার উপাসনাও বিশেষ সুমিষ্ট ছিল। তিনি মধুর কণ্ঠে যেমন সুমিষ্ট সঙ্গীত করিতেন, তেমনই সুমিষ্ট উপাসনা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতাও ভক্তিমাখা, ভাবপূর্ণ, অথচ সারগর্ভ ছিল। বয়সের পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপাসনা খুবই জমাট, গভীর, সারগর্ভ ও সরস হইয়া, সকলের বিশেষ সন্তোষের বিষয় হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গেই তাঁহার বিশেষ প্রচারক্ষেত্র ছিল। নববিধান-ঘোষণার পর যখন শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পশ্চিম প্রদেশে প্রচারযাত্রায় সদলে বাহির হইয়াছিলেন, ভাই দুর্গানাথ রায় সেই দলের একজন ছিলেন; এবং শুনিয়াছি, ভাই দুর্গানাথ রায় এই প্রচারকদলের আগমনসূচক বক্তৃতাও অগ্রগামী হইয়া করিয়াছিলেন। তখন ভাই দুর্গানাথের তরুণ বয়স, তিনি যেমন প্রিয়দর্শন ছিলেন, তেমনই ছিল তাঁহার ভক্তি ও বিনয়পূর্ণ সুমিষ্ট ব্যবহার; তাঁহার ভাষার লালিত্যও যথেষ্টই ছিল। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ভাই দুর্গানাথকে বিশেষ প্রীতি ও স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় তাঁহার দীর্ঘজীবনে পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে সঙ্গীত, উপাসনা, বক্তৃতা ও কথকতা-যোগে পবিত্র প্রচারক্ষেত্রে কতই সেবা করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার ও তাঁহার জীবনের অন্যান্য বিষয় বিবৃত করিবার এবার সুযোগ হইল না। আশা করি, ইহার পরে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে।

ইহার বহুপূর্ব্বে ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও তাঁহার সঙ্গী প্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই স্বর্গগত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় ও শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন তাঁহাদের পরে দীর্ঘকাল মিলিত থাকিয়া ঢাকা নববিধানমণ্ডলীর সেবা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন, প্রায় দুই বৎসর হইল, স্বর্গগত হইয়াছেন; শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়ের পরলোকগমনে ঢাকা প্রচারকশূন্য হইল। পরমজননী তাঁহার এই ভক্ত পুত্রকে অমরধামে ভক্ত ব্রহ্মানন্দদলে মিলিত করিয়াছেন; না জানি, সেখানে কত আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। আমরা পরমজননীর চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার এই প্রিয় পুত্রকে স্বর্গের প্রসাদ-বিতরণে আরও পরিপুষ্ট করুন, ধন্য করুন এবং ইঁহার রুগ্ন শোক-সন্তপ্তা পত্নীর প্রাণে এবং শোকসন্তপ্ত পুত্রকন্যা ও পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

—•—

ইস্‌লাম জগতে কেশবচন্দ্রের ঘোষণার প্রতিধ্বনি

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সিরাজ নগরে মির্জা আলী মহম্মদ নামক একজন বণিকের আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁহার শিষ্য-বর্গের সমীপে আপনাকে "বাব" অর্থাৎ স্বর্গের দ্বার বলিয়া ঘোষণা করেন; অর্থাৎ তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হইলে মানুষ স্বর্গে গমন করিতে পারিবে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্তে দেখিয়াছি যে, ১৮৪১ সনে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ একমাত্র অদ্বিতীয়, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, অনির্ব্বচনীয় ও তুলনা-রহিত ঈশ্বরের প্রচার করেন। নিজকে ব্রাহ্ম বলিয়া আখ্যাত করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদল গঠন করেন। যে সময়ে পারস্য দেশে এই নূতন আবির্ভূত 'বাব' নূতন নূতন ভাব ও মত লইয়া আবির্ভূত

হন, তখন পারস্যে সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরা কতকগুলি দুর্নীতি প্রচলিত ছিল ; সেই সকল দুর্নীতি তাঁহারা সযত্নে ভাবে পালন করিতেন। এই নবপ্রচারিত 'বাব ধর্ম্মে' দুর্নীতির স্থান ছিলনা। এমনকি এই নব অভ্যুদিত 'বাব' সম্প্রদায় প্রচলিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। উলেমাগণ ক্রোধান্বিত হইয়া এই 'বাব' সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং পরিশেষে তাঁহাদেরই উত্তেজনায় এই মিরজা আলী মহম্মদ তেব্রিজ নগরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং সেখানেই ১৮৫০ সনের জুলাই মাসে বন্দুকের গুলিতে নিহত হইলেন।

কথিত আছে যে, এই ছয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার শিষ্য কুড়ি হাজার লোক, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আহ্লাদের সহিত, তাঁহাদের ধন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত, তাঁহাদের এই ধর্ম্মের জন্য বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ; তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে মিরজা হুসেন আলী বাহাউল্লা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ১৮১৭ সনে তেহেরাণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যথাসময়ে এই বাবদিগের ধর্ম্মের অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার প্রাণে ঈশ্বর-প্রদত্ত যেরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান সঞ্চিত ছিল, সেরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রামমোহন রায়ের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সনে ব্রাহ্মসমাজের মূলভিত্তিতে ধর্ম্মের যে সকল চিরন্তন উদারতা খোদিত করিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানের ২৩ বৎসর পরে তাঁহার ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই একেশ্বরবাদধর্ম্ম নানাবিধ কুসংস্কার হইতে পৃথক করতঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়ের নবধর্ম্মমত-প্রচার-চেষ্টার সম সাময়িক কালেই বাহাউল্লা জন্ম গ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ যখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—বাহাউল্লাও সেই ভাবেই পারস্যে তাঁহার এই নূতন ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। যখন এই নূতন প্রচারিত ধর্ম্ম পারস্যে দাবাগ্নির ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে কনষ্টাণ্টিনোপলে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে উলেমাগণের আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের উপদেশানুসারেই বাহাউল্লার যাবতীয় সম্পত্তি পারস্যের রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করতঃ, তাঁহাকে বোগদাদে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাহাউল্লা বোগদাদ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তাঁহার ধর্ম্মের যাবতীয় ভাব ও মত পারস্যদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বোগদাদে মাত্র চারিমাস কাল ছিলেন। পরে তাঁহাকে তুরস্কের সুলতান এড্রিয়াটিকনোপলে স্থানান্তরিত করেন। সেখানেও তাঁহার ধর্ম্মমত বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। তাঁহার এই নূতন ধর্ম্মের প্রচার দেখিয়া তুরস্কের সুলতান ১৮৫৭ সনে "একার" নামক এক সমুদ্রতীরবর্ত্তী পরিত্যক্ত বন্দরে পাঠাইয়া দেন। সেখানেই ১৮৯২ সনের মে মাসের ২৯শে তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। বাহাউল্লা সুফী ধর্ম্মের উপরে এক অতি উচ্চতর অপূর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগামী সত্যের অনুসন্ধানোৎসুকগণ তাঁহাদের প্রিয়তম পরমেশ্বরের উচ্চতম অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার এবং তাঁহার সহিত যোগস্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় সাতটি বিশেষ বিশেষ সাধনাস্তরের উপর দিয়ে অগ্রসর হইতে বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

এখন দেখাইব, নববিধানের নূতন ভাব, মত ও বাহা সকল কিরূপ ভাবে এ ধর্ম্মে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বাহাধর্ম্মের ভিতরে কখনও নানা দল গঠিত হইতে পারিবে না। বিভিন্ন দলের নিমিত্ত এক সময়ে খৃষ্টীয় মণ্ডলীতে রক্তারক্তির তাণ্ডবলীলার অভিনয় হইয়াছিল এবং এখনও প্রকৃত ধর্ম্মের মূলতঃ অভাবের পরিদৃষ্ট হয়। বাহা ধর্ম্মে নানাস্থান হইতেই প্রকৃত সত্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সুদৃঢ় প্রস্তরে মুদ্রিত। ইহা প্রকৃত সাধুতার পরিপোষক। ইহা কুসংস্কার হইতে প্রকৃত বস্তুকে পৃথক করিয়া দেখায়। বাহা ধর্ম্মে যাজনিক কর্ম্মের নিমিত্ত পৌরোহিত্যের প্রয়োজন হয়না, ইহাতে জাতির বিচার নাই। এখানে যাজনিক ব্যাপারে কাহারও স্বতন্ত্র প্রাধান্য নাই। এখানে নরনারীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, নারীজাতির স্থান যেন পুরুষের অগ্রে নির্দ্দিষ্ট। এখানে নরনারী উভয়েই যোগ্যতানুসারে উপদেষ্টা হইতে পারেন। বাহা ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে একেশ্বরবাদীর ধর্ম্ম। এখানে নরনারী উভয়ের জীবনেই জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ সাধিত হইবার কথা। এখানে বিবাদ বিসংবাদ ও ব্যবসায়বুদ্ধির স্থান নাই। যে সময়ে মানবজাতি গভীর অরণ্যে বাস করিত, সেই সময়ের আচার বিচার, অনুষ্ঠান ও ভাব এখানে আর স্থান পায় না। এখানে এই একমাত্র প্রকৃত কথা যে, "আমরা সকলেই এক বৃক্ষের পত্রাবলী, এক মহা সমুদ্রেরই জলবিন্দু। আমরা কেবল জগতের কল্যাণসম্পাদনই করিব। সকল জাতির কল্যাণ ও শান্তিকামনাই আমাদের লক্ষ্য। সকলে যাহাতে এক বিশ্বাসে মিলিত হইতে পারি, সেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। সকলেই ভ্রাতৃভাবে বসবাস করিবার অভিলাষী। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে যাহাতে প্রেমের বন্ধনে একজাতি হইতে পারি, তাহাই আমাদের অভিপ্রেত। ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকারের বিরুদ্ধভাবগুলির যাহাতে তিরোধান হয়, সেই আমাদের চেষ্টা। জাতিতে জাতিতে পার্থক্য দূর করিয়া সকলে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হওয়াই আমাদের আদর্শ। সমস্ত মানবজাতি একপরিবারভুক্ত হউক। ঈশ্বরই সকলের পিতা বলিয়া গৃহীত হউন, এই আমরা প্রার্থনা করি। আমরা যেন কেহ মনে না করি, অথবা বাহিরেও যেন ইহা

প্রকাশ না করি যে, আমরা শুধু নিজ নিজ দেশকেই ভালবাসি। আমরা যেন বিশ্বাস করিতে পারি যে, সমস্ত জগৎকেই আমরা ভালবাসি। আমরা সকলেই যেন এক দেশের সন্তান।" ১৮৪৪ সন হইতেই বাহা উল্লার এই নবধর্ম্মমত প্রচার আরম্ভ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৮৪৪ সনের ১৯শে মে তাঁহার স্বনামধন্য পুত্র আবদুল বাহার জন্ম হয়। পিতা বাহা উল্লা যথাসময়ে পুত্র আবদুল বাহার উপরেই তাঁহার নবধর্ম-প্রচারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

পুত্রও যথাকালে তাঁহার উপরে ন্যস্ত এই "বাব" ধর্ম্ম প্রচারে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। "বাব" শব্দের অর্থ স্বর্গের দ্বার। আবদুল বাহা যখন পূর্ণোদ্যমে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন তিনি তুরস্কের সুলতানের দরবারে এই নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিবার নিমিত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হন এবং এক অতি জঘন্য কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। ১৯০৮ সনে তিনি কারামুক্ত হইয়া, হৈফা (Haifa) নগরের সমীপে বাস করতঃ, এই নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি লণ্ডন নগরে থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে সেখান হইতে তিনি প্যারিসে চলিয়া আসেন। ১৯১১ সনের নবেম্বর মাসে আবদুল বাহা প্যারিস নগরে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতাতে একজন লেডী প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। আবদুল বাহা বলিয়াছিলেন যে, "আমি সর্ব্বপ্রথমে মাননীয়া লেডী প্রেসিডেণ্ট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যে যে কথা বলিয়াছেন, সে জন্য আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি এবং আমাকে আজ এই গভীর ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সমীপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যদি আমরা আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে ইহার ভিতরে বিধাতাকে উপলব্ধি করিতে পারি। পরমাত্মার সহিত মহাসমুদ্রের তুলনা করিলে, আমরা যে সকলেই ঐ মহাসমুদ্রের ঢেউ মাত্র, ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে। যদিও এই সকল তরঙ্গ গণনার অতীত, তথাপি ইহা সত্য যে, এই অগণিত ঢেউগুলি মহা সাগরেরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাহারা বাহিরের আকৃতিতে বিভিন্ন, তথাপি সকলেই ঐ একই শক্তি হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। জগতে মানবজাতিকে তাহাদের একত্ব পরিষ্কাররূপে শিক্ষা দিবার জন্যই, ঈশ্বর মহাপুরুষদিগকে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিমূর্ত্তি করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। ইঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, বস্তুগত ভাবে ঐ সকল তরঙ্গের বিশেষ কোন মূল্য না থাকিলেও, মহাসমুদ্রের ভিতরে যে শক্তি নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই শক্তিই ঐ সকল তরঙ্গকে নিয়ত মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতেছে যে, জেরুজেলাম স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। এই সভার লেডী প্রেসিডেণ্ট ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই গৌরবময় (Holy city) জেরুজেলাম বাহিরে ইষ্টক প্রস্তর বা কর্দ্দমাদি দ্বারা নির্ম্মিত নহে; ইহা স্বর্গীয় শক্তিতে গঠিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ শিক্ষা এখন বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমজ্জিত। ঐ স্বর্গীয় জেরুজেলামের এখন আর কিছুমাত্রও চিহ্ন নাই। যখন সমস্ত চিহ্নই শেষ হইয়া গিয়াছে, তখনই এই "বাহা ধর্ম্ম" পূর্ব্বদেশে এসিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ব্ব দেশই ঈশ্বরের লীলাভূমি। শরীর আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ নহে; কিন্তু তাহার শরীরের ভিতরে আত্মা আছে বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের ধ্বংসশীল অংশ পশুদের সমভাবাপন্ন। এক মাত্র আত্মাই এ উভয়ের পার্থক্য দেখাইয়া দেয়। সূর্য্য যেমন আকাশকে আলোকিত করে, তেমনি ভাবে আত্মাই শরীরকে আলোকিত করে। ইহা আমাদিগকে স্বর্গীয় করিয়া তুলে। ইহা আমাদিগকে প্রত্যেক বস্তুর ভিতরের প্রকৃত অবস্থা দেখাইয়া দেয়। আমাদের জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুকেই ইহা উপস্থিত করে এবং ইহাই আমাদিগকে অনন্ত জীবন প্রদান করে। এই আত্মা (spirit) মানুষের সহিত মানুষকে, জাতির সহিত জাতিকে, পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমকে মিলাইয়া দেয়। এবং ইহাই পার্থিব জগৎকে স্বর্গীয় করিয়া তুলে। যাঁহারা এই স্বর্গীয় আলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা অন্যকেও বিলাইয়া দেন। যাঁহারা ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ, তাঁহারা যেন বাহা উল্লাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। বাহা উল্লা, যে মহাসত্য হইতে এ সমস্ত প্রকাশিত হইতেছে, একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধানে নিরত উৎসুক।

"আত্মার (spirit) কার্য্য দুই প্রকারে সম্পাদিত হয়। প্রথম ব্যবহার যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। যেমন চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, রসনা দ্বারা বাক্য উচ্চারণ। যদিও আমাদিগের এই শারীরিক যন্ত্রগুলি আমাদিগের শরীরেরই অন্তর্গত, তথাপি ইহাদের শক্তি ঐ আত্মা (spirit) হইতে প্রেরিত হয়। আবার আমরা যখন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, তখন আমরা আকাশে ঘর নির্ম্মাণ করি। তখন চক্ষু, কর্ণ ও পদ ভিন্নও আমরা দেখি, শুনি ও গমন করি, পক্ষান্তরে মানবশরীর একখানি কাচের ঘর বিশেষ। আত্মাই তাহার আলোক। আলোক না থাকিলে যেমন কাচের ঘরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না, তেমনি এই আত্মা না থাকিলে মানবশরীরের শোভা ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠেনা। কাচনির্ম্মিত বস্তু সকল আলোর অভাবে অদৃশ্যই থাকে। আত্মা শরীরের জীবনীশক্তি। আত্মা হইতেই জীবন প্রতিভাত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, আত্মা আছে বলিয়াই মানুষ। মানবাত্মা স্বর্গীয় দান এবং ইহাই ঈশ্বরপুত্রের প্রকাশ। যখন মানবাত্মাতে পরমাত্মার অবতরণ হয়, তখন উহা আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং চারিদিকে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিস্তার করে। আমরা যেন দিন দিন আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে অগ্রসর

হইতে পারি, সকল জাতির সহিত মিলিতে পারি, সকলকেই ভ্রাতৃভাবে বাঁধিতে পারি। আসুন, আমরা ঈশ্বরের করুণা দূর দূরান্তরে বিস্তার করি। সকল জাতির উপরেই যে তাঁহার করুণা তুল্যভাবে বর্ষিত হইতেছে, ইহা প্রচার করিতে পারি। ইহার ফলেই সমস্ত জগতে একমাত্র আত্মাই রাজত্ব করুক, এবং সকলে মিলিয়া এক হইয়া পড়ুক। বিবাদ বিসম্বাদ আর যেন কাহাকেও পরস্পর হইতে পৃথক করিতে না পারে। এমন দিন আসিলেই নূতন জেরুজেলাম নির্ম্মিত হইবে। সকলেই ঐ একই রাজ্যের অধিবাসী হইবে। প্রত্যেকেই বিধাতার উদার প্রেমের অংশ গ্রহণ করিবে। উপসংহারে আমি প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদিগকে শান্তিপ্রদান করেন, যে মিলনের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা যেন ক্রমে পূর্ণ হয়। আমাদিগের এই বর্ত্তমান যুগ এক মহা মিলনের যুগ। ইহা স্বর্গীয় যুগ। শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বাক্য পূর্ণতা লাভ করুক। খৃষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী মূর্ত্তিমান হউক। আমাদিগের এ যুগ সত্য ও ন্যায়ের যুগ হউক। সত্য সত্যই সময় আসিতেছে, যখন এই জড় জগৎ স্বর্গীয় জগৎ হইবে। ঈশ্বরের করুণায় আমরা যেন ভ্রাতৃত্বের দিকেই দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। ভ্রাতৃগণ, আসুন, আমরা সকলেই এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত হই।

"আমি আবারও প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় নবজীবন দান করুন। আমরা যেন মিলনের মন্দিরেই নিয়ত স্থিতি করিতে পারি। আমাদিগের হৃদয় যেন তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হয়। তাঁহার পবিত্র নাম যেন আমাদিগের রসনা নিয়ত উচ্চারণ করে। আমাদিগের কার্য্য যেন পবিত্র হয়। যাঁহারা স্বর্গরাজ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যেন হৃদয়ের সহিত আমরা মিলিতে পারি। মানবীয় জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উহা যেন উজ্জ্বলভাবে আমাদিগকে আলোকিত করিতে পারে।"

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—•—

পরমারাধ্যা ইচ্ছাময়ী দেবী

(সাম্বৎসরিক স্মৃতি উপলক্ষে)

অনন্ত স্নেহ প্রেমের নির্ঝর বিশ্বজননী এ ক্ষুদ্র জীবনে তাঁর অসীম করুণাধারা কত দিক দিয়ে কত ভাবে, কত রূপে প্রবাহিত করেছেন আমার জন্য, যাহা জীবনে পেয়ে কত কৃতার্থ হয়েছি, তাহা না প্রকাশ কল্লে আমাকে আমি অকৃতজ্ঞ, অপরাধী জ্ঞান করি। তাই আজ আমার পরমারাধ্যা ইচ্ছাময়ী মাতার সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলতে ইচ্ছা করি। এই মাননীয়া মহীয়সী দেবীর জীবনের বিষয় আমার ভাষা ভাব দিয়ে বলতে, জানি যে, প্রকৃত ভাবে কিছুই প্রকাশ হবে না, সেই সুন্দর পবিত্র জীবনের কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পারবো না; এই পবিত্র স্মরণীয় দিনে তথাপি দেবী জননীর পদতলে শ্রদ্ধা ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করে কিছু বলি।

যখন আমার বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়ে ১৫ বৎসরে পদার্পণ করেছি, সেই সময়ে সেই সুদূর চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে আমি প্রথম দেবী ইচ্ছাময়ী মার আলয়ে গৃহীত হয়ে নিজেকে কি সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়াছিলাম। স্নেহময়ী জননী আমার জন্য এত দিন যেন প্রতীক্ষা করে ছিলেন। কিশোরগঞ্জস্থ পিত্রালয়ে আমার গর্ভধারিণী জননীকে ছেড়ে যাওয়ার পর, চট্টগ্রামের আশাকুটীরস্থ জননী আমার হৃদয় এতখানি অধিকার করিয়াছিলেন যে, মনে আছে, আমার চট্টগ্রামে যাবার তিন বৎসর পরে যখন আমি কিশোরগঞ্জে যাই, দেবী ইচ্ছাময়ী আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদিতে লাগিলাম। মা অতি স্নেহের সুরে বল্লেন, মা, তুমি যে বাপের বাড়ী যাচ্ছ, কেঁদো না। সজলনয়নে আমায় বিদায় দিলেন। পুনরায় এক বৎসর পরে যখন ফিরে এলাম, কি আনন্দ তাঁর! তাঁহার দুজন ধর্ম্মপুত্র ছিলেন, তাহা অনেকেই প্রায় জানেন; মা বলেছিলেন, যখন তাঁর সেই পুত্রদ্বয় শ্রদ্ধাস্পদ রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করে মাতৃদেবীর চরণে প্রণত হলেন, সেই যে কি স্বর্গীয় দৃশ্য, যেন দেবদূত দুজনে আমার সমক্ষে উপনীত হলেন। মা সেই দুজনকে কি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে নবধর্ম্মভাব তাঁদের হৃদয়াকাশে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হলো। সেই প্রিয় আশাকুটীরের দেবালয় আমার নিকট পুণ্যতীর্থ বলে মনে হতো। আমি প্রথম চট্টগ্রামে গিয়ে ব্রাহ্মমণ্ডলীর ভিতর কি মহা উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত দেখিলাম। আমি সেই দেবী আত্মাকে যখনি স্মরণ করি, তখনি প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে। অমন নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে নিত্য পূজা পাঠেতে রত হতেন, নবশক্তি নবজাগরণ এনে দিত। আশাকুটীরস্থ বাগান দেবী জননীর বড় প্রিয় ছিল। প্রতিদিন প্রত্যূষে সজন উপাসনার বিধি ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী শঙ্খধ্বনি সহকারে সকলকে আহ্বান করা হতো। তৎপর পালাক্রমে উপাসনা হইত। যদি কোন সময় অন্যত্র উপাসনার বিশেষ কিছু থাকিত, দেবী জননী এবং আমি একত্রিত হয়ে পরমজননীর উপাসনাতে পরম তৃপ্তিলাভ করিতাম। মাতৃদেবীর ভক্তি ও অনুরাগ ভরা উপাসনায় নবশক্তি, নব উৎসাহ লাভ করে পরমানন্দে জীবনের কাজগুলি সমাপন করিতাম। মাতৃদেবীর এদিকে যেমন আত্মিক জীবন সুন্দর সুশোভিত, তেমনি সুগৃহিণী হইয়া সদানন্দে সকলের সেবায় নিযুক্ত দেখিতাম। কোন দিনও কাজ কর্ম্মে অলসতা দেখি নাই। তাঁর গৃহে তখন প্রায়ই দেখিয়াছি, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে দুজনেই খুব ভালবাসিতেন। আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা আহার পান সব কাজ চলিত। তাঁহাকে কখনও ভারাক্রান্ত বা বিষণ্ণ দেখি নাই। অত বড় গৃহের কর্ত্রী হয়েও, জীবনের সমতা ঠিক ভাবে রক্ষা করেছেন। এমন মিষ্টভাষী,

এমন গৃহের আদর্শ নারী অতি বিরল। অতি সৌভাগ্যক্রমে বিধাতার কৃপায় আমি এই আদর্শ দেবীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের প্রভাব, শারীরিক শ্রী পুণ্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত ছিল। এক দিকে যেমন কোমলতা, অপরদিকে তাঁর সন্তানদের প্রতি সুশাসন অতি সুন্দর ছিল। তাঁর স্নেহ ভালবাসা কখনই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার গৃহের দাসদাসীগণও তাঁর সুশাসনে শাসিত হতো। তাঁর স্নেহ ভালবাসায় সকলেই মুগ্ধ ছিল। তাঁহার গৃহে প্রায়ই লোক-সমাগম হতো; তাঁহাদের সকলকেই সুমিষ্ট ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিতেন।

আশাকুটীরের কর্ত্তা মহাশয় যখন চলে গেলেন, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে তাঁহার দেহ ভগ্ন হয়ে গেল। যত দিন তাঁহার দেহে বল ছিল, সকলের প্রতি তাঁর কোনদিন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় নাই। ভজনে নিয়মপালনে কোন দিকে তাঁর অবহেলা দেখি নাই। হায়! দেখিতে দেখিতে তাঁর সুন্দর দেহখানি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়িল। তিনি এদিকে আলিপুরে মেয়েদের কাছে কাছেই ছিলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে গেলেই গান করিতে বলিতেন। একদিন আমি বলিলাম, কি গান গাইব, মা? "বারে বারে দুঃখ দিয়েছ তারা" গাহিব? মা বলিলেন, "না, এ গান করো না। মা আমায় কোন দুঃখ দেন নাই।" সেই রুগ্ন ভগ্ন দেহেও তাঁহার মুখে হাসি দেখিয়াছি। কি বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ ছিলেন। এত রোগ, মৃত্যু-যাতনায়ও তাঁর মুখ মলিন দেখি নাই। কিন্তু হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য যে, আমি তাঁর শেষদিনে নিকটে ছিলাম না। রাত্রে নাকি কতবার "কুমুদিনী কুমুদিনী" বলে আমায় ডেকেছিলেন। সেদিন আমায় কি বলিতে চেয়েছিলেন, তা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। হে মাতঃ, আজ তুমি স্বর্গে, অতি উচ্চে, অতি গভীরে। জানি না, আজ নীরব ভাষায় আমায়—এ অযোগ্য তোমার সন্তানকে—কি বলিতেছ। মাগো, জ্ঞাত, অজ্ঞাত আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে, তোমার অমিয় আশীর্ব্বাদ আমায় দাও; এবং আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ণ প্রণতি গ্রহণ কর।

শ্রীকুমুদিনী দাস।

—•—

অভিভাষণ

(নীতিবিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণের উৎসবে, সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ)

যখন ধীরেনবাবু এখানে আসবার জন্য শকুন্তলা দিদির নাম করে আমাকে অনুরোধ করলেন, আমার 'না' বলবার ক্ষমতা রইলো না। আমি যৌবনের প্রারম্ভে শকুন্তলা দিদির স্বামী ঋষিতুল্য বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের চরণতলে বসে শিক্ষা লাভ করি। সেখানে আমার শত অক্ষমতা সত্ত্বেও, যা কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছিলুম, সেই পাথেয় নিয়ে জীবনের সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছি। এখনও সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সেই পাণ্ডিত্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল ললাট, সেই বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ অথচ স্নেহে পরিপূর্ণ দৃষ্টি আমার চোখের সামনে ভাসছে। এখনও যেন তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর, তাঁর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন কাণে বাজছে। এই নীতিবিদ্যালয়ের তিনিই প্রধান প্রবর্ত্তক—আজ আমার এখানে আসা মানে, তীর্থে আসা।

তবে শকুন্তলাদিদি আমাকে এখানে সভাপতি না করে যদি খেলাপতি করে ডাকতেন, তাহলে আমারও সুবিধা হতো, তোমরাও কিছু আমার কাছে শিখতে পারতে। এ বয়সে কোনও খেলায় দক্ষতা না থাকলেও, কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আজ যদি এখানে আমাকে কোন খেলার Referee কিম্বা Umpire করা হতো, বক্তৃতা করতে গিয়ে যে গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছি, তার চেয়ে কম হতুম। যা হোক্, খেলা করে ও খেলা দেখে একটা মহানীতি শিখেছি, সেটা তোমাদের বলতে চাই।

খেলার মাঠে তোমাদের মধ্যে যারা যাতায়াত কর, একটা জিনিষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে, ব্যক্তিগত ভাবে অনেক সেরা খেলোয়াড়ের দলও মাত্র একটা গুণের অভাবে অপেক্ষাকৃত খারাপ খেলোয়াড়দলের নিকটে হারতে বাধ্য হয়েছে—সেই গুণটিকে আমরা বলে থাকি Team work—অর্থাৎ দলের স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর রেখে সকলের সমান সাহায্য নিয়ে খেলা—কোনও একজনের ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য খেলা নয়। খেলায় এই নিঃস্বার্থপর সহযোগিতা যেখানে যত বেশী, বিজয়ের সম্ভাবনা সেখানে তত বেশী। খেলার মাঠের এই শিক্ষা জীবনের অপর সকল বিভাগেও বিশেষ কার্য্যকরী। সুষ্ঠুভাবে সংসার-পরিচালনের জন্য সংসারের প্রত্যেকের স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, পরিবারস্থ সকলের সুবিধা অসুবিধার অর্থাৎ Team work এর কথা ভাবতে হবে। সকলেই যদি নিজের পাওনা গণ্ডা আদায়ের কথা চিন্তা করতে থাকে, তাহলে পরিবারের মধুর সম্পর্কগুলিও দূষিত হয়ে ওঠে। কোনও একটি সংসারকে বড় হতে হলে, বাবা, মা, ভাই, বোন প্রত্যেককেই অপর সকলের কথা চিন্তা করে, ছোট বড় অনেক ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা ভোগ করতে হয়—অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবারের একজন হিসাবে, এই স্বার্থত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যে সংসারে এই Team work ভাল, সেই সংসারই সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে।

খেলার মাঠের এই শিক্ষা সংসারে আয়ত্ত করতে পারলে, সমাজও উন্নততর হয়ে ওঠে এবং উন্নততর সমাজবুদ্ধিসম্পন্ন দেশ অচিরাৎ বড় হয়। যে ব্যক্তি-সাধনার মূলে দেশের মঙ্গলামঙ্গলের ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি-সাধনা শেষ পর্য্যন্ত কখনই সুফলপ্রসূ হয় না। তোমরা এখন থেকে যদি স্বার্থত্যাগ করতে শেখো, সংসার

কত আনন্দের হবে, সমাজ কত পরিপুষ্ট হবে। আবার যখন নববিধানের পূর্ণজ্যোতি তোমাদের মনে প্রকাশ পাবে, তখন বুঝবে যে, সমস্ত মনুষ্য-সন্তানই তোমার ভাই, সকল ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, সকল কাজই তোমার কাজ। আত্মত্যাগ কত সহজ হয়ে যাবে, কত সুখের হবে।

এই বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ যে স্বার্থত্যাগ করে তোমাদের শিক্ষাদান করছেন, সে শিক্ষা যে তোমাদের কত উপকারে লাগবে, বড় হলে তোমরা তা বুঝতে পারবে। তখন কৃতজ্ঞতায় তোমাদের মাথা এঁদের কাছে আপনি নুয়ে আসবে।

ধীরেনবাবু Reportএ নিজের অযোগ্যতার কথা বলেছেন; এ সব কাজের জন্য তাঁর অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আমি জানি না। তোমাদের গোপনে একটা কথা বলছি—তাঁকে তোমরা কিছুতেই ছেড়ো না, ঠকবে তা হ'লে।

আমি এখানে শকুন্তলাদিদির কথায় ভগবানের চরণে তোমাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে শেষ করি। "ভগবানের চরণে ইহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, তিনি ইহাদের আদর্শ জীবন দান করুন। যে ঋষি-জীবনের অনুপ্রাণনায় নীতি-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাদিগের ভিতরে সেই জীবনাদর্শ জাগাইয়া তুলুন। ইহাদের দেখিয়া যেন কনিষ্ঠা ভগ্নীগণ এই যুগপরিবর্ত্তনের দিনে, দেশের এই সঙ্কট-সময়ে যথার্থ সুপথ দেখিয়া আশ্বস্ত হয়, শিক্ষার সার্থকতা কিসে, তাহা বুঝিতে পারে। যথার্থ শিক্ষা আমাদের প্রাচ্য জীবনধারাকে বিক্ষুব্ধ হইতে দেয় না। সে শিক্ষা ভারতনারীর বিশেষত্ব হারাইতে দেয় না। সে শিক্ষা নারীকে ত্যাগে, ধৈর্য্যে, সেবায় শক্তিশালিনী করে; ব্রতচারিণী করিয়া পরিবারের, সমাজের, দেশের রক্ষয়িত্রীরূপে পরিণত করে; সে শিক্ষা জীবনের চরম সত্য আমাদের চিনাইয়া দেয়। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, এই ক্ষুদ্র নীতিবিদ্যালয় যেন এই শিক্ষার আদর্শ তাহার কার্য্যধারায় ফুটাইয়া তুলিতে পারে।"

—•—

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব

কার্য্যবিবরণী

১লা মাঘ, ১৩৪৪, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উৎসব-দ্বারে বিশুদ্ধচিত্তে প্রবেশার্থ বিশেষ উপাসনা করেন। সম্মুখে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন রাখিয়া, যেন ব্রহ্মারতি-যোগে উৎসবে প্রবেশাধিকার লাভ হয়, এই ভাবে প্রার্থনা হয়।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি-সহকারে ব্রহ্মারতি করিয়া, উৎসব আরম্ভ হয়। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সংগীত করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করা হয় এবং ভাব-যোগে আরতির কীর্ত্তন দীপালোকসহযোগে সম্পাদিত হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া আরতি করেন। নববিধানের উৎসবে উপাসনা এবং সংকীর্ত্তনাদি বিশেষ আধ্যাত্মিক সাধন। বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্যে ব্রহ্মারতি ও নিশানবরণ নববিধানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা এই সকল বাহিরের অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেন না; পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বলিয়া অনেকে মনে করেন। পৌত্তলিকতার অর্থ, ঈশ্বরবোধে বাহিরের কোন বস্তুকে পূজা করা; কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষুর উন্মীলনের জন্য যখন আমরা গান করি, "জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল," তখন আলোকের ভিতর দিয়া ব্রহ্মরূপ-দর্শন-প্রক্রিয়া কেন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইবে? আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, "প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, পুণ্যের প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, নিরাকার বিবেক প্রদীপ আমাদের হস্তে; এই পঞ্চ প্রদীপ লইয়া, ব্রহ্ম, তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। আলোক, দেখাও তো আমার মার মুখ।" এইরূপ প্রার্থনা-যোগে ব্রহ্মদর্শনসাধনা কখনই বাহ্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে পারে না। ব্রহ্মসাধনা কেবল জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের পক্ষে সম্ভব, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই সংস্কার অপনোদনের জন্যই, নববিধানাচার্য্য ঈশ্বর-প্রেরণায় এই ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা ভাবযোগে এই আরতিতে যোগদান করেন, সকলেই ইহার গাম্ভীর্য্য এবং সাধন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবেন।

২রা মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে যথারীতি উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। উৎসবের আহ্বানসূচক উপদেশ ও প্রার্থনাদি হয়।

৩রা মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে যথারীতি ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর নেতৃত্বে নববিধান-নিশান-বরণ নবদেবালয়ের রোয়াকে হয়। অনেকগুলি মহিলা সসন্তানে যোগদান করেন। মহারাণী সুচারু দেবী মধুরকণ্ঠে সুগম্ভীরভাবে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের "বিজয়-নিশান" উপদেশ পাঠ করেন। শ্রীমতী সুধা দেবী তাঁহার প্রেম-সঙ্ঘের শিশুদিগকে লইয়া কয়েকটী নূতন সংগীত করেন। উৎসবান্তে সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

নববিধান-নিশান-বরণের অর্থ, গৃহপ্রাঙ্গণে বা পরিবার মধ্যে নববিধানের জয়স্থাপন। যখন কোন রাজা কোন রাজ্য অধিকার করেন, তখন তাঁর রাজপতাকা সেই রাজ্যে প্রোথিত করেন। এই নিশানবরণ তাহারি নিদর্শন। গৃহপরিবারস্থ মহিলাগণ আদরে বিধানের জয়পতাকাকে বরণ করিয়া গ্রহণ করিলেন; এবং প্রার্থনা-যোগে নববিধানের জয় যাহাতে গৃহ-পরিবারে হয়, তাহাই চাহিলেন। এই অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য অতি উচ্চ ও অধ্যাত্মফলপ্রদ। কেবল ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মারতি করিলে

হইবে না। আমাদের গৃহমন্দির এবং পরিবার যাহাতে সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের অধিকৃত হয়, সপরিবারে আমরা সেই রাজরাজেশ্বরের প্রজা ও পরিবার হইব, এই পবিত্র অনুষ্ঠান তাহারই নিদর্শন। কেবল উৎসবোপলক্ষে একদিন কিম্বা এক স্থানে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলে হইবে না। প্রতি গৃহে প্রতিদিন যদি আমরা নববিধাননিশানবরণ প্রবর্ত্তন করিতে পারি, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নববিধান-গ্রহণ সুলভ ও সহজ হইবে।

৪ঠা মাঘ, মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা 'মার হাতের জিনিস' আবৃত্তি করেন। মঙ্গলবাড়ী সত্যই মার স্বহস্তে রচিত। যাঁহারা আত্মজন ও আপন আপন গৃহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া নববিধানের সেবায় আত্মদান করিলেন, তাঁহাদিগকে এক পরিবারে নিবদ্ধ করিবার জন্য এই মঙ্গলবাড়ী রচিত। যাঁহাদের পরস্পর রক্তের সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া, নববিধানের নবপরিবারের আদর্শ দেখাইলেন। যাঁরা মার হাতে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের সকল ভার মা স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাহাই সাধনের জন্য নববিধানের এই বিশেষ প্রতিষ্ঠান। প্রতিজনের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধনা এবং নিজ নিজ পরিবারের বাসের জন্য এক একটী গৃহ নির্ম্মিত; কিন্তু সকল বাড়ীর বহির্দ্বার একটী এবং একত্র উপাসনার জন্য একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকের বিশেষত্বের সম্মান রক্ষা করতঃ, কেমন করিয়া একাত্মতা সাধন করিতে হয় এবং এক পরিবার হইতে হয়, তাহারই নিদর্শন দেখাইবার জন্য এই মঙ্গলবাড়ী। শ্রীমদাচার্য্যদেব নতজানু হইয়া মঙ্গলবাড়ীতে যে প্রার্থনা করেন, তাহা যেন এই পল্লীস্থ পরিবারবর্গের জীবনে পূর্ণ হয়। নবদেবালয় হইতে সংগীত করিতে করিতে মঙ্গলবাড়ীর উঠানে যাওয়া হয় ও এইভাবে আরাধনা ও প্রার্থনা হয়। সেখানে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ নন্দন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা করেন।

৫ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। আচার্য্যদেবের চিরযৌবনব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবীর সভাপতিত্বে নববিধানের যুব-সঙ্ঘের উৎসব হয়। দুইটী মেয়ে 'দীক্ষা-গ্রহণ' ও 'নবসংহিতা' বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ যুবকসঙ্ঘকে উপদেশ দেন। অধ্যাপক নাগ আচার্য্যদেবের যৌবন-সুলভ কার্য্যোদ্যম উল্লেখ করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

(ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত মাঘী পূর্ণিমার দিনে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র সিংহের জন্মদিন উপলক্ষে, ৯নং ষ্টার লেনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ কেশব শ্রীকেশবের চরিত্র ও জীবনলাভে কেশব নামের উপযুক্ত হোন, ইহাই প্রার্থনা হয়।

শুভবিবাহ—গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ময়মনসিংহে ব্রাহ্মপল্লীস্থ "বাসন্তীকুটীর" নামীয় বাসভবনে, স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র চন্দের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী মায়ালতার সহিত, রাজবাড়ী-নিবাসী স্বর্গীয় মহাভারত পালের পৌত্র, শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রফুল্লকমলের শুভপরিণয় নবসংহিতা অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে ভক্তিভাজন ভাই চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত বরকন্যাকে উপদেশ দান করিয়াছেন। উভয় সমাজের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সপরিবারে যোগদান করিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। ভগবান্ নব দম্পতীকে শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ৩০শে জানুয়ারী, ময়মনসিংহে, স্বর্গীয় বিহারী-কান্ত চন্দের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র চন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার চন্দ ও জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী মায়ালতা চন্দ নবসংহিতানুসারে ভক্তিভাজন ভাই চন্দ্রমোহন দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান্ নবদীক্ষার্থীদিগকে শুভাশীষ দান করুন।

উৎসব—গত ১১ই ও ১২ই মাঘ, নবশ্রীক্ষেত্রস্থ প্রেমেন্দ্র-স্মৃতিতীর্থে প্রেম-সঙ্ঘের যুবাগণ মাঘোৎসব ও নববিধান-ঘোষণার দিন উপলক্ষে উৎসব করেন। কলিকাতা হইতে সমাগত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র উপাসনা করেন। প্রেম-সঙ্ঘের যুবাগণ সংগীত ও কীর্ত্তনাদি করেন। ঐ দু'দিনে বাগনান ব্রহ্মানন্দ আশ্রমেও উপাসনাদি হয়। শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক উপাসনা, সংগীত ও পাঠাদি করেন।

শতবার্ষিকী—কটকে, উৎকল ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক কেশবচন্দ্রের জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এবার স্থানাভাবে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল না, পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আদ্যশ্রাদ্ধ—স্বর্গীয় শ্যামচন্দ্র দত্তের সহধর্ম্মিণী ৺স্বর্ণময়ী দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ, গত ১৯শে মাঘ, ১২৯নং থুরুট রোডে, জগবন্ধু আশ্রমের নবদেবালয়ে ভাসুরপো শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাল নবসংহিতামতে পুরোহিতের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১৲ ও গরিবদিগকে

কিছু দান করা হয়। মা বিধানজননী, পরলোকগত আত্মাকে স্নেহক্রোড়ে স্থান দান এবং শোকার্ত্তদিগকে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে জানুয়ারী, স্বর্গীয়া মিসেস পি, সি, সেনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, পুত্র আলিপুরের জজ মিঃ অমরেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা সরলচন্দ্র সেন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। মহিলাগণ সংগীত করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে ২৲, ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ২৲, নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয় ও গঙ্গানারায়ণ নবশিশুবিদ্যালয়ে পারিতোষিকের জন্য ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায় শান্তিকুটিরে, স্বর্গগত গৃহস্থ বৈরাগী রাজমোহন বসুর কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া কুসুমকুমারীর সাম্বৎসরিক দিনস্মরণে এবং স্বর্গগত শশীভূষণ মল্লিকের পত্নীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক তাঁহার মাতৃদেবীর স্মৃতিতর্পণার্থ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে ১৲, নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়ে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২৫০। নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের (আই.এম.এস) গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত ভাই বিহারীলাল সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, এলাহাবাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ২৯শে মাঘ, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীহট্টে মৌলবীবাজারে জামাতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের গৃহে উপাসনাদি হয়। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী সুষমা দত্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং ভিখারীদিগকে কিছু দান করেন।

গত ১লা ফাল্গুন, আর্টপ্রেসে, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় এস, কে, লাহিড়ীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবী প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা ফাল্গুন, বেলগাছিয়া কারমাইকেল কলেজে, তত্রত্য রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন ডাঃ বিবেকমোহন সেনের পিতৃদেব স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং সহধর্ম্মিণী প্রার্থনা করেন ও প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ৩রা ফাল্গুন, ৬৫।১ হ্যারিসন রোডে, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের কন্যা পরলোকগতা সুরমা দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, এলাহাবাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে স্বামী শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ দত্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করেন।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, গড়পার রোডে, ভ্রাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত আশা-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত পুত্রের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যার পর হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে, আলিপুরের জজ মিঃ অমরেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহার শ্বশুর কর্ণেল এন, পি, সিংহের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সিংহ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ভাই প্রিয়নাথের সেবার্থে কিছু সাহায্য করেন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই অমৃতলালের কনিষ্ঠ জামাতা ও কুমারী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষের পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের স্বর্গারোহণদিনে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। এবং শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র প্রার্থনা করেন, ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র মজুমদার পাঠাদির সাহায্য করেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, খিদিরপুরস্থ ময়ূরভঞ্জ রাজপ্রাসাদে, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রভঞ্জ দেবের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন এবং ডাঃ সত্যানন্দ রায় পাঠাদি করেন। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ কুনালচন্দ্র সেন সংগীত করেন।

অদ্য মঙ্গলবাড়ীতে, স্বর্গীয় সাধক মহেন্দ্রনাথ নন্দনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, প্রাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের গৃহে এবং সন্ধ্যায় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দনের গৃহে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, বেলেঘাটায়, বার্ডকোম্পানীর ষ্টোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের পত্নী স্বর্গীয়া উমা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৩০৲ এবং ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ডে ২০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, প্রাতে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় লোকনাথের স্বর্গদিনস্মরণে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ৫৭।২এ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, চট্টগ্রামের ৺রাজেশ্বর গুপ্তের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁদের পুত্র শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৩৲, চট্টগ্রাম নববিধান সমাজে ৩৲, কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ৪৲ টাকা এবং গরিবদিগকে ক্ষুদ্র দান ১৲ টাকা, মোট ১১৲ দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।
১লা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
15th. March, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, ধন্য হও তুমি। তোমার নবশিশু বিশ্বমানব শ্রীকেশবের জন্মশতবার্ষিকী মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ। এই মহাযজ্ঞে আমরা যাহাতে প্রবেশের অধিকার পাই, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। শ্রীকেশবকে তুমি দেহে থাকিতে থাকিতেই দ্বিজত্ব দিয়া নববিধানের নবজন্ম দান করিয়াছ। তোমার ও তাঁহার সঙ্গ-সহযোগে আমরাও এজন্মে জন্মান্তর বা দ্বিজত্ব লাভ করি, তাহারই জন্য তুমি আমাদিগকে নববিধানে আনিলে ও তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী করিলে; কিন্তু কই আমরা তোমার নববিধানের উপযুক্ত হইলাম? তুমি বিশ্বরাজরাজেশ্বর হইয়া, জগতে তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, তুমি এই নববিধান ঘোষণা করিয়াছ এবং তোমার নবভক্ত শ্রীকেশবকে নিজ হস্তে গঠন করিয়া নববিধানমূর্ত্তিমান করিয়াছ। তোমার ইচ্ছা, তাঁহার সহিত কায়মনোবাক্যে সমযোগী হইয়া, আমরাও নববিধানের নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া নূতন মানুষ হই; কিন্তু আমরা আমাদের পাপ, আমিত্ব ও দুর্মনের প্রলোভনে পড়িয়া, তোমার নববিধানকেতো পূর্ণ স্বীকার করিলাম না। রাজার রাজবিধি অমান্য করিলে যেমন দণ্ডনীয় হইতে হয়, তেমনই তোমার নববিধানের অমান্য অপরাধে, আমরা এই সংসারকারাগারে নিবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। সংসারে ধন, মান, কামনা, বাসনা আমাদিগকে এমনই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে যে, আমরা যে তোমার ব্রহ্মসন্তান, ব্রহ্মপুত্রকন্যা, তাহা বলিয়া আর পরিচয় দিতে কই পারিতেছি? আমাদের সংসারকেও যেন চণ্ডালের পরিবার করিয়া তুলিতেছি। তোমার উপাসনায় আমাদের মতি নাই। ধর্ম্মসাধনায় আমাদের রুচি নাই। তোমার দর্শন শ্রবণে আমাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। সংসারের বিষয়বিষপানের জন্যই সপরিবারে সদলে যেন পাগল হইয়া বেড়াইতেছি। তোমার পূর্ণ বিধানকে অমান্য করার যে দণ্ড, তাহা ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহার উপর তুমি যে তোমার নবভক্তকে আমাদের ধর্ম্মবন্ধুরূপে প্রেরণ করিলে, তাঁহাকে বন্ধুরূপে আদর ও গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অবিশ্বাসের অস্ত্রে এবং বুদ্ধিবিচারের খড়্গে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বধ করিলাম; এবং ভাই ভাই পরস্পরকে অপ্রেম ও অবিশ্বাসের অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া, আপনারাও খণ্ড খণ্ড হইলাম। তোমার নববিধানকে অমান্য করিয়া যেমন আমরা সংসারকারাগারে নিবদ্ধ হইলাম, তেমনই ভ্রাতৃহত্যা করিয়াও আমরা মৃত্যুর দণ্ডে দণ্ডিত। তাই আজ ব্রাহ্মসমাজ সাংসারিকতার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে এবং সমগ্র মানবসমাজই

যেন মৃত্যুগ্রাসে পতিত। তুমি যে জীবনের জীবন, তোমা ছাড়া হওয়াই তো মৃত্যু! কই, তোমাকে জীবনের জীবন বলিয়া দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া, আমরা তোমার প্রকৃত উপাসনায় পুনর্জীবনলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইতেছি? এবং কই বা, তোমার জীবন্ত নবভক্ত শ্রীকেশবের সহানুগমনসাধনায় বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহার আদর্শজীবন রক্ষা করিলাম? তাই আমরা অনুতপ্তচিত্তে, আজ সপরিবারে সদলে, তোমার চরণে আত্মদোষ স্বীকার করি ও তাহার জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করি। তুমি আমাদের সকল আমিত্ব এবং অবিশ্বাস ও পাপ অপরাধ বলিদান কর। আমরা তোমার পরিত্রাণপ্রদ নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য স্বীকার করি এবং সেই বিধি অনুসারে জীবন যাপনে যাহাতে সক্ষম হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নবভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্রকে, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, আমাদের মধ্যে ও বিশ্বমানবজীবনে পুনর্জ্জন্ম দান কর। তাঁহার শতবার্ষিকী জন্মযজ্ঞে আমরা তাঁহার সহিত নবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া, যাহাতে এক অখণ্ড মানবত্ব লাভ করিতে পারি এবং সমগ্র মানবপরিবার সহ নব জাগরণে ও নব জীবনে সঞ্জীবিত হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞ-সাধনার বিষয়

শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্ম মানবত্বের নব জন্ম। প্রত্যেক মানব যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। পিতামাতার ঔরস গর্ভে এ দেহে মানবের জন্ম। যখন মানুষ এ জন্মে জন্মান্তর লাভ করে, কিংবা ঈশ্বরের পবিত্রাত্মাজাত হইয়া ঈশ্বরের প্রকৃতিতে গঠিত হয়, তখনই তাহার নবজন্ম হয়। শ্রীকেশবচন্দ্র জন্মলাভ করিয়াই আত্মজ্ঞানে জীবনে এই নবজন্মলাভের পরিচয় দান করিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "আমরা মার হাতের গঠিত।"

যুগে যুগে বিধাতা এক এক মহামানবকে তাঁহার নিজ প্রকৃতিতে গঠন করিয়া, পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের দৈবশক্তিসম্পন্ন জীবনের মাহাত্ম্য দেখিয়া, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকেই পূর্ণব্রহ্মের অবতারভ্রমে পূজা করিয়াছে। এবং যাঁহাকে যখনই এরূপ কোন মহাশক্তি-সম্পন্ন দেখিয়াছে, তাঁহাকেই অমানুষিক পুরুষ বলিয়া, তাঁহাদের পুরুষত্বে গৌরব দিয়াছে।

তাই একদিকে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ যেমন ঐশ্বরিক-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া পূজিত, তেমনই পুরুষকারবলে যাঁহারা মহামানবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শ জীবনও তাঁহাদের ব্যক্তিগত পুরুষত্বের পরিচায়ক বলিয়া, সাধারণ মানবের পক্ষে সেই জীবনের আদর্শানুসরণ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীকেশবের জীবন এই দুই জীবনের সমন্বয়। আবার তাহা যে সর্ব্বসাধারণ মানবের লভনীয়, ইহা কেশবচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র নিজকে সাধারণ পাপপ্রবণ মানব বলিয়া যেমন পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই ব্রহ্মকৃপায় যে মানুষ ঈশা গৌরাঙ্গের মত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। এবং তাই বলিয়াছেন, আমি অসাধারণ মানব, আমি অপর সাধারণের মতনই। যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত, তাঁহারাও যে মহামানব, স্বয়ং ব্রহ্ম নন, ইহা কেশবচন্দ্রই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার মানবের দেবত্ব বা মহামানবত্ব তাহার অলৌকিক পুরুষকার সাধ্য বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন নাই। সাধারণ মানুষ সহজে নিজ আমিত্ব পরিহার বা অস্বীকার করিলেই যে এই জীবনে নবজন্ম লাভ করিতে পারে, এবং সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অখণ্ড বিশ্বমানব হইতে পারে, তাহারই সাক্ষ্য দান করিলেন শ্রীকেশবচন্দ্র।

এই জন্য জীবনে যাহা কিছু করিয়াছেন, যে মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যে কার্য্যকুশলতা ও যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের গৌরব জীবনে দেখাইয়াছেন, তাহা সকলই এক ব্রহ্মকৃপাসিদ্ধ। তাঁহার নিজ পুরুষকারসিদ্ধ নয়—ইহা তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

সত্যই তিনি একটী অসাধারণ মানবাদর্শ। সকল মানুষই নিশ্চয় তাঁহার মত হইতে পারিবে, ইহা তিনি সকলকেই আশা দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ ঈশ্বর-প্রেরিতত্ব এবং আত্মবিশেষত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কেশবচন্দ্র মানবের এই নবজন্মের শুভ বার্ত্তা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাকেই তিনি ঈশ্বর-প্রেরণায় নববিধান নামে অভিহিত ও ঘোষণা করিলেন।

তিনি কেমন করিয়া, শৈশব হইতে মার হাতে গঠিত হইয়া, তাঁহার জীবনের বিশেষবার্ত্তা বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনবেদে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সকলকারই অনায়াসসাধ্য; কিন্তু সে সাধনা বিনা যে মানুষ মাত্রেই প্রকৃত মানবত্ব লাভ করিতে পারিবে না, ইহাও যে বিধাতার বিধান, তাহা ঘোষণা করিতে তিনি ভীত হন নাই।

তাঁহার সাধনার মূলভিত্তি আত্মত্যাগ বা আমিত্ব-বিনাশ। তাহাও তিনি সাধ্য সাধনা করিয়া বা পুরুষকার-বলে করেন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁহার আমিত্ব নাশ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, তেমনি বিশ্বমানবের মধ্যেও আত্মনিমজ্জিত হইলেন।

ঈশার প্রাচীন বিধানে ধর্ম্মের দুই অঙ্গ সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ঈশ্বরের পিতৃত্বই সাধিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মানবের ভ্রাতৃত্ব তেমন পরিপুষ্টভাবে সাধিত হয় নাই, তাহা কেবল শাস্ত্র বা মতে রহিয়া গিয়াছে। কেন না যাঁহারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে মানবকুলে প্রেরিত হইলেন, তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়াই সম্মানিত বা পূজিত হইলেন। মানব-ভ্রাতা বলিয়া কেহ গৃহীত বা আদৃত হন নাই, এইজন্য ভ্রাতৃত্ব-সাধন জগতে হয় নাই।

এই জন্য শ্রীকেশবচন্দ্রই নববিধানে এই সাধনা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে, বিশ্বমানবে আমিত্ব বিসর্জ্জন করিলেন এবং নিজকে সবার ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখাইলেন; এবং নিজে সকলকে ঈশ্বর-প্রেরিত ভাই বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শ্রীঈশা যেমন ব্রহ্ম-যোগে সিদ্ধ হইয়া ঘোষণা করিলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক', শ্রীকেশবচন্দ্র সে ব্রহ্মযোগ-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানবযোগ সাধনা করিয়া বলিলেন, 'আমি ও আমার ভাই এক'।

তাই সকল মানবের সহিত সমযোগ-সাধনা তাঁহার বিশেষ সাধনা। তিনি সকল মানবের সহিত সম অবস্থাপন্ন, সমভাবাপন্ন, সম দুঃখে দুঃখী, সম সুখে সুখী, সম বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে সমধর্ম্মাবলম্বী বিশ্বাস করিয়া সকলকে আপনার করিলেন; এবং সকলকার ভিতর আপনাকে বিকাইয়া বা বিলাইয়া দিলেন। ইহা হইতে তিনি বিশ্বমানবত্বলাভের আদর্শ-প্রদর্শনে সক্ষম হইলেন। মানবজীবনের সকল অবস্থার ও সকল সমস্যার সামঞ্জস্যের অভিজ্ঞান আত্মজীবনে লাভ করিলেন ও পূর্ণ মানবত্বের পরিচয় দিলেন। এই জন্য তিনি বলিলেন, হিন্দুর নিকটে আমি হিন্দু, খ্রীষ্টানের নিকট আমি খ্রীষ্টান, মুসলমানের নিকট আমি মুসলমান, ইউরোপের নিকট আমি ইউরোপীয়, এসিয়াবাসীর নিকট এসিয়াবাসী, নারীর সঙ্গে আমি নারী, শিশুর সঙ্গে আমি শিশু। এই ভাবে তিনি সহানুভূতি-যোগে সবার সহিত একত্ব-সাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি সর্ব্বমানবের পাপপ্রবণতা নিজের পাপ অনুভব করিয়া, আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই ভাবেই তাঁহার সাধনা যে মানবমাত্রেরই সাধন-সুলভ ও সহজসাধ্য, ইহা তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমিত্বনাশ, দীনতা, পাপবোধ, শিষ্যপ্রকৃতি, শিশুর সরলতা ও শুদ্ধতা এবং জীবন্ত বিশ্বাস তাঁহার জীবনের প্রধান ভিত্তি। এবং এ সকলই তাঁহার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-দত্ত, কিছুই সোপার্জ্জিত নয়, ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। এবং এই সকল উপাদান হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া, যোগ ভক্তির উচ্চ শিখরে সমুন্নীত হইয়াছেন এবং সকল ধর্ম্মাচার্য্যদিগের চরিত্র আত্মস্থ করিয়া একদিকে যেমন বলিলেন, সকল মানব আমাতে, আমি সকল মানবেতে, তেমনি অন্যদিকে বলিলেন, ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, চৈতন্য আমার হৃদয়, ঋষিগণ আমার আত্মা, সক্রেটিস আমার মস্তিষ্ক, হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।

তিনি জীবনে যে বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্যসাধনার গুণগরিমা দেখাইয়াছেন, দেশহিতৈষণা, দেশসংস্কার, নারীজাতির উন্নতিসাধন, শিক্ষা-বিস্তার ও নানাপ্রকার কীর্ত্তিকলাপ, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্য আত্মগৌরব তিনি নিজে লইতে চান নাই। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাঁহার প্রভুর দ্বারা বাধ্য হইয়া করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বুদ্ধিতে কিংবা কোন মানুষের যুক্তি পরামর্শ বা উপদেশে কিছুই করেন নাই, ইহা বার বার তিনি বলিয়াছেন।

তিনি জীবন্ত ঈশ্বরে এবং জীবন্ত ঈশ্বর-বাণীতে এতই বিশ্বাসী ছিলেন যে, প্রত্যেককে একমাত্র ঈশ্বরগুরুর বাণী শুনিয়া চলিতে বলিয়াছেন। এবং যখনই যাহাকে কোন পরামর্শ দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন নিজকেও তাহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তুমি এই কর, এই কর না, এভাবে না বলিয়া, তিনি বলিতেন,

"আমাদের এ ভাবে চলা উচিত, এই ভাবে করা উচিত"। আমরা যেন অন্ধের মত না হই, আমরা যেন আমাদের পরীক্ষায় সুশিক্ষা লাভ করি, এই ভাবে "তিনি বলিতেন ও লিখিতেন"।

তাই তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞে আমরা যেন, কেশবচন্দ্র এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন, এই বলিয়া তাঁহার মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত না হই। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব কেবল মুখে বলা নয়, কাজে করা, জীবনে হওয়া। যুগে যুগে ধর্ম্মাচার্য্যগণের পূজা ও গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সে ধারা বন্ধ করিয়া, নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন, মুখে ঈশা ঈশা, গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলিলে হইবে না; যে ঈশা না হইতে পারিবে, সে যেন ঈশার নাম না লয়। তেমনি আমরাও যেন মুখে কেবল 'কেশব কেশব' না করি, কিন্তু তিনি যে আদর্শ মানবত্বের পরিচয় দিলেন, তিনি যে এই মানবজন্মে ব্রহ্মরূপাগুণে বিভূত লাভ করিলেন এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবে সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রাতৃ-নির্ব্বিশেষে ভালবাসার এবং সমযোগে সমুন্নতি সাধনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা জীবনে সাধন করিয়া আমরা কেশবের ভাই হবার উপযুক্ত হই। তাঁহারই সাধনায় আমরা যেন কৃত-সংকল্প হইতে পারি। বিধাতা এই জন্যই তাঁহাকে বিশ্বমানবের আদর্শরূপে গঠন দান করিয়া, নবযুগে নববিধানে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। আবার তিনি যে জীবনের আদর্শ দেখাইলেন, তাহা নিত্য নব নব উন্নতিশীল। অনন্তের উপাসনায় এ আত্মার অনন্ত উন্নতি হইবে। ইহাই ত কেশব প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই জন্য সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নাম বিধাতার আদেশে দিলেন 'নববিধান'। বিধাতার ধর্ম্ম, বিধাতার বিজ্ঞান নব নব ভাবে অভিব্যক্ত হইবে, হইতেছে; এই জন্যই তিনি বলিলেন, "শতচন্দ্র-স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছি, সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে অনন্তের পথে চলিয়াছি, স্ত্রী পরিবার দেশ জগৎকে লইয়া অনন্তে ডুবিব", "আমি কাল ছেলে মার কাছে দৌড়েযাচ্ছি"। এই ভাবে আমরাও যেন তাঁর সঙ্গের সঙ্গী হইয়া, অনন্তের পথে দৌড়াইতে পারি। ইহাই যেন আমাদের নব জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞের সাধনা হয়।

তাঁহার উপর যখন আমরা নিরাকার ঈশ্বরকে প্রণাম করি, তখন আমরা যেন বৃথা সংস্কার বা অভ্যাসবশতঃ না করি। ঈশ্বরের পদানত হওয়ার সাধন ঈশ্বরের প্রণাম। যখনি আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিব, তখনি যেন ইহা আমরা উপলব্ধি করি। তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম, এবং তাঁহার চরণ আমাদের মস্তকে তিনি স্পর্শ করিতে দিলেন। নিরাকার ঈশ্বরের চরণ নিরাকার চিন্ময়। চিন্ময় চরণ-স্পর্শে যেন আমাদের জড় মস্তক, জড়ীয় অহং ধূলা-বলুণ্ঠিত হয়। ঈশ্বর আবার সর্ব্বময়, তাঁহার চরণে প্রণতিতে যেন সকলকার চরণে আমাদের মস্তক অবনত হয়। মনকে বিনয়ে অবনত করাই প্রণাম-সাধনের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মপ্রণাম দ্বারা যেন তাঁহার পাদস্পর্শ অনুভব করিয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন আশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হই।

প্রবেশ-নিষেধ

জগন্নাথ-মন্দিরে চামড়ার পাদুকা পরিয়া, কিম্বা কোন প্রকার চামড়া লইয়া প্রবেশ নিষেধ। সত্য সত্যই নববিধানে নব জগন্নাথমন্দিরেও কেবল চামড়ার শরীর লইয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব, বেশ ভূষা ও সাংসারিক জড় বুদ্ধি লইয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে গেলে, উপাসনার ভিতর প্রবেশের অধিকার কই পাই? যাহারা কেবল মানুষের চামড়া লইয়া বা মানবীয় ভাব লইয়া, বিদ্যা বুদ্ধি বা পদমর্য্যাদার পূজা করিতে আসে, তাহারা কেমন করিয়া নবজগন্নাথ-দর্শনে প্রবেশাধিকার পাইবে? শ্রীকেশবচন্দ্র তাই আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এখানে কেবলি চামড়ার দুর্গন্ধ; যেখানে চামড়ার ব্যবসায় চলিতেছে, ইহার ভিতর হরি আসিবেন কেন? এখানে কেবল মাংস ও চামড়া; আত্মা কই?" সত্যই যদি চামড়া লইয়া কেবল আমরা কারবার করি, আমরা কেমন করিয়া আত্মার উপাসনায় প্রবেশা-ধিকার লাভ করিব? এই জন্যই উপাসনায় আমাদের এত অরুচি, ইহা কি সত্য নয়?

ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রণাম

প্রণাম শব্দের অর্থ, প্রকৃষ্টরূপে নত হইয়া নমস্কার। ভক্তি-শাস্ত্রে ইহা এক প্রধান সাধন। আমরা প্রণাম বা নমস্কার করিতে যত অভ্যস্ত হই, তত ইহা একটা বাহিরের অভ্যাস মাত্র হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত ভাব আমরা না বুঝিয়াই প্রণাম বা নমস্কার করিয়া থাকি। প্রণামে বিশেষ সাধন, যখনি আমরা বাহিরে মস্তক অবনত করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনও যাহাতে বিনয়ে অবনত হয়, তাহা যেন সাধন করিতে পারি;

পরলোকে শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায়

সঙ্গীতাচার্য্য ভক্ত প্রচারক

বিগত ১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী), বুধবার প্রাতে ৯॥টার সময়, পূর্ব্ববঙ্গ নববিধানসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য ভক্ত প্রচারক দুর্গানাথ রায় মহাশয় ৮৮ বৎসর বয়সে ঢাকা নগরীতে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাবাপন্ন ও শুদ্ধচরিত্র ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন; ক্রমে স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে, তাঁহার সহযোগী ও সহকর্ম্মিরূপে ঢাকা নগরী কেন্দ্র করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে

নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হন এবং চির দারিদ্র্য বরণ করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন এবং কয়েক বার তাঁহার দলের সঙ্গে দেশ বিদেশে প্রচারে গিয়াছেন।

তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং উপাসনাকালীন ভাব অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতা শ্রোতাদের মনে ভক্তিভাব উদ্দীপিত করিত। তিনি অনেক বৎসর ঢাকা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র "বঙ্গবন্ধুর" সম্পাদকতা করেন এবং কিছু কালের জন্য "মিলন" নামে একখানা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাগজ বাহির করেন।

তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং সকলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহাকেও যাঁহারা জানিতেন, সকলেই সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা করিতেন। ঈশ্বর-ভক্তি তাঁহাকে সেবাপরায়ণ করিয়াছিল। ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্য্যে তিনি সহায়তা করিতেন ও অনেক কাল নবাব আবদুল গণি রিলিফ ফণ্ডের কার্য্য করিয়াছেন।

(২৪শে ফাল্গুনের "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

—•—

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা !

(সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি)

কলুটোলার বৈদ্যকুলতিলক, বিশ্ববিশ্রুত ভবিষ্যদ্বাণী-প্রবক্তা, মানবের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সকল প্রকারের দুরারোগ্য ব্যাধির সুচিকিৎসক, স্বর্গগত জগদ্বরেণ্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় আশী বৎসর পূর্ব্বে মহানগরী কলিকাতায় এই 'অত্যাশ্চর্য্য বটিকা' প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা তিনি তাঁহার আরাধ্য ইষ্ট দেবতার মুখনিঃসৃত পবিত্রবাণীসঞ্জাত বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও, সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, পাপী সাধু, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই নিজ নিজ জীবনে ইহার দ্বারা অতি দ্রুত চমৎকার ফললাভ করিয়াছেন বলিয়া সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ইহা মানবের আত্মিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকারের সাংঘাতিক ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলে হাতে হাতেই ইহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করা যায়। ইহা আর এখন শুধু বাগাড়ম্বরের সহিত ঘোষণা মাত্র নহে; পরীক্ষিত সত্য! সাক্ষাৎ ফলপ্রদ! এই আশ্চর্য্য বটিকার নাম "প্রার্থনা বটিকা"। ইহা যথাযোগ্যভাবে কিছুদিন ব্যবহার করিলেই, ইহার অন্তর্নিহিত নব জীবনপ্রদ স্বর্গীয় গুণাবলীর সাক্ষাৎ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। আপনি আত্মিক কি কি ব্যাধিতে ভুগিতেছেন? অথবা আপনার মানসিকই বা কি কি দৌর্ব্বল্য আছে? একবার নিবিষ্টচিত্তে গভীরভাবে "আত্মচিন্তা" করিয়া দেখুন। আপনি কি আপনার আধ্যাত্মিক অরুচি বা অজীর্ণতা অনুভব করেন? না, কি আপনি আধ্যাত্মিক জড়তা প্রাপ্ত হইয়া, এখন পঙ্গু প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন? না, কি আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীনতায় অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্য্য কমিয়া গিয়াছে? আপনি কি আশা-ভগ্ন-প্রাণে একবারেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন? নিরাশ হইবেন না। এ অবস্থাতেও ভয়ের কোন কারণ নাই। এই 'প্রার্থনা বটিকাটি' একবার বিশ্বাস-সহকারে সেবন করুন। ইহার অসাধারণ শক্তিতে আপনি পুনরায় উঠিতে, বসিতে ও চলিতে সমর্থ হইবেন। ইহা সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, শত শত পাপভারপ্রপীড়িত, মলিন ভগ্নপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে, শত শত উপদেষ্টার উপদেশ অথবা বহু সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়াও যেখানে কোন ফল পরিদৃষ্ট হয় নাই, এমন সব ব্যক্তিও এই 'প্রার্থনা বটিকার' গুণে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মনে রাখিবেন, ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহারে মানবপ্রাণ অচিরে শান্তি লাভ করে, পাপভারপ্রপীড়িত কত ভগ্ন প্রাণ পাপভার হইতে মুক্তি লাভ করে। প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয়ও ইহার বলে প্রেমের আগুনে গলিয়া যায়। প্রকাণ্ডকায় শুষ্ক তরুও যেমন বসন্তের আগমনে পুনরায় পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে, মানব-জীবনেও ইহার প্রভাবে তেমনি ভাবে ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভীষণ বজ্রাঘাতসদৃশ নানাবিধ শোকের আঘাতে যে প্রাণ ঝলসাইয়া যায় অথবা ভাঙ্গিয়া পড়ে, দেখিতে দেখিতে মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়, নাড়ীবিহীন দেহের ন্যায় যখন মানবাত্মাও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে, তখন মৃতকল্প ব্যক্তিকে ইন্‌জেকশন প্রদান করিলে যেমন তাহা তখনই সাড়া দিয়ে থাকে, তেমনিভাবে এই বটিকার ফলে মৃতকল্প আত্মাও পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। শ্রাবণের বারিধারা বৎসরে একবার মৃত্তিকাতে বর্ষিত হয়। আমাদিগের কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতাতে দেখিয়া আসিতেছি যে, প্রাণে ঐ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অহোরাত্র কত শোকের, রোগের, দুঃখের, অবিচার ও অত্যাচারের এবং নানা প্রকারের উৎপীড়ন ও পারিবারিক বহুপ্রকারের সুতীক্ষ্ণ তীরের আঘাতে আমাদিগকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে। বহু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, এই 'প্রার্থনা বটিকার' সুশীতল গুণে তজ্জাবতের অসহ্য যন্ত্রণাও পলকে দূরীভূত হইয়া যায়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয়সমাজের অতি শ্রদ্ধেয় "বানিয়ানের" রচিত যাত্রিকের গতি (Pilgrim's Progress) এবং ধর্ম্মযুদ্ধ (Holy war) পড়িয়াছিলাম; ইহাতে রূপকরূপে সংসারে মানবাত্মার অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমারই ন্যায় এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ, পৃষ্ঠ দেশে নানাবিধ সামগ্রী মিশ্রিত গুরুতর এক বোঝা বহন করতঃ, সংসারের দুর্গম পথে চলিতেছিলেন; তিনি চলিতে চলিতে হঠাৎ "নৈরাশ্য-পঙ্কে" পড়িয়া গিয়াছিলেন। পঙ্কে পাদদ্বয় নিমজ্জিত, পৃষ্ঠে গুরুতর দুর্ব্বহনীয় বোঝার ভার, নিজে শত চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ আর উঠিতে পারিতেছেন না।

পদদ্বয় প্রগাঢ় কর্দ্দমে ক্রমশঃ নিমজ্জিত হইতেছে। হায়! বৃদ্ধের কি নিদারুণ অবস্থা! নিরুপায়! নিজের বলে আর উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না। বৃদ্ধ নিরাশ! নিরাশ! নিরাশ! হইয়া পড়িলেন, আর তাঁহার বাঁচিবার কোন উপায় নাই, চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আহা! কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ তাঁহার প্রাণের এক নিভৃত স্থানে যে এই অত্যাশ্চর্য্য "প্রার্থনা বটিকাটি" রক্ষিত ছিল, তাহা তাঁহার স্মরণে আসিল। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া উহা ব্যবহার করিলেন। কি চমৎকার! এ কি চমৎকার!! কোথা হইতে বৃদ্ধের প্রাণে অনুপ্রেরণা আসিল, কাহার অদৃশ্য হস্ত যেন বৃদ্ধকে ধরিয়া উঠাইয়া দিল। বৃদ্ধ পুনরায় যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া, পূর্ণ উদ্যমে সংসারের দুর্গম কণ্টকময় পিচ্ছিল পথে লক্ষ্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক ও পাঠিকাগণ, একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন, এমন অবস্থাতে কখনও পড়িয়াছেন কি না? অত বড় ঐশ্বর্য্যশালী, মহাজ্ঞানী, অতি উচ্চাসনে আসীন, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকেও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে যে, "এই সংসারপথ, দুর্গম অতি, কণ্টকময় হে," তখন আমাদিগের ন্যায় অতি সাধারণ নগণ্য লোককে যে এ পথে নিয়ত জর্জ্জরিত হইতে হয়, এখানে তাহা বলা জীবনের সত্য অবস্থা প্রকাশ করা মাত্র। আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিগণ কখনও, ঐ সেই "আলালের ঘরের দুলালের মত" সংসারে নিরবচ্ছিন্ন হেসে খেলে, নেচে কুঁদে, সমস্ত জীবন কাটাইয়া যাইতে পারে না। যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া এই সুদীর্ঘ সংসার-পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাঁহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কেন না, সকলেই আমরা সে সব বিষয়ের সহিত নিয়তই সংগ্রাম করিতে করিতেই অগ্রসর হইতেছি। কথিত আছে যে, সমুদ্রে উৎপন্ন ইলিস মৎস্যকে নিয়তই কেবল উজান স্রোত অতিক্রম করিয়াই, নদীপথে দূর দূরান্তরে অগ্রসর হইতে হয়। কত বিঘ্ন, কত বাধা, কত বিপদ যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়, তাহা উপলব্ধি করা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাকে আবার আবদ্ধ করিবার জন্য, বধ করিবার জন্য, শত স্থানে শত লোক জাল পতিয়া বসিয়া আছে। আমরাও এই সংসারসমুদ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই সংসার-পথেও আমাদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য, বিমুগ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং প্রতারিত করিবার মানসে কত প্রকারের যে জাল, পাখী ধরিবার ফাঁদের মত, দিবারাত্রি পাতা রহিয়াছে, সংসারের দৃষ্টিতে তাহা "ধরা" অতি সুকঠিন। আমাদিগের নিয়ত সংসারের উজান স্রোতেই জীবনতরী চালাইয়া যাইবার ব্যবস্থা। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে চলিয়া যাইবার সময়ে, এই 'প্রার্থনা বটিকাটি' সঙ্গে রাখিবার আবশ্যকতা একান্ত অপরিহার্য্য। আমাদিগের বৈদ্যকুল-চূড়ামণি কেশবচন্দ্র তাঁহার "Regenerating Faith" এবং "Inspiration" বক্তৃতাতে, শিক্ষার্থিগণকে যে সকল বিষয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আধ্যাত্মিক ও মানসিক ব্যাধি সকলের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র। বৈদিক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন আর্য্যজাতি ভারতে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদিগের ভিতরে ক্রমশঃ নানা ব্যাধির উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনেকেই মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে। ইহার প্রতীকারের নিমিত্ত তাঁহারা কোন উপায়ে অবগত ছিলেন না। তখন সকলে পরামর্শ করতঃ, ঋষিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজকে, স্বর্গে স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সমীপে ব্যাধি সকলের প্রতীকারের নিমিত্ত, ঔষধের বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ইন্দ্র-সমীপে গমন করিয়া যথাযথরূপে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করতঃ, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই আদিমকাল হইতেই এদেশে সর্ব্বাগ্রে আয়ুর্ব্বেদের প্রচলন হইয়াছিল এবং তাহা ধারাবাহিক রূপে এখন সমস্ত জগতে নানাভাবে নানা আকারে প্রচলিত হইয়াই আসিতেছে। বৈদ্যকুলচূড়ামণি কেশবচন্দ্র স্বর্গরাজ্য হইতে যৌবনের প্রারম্ভেই, আমাদিগের আধ্যাত্মিক নানা ব্যাধির মহৌষধ এই 'প্রার্থনা বটিকার' বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তবুও এদ্রব্যটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত কেশবচন্দ্রকে স্বর্গরাজ ঈশ্বরের সুপণ্ডিত সুপুত্র যিশু খৃষ্টের সমীপে শিক্ষার্থিরূপে শিষ্যপ্রকৃতি লইয়া বহুকাল তাঁহার সাহচর্য্য করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্ট কেশবচন্দ্রকে আধ্যাত্মিক আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে তাঁহাকে এই 'প্রার্থনা বটিকার' মূল উপাদান (formula) বিশ্লেষণ করতঃ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। জ্যামিতিশাস্ত্রে আমরা যেমন পড়িয়াছি যে, ৩টী স্বীকার্য্য ও ১২টি স্বতঃসিদ্ধ আছে এবং এই সকলগুলিকে বিশ্বাস করিয়াই লইতে হয়; এ সকল লইয়া বিতর্ক উপস্থিত করিলে শিক্ষার্থীর জ্যামিতিশাস্ত্রে প্রবেশ করিবারই অধিকার জন্মেনা। তেমনি ভাবে খ্রীষ্ট শুধু কেশবচন্দ্রকে নহে, তাঁহার আরও বহু শিক্ষার্থীকে সর্ব্বপ্রথমে ৩টি স্বীকার্য্য শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। (১ম) "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" (২য়) "অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে"। (৩) "আঘাত কর, তোমাদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইবে।" এই ৩টি স্বীকার্য্য বিষয় 'প্রার্থনা বটিকার' প্রধান উপাদান। এই তিনটির সহিত সরলতা, শিশুপ্রকৃতিসিদ্ধ ব্যগ্রতা, নির্ভরশীলতা ও পবিত্রতা সমানভাবে মিশ্রিত করতঃ, অনুষ্ঠান দ্বারা মন্থনান্তে, পবিত্র সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিত তৌলে, নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

কেশবচন্দ্র সকলকে শিখাইয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর স্বল্পভাষী, তাঁহার কথা বক্তৃতা নয়, অফুরন্ত বাক্যাড়ম্বর নয়, অতি সংক্ষিপ্ত; তিনি নিয়ত বলিতেছেন—'I am', 'আমি আছি', 'I love'—'আমি ভালবাসি'—তাঁহার সমস্ত টুকিই এপ্রকারের সহজ ভাষা। সুতরাং প্রার্থনাও কতকগুলি বাক্যাবলীর প্রদর্শন নহে; মূর্খকে

বুঝাইতে অনেক কথা, অনেক যুক্তি প্রমাণ, অনেক শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন করে; কিন্তু ঈশ্বরকে বুঝাইতে দু'ঘণ্টা ব্যাপী নানা ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলীর প্রয়োজন করে না—তিনি মন দেখেই বুঝিতে পারেন। প্রার্থনা মানবাত্মার স্বর্গপানে তাকাইবার প্রক্রিয়া বিশেষ। ঠিক ঠিক বিন্দুতে বিন্দুতে (Point to point) মিলিয়া গেলেই, "কোথায় ভূ-লোক, কোথায় দ্যুলোক, পলকে হয় একাকার।" কেশবচন্দ্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, "সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা"। "সরল শিশুর মত, ডাক মা বলে অনুদিন হে।" আমরা 'প্রার্থনা বটিকার' সকল উপাদানই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম। ইহার ব্যবহারে সহপান ও অনুপানের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। প্রতিদিন ঠিক মতে, সময় মতে, একবার মাত্র সতৃষ্ণ উদগ্রীব ভাবে সেবন করিলেই যথেষ্ট ফল লাভ হইবে। বটিকা-ব্যবহারান্তে, নিজ নিজ রুচি সহ মিল রাখিয়া, নিজের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, একটি সংগীতই ইহার সহজ অনুপান। ইহা ঔষধ-সেবনকারী নিজেই অন্বেষণ করতঃ বাছিয়া লইবেন।

এই বটিকার প্রভাবে কত যে অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, কত যে অলৌকিক ক্রিয়া দেখা গিয়াছে, তদ্ভাবৎ ইউরোপীয় নানাদেশ হইতে প্রেরিত সকল খ্রীষ্টদূতগণ, আমাদিগের এই বঙ্গদেশে ও ভারতের সর্ব্বত্রই অবস্থিতি করতঃ অহর্নিশ আমাদিগকে, নিজ নিজ জীবনে, নিজ নিজ মণ্ডলীতে, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিয়ত যে সকল অমানুষিক ব্যাপারগুলি অনুষ্ঠিত হইতেছে, তদ্ভাবতের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া যাইতেছেন। কেশবচন্দ্রের জীবিত অবস্থাতেই 'মুক্তি ফৌজের' কর্ম্মিগণ নানাভাবে 'প্রার্থনা বটিকার' গুণগান করিয়া, কেশবচন্দ্র প্রমুখ শত শত প্রচারক, সাধক, বিষয়ী, কর্ম্মী ও গৃহস্থের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার জ্বলন্ত ইতিহাস রচিত রহিয়াছে। আমাদিগের ন্যায় সহস্র সহস্র সাধারণ ভাবের ব্যক্তিগণও ইহা ব্যবহার করতঃ উপকৃত হইয়া থাকেন, তাহার সাক্ষ্য শুধু আমি নহি, আমার সমবিশ্বাসী শত শত ভাই ভগ্নী এদেশের নানা স্থানে স্থিতি করিয়া এ উপকার ঘোষণা করিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাক্ষ্যদান

(৩০শে জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবেদন)

কিরূপে আমার নববিধানাশ্রয় ঘটিল, তা একটু বলছি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন "হেয়ারস্কুলে" পড়িতাম, তখন 'কেশব সেনের গির্জ্জায়' (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে) কি হয়, দেখিতে ইচ্ছা হয়। রবিবারে রবিবারে সেখানে যাওয়া আরম্ভ হল।

বেদীর উপর কেশবচন্দ্র উপবিষ্ট, কেশবের মুখের চারিদিকে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, দেখিলাম। তাঁহার মুখের অমৃতবাণী যেন পৃথিবীর বহু উপরে কোন এক মহা উচ্চ স্থানে লইয়া যাইত। সেখানে পৃথিবীর কোলাহল নাই—পৃথিবীর ময়লা, অপবিত্রতা নাই। মন এক অপূর্ব্বস্থানে পৌঁছিত। সেখান হইতে ফিরিতে ইচ্ছা হইত না। আহার নিদ্রা ও পৃথিবীর কোন বিষয়ে তখন আকর্ষণ থাকিত না। যদিও সকল কথা তখন বুঝিতে পারিতাম না, তথাচ মন্দির ছাড়িয়া আসিতে প্রাণ চাহিত না। "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর" এই গান, বোধ হয়, এই অবস্থাতেই রচিত হয়েছিল। পৃথিবীতে থেকেই যেন স্বর্গের আভাস পাইতাম।

একটী ভাদ্রোৎসবে প্রত্যুষেই যাই। বহু দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও সেস্থান হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলাম না। অনাহারে যে আছি, একথা মনেও হইল না। কি জমাট যে তখন দেখিয়াছি, বর্ণনা করিতে পারি না। সেই জমাটের মধ্যে না পড়িলে, অতি দুর্ব্বল চিত্তের লোক যে আমি কোথায় গিয়া পড়িতাম, বলিতে পারি না। সে সময়ের উৎসাহ, উদ্যম, সরলতা, নির্ম্মলতা, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা, নিষ্ঠা এবং সুগভীর ও সুমিষ্ট জীবন্ত উপাসনা স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে। কি আগুন ও কি প্রেম।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন (সম্বলপুরে যিনি উকীল ছিলেন) আমাকে প্রথম কমলকুটীরে লইয়া গিয়া, কেশবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেন। কমলকুটীরে প্রতি রবিবার দুপুর বেলায় ইয়ংম্যানেরা একত্রিত হইতেন এবং কেশবচন্দ্র এক ঘণ্টা সরল ভাষায় তাঁহাদিগকে গল্পচ্ছলে মধুর উপদেশাদি দিতেন। আমিও সেখানে যাইতে আরম্ভ করি এবং নন্দলাল, ভবানীপ্রসাদ, প্রিয়নাথ, সুখো প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হই। সে যে কি মধুর উপদেশ, তা বলিতে পারি না। এখনো কাণে বাজিতেছে। ঐখানে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কেশব বলেন যে, সাধারণ সমাজের লোকের তাঁহার মত ও উক্তি উপেক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিবেন। আমি নিজ জীবনে, এই কথা যে prophetic, তাহা দেখিতেছি। ভগবানের নাম, হরি, মা ইত্যাদি আগে সাধারণ সমাজ গ্রহণ করেন নাই, বিদ্রূপ করিয়াছেন; এখন সে সমস্ত এবং নববিধানের ভাব গ্রহণ করিতেছেন।

কেশবের টাউন হলে, এলবার্ট হলে, বিডন পার্কে বক্তৃতা ও মন্দিরের উপদেশ শুনিয়াছি। জীবনবেদ, আচার্য্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন কতক কতক স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ঐ সময় "ব্যাণ্ড অফ হোপের" সভ্য হইলাম। কমলকুটিরে ও এলবার্ট স্কুলে "নববৃন্দাবন" নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। স্বয়ং কেশবচন্দ্রকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। কমলকুটীরে যাত্রাভিনয় দেখিয়াছি।

অতি সামান্য ব্যাপারেও কেশবের দৃষ্টি ছিল। যখন রবিবারে

রবিবারে কমলকুটীরে যাইতাম, তখন একটী রবিবারের কয়দিন আগে কেশবের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয় এবং সে রবিবারের কয় দিন পরে তাঁহার প্রথম পুত্রের বিবাহ হয়। সে রবিবারে কেশব আমাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার কন্যার বিবাহের দিন আমরা কেন আসি নাই? আমরা বলিলাম যে, কেহ আমাদের আসিতে তো বলেন নাই। তাহাতে কেশব বলেন যে, তিনি কান্তিবাবুকে আমাদের নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন; দেখিতেছি যে, কান্তিবাবু তাহা ভুল করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহে আমাদের স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিলেন।

ক্রমে তিনি রোগশয্যায় শায়িত হইলেন। একদিনের কথা বলি—মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে শিবনাথবাবু ও তাঁহার দলের কয়জন লোক কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য যাইতেছিলেন, আমিও পথে তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। বারাণ্ডা হইতে কান্তিবাবু বলিলেন যে, ডাক্তারের হুকুম, কাহাকেও কেশবের কাছে আসিতে না দেওয়া—তাঁহার অবস্থা বড়ই খারাপ। কেশব তাহা শুনিতে পাইয়া, কান্তিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—কে আসিয়াছে? কান্তিবাবু বলিলেন, শিবনাথ। পরে কান্তিবাবু আমাদের যাইতে অনুমতি দেন। আমরা ঢুকিবামাত্র, শয্যাশায়িত কেশব শিবনাথকে বুকের উপর নিয়া জড়াইয়া বলিলেন, শিবনাথ, এসেছ? আর উভয়ের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা দরদর করিয়া বহিতে লাগিল। কেশব মৃদুস্বরে বলিলেন, "শিবনাথ, এসেছ?" সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। কেশবের প্রেম যে কি জিনিষ, শত্রুর প্রতিও তাঁহার কিরকম প্রগাঢ় প্রেম! কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিবনাথ তাঁহার লিখিত 'History of the Brahmo Somaj'এ একথা একেবারেই উল্লেখ করেন নাই।

কয়েকদিন পরেই কেশব দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ বহনকারীদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমিও একজন ছিলাম। এই আমার প্রথম শ্মশানে যাওয়া। তাঁহার মৃত্যুর পরই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মহাগণ্ডগোল, বিবাদ বিসম্বাদ। বিরক্ত হইয়া আমি তখন সাধারণসমাজে যোগ দিই। দুই বৎসর সেখানে 'Fish out of water' ভাবে থাকিয়া, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার নববিধানসমাজে ফিরিয়া আসি। এই দুই বৎসরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে বিবাহিত হই ও তাহার পর ভাগলপুরে ওকালতী আরম্ভ করি। ভাগলপুরে সাধকমণ্ডলীর (ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধু হরিসুন্দর বসু, দৃঢ় বিশ্বাসী, কর্ম্মী ও ভক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের) সংস্পর্শে আসি। ঐ খানেই বিশ্বাসী ও সেবাব্রতী বলদেবনারায়ণের সঙ্গে পরিচয় হয়। উঁহাদের সংস্পর্শে নববিধানে কথঞ্চিৎ প্রবেশ ঘটে।

কি দেখিলাম? নববিধান কিসে নূতন? দেখিলাম যে, ইহা সাম্প্রদায়িক নহে। ইহা সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। কোন ধর্ম্মকে ইহা ঘৃণা করে না, সকল ধর্ম্মের সাধু ও গ্রন্থকে ইহা আদর করে। সকল ধর্ম্মকে ইহা ইহার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করে। ইহার আদি পৃথিবীর আদি হইতে। যত ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছে, সকলেরই ঈশ্বর এক; সকল ধর্ম্ম এক, সকল মানুষ এক পরিবারভুক্ত। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির কলহ অস্বাভাবিক, ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিবাদ ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ।

নববিধান যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের সমন্বয়; একটীকেও ছাড়া যায় না। যেমন একটি তাঁবু, চারিটি খুঁটি সমানভাবে টান দিয়া বাঁধা না থাকিলে, একটি কোণ হইলে তাঁবুটি হেলিয়া বা পড়িয়া যায়; তেমনি প্রকৃতধর্ম্মে যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম সমভাবে না থাকিলে, সে ধর্ম্মেরও ঐ তাঁবুর অবস্থা হয়। নববিধানে সকল ধর্ম্মের ও সকল দেশের এবং সকল সময়ের সাধুরা সভ্য ও পরস্পর বন্ধু। সাধুদের মধ্যে বিবাদ নাই। নববিধানের যোগ ও ভক্তি নূতন রকমের। নববিধানের যোগী সহজ সরল প্রকারের যোগী, ইঁহাদের পরিবার ও সন্তানাদি আছে। ইঁহারা অস্বাভাবিক হঠযোগ অভ্যাস করেন না। নির্ম্মল চিত্ত ও বিশ্বাস অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ অনুভব করেন।

নববিধানে কেবল ঈশ্বরই গুরু। মানুষ গুরু হইতে পারেন না। মনুষ্যপূজা মহাপাপ। নববিধান ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিতে বলেন। অন্তরে ঈশ্বর যে আদেশ করেন, তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী হইলেও, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে নববিধান বলেন। পার্থিব ব্যাপারেও ঈশ্বরালোকে চলা যায়। আমি নিজে দেখিয়াছি, যে কয়েকবার বিচারকার্য্য করিবার সময়, উভয় পক্ষের উকীলদের বক্তৃতায় মোকদ্দমার বিষয়টী পরিষ্কার না হয়েছে, পাঁচ মিনিট ভগবচ্চরণে বসিয়া তাঁহার সাহায্য চাওয়ায়, সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে যে রায় দিয়াছি, তাহাতে উভয় পক্ষেরই সন্তোষ হয়েছে। নববিধানের শিক্ষা, ভক্তিকে স্থায়ী করিতে হইলে, যোগের আবশ্যক, নচেৎ ভক্তি বিকৃতরূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা। অন্যান্য কার্য্যে ও শোকের সময় তাঁহার নিকট হইতে শক্তি, ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করা যায়।

ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি একটু একটু খুলিতে লাগিল, যদিও জীবনে সব সাধন করিয়া উঠিতে পারি নাই, যদিও অন্তরে এখনও নরকের কীট, রিপু প্রভৃতির শক্তি একেবারে লোপ হয় নাই, তবু এটুকু বুঝিতেছি :—

১। ভগবান্‌কে না দেখিতে পাইলে পূজা উপাসনা সব ব্যর্থ হয়। ২। তাঁহাকে হৃদয়ে না পাইলে অকুতোভয় হওয়া যায় না। প্রাণ তৃপ্ত হয় না, প্রাণে আরাম পাওয়া যায় না। ৩। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাঁহাকে দেখা যায় না। সর্ব্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ না করিলে, প্রার্থনাশীল না হইলে, ভিতরের শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। তিনি ছাড়া একদণ্ড চলে না। ৪। দুর্ব্বলচিত্ত পাপীকেও তিনি সময়ে সময়ে দেখা দেন।

৫। নববিধান জীবনে সাধন না হইলে কিছুই হইল না। ইহার জন্য একান্ত চেষ্টা আবশ্যক। ৬। বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে ঈশ্বর-দর্শন হয় না। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। ৭। যোগ, ভক্তির প্রকৃত সাধন আবশ্যক।

কার্য্য হইতে অবসরান্তে কেশবানুচরদের সহিত আরও গাঢ় যোগ হয় এবং কেশব ও কেশবদলের পুস্তকাদি শ্রদ্ধার সহিত পাঠারম্ভ করি ও তাহার রসাস্বাদনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নববিধানে প্রবেশাধিকার জন্মিল। পরে নান্টুবাবুর সঙ্গে যোগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পুস্তক-প্রচার আরম্ভ করি এবং কেশব-প্রচার-ব্রত গ্রহণ করি। পুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদন ও প্রচার, এ সব কার্য্যে অনেকের সহানুভূতি পাই, অনেকের আবার adverse criticism মনে উদয় হয়। কেশবের শিক্ষা, "মানুষের নহে, ঈশ্বরের কথায় চল। অগ্নি জ্বালিয়া রাখ, নচেৎ মৃত্যু।" "হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি পূর্ণ বিশ্বাসী হও, ভারত কাঁপিবে।" "ঈশ্বর হইতে যে সকল সত্য পাইবে, অকুতোভয়ে তাহা প্রচার কর।" এই সকল মনে হইলে, মন আবার সতেজ হয়, ভয় চলিয়া যায়, নিরানন্দ কাটিয়া যায়। যে নববিধান হইতে জীবনের পরীক্ষায় কত বল লাভ করিয়াছি, তাহার রক্ষার জন্য প্রাণ সততই উদগ্রীব হয়; তাই যতটুকু শক্তিতে কুলায়, তাহার প্রয়াস জীবনের ব্রত স্থির করিয়াছি।

জীবনের এই সন্ধ্যা-সময়ে ভক্ত চিরঞ্জীবের অন্তরস্পর্শী এই গানটী সততই হৃদয়ে উদিত হয়:—

"দেহ-লীলা হ'ল প্রায় অবসান।
এখন নাস্যব্রত হোমাগুনে, পূর্ণাহুতি কর দান।
যা কিছু করিবার থাকে, ফেলে আর রেখ না তাকে,
কর সমাধান; ও ভাই জীবের সেবায় একেবারে
ঢেলে দাও হে মন প্রাণ।
যার যাহা আছে দেনা, দাও আর বাকী রেখোনা,
ছাড়ি অভিমান;
যেন মৃত্যুকালে শত্রু মিত্র করে আশীর্ব্বাদ দান।
ভাসায়ে জীবনতরী, মুখে বল হরি হরি, উড়ায়ে নিশান;
হয়ে মায়ামুক্ত হরি-ভক্ত, কর হরিগুণ গান।"

এই নববিধান-রক্ষার একটী উপায় হইতেছে, অনুসন্ধান করা যে, কেশবজীবনে কি ভাবে নববিধান প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ কেশব-সাধন—কেশবকে জীবনে গ্রহণ। নববিধানের গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ের হদিস পাওয়া যায়।

ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হয় না, এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। মানুষ কেবল পাপীর ভাগী। ভগবানের স্পর্শ ও তাঁহা হইতে আলোক পেলে, পাঁচ ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় হয়, উৎসাহের সঙ্গে হয়, ভয়শূন্য প্রাণে হয়, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে, আনন্দ থাকে। তাঁর স্পর্শ না পেলে, মন নিস্তেজ থাকে, এক ঘণ্টার কাজে দশ ঘণ্টা লাগে, কাজও ভাল হয় না, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, আনন্দ থাকে না, মন ভার থাকে, জীবন ভারবহ হয়। তাঁর উপাসনা ভাল রকম হলে, এ জগতের জিনিষে ক্রমে অরুচি জন্মে—দৃষ্টি পরপারের দিকে যায়। যথার্থ আনন্দ তাঁহারই চরণতলে। চিত্তের অপ্রসন্নতা, চাঞ্চল্য, অপরিষ্কৃত অবস্থা দূরের একমাত্র উপায় তাঁহার চরণস্পর্শ। সাধারণ লোকের পক্ষে এ স্পর্শ হঠাৎ হয়, স্থায়ী হয় না, সাধুদের হয়। আমার মত লোকের ইহা কখন হয়, আবার কখনও হয় না, মনের মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ চলে। একান্ত বিশ্বাস যখন আসিবে, তখন স্থায়ী হইবে, আশা হয়। মানুষের মুখ চাহিয়া কিছু না করাই শ্রেয়। মনকে আয়ত্তাধীনে রাখার সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়:—

১। এখন হইতে নববিধানের গ্রন্থাদি পাঠের জন্য ক্লাস খোলা ও তাহাতে নিয়মিতভাবে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা ও বুঝিবার চেষ্টা করা।

২। কয়েকজনের নববিধান-সাধন-ব্রতগ্রহণ।

৩। ঐকান্তিকভাবে কয়েকজনের উপাসনা-সাধন আরম্ভ করা এখন হইতে।

৪। কি ভাবে শতবার্ষিকী করা হইবে, তাহার আলোক অন্বেষণ।

৫। নূতন পুস্তক প্রকাশ ও পুরাতন পুস্তক পুনর্মুদ্রণ।

৬। নববিধানের গ্রন্থাবলী প্রচার করা, বিক্রয় করা, বিতরণ করা।

—•—

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব

কার্য্যবিবরণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬ই মাঘ, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় মহর্ষির জীবন সম্বন্ধে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক কিছু কিছু বলেন। মহর্ষি সম্বন্ধে আচার্য্য দেবের উক্তিও পঠিত হয়। মহর্ষিদেব এবং কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ এক অদ্ভুত দৈব সম্বন্ধ। মহর্ষিদেব বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নামে প্রবর্ত্তন করেন এবং একটী অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ গঠন করিয়া বৈদান্তিক উপাসনা ও অনুষ্ঠান সাধনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে, মহর্ষি তাঁহাকে পুত্রবৎ আদরে গ্রহণ করেন। উভয় উভয়কে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক প্রেমে ভালবাসিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও, সে প্রেম-যোগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও কেমন করিয়া ধর্ম্মবন্ধুদিগকে ভালবাসিতে হয়, তাহার নিদর্শন

উভয়েই দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের চির উন্নতিশীল সর্ব্বসমন্বয়কারী হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেরিত আচার্য্য জানিয়া, ঈশ্বরের আদেশে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন এবং 'ব্রহ্মানন্দ' নামে অভিহিত করেন। আচার্য্যপত্নীকেও আপন কন্যাবৎ আদর অভ্যর্থনা করিয়া 'ব্রহ্মনন্দিনী' নাম দান করেন। ব্রহ্মানন্দের ঈশ্বর প্রেরিতত্বে মহর্ষিদেব বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁহাকে আচার্য্যপদে বরণের পর ব্রাহ্মসমাজের যাহা কিছু উন্নতি, তাহা কেশবচন্দ্রেরই গুণে, ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে, ২৫ বৎসরের পর যাহা কিছু কার্য্য, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই বলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় যে বর্ত্তমান ঈশ্বর-প্রেরিত নববিধান, তাহা কেশবচন্দ্রই ঘোষণা করেন।

৭ই মাঘ, আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব হয়। শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী মল্লিকা দেবী আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। শান্তিকুটীরে মহিলাদিগের প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ডাঃ জ্যোতিলাল সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী পুনর্নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেনকেও অতিরিক্ত সম্পাদকরূপে গ্রহণ করা হয়।

৮ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে যথারীতি উপাসনা হয়, এবং কেশব একাডেমীতে উৎসব হয়, তথায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তন-যোগে উপাসনা হয়। এবারকার সংকীর্ত্তনে কয়েকটী বালিকাও মধুরকণ্ঠে সংকীর্ত্তনে সহযোগিতা করেন। নববিধান সংকীর্ত্তনের বিধান। পবিত্র প্রেম-যোগে, সঙ্গীত-সুর-লহরীসহকারে উপাসনা-সাধন বিশেষ ভক্তি-যোগের উন্মাদনা আনয়ন করে। সাধক সাধিকাগণ কেবল সংগীতের মাধুর্য্য অপেক্ষা, ভক্তি-যোগসাধনায় যদি এই সংকীর্ত্তনোপাসনা সাধনের বিষয় করেন, ইহা বিশেষ আধ্যাত্মিক ফলপ্রদ হয়। বহুসংখ্যক সাধক সাধিকা এই উপাসনায় যোগদান করেন।

৯ই মাঘ, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ৭টা হইতে কীর্ত্তনে মহা উৎসবের উদ্বোধন হয়। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ভাবযোগে কীর্ত্তন করেন। প্রাতে ৮॥টায় প্রাতঃকালীন উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। এবেলার উদ্বোধন, আরাধনা এবং উপাসনার সারমর্ম্ম এই:—"জীবন্ত মার ক্রোড়স্থ চিরজীবিত এবং নববিধানের ঈশ্বর-নিয়োজিত চির আচার্য্য ব্রহ্মানন্দসঙ্গযোগে, সমগ্র বিশ্বমানবমণ্ডলীর সহিত ব্রহ্মোৎসব-সম্পাদনের জন্যই আমরা আজ আহূত। ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ-প্রভাব অধ্যাত্মযোগে দর্শন বা উপলব্ধি দ্বারায় এই মহোৎসব ঘনীভূত ভাবে সাধিত হয়। ব্রহ্ম স্বয়ং যেমন মাতৃরূপে বর্ত্তমান যুগে নববিধানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি মানবসন্তানকেও ক্রোড়ে লইয়া তেমনই সসন্তানে আবির্ভূত। যাঁর সন্তান না হইয়াছে, তিনি কখনও মা নামে অভিহিত হইতে পারেন না; তেমনই অনন্ত মা তাঁর অমর সন্তানকে ছাড়িয়া কখনই থাকেন না এবং সন্তানও জীবনের জীবন মার গর্ভে চিরজীবিত। তাই নববিধানে জীবন্ত মা চিরজীবিত সন্তানকে লইয়া নিত্য বিরাজিত। মাকে বিশ্বাস করিতে হইলে সন্তানকেও বিশ্বাস করিতে হয় এবং সন্তানকে ছাড়িয়া যেমন মা থাকেন না, সন্তানও তেমনি যেখানে যত মানবসন্তান, তাহাদের ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবে? তাই একদিকে নববিধানাচার্য্য যেমন মাতৃযোগে যুক্ত এবং জীবিত, তেমনই বিশ্বমানব সঙ্গে ভ্রাতৃযোগে এক অখণ্ড মানবাদর্শরূপে মূর্ত্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে একেশ্বরের উপাসনায় তাঁহার পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্মের অপর অঙ্গ মানবের ভ্রাতৃত্ব বিশেষ ভাবে সংসাধিত হয় নাই; কেন না যাঁহারা মানবাদর্শরূপে প্রেরিত হইলেন, তাঁহারাও ঈশ্বরবোধে পূজিত হইলেন। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই প্রমাণিত হইল। তাই বর্ত্তমান যুগে বিধাতা যে মানবধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিলেন, তাহাতে মানবের ভ্রাতৃত্ব বা অখণ্ড মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ প্রেরিত। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ঈশ্বর-প্রেরিতগণকে মানবজাতির প্রতিনিধিরূপ মানবাদর্শরূপে শুধু বরণ করিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের আত্মসমাগম সাধন করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ দেবচরিত্র যেমন আত্মস্থ করিলেন, তেমনই সকল পাপী মানবকেও আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রহণ ও স্বীকার করিলেন এবং সকল মানবের সঙ্গে একাত্মে নববিধান-সাধনায় কেমন করিয়া নূতন মানুষ হইতে হয় বা এই মানবজীবনে দ্বিজত্ব লাভ করিতে হয়, তাহারই আদর্শ দেখাইলেন।

জীবনের জীবন, জীবন্ত মাকে পূজা করিয়া, আমরা যদি এ জীবনে নববিধানের নবজীবন লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হই, তাহা হইলে কেশবচন্দ্র নববিধানে যে সেই জীবন লাভ করিলেন এবং তদ্দ্বারা আশা দিলেন, আমরা যদি তাঁহার সহিত সমযোগে সাধন করি, আমরাও তেমনি দ্বিজত্ব লাভ করিব। এই জন্যই বিধাতা স্বয়ং তাঁহাকে নববিধানের আদর্শ জীবনে গঠন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। তিনি যে মাকে মা বলিয়াছেন, সেই মাকে মা বলিয়া, তাঁহার সহিত এক হইয়া, আমরা যেন এক অখণ্ড মানবত্ব প্রাপ্ত হই এবং তদ্দ্বারা আমরা যেন তাঁহার শতবার্ষিকী জন্মযজ্ঞ সাধনের উপযুক্ত হই। উপাসনার প্রথমাংশ শেষ হইলে, আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও জামাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের পৌত্রদ্বয় নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার্থীদিগকে উপদেশ

দিয়া, ভাই প্রিয়নাথ নববিধানের নিশানপ্রদানকালে বলেন—তোমরা একদিকে যেমন কোচবিহারের রক্ত মাংসে, তেমনই আর একদিকে নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মনন্দিনীর অংশে জন্ম লাভ করিয়াছ। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং তোমাদিগকে এই নববিধানের নিশান দিতেছেন, বিশ্বাস কর। তিনি বিশ্বমানব-ত্রাতা হইয়া, তাঁহার সমাযাগ এবং আত্মার সহায়তা দিয়া, তোমাদিগকে এই মহাব্রতপালনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ বলিলেন, কেশব ষ্টীম বোট, তাহার সঙ্গে যাহাদের জীবনবোট গাঁথা হয়, তাহারাও উজান স্রোতে ভাসিয়া গম্য স্থানে যায়। এই দীক্ষাগ্রহণে দ্বিতত্ত্ব লাভ হয়, তোমরাও মা'র কৃপায় সেই দ্বিজত্ব লাভ কর এবং নববিধানের নিশান-বহনে সংসারের সকল রিপুকুল বিনাশ করিয়া নবজীবনলাভে ধন্য হও। কেশব একদিন স্বয়ং আমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তোমাদের সঙ্গে আমরাও আজ নবদীক্ষা লাভ করিয়া নবজন্মলাভে ধন্য হই, সসন্তানে মা এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্লোকপাঠান্তে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ আচার্য্যের উপদেশ 'আমার আচার্য্যপদ ঈশ্বরপ্রদত্ত, মানবপ্রদত্ত নহে' এবং প্রার্থনা 'আত্মপরিচয়' আবৃত্তি করেন। প্রার্থনানুসরণে ভাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচনোচ্চারণ করেন। উপাসনান্তে শান্তিকুটীরে প্রীতি-ভোজন হয়।

পরে ৩টার সময় ভাই অখিলচন্দ্র রায় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা করেন। পরে পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ধ্যানের উদ্বোধন করিলে কিছুক্ষণ ধ্যান হয়। পরে সন্ধ্যায় বিধানমুরলীর নেতৃত্বে উন্মত্ত সংকীর্ত্তন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু সন্ধ্যায় উপাসনা করেন। তিনি উপদেশে বিশেষ ভাবে বলেন, প্রাতে যে জীবন্ত আচার্য্যের কথা বলা হইল, সত্যই কি তিনি এই মণ্ডলীতে এখনও জীবন্ত আছেন, ইহা আমাদের চিন্তা ও সাধনার বিষয় হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

৯ই পৌষ প্রাতে উপাসনা, সায়ংকালে শ্রীঈশার জন্মোৎসবের প্রারম্ভিক সাধনা, সমাধিচত্বরে আলো দেওয়া হয়, মন্দিরে আরতির প্রার্থনা ও আরতির কীর্ত্তন হয়।

১০ই পৌষ সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা. এ সেবককেই উপাসনার কার্য্য করিতে হয়। আজ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশার চরিত্রের উচ্চভাব প্রতিভাত হয়।

১১ই পৌষ প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরেই বন্ধু-সম্মিলন। আমাদের বিনীত আহ্বানে স্থানীয় অনেকগুলি বাঙ্গালী-ভদ্রলোক ও বালকবালিকাগণ সমবেত হন। প্রথমে সংগীত, তৎপরে এখানে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভাগমনে কেমন ভক্তির প্রবাহ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ সেবক কর্ত্তৃক বর্ণিত হয়। স্থানীয় জজ আদালতের এডভোকেট বাবু তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গীতায় একেশ্বরবাদ ও নিরাকারতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার যেমন ভক্তিবিগলিতভাব, তেমনি ভাষার লালিত্য। তিনি স্পষ্টই প্রমাণ করেন, নিরাকার ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য এবং তাঁতে বিশ্বাস ও ভক্তিই মুক্তির উপায়, শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহাই জীবনে দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধপাঠের পর আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "মার সহিত কথোপকথন" বিষয়টি এ সেবক কর্ত্তৃক পঠিত হয় ও শেষে একটী বালিকা সংগীত করিলে জলযোগান্তে বন্ধুসম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। পুনরায় সন্ধ্যার পর রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনা ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে 'ব্রহ্মস্পর্শ' উপদেশটি পঠিত হয়।

১২ই পৌষ, সন্ধ্যাকালে যথাবিধি শান্তিবাচনের প্রার্থনাদি হয়। পরদিন ১৩ই পৌষ অপরাহ্নে ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও সংগীত এবং প্রসঙ্গ বেশ জমাট হইয়াছিল। একনিষ্ঠ সাধক ভক্তিতীর্থবাসী স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বাগচির প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বাগচি সাঙ্গোপাঙ্গ কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গ করিয়া উৎসবের আহ্লাদকে জমাট করিয়া তোলেন। আজ অনেকগুলি ভক্তিপিপাসু বন্ধু উৎসব-মন্দিরে সমবেত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে উৎসব

উৎসবের প্রথম চারিদিন কার্য্যপ্রণালীর সবগুলিই তীর্থবাসী বন্ধু ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্ত সপরিবারে সম্পন্ন করেন; তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী নীহারিকা সুললিত কণ্ঠে সময়োপযোগী সংগীত করিয়া বেশ জমাট করেন। ৮ই পৌষ, অপরাহ্নে সমাজের অন্তর্গত ভুক্ত দীননাথ শিক্ষাতীর্থের ছাত্র ছাত্রীরা সংগীত করে; তারপর তাহাদিগকে সহজ ভাষায় "ঈশ্বর নিরাকার এক অদ্বিতীয় ও বিবেকের বাণীই সত্য ধর্ম্ম, সমস্ত মানব একজাতি" বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শেষে একটী বালিকা সংগীত করিলে, পরে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন দিয়া পরিতুষ্ট করা হয়।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বৃহস্পতিবার (২৩শে ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন। শুক্রবার (২৪শে ডিসেম্বর) প্রাতে উলটাডাঙ্গা বাজার হইতে নগরসংকীর্ত্তনদল মন্দিরে আসিলে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। তৎপূর্ব্বে সমস্বরে বৈদিক মন্ত্রের আবৃত্তি করা হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়ের সভাপতিত্বে, উলটাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা স্বর্গীয় কানাইলাল

সেনের স্মৃতিসভা হয়। অপরাহ্নে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবতরত্নের সভাপতিত্বে সর্ব্বধর্ম্মসম্মিলন হয়; শ্রীমৎ আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত নলিনী লাহেড়ী হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল ভক্তিবিনোদ শিখধর্ম্ম বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী রাও জীবে দয়া সম্বন্ধে, মৌলানা কাজি ইসরারী মুসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী আর্য্যসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শনিবার (২৫শে ডিসেম্বর) প্রাতে মুরারীপুকুর রোডে উষাকীর্ত্তনের পর, মন্দিরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিনের সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ স্বামী নির্ব্বেদানন্দ অদ্বৈত বেদান্ত বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর থিয়সফি (তত্ত্ববিদ্যা) বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ভক্তিবাচস্পতি বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী রাও জৈনধর্ম্ম বিষয়ে এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলনে উভয়দিনই মন্দির জনতাপূর্ণ হয়। রবিবার (২৬শে ডিসেম্বর) প্রাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন, পরে সভ্যগণের বার্ষিক সভা হয়। অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও শান্তিবাচনের পর উৎসব শেষ হয়।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৬রা মার্চ্চ, শ্রদ্ধেয়া মণিকা দেবী তাঁহার স্বামী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাদের গৃহে ৪৫নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করেন। শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং মণিকা দেবী আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করিয়া, নিজের প্রার্থনাও ভগবচ্চরণে নিবেদন করেন।

শুভবিবাহ—গত ২০শে ফাল্গুন, (৪ঠা মার্চ্চ), আলিপুরে, ২৮নং নিউ রোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণার সহিত, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল কাণ্ডগীরের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুধীরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

রঙ্গপুর-নিবাসী স্বর্গীয় রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্ম্মলেন্দুর সহিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের চতুর্থ কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কল্যাণীর শুভপরিণয় গত ২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ্চ) শনিবার, বালীগঞ্জে ৬।৭।১ একডালিয়া রোডে, সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ নবদম্পতিযুগলকে শুভাশীষ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৩ই মার্চ্চ, ঢাকা বিধানপল্লীস্থ "পদছায়া" ভবনে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায়ের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক যথাযোগ্যভাবে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানের প্রথমে পবিত্র ভস্মস্থাপনানুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হয়। "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" সংগীত করিতে করিতে ভস্মাধার সহ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ সংহিতার প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর ভস্মাধার যথাস্থানে রক্ষিত হয়। উপস্থিত প্রায় সকলেই শ্রদ্ধাভক্তির চিহ্ন-স্বরূপ পুষ্পাঞ্জলি তাহাতে অর্পণ করেন। প্রাঙ্গণস্থ সামিয়নাতলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। সকলে উপবেশন করিলে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভক্তিভাজন ভাই চন্দ্রমোহন দাস আরাধনা করেন, উদ্বোধনাদি অন্যান্য অংশ ভাই অক্ষয়কুমার লধ সম্পন্ন করেন। কলিকাতার শ্রীমান্ সমীরচন্দ্র দত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠে সংগীত করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী ভক্ত পিতার সুন্দর জীবনী পাঠ করিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায় ভ্রাতৃগণসহ দণ্ডায়মান হইয়া নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, বন্ধুবান্ধবগণ অনেকেই উপস্থিত হইয়া ভক্ত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ বিবিধ সৎকার্য্যে, ব্রাহ্মসমাজে এবং দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থ ৫০০৲ টাকা এবং 'বিধান-সঙ্গীত' পুস্তক পুনঃ প্রকাশের জন্য স্থায়ী ফণ্ড রূপে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। দিগ্‌বাজারের দাসমণ্ডলী সঙ্গীত পুস্তক ফণ্ডে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রাদ্ধবাসরে "বিধান-সঙ্গীত" পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। এইদিনে সমযোগ রক্ষা করিয়া কলিকাতায় নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সমযোগে উপাসনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত ভক্ত আত্মাকে স্বর্গধামে ভক্তশিশুদলে স্নেহক্রোড়ে নিত্য শান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজন-গণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা ফাল্গুন, বালীগঞ্জে, ৪৩নং ফার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুর ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিকে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, বাণীবনের স্বর্গীয় ডাঃ এককড়িসিংহ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জামাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়-চন্দ্র সেনের বালীগঞ্জস্থ ভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। কন্যাদ্বয় শ্রীমতী সুষমা দাস এবং শ্রীমতী সুরমা সেন সমযোগে দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবারদিগের সাহায্য ফাণ্ডে ১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীযুক্তা সরস্বতী সেন স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ৪৪নং নিউথিয়েটার রোডস্থ গৃহে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করেন। শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী স্বর্গীয় আত্মার সদ্‌গুণ উল্লেখ করিয়া হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে খাঁটুরায়ও উপাসনা ও স্মৃতিসভা হইয়াছে।

গত ৮ই মার্চ্চ, পাটনায়, "ঋষি কেদারনাথ ধর্ম্মগ্রন্থাগার" গৃহে, প্রেরিত-প্রচারক স্বর্গীয় কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। সমবেত ভাই ভগ্নীগণ এই পুণ্যস্মৃতিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে ঋষি আত্মার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মারাধনা করিয়া স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করেন। অদ্য কলিকাতায় ২৩।১ডি ফার্ণ রোডে, শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাস এবং খাঁটুরায় সমাধিতীর্থে মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দে ৫৲ এবং দৌহিত্রী শ্রীমতী শান্তি ৫৲ টাকা দান করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৭৩ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
১৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
30th. March, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে ভূমা মহান্, কে আর তোমার সমান? কেই বা পায় তোমার সন্ধান? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য আকাশে তোমারই সন্ধানে যেন ভ্রমণ করিতেছে। কে কবে তোমার নিরূপণ করিতে পারিয়াছে? কত যোগী, কত ঋষি, কত মানবাত্মা তোমায় নিরূপণ করিবার জন্য, তোমার সন্ধান পাইবার জন্য সংসার ছাড়িলেন, গিরিগুহার আশ্রয় লইলেন, সর্ব্বত্যাগী হইলেন, তবুও কই তোমার দর্শন লাভ করিতে পারিলেন? তোমায় দেখা যায়, তোমার কথা শোনা যায়, তোমায় ধরা যায়, কই কে তেমন বলিতে পারিলেন? জ্ঞানাভিমানে, কষ্ট-সাধ্য সাধনে, পুরুষকার-প্রচেষ্টায় কে তোমায় পায়? ধন্য তোমার কৃপা! তুমি বর্ত্তমান যুগে কলির সংসারাসক্ত পাপপ্রবণ, আমাদের মত জ্ঞানবিহীন সাধনাবিহীন, দীন দুঃখী মানবকে আপনি দেখা দিবে বলিয়া, নববিধান লইয়া মাতৃরূপে প্রকট হইয়াছ। আমাদের অন্তরেও তুমি স্বয়ং কথা কহিয়া, আমাদিগকে জীবনপথে পরিচালিত করিতে চাও। তুমি স্বয়ং জীবনদাতা হইয়া যেমন আমাদিগকে মানব-জন্ম দিয়াছ, তেমনই আমাদের ন্যায় এক মানব-সন্তানকে তোমার সাক্ষিরূপে গঠন করিয়াছ। তুমি স্বয়ং শ্রীকেশবচন্দ্রকে এই কলির মানবকুল হইতে বিশেষভাবে মনোনীত করিয়া, কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তাহা শিখাইলে—তোমাকে কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হয়, অন্তরে কেমন তোমার বাণী শুনিয়া জীবনে প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, সংসারে থাকিয়া সংসারের প্রত্যেক কর্ত্তব্য তোমারই আদেশে এবং প্রেরণায় পালন করিতে হয়, তুমি জীবন্ত গুরু হইয়া সকলই শিখাইলে। তোমার উপাসনা এবং প্রার্থনা অবলম্বনে যোগ ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানের উচ্চ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাও দেখাইলে। তাই তিনি আশা দিয়া বলিলেন, 'আমার ন্যায় অধম আর কে হইবে? এই আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলকার আশাপ্রদ। আমার কি না হইয়াছে? আমি কালো বাঙ্গালী, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুই তুলনা হয় না, কিন্তু আমার জীবনে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। নারকী উদ্ধার হয়, ইহা যদি দেখিতে চাও, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ।' বাস্তবিক তোমার কৃপাগুণে যে কি আদর্শ মানবজীবন হয়, তাহা তুমি শ্রীকেশব-জীবনে দেখাইয়াছ। তিনি তোমার জীবন্ত প্রেরণায় বলিলেন, 'যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে স্পর্শ করেছে, সে বলিতেছে, অবিশ্বাস করিও না।' মা, তুমি যে অনন্ত কৃপাগুণে আমাদের ন্যায় পাপপ্রবণ মানুষকেও তোমার নববিধানে নূতন মানুষরূপে গঠন কর,

তাহার দৃষ্টান্ত তুমি যদি কেশবজীবনে দেখাইলে, তবে আমরা কেন না পুরুষকারসাধ্য সাধনার আন্দাজী পথ পরিহার করিয়া এই আদর্শ গ্রহণ করিব? যাহা একজন মানুষের জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা মানবমাত্রেরই জীবনে সিদ্ধ হইবে, ইহা কেন না বিশ্বাস করিব? আশীর্ব্বাদ কর, আমরা আমাদের পুরুষকার অহংকার ত্যাগ করিয়া, তুমি যে আমাদের নববিধানের সহজ পথ দেখাইলে এবং যাহা শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনে সপ্রমাণ করিলে, তাহা যেন অনুসরণ করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, আমরা পুরুষকারসাধ্য সাধনার পথে গিয়া, কতই কল্পনা ও আন্দাজে বিচারবুদ্ধির পথে ধাবিত হইতেছিলাম, তুমি তোমার কৃপাগুণে নববিধানের সহজ পথ খুলিয়া দিলে, যে বিধানে তুমি সকল ধর্ম্ম মিলাইলে, সকল সাধনার সামঞ্জস্য করিলে, পুরুষকার ও আনুগত্যের সমন্বয় করিলে এবং ইহা এক মানবজীবনের অভিজ্ঞানে সপ্রমাণ করিলে। তুমি স্বয়ংই শ্রীকেশবচন্দ্রকে নববিধানমূর্ত্তিমান করিয়া আমাদের ধর্ম্মবন্ধুরূপে প্রেরণ করিলে। আমাদের ন্যায় কলির নরনারীদিগকে পরিবর্ত্তিত নবজীবন দেবার জন্য যখন নববিধান বিধান করিয়াছ, তখন যেন আমরা তোমার নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসী হই এবং শ্রীকেশবচন্দ্রকে তোমারই প্রেরিত ধর্ম্মবন্ধুরূপে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার সঙ্গ সহযোগে এই নববিধানসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

কেশব-জীবনবেদ

শ্রীকেশবচন্দ্র আত্মজীবনকে জীবনবেদ বলিয়া অভিহিত করিলেন। এ মানবজীবন জীবনদাতা ভগবানেরই আত্মদ্যোতক। আত্মজ্ঞানে মানবমাত্রেই নিজ নিজ জীবনকে স্বয়ং বিধাতার হস্তগঠিত গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিবে, ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি আত্মজীবনকে প্রত্যক্ষ বিধাতার হস্তরচিত জীবনবেদ বলিয়া উপলব্ধি করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিলেন, "হে বেদব্যাস, তুমি অনেক বেদ লিখিয়াছ। তুমি জীবনবেদ যেমন লিখিয়াছ, এমন শাস্ত্র আর কৈ? তুমিই লিখিয়াছ, তুমিই বুঝাইতে পার। ইহার অক্ষরগুলি দেবাক্ষর, স্বর্ণাক্ষর। ইহার শিষ্য হইয়া আমিও পড়ি, সকলেও পড়ুন। এই জীবন-গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন নিজ জীবন সম্বন্ধে বলিলেন, তেমনি প্রত্যেকেই আমরা নিজ নিজ জীবনকে জীবনবেদ-রূপে গ্রহণ করিব। যিনি বিশেষ ভাবে নিজ জীবনকে জীবনবেদ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, সে জীবনে বিধাতা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত শিষ্য হইয়া যেন আমরা অধ্যয়ন করি এবং তদনুরূপ জীবনে গঠিত হইতে আকাঙ্ক্ষিত হই।

শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবন এই জন্যই বিশেষ ভাবে প্রেরিত; শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের শিক্ষা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা জীবন চরিত্রে অঙ্কিত করিব। সেই ভাবে যেন আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনবেদ কেবল অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত না হই, কিন্তু অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হই। বর্ত্তমান যুগে মানুষের মতন মানুষ বা আদর্শ মানুষ কেমন হয়, তাহাই শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনে ভগবান দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক মানবজীবন কেমন করিয়া প্রকৃত আদর্শ মানবত্বে গঠিত হয়, তাহাই শ্রীকেশবজীবন-বেদের শিক্ষা।

শ্রীকেশবচন্দ্র হিন্দু বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, ধর্ম্মপরায়ণা মাতৃদেবার গর্ভ হইতে ধর্ম্মপ্রাণতা লইয়া তাঁহার জন্ম। যখন তিনি অতি শিশু, এক বিগ্রহ-মূর্ত্তি অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? ভক্তি-বিগলিত-ভাবে শিশু কেশব উত্তর দিলেন, ইহার ভিতর যে বস্তু আছে, তাই দেখিতেছি। ইহা হইতে বুঝা যায়, সাকারের ভিতর নিরাকারদর্শনের আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং বিধাতা তাঁহার প্রাণে নিহিত করিয়া দেন।

তিনি আত্মনিবেদনে পরে বলেন, "যখন পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া গেল, একজন জীবন্ত ঈশ্বরের দরকার হইল। কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখিব, ব্যাকুল হইলাম। প্রথম তেমন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু মনে হইল, তিনি যেন হাসিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দর্শন উজ্জ্বল হইল। ছাতে ঘরে যখন তখন তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।"

এইরূপ সহজ বিশ্বাসে শ্রীকেশবচন্দ্রের ঈশ্বরদর্শন এবং বিবেকের বাণীর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বাণী-শ্রবণ সহজ হয়। তিনি এজন্য কোন প্রকার অস্বাভাবিক

সাধন অবলম্বন করেন নাই। যেমন ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁহার বাণীশ্রবণে সহজ বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাঁহার মনে প্রশ্ন আসিল, কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিব? তখনই তাঁহার প্রাণে দৈববাণী আসিল, "প্রার্থনা কর"। কেশবচন্দ্র বলেন, "কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, কি বলিয়া প্রার্থনা করিব, কিছুই জানিতাম না। ভিতরকার বাণী কেবল বলিল, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করিলেই সকলই পাইবে। তোর বইও নাই, শাস্ত্রও নাই, তোর কিছুই নাই, কেবল প্রার্থনা কর।" ভাষা নিবন্ধ করিয়া প্রার্থনা করিতে জানিতেন না, যাহা মনে আসিত, তাহাই কোন রকমে লিখিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন; যাহা কিছু জীবনের ধর্ম্মোন্নতি, সকলিই হইল এই সরল ব্যাকুল জীবন্ত প্রার্থনার ফলে।

শিশু যেমন জন্মগ্রহণ করিয়াই ক্রন্দন করিতে শিখে এবং ক্রন্দনের ফলে যেমন তাহার শরীরের পরিপুষ্টি হয় এবং মাতার অনুকম্পা ও স্নেহফলে দেহ মনের সুগঠন হয়, শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রার্থনা-শিক্ষাও তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের পুষ্টির পক্ষে ঠিক সেইরূপ। তিনি বলেন, "প্রার্থনা করিতে করিতে দুর্জ্জয়বল লাভ করিলাম; কি মনের বল, প্রতিজ্ঞার বল, সকলই লাভ হইল প্রার্থনার বলে। পাপকে ঘুসি দেখাইতাম ও প্রার্থনা করিতাম। প্রার্থনা মানি বলিয়া জীবন যাহা তাহা।" বাস্তবিক একমাত্র সরল ব্যাকুল প্রার্থনার বলে তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের দর্শন পাইলেন এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণ করিতে শিখিলেন এবং তাঁহার জীবনে যাহা কিছু লাভ হইবার সকলই হইল। তাহার প্রার্থনা কেবল মুখের প্রার্থনা নয়, প্রার্থনা করিয়া তাহার উত্তর না লইয়া তিনি ছাড়িতেন না; এইরূপে প্রত্যাদেশলাভ তাঁহার সহজসিদ্ধ হয়। তিনি কোন কাজ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বাণী না শুনিয়া করিতেন না। প্রার্থনা হইতেই তাঁহার এই সাধন-সিদ্ধি হয়।

তাঁহার ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, ভাষা নিবন্ধ করিয়া আমি দুটি কথা লিখিতে পারিতাম না। কিন্তু সহজ জ্ঞানে ও প্রার্থনার বলে এমনই ভাষা-জ্ঞান তাঁহার লাভ হয় যে, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের নিকট বলিয়াছেন, কেশবের বাঙ্গলা শিখিতে আমি ব্রহ্মমন্দিরে যাই। এমন ভাষা না বলিতে পারিলে "বাঙ্গালীর উদ্ধারের আর উপায় নাই"। শ্রীকেশবচন্দ্রকে প্রতাপচন্দ্র একবার জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেমন করিয়া এমন বাঙ্গালা বল, তুমি কখনও বাঙ্গালা শিক্ষা কর নাই। ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলেন, "কেমন করিয়া আমি বাঙ্গলা বলি, আমি জানি না, যা আসে, তাই বলি; তা ভাল বাঙ্গলা হয়, কি কি হয়, আমি বলিতে পারি না।" সহজ বাঙ্গলা ভাষায় সমুদায় উপদেশ তিনি দিয়াছেন; বিশেষ ভাবে যোগভক্তি-বিষয়ক গীতোপনিষদ্রূপ এমন উচ্চ তত্ত্বকথাও এত সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় সবার বোধগম্য-রূপে যে বলা যাইতে পারে, তাহা কেহ জানে না। তাঁহার ইংরাজী বাগ্মিতাও সত্যই অতুলনীয়। ইংরাজ সম্পাদকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার বাগ্মিতা 'সিসিরের' ন্যায়। এবং "তিনি যাহা বলেন, জগজ্জন তাহা শ্রবণ করিয়া ধন্য হয়।"

এই সরল প্রার্থনা করিতে করিতে প্রথমে তাঁহার পাপ-বোধ উদ্দীপন হইল; অর্থাৎ যেমন তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইল, আত্মজ্ঞান লাভ হইল, ভিতরে যে সকল মানবীয় দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা লুকায়িত ছিল, তাহা ধরা পড়িল। সামান্য পাপের সম্ভাবনাকেও তিনি ভয়ানক দেখিলেন। কাজে কর্ম্মে কথায় ব্যবহারে আমরা যে সকল অন্যায় অপরাধ করি, তাহাকেই আমরা পাপ বলিয়া থাকি; কিন্তু কেশবচন্দ্র পাপের সম্ভাবনাকেও পাপ বলিয়া, নিজেকে পাপীর সর্দ্দার মনে করিলেন এবং সুনীতি ও শুদ্ধতা তাঁহার জীবনের অন্ন পান করিলেন। মানবীয় অপূর্ণতা হইতেই পাপের উৎপত্তি; এই তীব্র পাপ-বোধ হইতেই, তাঁহার পাপ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও জীবনে উন্নতি-লাভে ব্যাকুলতা উদ্দীপন হইল।

প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ হও; কেশবচন্দ্রের প্রাণে পাপ-বোধ হইতে জীবনের অনন্ত উন্নতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। ইহা হইতে তাঁহার যেমন পাপের জ্বালা হইত, তেমনই তাঁহার প্রাণ সে বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য ছটফট করিত এবং যেমন ছটফট করিত, তেমনি তিনি আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতেন। এই প্রার্থনায় তাঁহার আত্মশক্তিলাভ হইত এবং এই প্রার্থনা তাঁহার প্রাণে অগ্নিময় উৎসাহ প্রজ্বলিত করিত।

বিধাতা যেমন তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন, যেমন তাঁহাকে স্বয়ং গুরু হইয়া আত্মজ্ঞান দিলেন ও অগ্নিময় তেজে পাপদমনে দৃঢ়সংকল্প করিলেন, অমনি তাঁহাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। জীবন্ত ঈশ্বর শ্রীকেশবের ধর্ম্ম দীক্ষা-গুরু। যেমন শাস্ত্রে প্রথা আছে, যখন কোন ব্রাহ্মণসন্তান দীক্ষা গ্রহণ করেন, হোমাগ্নিতে তাঁহার রিপুকুল ভস্ম করিয়া, তাঁহাকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণরূপে উপবীত গ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বয়ং তেমনি

কেশবচন্দ্রকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া, অগ্নিময় উৎসাহে এবং তেজে তেজস্বী করিলেন। নিস্তেজ ভাব, নিরুৎসাহ ও নিরাশার ভাব, শীতল মানবীয় হিসাব নিকাশ করিয়া চলার ভাব একেবারে তাঁহার তিরোহিত হইল।

অগ্নির উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা যেমন সমস্তদিন সর্ব্বক্ষণ গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখেন, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র অন্তরে সেইরূপ সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন। অগ্নিই জীবন, উত্তাপ-হীনতাই মৃত্যু; তাই তিনি অগ্নিময় উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন।

ইহা হইতেই তাঁহার কর্ম্মোদ্যম। এক দণ্ড তিনি সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বাল্যকালে খেলা ধূলাতেও তিনি নিত্য নূতন নূতন খেলা উদ্ভাবন করিয়া খেলা ধূলা করিতেন। একটার পর আর একটা অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, দেশসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার ইত্যাদি সকলই তাঁহার এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার ফল। ইহা হইতে নিত্য নব নব উৎসবসাগরে জীবনে ও সমাজে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। অগ্নির অভাব যেখানে, মৃত্যু সেখানে। তাই তিনি যেমন মৃত পুত্তলিকা ত্যাগ করিলেন, তেমনই মৃত শাস্ত্র, মৃত ধর্ম্ম, মৃত মন্ত্র, মৃত অনুষ্ঠান, মৃত সংস্কার, সব বর্জ্জন করিয়া, সবার ভিতর জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত প্রভাব সঞ্চার করিলেন এবং মৃত দেবদেবীদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহাদের ভিতরে হইতে জীবন্ত ঈশ্বরকে বাহির করিলেন।

এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা হইতেই সংসারে অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য সাধন করিলেন। যেখানে পাপের প্রলোভন আছে, যেখানে কাম, ক্রোধাদি বাঘ ভাল্লুক বাস করে, বৈরাগ্যের অনল জ্বালিয়া সংসার-অরণ্যে সে বাঘ ভাল্লুক তাড়াইয়া দিলেন এবং ক্রমে বৈরাগ্যবলে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের কৃপাবলে এই সংসার-অরণ্যকে স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত করিলেন এবং মার চরণ-কমলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, সস্ত্রীক সপরিবারে মার প্রেমপরিবার, যোগী পরিবার রচনা করিলেন। স্ত্রীর অধীন বা স্ত্রৈণ না হইয়া, সংসারে নিষ্কামধর্ম্ম সাধনা ও প্রতিষ্ঠা করিলেন।

একদিকে যেমন তাঁহার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা, আর একদিকে চির স্বাধীনতা তাঁহার জীবনে মহাব্রত। তিনি জীবন্ত ঈশ্বরকে একমাত্র প্রাণের ঈশ্বর, জীবনের ঈশ্বর বলিয়া চির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; তাই আর কাহারও দাসত্ব করিতে চান নাই। এমন কি নিজের আমিত্বেরও অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাই কোন সম্প্রদায়, ধর্ম্মমত, শাস্ত্র, সাধন, গুরু, এমন কি কোন মহা-পুরুষেরও পূর্ণ দাসত্ব করাকে অপরাধ ও পাপ মনে করিতেন। অপরদিকে স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিনয়, আত্মম্ভরিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। দেশানুরাগ এবং রাজভক্তি প্রকৃত স্বাধীনতালাভের উপায়রূপে সমন্বিতভাবে সাধন করিয়াছেন।

বিবেক তাঁহার অতি প্রবল। বিবেকের বাণী ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেই বাণী না শুনিয়া তিনি কিছুই করিতেন না এবং যখন শুনিতেন, তাহা পালন করিতে কিছুতেই ভয় করিতেন না। এই জন্য তিনি যখন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া আচার্য্যব্রত গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনি গৃহ হইতে তাড়িত হইলেও বিচলিত হইলেন না। পরে ঈশ্বরকৃপাতে আবার সেই গৃহে নিজ বিশ্বাসমত অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হই-লেন। বিবেকের আদেশে যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ লাভ করিলেন, আবার ব্রাহ্মসমাজের বৈদান্তিক গণ্ডীভাঙ্গিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেও ভীত হইলেন না। আবার যখন ঈশ্বরাদেশে আপন কন্যাকে কুচবিহারের রাজাকে দান করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং তদ্দ্বারা নববিধান ঘোষণা করিবার প্রেরণা অনুভব করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানবিচারমতাবলম্বীই দল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও, তিনি আদেশ পালন করিতে ভীত হন নাই। ইহাতেই নববিধানের অনন্ত ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইল এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং সর্ব্বমানব এক অখণ্ড ধর্ম্মপরিবারে মিলিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইল।

এইরূপে যে জীবনে বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাস প্রধান ছিল, সেই জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণে প্রগল্ভা ভক্তির সঞ্চার হইল এবং মহা ভক্তিতে জীবন উন্মত্ত হইল। সংসারের লজ্জা ভয় চলিয়া গেল, এবং ক্রমে যোগ ভক্তির সমন্বয়সাধনে মহাযোগে মন মগ্ন হইল; সে যোগে যেমন ব্রহ্মযোগ, তেমনি মানব-যোগও সমাহিত হইল। এই যোগসাধনে কেমন করিয়া আশ্চর্য্য গণিত অনুসারে জীবনে সংসারে সকল কর্ম্ম অলৌকিক রূপে সম্পাদন হয়, তাহাও প্রতিষ্ঠা করিলেন। জীবনে যেমন শিশুভাব, মত্ততা ও উন্মাদের ভাব লাভ হইল, তেমনি চির দীনতা ও চির শিষ্যপ্রকৃতি জীবনে অক্ষুণ্ণ রহিল। ধর্ম্মসাধনায় বিয়োগ সংযোগ ও বিচিত্রভাবে সমন্বয় সাধন করিয়া, তিনি যথার্থ নববিধান-মূর্ত্তিমান অসাধারণ বিশ্বমানব হইলেন। এই সকল জীবনের মৌলিক উপাদান হইতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে নববিধান সাধন ও প্রতিষ্ঠা করিতে, তিনি যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন সাধনার পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাতে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা এবার আমরা কেবল উল্লেখমাত্র করিয়া, এই প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব।

জড় মৃন্ময় পূজা হইতে তিনি চিন্ময় জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত পূজা ও জীবন্ত উপাসনা প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি প্রাচীন মহা পুরুষ সাধু ভক্তদিগকে আত্মারূপে জীবন্ত ঈশ্বরের মধ্যে দর্শন করিয়া সাধুসমাগম সাধন করিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের আত্মিক চরিত্র আত্মস্থ করিলেন। তিনি নিরাকার ব্রহ্মকে আরতি করিয়া তাঁহার উজ্জ্বল আবির্ভাব বিশ্বময় দর্শন করিতে শিখাইলেন, তিনি হোমানুষ্ঠানকে পুনরুদ্ধার করিয়া রিপু-সংহার-ব্রতসাধনের উপায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি স্নানকে জলাভিষেকরূপে পাপধৌতকরণের উপায় বলিয়া সাধন করিলেন।

প্রভৃতিদিগের অন্নপানকে ভক্ত-চরিত্রগ্রহণের সাধনরূপে প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়সাধন নিশানের আকারে গ্রহণ করিয়া, তাহে নববিধানের জয়লাভ পরিবারে ও সংসারে স্থাপন করিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মকে একই বিধানের বিভিন্ন অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া, সকলের সমন্বয় সাধন প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং সকল মানবজাতির ভ্রাতৃত্বমিলনের উপায় বলিয়া, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে বিধাতার বিধান নববিধান বলিয়া ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং তাহা পূর্ণভাবে নিজ জীবনে সাধন করিয়া বিশ্বমানবমণ্ডলীর আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের এই নবধর্ম্মসাধনের পথপ্রদর্শক ও বন্ধু জানিয়া, তাঁর সেই একই মার সন্তানরূপে তাঁহার ভাই হইয়া, পরস্পরকে ভাই ভগ্নী নির্ব্বিশেষে ভালবাসি ও গ্রহণ করি, ইহাই কেশব চাহিলেন।

তিনি সস্ত্রীক যুগলব্রত সাধন করিয়া, স্ত্রীর সহিত একাত্মনে সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিলেন এবং সংসারে ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি শ্রীদরবার স্থাপন করিয়া, 'ভাই আমি এক' যেমন হইলেন, তেমনই দলগত সাধনে বিশ্বমানব-ভ্রাতৃত্ব জগতে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

প্রসঙ্গ

পংক্তি-ভোজন

ভদ্রসমাজে প্রীতিভোজনে এক পংক্তি করিয়া, কতকগুলি লোকের একত্র ভোজনের জন্য আসন ও ভোজনপাত্র দেওয়া হয়। প্রীতিভোজনের নিয়ম, সকলে একত্রে ভোজনে বসিবে এবং একত্রে ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিবে। সকলে ভোজনে না বসিলে ভোজন আরম্ভ করা কিম্বা ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া উঠা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। নববিধানের উপাসনা-সাধনও এইরূপ সমযোগসাধন। একত্রে উপাসনারূপ অন্ন পান গ্রহণ এবং একত্রে উপাসনার শান্তিবাচন উচ্চারণ, নববিধানের পরিবারগত দলগত জীবনগঠনের উপাদান। পরিবারের মধ্যে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া যেমন পরিবারের পূর্ণতা সমাধান হয় না, তেমনি মণ্ডলীর কেহ কাহাকে ছাড়িয়া আমরা নববিধানের পূর্ণধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না। একা একা সাধন বা ব্যক্তিগত সাধন নববিধানের আংশিক সাধন মাত্র, সমীচীন সাধন নয়, উপাসনা-সাধনকালে আমরা সর্ব্বদাই যেন ইহা মনে রাখি।

নববিধান—শ্রীদরবার—শ্রীকেশব

নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্ব শাস্ত্র, সর্ব্ব মত, সর্ব্ব সাধন এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সমন্বয়বিধান,—পবিত্রাত্মার প্রেরণায় সাধিত। শ্রীদরবার বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন ভাবাবলম্বী, বিভিন্ন সাধন ও বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন মানবাত্মাগণের, ব্যক্তিগত আমিত্ব পরিহারপূর্ব্বক প্রেম ও বিশ্বাস-যোগে, এক ব্যক্তিত্বসমাধানের প্রতিষ্ঠান। নববিধানের ধর্ম্ম, শ্রীদরবারে যাহা মূর্ত্তিমান, শ্রীকেশব তাহা এক চরিত্রে ও জীবনে সমাধান করিয়া এক ব্যক্তিরূপে মূর্ত্ত হইয়াছেন। নববিধান, যাহা শ্রীদরবারের প্রতিষ্ঠানে সাধিত, শ্রীকেশবের এক ব্যক্তিত্বে তাহা মূর্ত্ত, এই তিনের সম্বন্ধ এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পরমারাধ্য পিতৃদেব

(গত ১৩ই মার্চ্চ, ঢাকায়, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত)

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে আমাদের পরমারাধ্য পিতামহ স্বর্গীয় রাজেশ্বর রায় মহাশয় সর্ব্বজনমান্য, ধনজনসম্পন্ন তালুকদার ছিলেন। পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যে তিনি কখনও মুগ্ধ হন নাই। সুমধুর হরিভক্তি ও পুণ্য চরিত্র তাঁহাকে সংসারে নির্লিপ্ত রাখিয়াছিল। আমাদের পিতামহী দেবীও ভক্তিমতী সেবাপরায়ণা সাধ্বী নারী ছিলেন। পতি পত্নী দুজনেই অতি সরলচিত্ত ছিলেন, সংসারের ঘোর ফের ইঁহারা কিছুই বুঝিতেন না। ইঁহাদেরই প্রথম সন্তান আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব।

আমাদের বাবা ১২৫৭ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ, সোমবার, অনুমান ৪ ঘটিকার সময় মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্যশালী বৃহৎ পরিবারের প্রথম সন্তান আমাদের পিতৃদেব পরমাদরে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বাবা তাঁহার ঠাকুরমার বড়ই আদরের পাত্র ছিলেন, বাবাও ঠাকুরমাকে মার চেয়ে বেশী ভালবাসিতেন। শৈশবেই মা ও ঠাকুরমার কাছে দেবতার নাম করিয়া গাত্রোত্থান ও সরস্বতীর বন্দনাদি শিখিয়াছিলেন।

বাড়ীতে গোপাল-বিগ্রহ ছিল। সন্ধ্যার সময় বাবাকে যখন ঠাকুরমা আহার করাইতেন, তখন গোপালের আরতি হইত। বাবা খাওয়া ফেলিয়া দেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেন। ঠাকুরমা বলিতেন, 'তুমি এখান হইতেই প্রণাম কর।' বাবা বলিতেন, 'এখান হইতে প্রণাম করিলে কি হইবে?' ঠাকুরমা বলিতেন, 'এখান হইতে প্রণাম করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন।' বাবা বলিয়াছেন, ঠাকুরমার ঐ কথাতেই, ভগবান্ যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা বুঝিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে বাবার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। বাবার পিতৃব্য, আমাদের পরম পূজনীয় ছোট ঠাকুরদাদা স্বর্গীয় প্রাণেশ্বর রায় মহাশয় কর্ত্তৃক একখানা সুন্দর পাথরের রেকাবীতে অক্ষরলিখন ও বিদ্যারম্ভ হয়। নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনিই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ঠাকুরদাদা যদুর

জানিতেন, শিক্ষা দিলেন। তখন কেদারপুরে স্কুল ছিল না। প্রায় দুই বৎসর খেলিয়া বেড়াইয়া দিন কাটিল। ভগবানের কৃপায় কেদারপুরে একটি স্কুল স্থাপিত হইল। নূতন স্কুলের মাষ্টার স্বর্গীয় গোলোকমোহন ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী করিতে চেষ্টা করিতেন। বাবা তাঁহার মুখে কি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় শ্রবণ করিয়া খুব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন খুব তেজের সহিত মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা বলেন? হিন্দুধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, আর কোন ধর্ম্মই ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।" উক্ত মাষ্টার মহাশয় বালকের পানে প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমার যখন ধর্ম্মে এত বিশ্বাস, তখন তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম হইবে, কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম"। এমন বিশ্বাসের তেজে পূর্ণ হইয়া মাষ্টার মহাশয় এই বাণী উচ্চারণ করিলেন যে, সেই বিশ্বাস বালকের হৃদয় স্পর্শ করিল। খুব সম্ভব, সেই সময় বালকের বয়স বার বৎসর।

সেই বাক্য বালকের হৃদয়কে তোলপাড় করিল। অল্প-বয়স্ক বালক ধর্ম্মচিন্তায় রত হইলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন। এক বৎসর পর কেদারপুর স্কুল উঠিয়া গেল। বিদ্যাশিক্ষার আর কোনও রূপ ব্যবস্থা না হওয়াতে, আবার খেলা ধূলাতে দিন কাটিতে লাগিল; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যে দৃঢ় বিশ্বাসবীজ হৃদয়ে রোপিত হইয়াছিল, তাহা গুপ্ত ভাবেই রহিল, বৎসর দুই এই ভাবেই গেল। তৎপর বলিয়াটি গ্রামে স্থাপিত স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া শিক্ষার্থ কলিকাতায় গমন করিলেন। পুত্র যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে না পড়েন, সেইজন্য ঠাকুরদাদা তাঁহাকে ভক্ত বৈষ্ণব স্বর্গীয় হরিমোহন দত্ত মহাশয়ের অভিভাবকতায় রাখিলেন। তিনি বাবাকে, যাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে অগ্রসর না হন, সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন।

তিনি বলিতেন, "তুমি বৈষ্ণব হবে।" বাবা বলিতেন, "আপনি ব্রাহ্ম হইবেন।" কালে বাবার কথাই সত্য হইল, উক্ত দত্ত মহাশয়ই ব্রাহ্ম হইলেন। বাবাও নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগিলেন। ছয়মাস পরে কলিকাতা হইতে আসিয়া ঢাকায় পড়াশুনা করেন এবং পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত-সভার সভ্য হন। ঠাকুরদাদা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার খরচ পত্র বন্ধ করিয়া দেন। অর্থাভাবে পড়াশুনাও বন্ধ হইল। ঢাকার ভক্তিভাজন স্বর্গগত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়কে পড়শুনার অসুবিধা জানাইয়া, এখন কি করিবেন, সেই বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। তখন ময়মনসিংহ স্কুলের ব্রাহ্মশিক্ষক স্বর্গীয় ভুবনমোহন সেন মহাশয় নোয়াখালি বদলি হইলেন। বঙ্গবাবু মহাশয় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তিনি যেন বাবাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, এবং বাবাকেও তাহা জানাইলেন।

ভুবনবাবুর সঙ্গে নোয়াখালি গিয়া তাঁর বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়াশুনা করিতেন। চারমাস পর রক্তামাশয় রোগে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসেন, চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা হইল; কিন্তু রোগের উপশম না হওয়াতে, বঙ্গবাবু মহাশয় ঠাকুরদাদাকে চিঠি লেখেন। ঠাকুরদাদা বাবাকে বাড়ীতে লইয়া যান এবং চিকিৎসা শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করেন। ইহার পর মাণিকগঞ্জের মুন্সেফ বিখ্যাত ব্রাহ্ম স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কাছে কিছু দিন রহিলেন। এই সময় কলিকাতায় মাঘোৎসব হইতেছিল। বাবা চণ্ডীবাবুকে জানাইলেন, তিনি মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা রওনা হইবেন। তখন বাবার বয়স সম্ভবতঃ আঠার বৎসর। সেন মহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে কলিকাতা যাইবে? পাথেয় আছে?" বাবা বলিলেন, "পাথেয় প্রয়োজন হইবে না, আমি সাঁতরা-ইয়া সাঁতরাইয়া কলিকাতায় যাইব।" চণ্ডীবাবু মহাশয় হাসিয়া বাবাকে পথ খরচ স্বরূপ ৫৲টী টাকা দিলেন। বাবা মহানন্দে কলিকাতা গিয়া মাঘোৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সাধু যাঁহার সংকল্প, ঈশ্বরই তাঁহার সহায়, এই ঘটনাই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

এই স্থানে ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে ভগবানের করুণার সাক্ষ্য দিতে যাইয়া বাবা নিজ মুখে যাহা বলিয়াছেন, সেইটুকু উদ্ধৃত করি-তেছি। "ভগবানের করুণার নিদর্শন অসংখ্য। সকল নিরাশা তিনি দূর করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিপাঠ এবং অভিভাবক মহোদয়দের মুখে নানা কথা-শ্রবণে ধারণা হইয়াছিল, এখন কলি যুগ, এখন আর কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। সত্য যুগে সকলেই দেবতা ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-দর্শন পাইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যখন শুনিলাম, 'পাপী কাতর প্রাণে ডাকিলে তিনি দেখা দেন', তখনই প্রাণ আশ্বস্ত হইল। তখন হইতে যেখানে সেখানে পাগলের মত প্রার্থনা করিতাম। অনেকে বলিতেন, লোকটী বাস্তবিক অনুরাগী হইয়াছে। তখন অনেক দিন বুড়ীগঙ্গার তীরে একাকী বসিয়া থাকিতাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়, কিছুতেই ভয় হইত না। 'শ্রীহরি নিকটে' ইহা মনে হওয়াতে সকল ভয় চলিয়া যাইত। বাড়ীতে গেলে পিতা অনেক তিরস্কার, শাসন ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। শেষে একটু ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া আমাকে বাড়ীর বাহির হইতে হইল। এক স্থানে হরিসংকীর্ত্তন হইতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হওয়াতে অনেকে আমাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী মনে করিলেন। মা ও ঠাকুরমা বস্ত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি কাপড় পরিতে না চাওয়াতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। পিতার ভয়-প্রদর্শনই উদ্দেশ্য ছিল, বস্ত্র না দেওয়া তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না। অবশেষে আমি বস্ত্র পরিলাম। প্রথম হইতেই ভগবান্ প্রেমময়রূপে বিশেষ ভাবে আমার সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার প্রেমে মন প্রাণ মুগ্ধ, অনেক সময় শরীর রোমাঞ্চ এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ থাকিত। কত গোপন করিতাম, তবুও লোক

দেখিয়া ফেলিত। শ্রীহরির প্রেমাকর্ষণে এমনই মত্ততা জন্মিত যে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে কষ্ট হইত না। ইহাতে অহংকারও হইত না।...কাতরহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম, ঠাকুর, সৎসঙ্গ দিয়া আমাকে রক্ষা কর। ভগবানের কৃপায় আমার সাধুসঙ্গ লাভ হইয়াছে, স্বর্গের সুধাবিন্দু আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে ভাবের তরঙ্গে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও প্রমত্ত হইত। শরীরে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। ধর্ম্মজীবনের একমাত্র ভিত্তি যে বিশ্বাস, তাহা কেবল ভগবানের মনোনীত এই দলভুক্ত হইয়াই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার প্রেম ভক্তি ব্যাকুলতা এবং উৎসাহ অনুরাগ সকলই এই দল।...দল শ্রীহরির প্রতিনিধি, ইহাই তাঁহার চরণতরণী। এই দলে থাকিয়া নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইব, স্বর্গলাভ করিব। যাঁহারা ভক্তি ব্যাকুলতা নাই বলিয়া হরিপদারবিন্দ সাধন করিতে পারেন না বলেন, তাঁহারা বিশ্বাসী দলের আশ্রয় গ্রহণ করুন, অনায়াসে ভগবানের পদছায়া প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন।"

বাল্যকাল হইতেই মৎস্য বাবার অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। ব্রাহ্ম হইয়াই বাবা চিরজীবনের জন্য মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাবা লেখা পড়ায় খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। এন্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াও ব্রাহ্ম হওয়াতে পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। সম্ভবতঃ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মপদে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারব্রতে ব্রতী হইলেন। স্বয়ং ভগবান্ সদ্গুরু হইয়া তাঁহাকে পরাবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বিবেককর্ণে ভগবদ্বাণীশ্রবণে কত অনুপ্রাণনা লাভ করিতেন। সঙ্গীতময়ী বাগ্দেবী প্রিয় ভক্তের কণ্ঠে অবতরণ করিয়া, তাঁহাকে বিধান-সঙ্গীতগায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দৈনিক মিলিত উপাসনায় প্রতিদিন নূতন সঙ্গীত রচনা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। তদ্ভিন্ন পারিবারিক উপাসনা, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কত যে নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার যে সংখ্যা আমরা জানিনা। সঙ্গীতপুষ্পহার ও বিধান সংগীতে যাহা প্রকাশিত, তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সংগীতই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। প্রভাতে জাগিয়াও কত প্রভাতসংগীত রচনা করিয়া গাইতেন। সংক্ষেপে উপাসনাসম্বলিত একটী সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রতিদিন প্রভাতে আমাদিগকে লইয়া প্রাভাতিক আরতি করিতেন। বিশ্বাসী সন্তান ভক্তিভরে হরিপদে আত্মোৎসর্গ করিলে, সত্য শিব সুন্দর হরি ভক্তহৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তের তো নিজের কিছুই নাই। ভগবান্ই তাঁহার সর্ব্বস্ব। ভক্তজীবন-ভাগবত হরির প্রেমলীলায় পরিপূর্ণ। সে লীলা-কাহিনী ভক্ত ভিন্ন কেবা পাঠ করিতে পারে, কেবা তাহা বলিতে পারে? আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে কতটুকু বা বুঝিতে পারি, অতি অল্প সময়ে কি বা বলিব? আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে হরি-প্রেমলীলার সামান্য একটু আভাস দিতে পারিলে, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিব। ভক্তজীবন ভগবান আমাদের সহায় হউন।

নানা প্রকার রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বিপদ, পরীক্ষা বাবার অটল বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করিয়াছে। আমাদের মাতৃদেবী-চিররুগ্না ছিলেন। কতবারই যে কত কঠিন রোগে প্রাণসংশয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আমরা তখন অপোগণ্ড। বাবা একাকী দিনের পর দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া মায়ের সেবায় রত। একাদিক্রমে ছয়মাসও অনাহারে অল্পাহারে রাত্রিজাগরণে কাটাইতে হইয়াছে। অতি আশ্চর্য্য রূপে মার চিকিৎসা নির্ব্বাহ হইত। বহুব্যয়সাপেক্ষ ঔষধ পথ্য চিকিৎসক, যাহা প্রয়োজন, স্বয়ং ভগবানই তাহা যোগাইতেন। কেমন অটল অচল থাকিয়া বাবা প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিতেন, ভাবিয়া অবাক হই। মার একবার সাংঘাতিক রোগ হইল, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন সূর্য্যবাবু চিকিৎসা করিতেন। একদিন তিনি মার অবস্থা দেখিয়া জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, তাহা বাবার নিকট প্রকাশ করিলেন। দেখিলাম, বাবা মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং নিম্নলিখিত নূতন সংগীতটী তখনই রচনা করিলেন :—

"তুমি আছ মাগো আমার হইয়ে চিরসম্বল।"

ইহার পরই মা আরোগ্যের পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

জীবনে এইরূপ ব্যাপার যে কতবার দেখিয়াছি, তাহা এখানে বলিবার সময় নাই। বৃদ্ধ বয়সে মাতৃদেবী মস্তিষ্করোগাক্রান্ত হইয়া বহুদিন ভুগিতেছিলেন। বহু চিকিৎসা ও যত্নে আরোগ্য লাভ করিতেছেন না দেখিয়া, আমি একদিন নিরাশ হইয়া বলিতেছিলাম, মা বোধ হয় আর ভাল হইবেন না। বিশ্বাসী বাবা বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় সকলই সম্ভব হয়। তাঁর ইচ্ছা হইলে ইনিও রোগমুক্ত হইবেন।" আশ্চর্য্য ভক্তের বিশ্বাসপূর্ণ বাণী, ইহার কিছুদিন পরই মাতৃদেবী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া, আট বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ থাকিয়া সকলের সেবা করিয়া সংসারকে সুখময় করিয়াছিলেন। এইরূপ আমাদের সংকটাপন্ন রোগে কত যে সেবা যত্ন ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অবর্ণনীয়। কেবল নিজ গৃহে নয়, সহধর্ম্মিণীসহ কত প্রকারে পরসেবা করিয়াছেন, তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। (ক্রমশঃ)

—•—

শান্ত সাধক স্বর্গগত কেদারনাথ দে

(৮ই মার্চ্চ, সাম্বৎসরিক পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে)

কলিকাতার দক্ষিণে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত সোণারপুরের নিকটে হরিনাভি গ্রামে, সম্ভ্রান্ত দে পরিবারে, ১৮৩৮খৃষ্টাব্দে, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, রাত্রি ১১টার সময়, কেদারনাথ দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরামকুমার দে এবং পিতামহের নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র দে। হরিনাভি গ্রামের অধিকাংশ ভূমি ইঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। ইঁহাদের গৃহে দোল দুর্গোৎসব এবং নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত।

১২৭১ সালের ভীষণ ঝড়ের সময় নিকটস্থ সকল গ্রামের অধিবাসিগণ ইঁহাদের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল।

শৈশবেই কেদারনাথ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী Senior পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল এবং ইংরাজী ও গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ লক্ষিত হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ক্রমে নিরাকার সত্য পরব্রহ্মের সাধনার জন্য, ঐ অল্প বয়সে প্রত্যূষে উঠিয়া বিজন, প্রান্তরে বসিয়া ধ্যান করিতেন। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িত, রাখাল বালকগণ কেহ বা ঢিল ছুড়িত, কেহ বা আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া থাকিত, সঙ্গিগণ কখনও কখনও দেখিয়া উপহাস করিত, তথাপি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইত না। ক্ষুধা পিপাসা ভুলিয়া, সকল অবমাননা তুচ্ছ করিয়া, সেই পূর্ব্বকালের ঋষি মুনিদিগের মতই তিনি ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন থাকিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে সাধু অঘোরনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা হয় এবং দুজনে মিলিয়া কিছুদিন মারী পর্ব্বতে গিয়া একত্রে যোগ সাধন করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন।

এই সময়ে আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে যে কেহ আসিতেন এবং তাঁহার তেজোময় বাণী শুনিতেন, তাঁহার অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কেদারনাথ এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া সেই সময় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। তাঁহার অনুরোধে কেশবচন্দ্র একবার হরিনাভিতে আসিয়া উপাসনা করেন এবং বক্তৃতা দেন। এই সময়ে হরিনাভির অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং কেদারনাথের বিশেষ চেষ্টায় হরিনাভি গ্রামে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিতার ইচ্ছায় এবং আদেশে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের হিসাব বিভাগে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, বিশেষ পঞ্জাব প্রদেশে অতি সুনামের সহিত কার্য্য করেন। কিন্তু দৈনিক সাধনা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই এবং মন তাঁহার চিরদিনই ধর্ম্মার্থে জীবন নিয়োজিত করিবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। পাঞ্জাবে অবস্থানকালে তাঁহার জীবন ও চরিত্র দেখিয়া, লালা কাশীরাম প্রভৃতি তাঁহার পাঞ্জাবী বন্ধুগণ তাঁহাকে ঋষি কেদার নামে অভিহিত করিতেন।

ইহার পর যখন তিনি কিছুদিনের জন্য ছুটী লইয়া কলিকাতা আসেন, মধুলোভে প্রমত্ত ভ্রমরের ন্যায় সর্ব্বদাই শ্রীআচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ছুটী ফুরাইয়া আসিলে একদিন আচার্য্যদেব বলিলেন, "আর কি ফিরিয়া না গেলে চলে না?" এই কথাটীর জন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। আহ্বান আসিল, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের ভার ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া, সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া, শুভমুহূর্ত্তে ধর্ম্মপ্রচারব্রতে আত্মনিয়োগ করিলেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

কেদারনাথের দৈনিক জীবন ব্রহ্মময় ছিল। গাত্রোত্থান করিয়া অতি প্রত্যূষে নামগান করিতেন। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সংবাদপত্র পড়িতেন। পরে স্নান,—স্নানাবগাহনকে তিনি একটী পবিত্র তীর্থের মত জ্ঞান করিতেন। ধৌত পরিষ্কৃত স্নানাগারে জপ করিতে করিতে প্রবেশ করিতেন। মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতেন। সাধু সাধ্বীগণের নাম, সকল দিকের নাম, নদ নদীর নাম এবং হরিনামের নানা মন্ত্র স্নানের সময় অনর্গল উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। স্নানান্তে নাল্‌তে ও আদা ঔষধ হিসাবে খাইয়া উপাসনায় বসিতেন। দুই ঘণ্টা তাঁর উপাসনার সময় ছিল। ধীর স্থির ভাবে বসিতেন, ব্রহ্ম তদগত প্রাণ, চক্ষে অবিরাম আনন্দাশ্রু বহিয়া যাইত। যিনি সে ছবি একবার দেখিয়াছেন, কখনও ভুলিতে পারিবেন না। উপাসনার পর অন্ততঃ একজন ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র অতিথিকে আহার করাইয়া, পরে নিজে সাত্ত্বিক ভাবে আহার করিতেন। মধ্যে মধ্যে ব্রত লইয়া স্বপাক আহারও করিতেন।

কেদারনাথ চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক অধ্যয়নে কাটাইয়া দিতেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত Indian Mirror, Interpreter প্রভৃতি তৎকালীন সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে প্রফুল্লবদনে কথা কহিতেন। কখনও কাহারও সহিত কঠোর ব্যবহার বা রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। কেহ বিরক্ত করিলেও কখনও বিরক্ত হইতেন না। দাসদাসীগণকে অল্পক্ষণের জন্য হলেও, ভগবানের উপাসনার জন্য অবসর লইতে বলিতেন এবং তাহারা যাহাতে লিখিতে পড়িতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিতেন। উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ঘরে আসিলে, নিজের পুত্রকন্যাদের মত তাহাদিগকেও নিজ হাতে খাইতে দিতেন।

তিনি চিরদিন নির্জ্জনতা ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তাই ভগবানের ইচ্ছায়, তিনি স্বর্গীয় জমীদার লক্ষ্মণচন্দ্র আশের অনুরোধে, তাঁহার খাঁটুরাস্থ 'মঙ্গল আলয়' নামে সুন্দর প্রাসাদে, প্রাকৃতিক শোভায় সুশোভিত শান্তিপূর্ণ স্থানে, পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া, জীবনের শেষ দুইমাস শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া, ইং ১৮৯১ সালের ৮ই মার্চ্চ, শিবরাত্রি তিথিতে, রবিবারে, ধর্ম্মবন্ধুগণের সম্মুখে, সহধর্ম্মিণী এবং পুত্রকন্যাগণের সমস্বরে উচ্চারিত ব্রহ্মস্তোত্র শুনিতে শুনিতে, সজ্ঞানে ধীরে ধীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। স্বর্গের বাদ্যধ্বনি ও আনন্দোৎসব ইহারই সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাহার প্রতিধ্বনি ও সেখানকার উৎসবায়োজনের দৃশ্য তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিমীলিত চক্ষের সম্মুখে পরিষ্কার প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি বিন্দুমাত্র শোক

করেন নাই এবং সেই রাত্রেই বলিয়াছিলেন, "আজ মহাদেবকে লইয়া আমরা রাত্রি যাপন করিতেছি।"

কেদারনাথের বাসনানুসারে মঙ্গলালয়ের সম্মুখে, খাঁটুরা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে, তাঁহার ও তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সমাধি স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে পাখীর গানে, চাঁদের হাসিতে, ঝাউয়ের বাতাসে, ফুলের সৌরভে, বনদেবীগণের আনন্দসংগীতে সুরলোকের মধুর শান্তি বিরাজিত। ভক্তগণের ব্রহ্মানন্দ-সম্ভোগের উপযুক্ত স্থান।

দুঃখের বিষয়, কেদারনাথের পত্র ও প্রবন্ধাদি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ জামাতা রমণীকান্ত চন্দ্রকে লিখিত পত্র হইতে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহার উন্নত জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন:—"চরিত্রের শুদ্ধতাই সাধনের শেষ ফল। ব্রহ্মদর্শন, ক্রমে ব্রহ্মসহবাস, তারপর ব্রহ্মপ্রাপ্তি, যোগে একতা, তবে চরিত্র নির্ম্মল হয়। ব্রহ্মকৃপায়, বিধান-মাহাত্ম্যে এই সোপানত্রয় পর্য্যায়ক্রমে আরোহণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর, ইহাই প্রাণগত ইচ্ছা।"

অন্যস্থানে লিখিতেছেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর ঐ উপরে। সকল সাধনের মূলে কৃপা; কৃপাহীন সাধন—যেমন মূলহীন বৃক্ষ—অসম্ভব; চিদাকাশ এই কৃপাবায়ুতে পরিপূর্ণ। যখন নিস্তব্ধ, তখন পাখা সঞ্চালন করিয়া সেবন করিতে হয়, যখন মৃদুমন্দ গতিতে বহিতে থাকে, তখন গৃহদ্বার খুলিয়া বসিলেই হয়, আর যখন প্রবল ঝড় উঠে, তখন দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা না মানিয়া তাহার কার্য্য করিয়া যায়; অতএব এই বিবিধ প্রণালীতেই দেবপ্রসাদ ধারণ করিতে হইবে। কেবল ঝড়ের আশায় অলস হইয়া থাকিলে কি জীবনের কার্য্য চলে? বায়ু অনুকূল থাকিলে কেবল পাল তুলিয়া দিলেই হয়, না হলে দাঁড় টানিতে হয়, এইরূপে ভবনদী পার হইতে হইবে। দৈব শক্তি এবং মানবযত্ন উভয়ে মিলিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর করে। দেবকৃপাই সার বস্তু, সাধন কেবল তাহা ধারণের প্রণালী মাত্র।" তাঁহার দর্শিত এই ব্রহ্মকৃপা-সাধনই আজ আমাদের ব্রত হউক।

শ্রীবনলতা দে।

তর্পণ, না, তীর্থ-মহিমা-দর্শন?

(খাঁটুরায় শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের সমাধিতীর্থ দর্শনে)

এ কি! মা যে নিজে অমৃতের দ্বার খুলে দিয়েছেন। বৃক্ষগুলি পুষ্পপত্রে সমাধিতলে অপূর্ব্ব আসন রচনা করেছে। বাতাস ফুলের সৌরভে, ঝাউগাছের শন্ শন্ শব্দে কি এক মদিরা দক্ষার করে প্রাণ মন মাতিয়ে তুলছে। এ যে দেখছি, প্রকৃতি দেবী স্বয়ং তর্পণ আরম্ভ করে দিয়েছেন। এখানে আমি কে? আমি কি এই পুষ্পাসনে বসবার যোগ্য? এই সব ভাবছি, এমন সময় দেখি, মন্দিরের সেবক তাঁর সম্মার্জ্জনী হস্তে এসে ফুলপাতাগুলি সরিয়ে দিতে লাগলেন। তখন ভাবলাম, আর দেরী কেন, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যেমন করে পারি, এই মহিমাময় তর্পণে যোগদান করি। সঙ্গে কিছু ফুল ছিল, গাছ থেকে আরও কিছু ফুল পাতা পেড়ে সমাধি সাজিয়ে বসবার আয়োজন কর্‌ছি, দেখি, ঐ সেবক মন্দিরের দরজা খুলে আসন নিয়ে আস্‌ছেন। বললাম, ওগুলি আর দরকার হবে না। আমাদের সঙ্গে আসন আছে, আপনি ওখানেই রেখে আসুন। শুনেছিলাম, ওঁর হাতে চাবি নেই, মন্দিরের দরজা খুলে দিতে পারবেন না, জিনিষও কিছুই পাওয়া যাবে না। জিনিষ পত্র আসন ইত্যাদি আমরা গতবারেও এনেছিলাম। ঘর না পেলে কোথায় বা থাব দাব, কোথায় বা একটু বিশ্রাম করব? মনে হয়েছিল, তার চেয়ে মনোরথের আহ্বানে ওঁর বাড়ীতে গিয়ে ভাইবোন সবাই মিলে বসব, সেইত ভাল। গোবরডাঙ্গায় যাওয়া বড় কষ্ট! কিন্তু কি করে যে মা নিয়ে এলেন, তা জানিনে। বুঝি বল্লেন, "ওরে তোকে ঘর খুলে দেবে না কে? তোকে আসন দেবে না কে? এসে একবার দেখে যা, কি চমৎকার 'সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্' আমি তোর জন্যে খুলে রেখেছি, কি সুন্দর আসন আমি তোর জন্যে রচনা করেছি।" আর ভাইবোন? উপাসনায় ত আমরা স্বর্গ মর্ত্তের সমস্ত ভাই বোন একসঙ্গে মিলেছি। এখানে কি আর ভেদ আছে? তাইত, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখলাম! গাছতলায় হবিষ্যান্ন রেঁধে, দুটি কন্যা এবং ঐ সেবকসহ আহারে বসলাম; মার্চ্চ মাসের দুপুরে ঝড়ো হাওয়া হু হু করে ধুলো শুকো পাতা উড়িয়ে আনতে লাগল। পাশে বসে শান্তি বল্লেন, মা, আমাদের পাতে ত একটীও পড়চে না? পাতা পরিষ্কার। "তবে আর নামের মহিমা কি? ওরা যে আমার মার আজ্ঞাকারী ভৃত্য।" তারপর সমাধির পাশে কাঁঠাল গাছতলায় তিনজনে বিশ্রাম করলাম। গাছটি ছত্রধারী হয়ে আমাদের আরাম দান করলেন। গোবরডাঙ্গায় আমরা অনেকবার এসেছি, কিন্তু এমনটি আর কখনও হয় নি। ভয় পেয়েছিলাম, কষ্ট হবে, তাই মা আমাদের এই আশ্চর্য্যলীলা দেখালেন। তাই এবার এখানে এসে এত আনন্দ, এত আরাম পেলাম যে, তা প্রকাশ করে বলবার আমার ভাষা নেই। ধন্য মা ভক্তজননী! ধন্য মা আমাদের জননী! ধন্য এই ঋষিতীর্থ!

মা, তুমি আমাদের যেমন দেখালে, এমনি সকলকে দেখাও। এমনি আনন্দদানে সকলকে কৃতার্থ কর। তোমার মহিমা মহিমান্বিত হউক! আমরা ভক্তিভরে, কৃতজ্ঞ অন্তরে বারবার তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীঅশোকলতা দাস।

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(বা স্থগিত গতি)

(১)

আমরা আজ যে বিষয়টি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার শিরোনাম দেখিয়াই সমবিশ্বাসী ভাই ভগ্নীগণ বিস্মিত হইবেন। এখন আমি "মরণের পারে, অমৃতের দ্বারের" সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। ৬০ বৎসরের অধিককাল এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে অবস্থিতি-করতঃ, ইহার উন্নতি, বিস্তৃতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং ইহার অভ্যন্তরনিহিত শক্তি, পরাক্রম, কর্ম্মশীলতা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতির সমষ্টি সঞ্জাত সফলতা দেখিয়া, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা দেখিয়া যাইতেছি। কেশবচন্দ্র যে ভাবে গাহিয়া গিয়াছেন, "আশা পূরিল রে! আমার সকল সাধ মিটে গেল," আমি ব্রাহ্মসমাজেরই একজন হইয়া আমার ক্ষীণস্বরে গাহিয়া যাইতেছি, "আমাদিগের আশা পূর্ণ হইয়াছে।" বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে সর্ব্বত্র দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে সত্য কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি যেরূপ ভাবে ভাবিয়া থাকি, অন্যেরা সেরূপ ভাবে নাও ভাবিতে পারেন। আমার ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধের চক্ষুর সান্নিধ্যে যেমন প্রতিনিয়ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ বিন্দু বিন্দু আলোক এবং কখনও বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালবরণের কীটের ন্যায় কীটাবলী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই উঠিতেছে, নামিতেছে, ভাসিতেছে ও পরক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমার অন্তর্দৃষ্টির সুমক্ষেও ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ব্ব ইতিহাস-সঞ্জাত নানাবিধ চিন্তার ধারা, অব্যক্ত ভাবতরঙ্গ দিবসে ও নিশীথে উঠিতেছে, ডুবিতেছে, ভাসিতেছে এবং পলকে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। আমি আজ যে বিশ্রামলাভের কথা বলিতেছি, ইহা ব্রাহ্মসমাজের চির বিশ্রাম নহে। বাঙ্গালীর চিরগৌরব, বঙ্গের কবিকুলাগ্রণী মাইকেল মধুসূদন যেমন সমাধির নিম্নস্তরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া বাঙ্গালীজাতিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছেন, "দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে" বলিতে বলিতে শেষ কথা শুনাইতেছেন যে, "এখানে কবিবর শ্রীমধুসূদন চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন।" আমার এ বিশ্রামলাভ তেমন ভাবের বিশ্রাম নহে। অথবা কোন মহা শোকার্ত্তব্যক্তি যেমন প্রাণের ভিতর হইতে মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে প্রত্যূষ সময়ে হঠাৎ জাগরিত হইলে উষা কালকে সম্বোধন করতঃ বলিয়া উঠেন যে, "মহানিদ্রা হোক নিদ্রা, শয়নে বাসনা, কেন জাগাইয়া ঊষা বাড়াও যন্ত্রণা?" আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ সে ভাবেরও নিদ্রা নয়। ইহা বলিতে গেলে রণগর্ব্বে গর্ব্বিত বীর সৈন্যদলের রণক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামলাভ মাত্র। সৈন্যদল নানাবিঘ্নসঙ্কুল দুর্গমপথ অতিক্রম করতঃ সংগ্রাম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াই, সেনাপতি সাময়িক ভাবে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতধ্বনি করিলেন, যেন বিশ্রামান্তে পুনরায় নব বলে, নব তেজে ও নব উৎসাহে সংগ্রামক্ষেত্রের অভিমুখে পুনরায় ধাবিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজেরও যে ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে করিতে এ অবস্থাতে আসিতে হইবে, ইহা আমাদিগের নেতা কেশবচন্দ্র তাঁহার সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া, আমাদিগকে এবং আমাদিগের ভবিষ্যদ্বংশীয় অনাগত সৈনিক দলকে সতর্ক থাকিবার জন্যই, প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়া আমাদিগকে সাহসের সহিত আশান্বিত থাকিবার নিমিত্ত দূরদর্শিতা সহকারে ঘোষিত করিয়াছিলেন, আজ এখানে আমাদিগের নিজের বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার সেই চিরজীবন্ত বাণী ভাই ভগ্নী এবং সন্তান সন্ততিগণকে শুনাইতেছি। তিনি তাঁহার রচিত "Immobility" নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে সকলেই ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত গতির বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পারিবেন, নানা সন্দেহ নিরাশার মধ্যেও আশার আলোকের ভিতর দিয়া আশার দৃশ্য বা আশার চিত্র দেখিয়া সাহসী ও আশান্বিত হইতে পারিবেন। কেশবচন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন, যে সমগ্র মানবজাতি নৈতিক ভাবে সত্যের দিকে ও ধর্ম্মের পরবশ হইয়া পুণ্যের পথে ধাবিত হইতেছে। ইতিহাস মানবজাতির এই সংগ্রাম করিতে করিতে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে গমনের বিষয় লিখিয়া রাখিতেছে; কিন্তু ঐ ইতিহাসই আবার দেখাইয়া দিতেছে যে, ঐ উন্নতির গতি ক্রমাগত এক অবিশ্রান্তগতিতে ও অপ্রতিহতভাবে সাধিত হইতেছে না। মানবজাতির উন্নতির ভিতরেও সময়ে সময়ে উত্থান ও পতন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উন্নতির স্রোত কখন কখন স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। সৈন্যশ্রেণী যেমন অগ্রসর হইল, আবার বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাহাদের গতি স্থগিত রাখিতে হইল; পুনরায় আবার অগ্রসর হইল, আবার বিশ্রাম লাভ করিল। শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত যাত্রিদল যেমন পথিমধ্যে বিশ্রাম লাভ করিয়া তাহাদের শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক জীবনে, সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতীয় জীবনেও এই অগ্রগমন ও বিশ্রাম লাভ করিবার অবস্থা শুধু উপলব্ধি নহে, পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই আসিতেছি। আমাদিগের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, প্রার্থনা এবং ক্রিয়াশীল সৎপ্রবৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদিগকে যেমন অনেক উপরে উঠাইয়া দেয়, আবার যেন দেখিতে দেখিতে নদীর জলের ভাটার মতন এই ধর্ম্মজীবনেও ভাটা উপস্থিত হয়। তখন আমাদের আশা-প্রদীপ যেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, এমন কি বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া যায়। জীবনে যেন মৃত্যুর লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠে। উৎসাহ, উদ্যম ও বিশ্বাস ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া আত্মাকে যেন এই মারাত্মক অচলতা (Immobility)

আক্রমণকরতঃ একবারে নির্জীব করিয়া তুলে। * উৎকৃষ্ট আচার্য্যের উৎকৃষ্ট উপদেশও হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। সুগায়কের সুমিষ্ট সংগীতও প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রার্থনাদি শুধু শুষ্ক হইয়া পড়ে, তাহা নহে, প্রার্থনা করিতে বা সংগীত করিতেও তখন আর প্রবৃত্তি হয় না। লৌকিক ভাষায় কথিত আছে যে, "পাপীর কণ্ঠে হরিনাম" অথবা "ভূতের মুখে রামনাম" আসে না। সেই ভাবেই শুষ্ক হৃদয়ে কোন কিছুই ভাল লাগে না। প্রার্থনা, সংগীত ও ঈশ্বরের করুণার জীবনে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, সে সকলও তখন আর স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। এ সকল বিষয়ে তখন একেবারে অরুচি জন্মিয়া যায়। উহা যেন 'কলের গানের' ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে মনের ভিতরে আবার পবিত্র ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তখন ইচ্ছা হয়, যেন এই অবসন্নতা দূরে ঠেলিয়া দিয়া অগ্রসর হই। খদ্যোতের আলোকের ন্যায় "এই আছে, এই নাই, এই আরবার" এই ভাবে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপে মনের ভিতরে শুভ ইচ্ছার উদ্রেক হইলেও, শরীরের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-গুলির শিথিলতায়, সে ইচ্ছার শক্তি আর পুনরায় অগ্রসর হইতে কার্য্যকরী হয় না। এই অবস্থাই "আত্মার মৃত্যুর লক্ষণ।" নাড়ীবিহীন দেহের ন্যায় নাড়ীবিহীন আত্মা তখন দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। এই মহা সঙ্কটের অবস্থাতে পড়িয়া যাঁহারা বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারেন, (প্রাচীন বাইবেলে বর্ণিত ঐ সেই দৃঢ় বিশ্বাসী জোভের ন্যায় জীবনের সকল প্রকারের প্রতিকূল অবস্থাতে) বিধাতার করুণা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে আবার উঠাইয়া দিয়া দাঁড়াইতে ও অগ্রসর হইতে সমর্থ করে। ইঁহাদের ন্যায় ব্যক্তি-গণই ধন্য! তাঁহারাই ভগ্নহৃদয় মানবের আদর্শ। পক্ষান্তরে আবার তাঁহারা কি দুর্ভাগা ও দুঃখী, যাঁহারা এই নিরাশার অবস্থা হইতে আর উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের দুঃখের রজনীর আর উষাকাল উপস্থিত হয় না। এখানেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইতে হইতে একেবারে অচৈতন্য হইয়া যান। তাই ভগ্নি! এই অবস্থাতেও পুনর্জীবন পাইবার চেষ্টা করিতে কেহ যেন ত্রুটি না করেন। জীবনতরী যদিও চড়ায় বাধিয়া অচল হইয়া পড়ে, তথাপি তাহাকে পুনরায় ভাসাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।" শাস্ত্রের বচন তখন দেখাইয়া দিবে যে, বিধাতার প্রেমের বন্যা পুনরায় এই অচল প্রাণকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। প্রার্থনা করিবেন, স্থিরতা যেন জীবনে স্থায়ী না হইতে পারে। আবার যেন চলিতে চলিতে স্থিরতা আমা-দিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। স্থিরতা জীবনহীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গতিশীলতাই উন্নতির যথার্থ জীবন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—•—

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ৬ই মার্চ্চ, ২০।ডি কালিদাস পটিটেণ্ডি লেনে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্র, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নবজাত দ্বিতীয় শিশুপুত্রের শুভজাতকর্ম্মানুষ্ঠানে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মাতামহগৃহে জন্মলাভ করে। ভগবান্ নবজাত শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবালয়-প্রতিষ্ঠা—গত ১৫ই মার্চ্চ, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ প্রেমেন্দ্রস্মৃতিতীর্থে দ্বিতলেরপ্রকোষ্ঠ একটী দেবালয়রূপে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা-যোগে প্রতিষ্ঠা করেন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত শোক-সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে :—

গত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার, সন্ধ্যা ৭॥টার সময়, ভাগলপুরে লেডী ডাক্তার শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি আজীবন প্রসূতিগণের সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জীবন মহিলাগণের আদর্শস্থানীয়, অনুকরণের যোগ্য। এই সেবাপরায়ণা নারীর তিরোধানে ভাগলপুরের সর্ব্বজাতীয় মহিলাসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে স্বর্গীয় বসন্তকুমার চৌধুরীর (শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মাতুল) জামাতা শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ মজুমদার, অনুমান ৫০বৎসর বয়সে, পত্নী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া, ডবল নিউ-মোনিয়া রোগে, পরলোক গমন করেন। গত ১১ই মার্চ্চ, কালু ঘোষ লেনে, তদীয় শ্যালক শ্রীমান্ সুকুমার চৌধুরীর গৃহে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ সন্তানদের কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে; ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অরুণকুমার ঘোষ মজুমদার নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন।

গত ১৯শে ফাল্গুন, চট্টগ্রামে, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের জামাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী, বহুদিনের রুগ্ন ভগ্ন ক্ষীণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, একপুত্র ও তিনকন্যা রাখিয়া, পরলোকেগমন করিয়াছেন।

বিগত ১৪ই মার্চ্চ, আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা, লক্ষ্ণৌস্থ ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমাদের স্নেহাস্পদ কুমার কমলেন্দ্র নারায়ণের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রেণুকা দেবী সন্তান প্রসব করিবার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থ, ২৭শে মার্চ্চ, রবিবার, ভ্রাতার গৃহে উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে ডাঃ বসু প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ঐ তারিখে কলিকাতায় ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে, আত্মীয়দের লইয়া ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। দেড়মাসের

শিশুটীকে লইয়া পিতা কলিকাতা আসিতেছিলেন, পথে ট্রেণেই খুব অসুখ হইয়া শিশুটী মার কোলে চলিয়া যায়।

গত ১৩ই চৈত্র, রবিবার, বালেশ্বরের স্বর্গীয় ধ্রুব করের পত্নী শ্রীমতী সুমতি দেবী, শ্রীরামপুর হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। অল্পদিন হইল, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী কোন্নগর বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া তথায় যান; মাতৃদেবী তাঁহার সঙ্গে যান। সেখানেই আকস্মিকরূপে কলেরা রোগাক্রান্ত হন; রোগটী কঠিন হইয়া পড়িলে, শ্রীরামপুর হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানেই ইহলীলা শেষ হয়।

পরমজননী পরলোকগত আত্মাদিগকে স্নেহক্রোড়ে স্থান দান করুন, এবং আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

ঢাকার সংবাদ—ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন :—

দিগবাজারস্থ দাসমণ্ডলী কর্ত্তৃক, স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের ভবনে, বিগত ১২ মার্চ্চ প্রাতে, ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দার উদ্বোধন, পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন আরাধনাদি, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্লোকসংগ্রহাদি পাঠ করিলে, ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ পরলোকগত আত্মার জীবন সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। তদনন্তর পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন ও রমেশবাবু শেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের পুত্রগণ হবিষ্যান্ন আহার করাইয়া সকলকে প্রীত করেন। এই উপলক্ষে উক্ত দাসমণ্ডলী স্বর্গগত দুর্গানাথ রায় প্রণীত "বিধান-সঙ্গীত" পুনঃ পুনঃ মুদ্রণ জন্য স্থায়ী ফণ্ড গঠনের অভিপ্রায়ে ৫০৲ টাকা তাঁহার পুত্রদের হাতে, কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ২৲, ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠা—অমরাগড়ীর স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া শশিমুখী দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ৪ঠা চৈত্র সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং ৫ই জয়পুর ফকিরদাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংলগ্ন "শশিমুখি বিজ্ঞান-মন্দিরের" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পৌরোহিত্য করেন। বিস্তৃত বিবরণ পরে জ্ঞাতব্য।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই মার্চ্চ, ৪৬।এ রমেশ মিত্র রোডে, ৺রমেশচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী ৺সুখময়ী সিংহের সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন।

গত ১৬ই মার্চ্চ, বাসন্তীপূর্ণিমা তিথিতে, স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে, ভবানীপুরে ২।এ বেচু ডাক্তার লেনে, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৩শে মার্চ্চ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲, অনাথাশ্রমে ৫৲ এবং অন্ধ স্কুলে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে মার্চ্চ, বালীগঞ্জে ২।৩বি, পণ্ডিতীয়া রোডে, স্বর্গীয় মনোগতধন দের কনিষ্ঠ পুত্র সুহাসকুমারের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং দুই ভগ্নী শ্রীমতী অরুণাশোভা ও মাধুরীলতা অনাথাশ্রমে ২৲ করিয়া ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—সেবিকা শ্রীমতী হেমলতা চন্দ পিতৃদেব স্বর্গগত ভাই ঋষি কেদারনাথ দের, ৮ই মার্চ্চ, সাম্বৎসরিক স্মৃতি উপলক্ষে 'কান্তিচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে' ১৲ এবং স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণার শুভবিবাহ উপলক্ষে কন্যার পিসিমাতা শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ এবং ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—অমরাগড়ী নববিধানসমাজের ষট্‌পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধন, ৬ই মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন দুইবেলা উপাসনা, ৭ই বালকবালিকাসম্মিলন, ৮ই রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে দুই বেলা উপাসনা, অপরাহ্নে উপাসকমণ্ডলীর পুনর্গঠন ও আলোচনা, ৯ই প্রাতে শ্মশানে পারলৌকিক সাধনা, অপরাহ্নে জয়পুর হাই স্কুলে নৈতিক জীবন গঠন বিষয়ে আলোচনাসভা, ১০ই শান্তিবাচন হইয়া উৎসব শেষ হয়। দিনব্যাপী উৎসবে প্রাতের উপাসনা শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস এবং অন্যান্য দিনের উপাসনাদি ভাই অখিলচন্দ্র রায় সম্পাদন করেন।

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভ্রাতা খড়্গসিংহ ঘোষ প্রভৃতি আগমন করায় এবার বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১১ই ফাল্গুন) "ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন" প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধন,—আচার্য্য ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু; সন্ধ্যায় উপাসনা,—আচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ। ২৪শে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন, পাঠ ও আলোচনা হয়। ২৫শে সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 'ভক্তের উৎসব' সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী কথকতা করেন। বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৈকালে বালকবালিকা-সম্মিলন ও সন্ধ্যায় ইংরাজী বক্তৃতা, বক্তা প্রফেসার খড়্গসিংহ ঘোষ। বিষয়—Present day Religious crisis। ২৭শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত মন্দিরে প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসু; তৎপর মধ্যাহ্নে শ্রীমতী অকিঞ্চন বসুর গৃহে প্রীতিভোজন। সন্ধ্যায় উপাসনা—আচার্য্য অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ। ২৮শে প্রাতে ব্রাহ্মিকা-উৎসব—আচার্য্যা : শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু, পরে শ্রীমতী অকিঞ্চন বসুর গৃহে প্রীতিভোজন; সন্ধ্যায় শ্রীমতী মণিকা চাটার্জ্জির গৃহে উপাসনা—আচার্য্য ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসু, পরে প্রীতিভোজন। ১লা মার্চ্চ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দাসের গৃহে তরুণসম্মিলন ও শান্তিবাচন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ, বক্তা অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ, পরে প্রীতিভোজন। ২রা মার্চ্চ, পরম ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরে সদলে প্রচারযাত্রা, প্রাতে মুঙ্গের মন্দিরে উপাসনা—আচার্য্য ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু, পরে প্রীতিভোজন, সন্ধ্যায় উপাসনা—আচার্য্য অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
14th. April, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে কালের পরম অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কালচক্র, সময়-চক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে। একটী পুরাতন বৎসরের তিরো-ধান, একটী নববর্ষের আগমন তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তুমি বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা হইয়া, এই কালচক্রের সঙ্গে বিশ্বের ভাগ্যকে এমন জড়িত করিয়া রাখিয়াছ যে, এই কাল বা সময়ের সদ্ব্যবহারের উপর বিশ্বের তোমার সকল পুত্র কন্যার উচ্চ ভাগ্য ও জীবনের পূর্ণ উন্নতি ও অমর জীবন নির্ভর করে। আমাদের জীবনে কাল-চক্ররূপে কত এরূপ বর্ষ আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে। আমরা যে যত পরিমাণে এই সকল বর্ষের বক্ষোভরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমরা সদ্গতি লাভ করিয়াছি; যে পরিমাণে এই সময়ের অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের জীবন অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতীত জীবনে এই সময়ের কত অসদ্ব্যবহার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, স্মরণ করিয়া প্রাণ কতই ব্যথিত হয়। আজ সেই ব্যথা প্রাণে লইয়া এবং তোমার কৃপায় যতদূর সময়ের উচ্চ ব্যবহার করিয়া তাহার শুভ ফল লাভ করিয়াছি, তাহা স্মরণে আশা বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া, তোমার চরণতলে আমরা উপস্থিত। জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি, তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমার শিক্ষাধীন না হইলে, আমরা তোমার অযাচিত দানরূপ অমূল্য সময়ের কোন সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। সময়ের বিশেষ চিহ্নিত ভাণ্ডার করিয়া, এই নববর্ষকে স্বর্গের বিশিষ্ট দানরূপে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছ। আমাদের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধু ভক্তগণ এক একটি বৎসরের সদ্ব্যবহার করিয়া আপনাদের জীবনে কত ধন্য হইয়াছেন, তোমাকেও কত মহিমান্বিত করিয়াছেন। এই একটী বৎসরের বক্ষে আমাদের জন্য যেমন বহু অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে, তেমনই কত রোগ, শোক, বিচ্ছেদ, দৈন্য, দুঃখরূপ কত প্রতিকূল অবস্থাও রহিয়াছে। কিন্তু জানি, তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমার পরিচালনে সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে, জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সকল প্রতিকূল অবস্থাও অনুকূল হইয়া আমাদের জীবনে শুভফল দান করে, জীবনের উচ্চ গতি বিধান করে। তোমার স্বর্গের বিধান, নববিধানের সাধনা ও তাহার ক্রমিক উচ্চ সিদ্ধি জীবনে, গৃহে, পরিবারে, মণ্ডলীতে ও দেশে বিদেশে লাভ করা অপেক্ষা, আমাদের জীবনের উচ্চ সিদ্ধি, শ্রেষ্ঠগতি আর কি হইতে পারে? তাই তব চরণে এ সময় কাতর প্রার্থনা, শ্রীকেশবচন্দ্রের শুভ জন্মের শতবর্ষ

বৎসরে, তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম, তোমার শ্রেষ্ঠ দান, নববিধানধর্ম্ম সাধন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই যদি আমাদের উচ্চ সংকল্প হয়, তবে তোমার কৃপায়, তোমার শিক্ষা ও সহায়তায় এই নববর্ষের সদ্ব্যবহার করিয়া, যেন আমরা সেই উচ্চ সংকল্প-সাধনে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারি, তোমাকে মহিমান্বিত করিতে পারি, তোমার নববিধানকে জয়যুক্ত করিতে পারি, এবং তোমার এই নবযুগের নবভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনকেও জগতের নিকট গৌরবময় করিতে পারি। তুমি নিজ কৃপাতে আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!

পুণ্য বৈশাখ

একটী নূতন বর্ষ নব সাজে সজ্জিত হইয়া, মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত। এই নূতন দান, নূতন আশীর্ব্বাদের জন্য সর্ব্বাগ্রে পরম মঙ্গলময় বিশ্বরাজের চরণে আমরা প্রণাম করি। এই নব বৎসরের প্রশস্ত বক্ষে আমাদের জন্য নবজীবন, যেন জীবন, অনন্ত জীবনের কত নব নব বিকাশ ও প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার ভিতরে কত ঘটনা পরীক্ষার আকারে, রোগ শোক, শাসন, সংশোধনের আকারে উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু যাহা মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা হইতে সমাগত হয়, সে সকলই পরম মঙ্গলের জন্য। প্রতিকূল, অনুকূল, সকল ঘটনাই অনন্ত জীবনপথের পরম সহায়, এই বিশ্বাসে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া, আমরা এই নববর্ষকে ঈশ্বরের বিশেষ দানরূপে আনন্দ উৎসাহের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি।

বৎসরের প্রথম মাস, শুভ বৈশাখ মাস ভারতের আর্য্যজাতির নিকট পুণ্য মাস বলিয়া কতই আদৃত। এ মাস তপস্যার মাস, এ মাস পুণ্যব্রত-গ্রহণের মাস, এ মাস স্নান ও ধ্যানের মাস। এ মাসে আর্য্যভূমির ধর্ম্মার্থিগণ নূতন নূতন কত ব্রত নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন, কত জলদান ফলদানের অনুষ্ঠান পুণ্যানুষ্ঠানরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র নবযুগে নব আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি মঙ্গলময় বিধাতার ব্যবস্থায় এই বৈশাখের প্রথম দিনে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদের ব্রত গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মের শতবার্ষিকীর শুভ বৎসরে, এই পুণ্য বৈশাখে, তাঁহার জীবনের এই শ্রেষ্ঠব্রত-গ্রহণের স্বর্গীয় ব্যাপারকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি, মনন করি, এ সময় ইহা চর্চ্চার বিষয় করিয়া লই।

বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উত্তাপ সাধকের প্রাণে উচ্চ তপস্যা, উগ্র তপস্যা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন কি উগ্র তপস্যার জীবন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উষাকাল হইতে, বিশেষভাবে এই আচার্য্যব্রত, মহাপ্রচারব্রত গ্রহণ হইতে, তাঁহার জীবনে কি উচ্চ তপস্যা আরম্ভ হইল। ধর্ম্মের জন্য ব্রতগ্রহণ ও তাহার উদ্‌যাপন-সঙ্কল্পে বাহ্য সংসারত্যাগ, পরিবারের বন্ধনচ্ছেদন প্রভৃতি কার্য্যের মূলে কেবল তপস্যা। তিনি তো বলিয়াছেন, আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, অগ্নির উপাসক। তাঁহার জীবন শীতলতার প্রতিবাদস্বরূপ। ব্রহ্মানন্দজীবনে প্রথমতঃ বিষয়কার্য্য-পরিত্যাগ, ঈশ্বরের কার্য্যে আত্মসমর্পণ, ধর্ম্মব্রত-গ্রহণ জন্য সস্ত্রীক গৃহত্যাগ, প্রাচীন পরিবার-বন্ধনচ্ছেদন ইত্যাদি তপস্যামূলক কার্য্যের মূলে তপস্যার প্রবর্ত্তক তাঁহার জীবনে প্রার্থনা। এই এক প্রার্থনার প্রবর্ত্তনায় তাঁহার জীবনে বিচিত্র তপস্যা; তপস্যার ফল ব্রহ্মাগ্নিলাভ ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ ব্রহ্মোত্তাপ, পুণ্যতাপ গ্রহণ বিষয়ে কি মানব-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে না? বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্যের মধ্যে পরম সূর্য্য ব্রহ্ম যিনি, তিনি কি উত্তাপরূপে বর্ত্তমান নন? যদি স্বয়ং পরব্রহ্ম বাহিরের সূর্য্যের ঘনীভূত তাপের মধ্যে পরম উত্তাপরূপে বিরাজমান থাকেন, তবে সেই বহিঃ সূর্য্যের ঘনীভূত উত্তাপ পরম সূর্য্যের উত্তাপকে আত্মাতে গ্রহণ করিবার জন্য মানব-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিবে না কেন, প্রবর্ত্তনা দান করিবেনা কেন? "পুণ্যগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ, তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ"—ঈশ্বরই পৃথিবীর সকল তীর্থে তীর্থে, সাধু জীবনে জীবনে, ফলে ফুলে পুণ্য গন্ধ। ঈশ্বরই সূর্য্য চন্দ্রের প্রকৃত তেজ। আবার তিনিই সর্ব্বভূতে জীবনরূপে বিরাজমান, তিনিই তপস্বিজনের তপস্যার উত্তাপ। "জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।"

যেখানে শক্তির ঘনতা, সেইখানেই শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ। বৈশাখের সূর্য্যের মধ্যে উত্তাপের সমধিক ঘনতা। সেই উত্তাপের ঘনতা মধ্যে ব্রহ্মোত্তাপের ঘনতার স্পর্শ সহজে লাভ হওয়া সম্ভব বলেই, বৈশাখের সূর্য্যোত্তাপের মধ্যে পুণ্যতেজ, বৈশাখের সূর্য্যোত্তাপের মধ্যে

সাত্ত্বিকতার সর্ব্বাধিক লীলা-খেলা। তাই বৈশাখের সূর্য্যোত্তাপের মধ্যে উচ্চ তপস্যার প্রবর্ত্তনা।

এই পুণ্য বৈশাখে মহাতপা শ্রীবুদ্ধের জন্ম, উচ্চসিদ্ধি, ও মহা প্রয়াণ। এই পুণ্য বৈশাখের তপোভাব আমাদের মত তাপহীন, তপস্যাহীন ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মোত্তাপ গ্রহণ জন্য কেমন উদ্বুদ্ধ করে! বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ বহির্জ্জগতের, প্রকৃতিরাজ্যের সকল প্রকার দূষিত পদার্থকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া প্রাকৃতিক জগৎকে সর্ব্বপ্রকার দোষমুক্ত করে, নির্ম্মলতা দান করে, ভূমিকে উৎপাদিকাশক্তি দান করে। তেমনই বৈশাখের পুণ্যোত্তাপ মানবপ্রাণকে তপস্যানিরত করে, অন্তরের যাহা কিছু দূষিত, তাহা হইতে মুক্ত করে, মানবচিত্তকে শুদ্ধ করে, নির্ম্মল করে, বিবেকপরায়ণ করে, ব্রহ্মতেজে ও ব্রহ্মাগ্নিতে পূর্ণ করে। এই পুণ্য বৈশাখ আমাদের মত অসাধিত জীবনকে তপস্যা, ধ্যান ধারণাতে নিরত করিয়া, স্বদেশের বিদেশের সকল যোগী তপস্বী, সাধু ভক্তের জীবনের প্রতি সচেতন করে, আকৃষ্ট করে এবং ক্রমে সেই সকল উচ্চ জীবনের সঙ্গে মিলন সংস্থাপন করে।

হে পুণ্য বৈশাখ, তোমার পুণ্যতাপে উদ্বুদ্ধ হইয়া নবযুগের উগ্রতপা নববিধানের মহা সমন্বয়াচার্য্য শ্রীকেশব-জীবনের উচ্চ তপস্যার পরিচয় যেমন লাভ করিতেছি, তেমনই প্রাচীন ভারতের উগ্রতপা কত ঋষি আত্মা, যোগী আত্মা, ভক্তাত্মা, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি তাপসজীবনের তপস্যার পুণ্য গন্ধের সুখদ আস্বাদন গ্রহণ করিতেছি। তাঁহাদের জীবনের উত্তাপ আমাদের এই সামান্য মলিন জীবনকে সত্যই পৃথিবীর সকল উগ্রতপা সাধু আত্মাদিগের দিকে নবজাগরণ দান করিতেছে। তুমি সত্যই নববিধানের সাধু-সমাগম-সাধনের প্রবর্ত্তক হইয়া সাধুসমাগম-সাধনে আমাদিগকে ধন্য করিতেছ। হে পুণ্য বৈশাখ! তোমার মধ্যে পুণ্যের অনন্তখনি যিনি, তাঁহাকে তোমার মধ্যে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করি। হে বৈশাখের সূর্য্য! তোমার প্রচণ্ড তাপের মধ্যে সূর্য্যের সূর্য্য পরম সূর্য্য যিনি, তাঁহাকে তোমার মধ্যে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করি। হে পুণ্য বৈশাখ! তুমি সময় হিসাবে এই নববর্ষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। তোমার সদ্ব্যবহার করিয়া যেন তোমার গৌরব রক্ষা করিতে পারি, তোমার গৌরবে লাভবান্ হইতে পারি, এবং তোমাকে যিনি এই স্বর্গীয় গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়া ধন্য হইতে পারি। তিনি তাঁহার অযাচিত কৃপাগুণে আমাদের সহায় হউন।

—:—

নববিধান

রাজবিধির ব্যবস্থাপকসভায় সময়ে সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধি পরিবর্ত্তন করিয়া নব নব বিধি প্রবর্ত্তিত ও জাহির করা হইয়া থাকে। যখন যে নববিধির প্রবর্ত্তন হয়, তখন সেই বিধি অনুসারেই রাজ্য শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন আর পূর্ব্বকার বিধি চলে না। অবশ্য যখন যে নববিধির প্রবর্ত্তন হয়, তাহার ভিতর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধির সার সত্য নববিধিতে অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান নববিধানও সেইরূপ। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বিধানই অঙ্গীভূত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিধাতা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই নববিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ইহা মানিতে হইবে। ইহার উপর মানুষের বুদ্ধি বিচার চলিবে না, কিম্বা নিজ নিজ ইচ্ছা বা সুবিধামত বাদ সাদ দিয়া লইলেও চলিবে না। ষোল আনা মানিতে হইবে।

—

খাঁটী টাকা

টাকাটী রূপার, তাহাতে যাহা কিছু মুদ্রিত থাকিবার, সকলই আছে। তাহাতে সম্রাটের মুখ অঙ্কিত, কিন্তু বাজাইতে গেলে একটু বাজনা কম। যেখানে লইয়া যাই, কেহ তাহা লইতে চায় না। টাকাটি বাজারে চলে না। এমনই ধর্ম্মের বাজারেও ধর্ম্মের খুব উচ্চ চিহ্ন সকল থাকিলেও, যদি বাজনায় একটু কম হয়, তাহা হইলে চলিবে না, কেহ লইবে না। ষোল আনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, জীবনের পরীক্ষায় বাজাইয়া খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, সে ধর্ম্ম চলিবে না। ভাব উচ্চ হইলেও, ভাষা শব্দ যদি একটু মিষ্ট না হয়, মিষ্ট কম হয়, এ বাজারে চলিবে না।

—০—

আত্মনিবেদন

(পরমভক্তিভাজন প্রেরিত দাস ভক্ত, স্বর্গগত দুর্গানাথ রায়ের দাসমণ্ডলী কর্ত্তৃক পারলৌকিক অনুষ্ঠানে পঠিত)

বন্ধুগণ,

আজ আমরা গভীর প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভক্তির পূর্ব্বাভাস আমাদের জীবনে অনুভব করিতেছি। যিনি প্রেম, ভক্তি, পুণ্য, বিশ্বাস ও শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবিত হয়ে, শেষে আজ ১৭দিন হল, পরম পিতার স্নেহময়ক্রোড়ে, ৺কেশবচন্দ্র ও ৺যদচন্দ্রের সঙ্গে হাসি

হাসি মুখে চতুর্দ্দিকে মধু ছড়ায়ে বিচরণ করিতেছেন। আজ তিনি আমাদের জীবনাকাশে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের জীবনও মধুময় এবং প্রেম, পুণ্য, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণালোকে আলোকিত করিবার জন্ত আমাদের নিকট অবিভূ'ত হইয়াছেন।

শ্রাদ্ধ দুই ভাবে সম্পন্ন হয়। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে আমরা পরম পিতার ক্রোড়ে মৃত আত্মাকে শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করিতে দেখিয়াই সুখী এবং তজ্জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত শরীর পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলি। আর তাঁহাকে আসক্তিপূর্ণ পৃথিবীতে চাহি না। খ্রীষ্টভক্তগণ মৃত ব্যক্তির শরীর মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখেন এবং আত্মার পুনরুত্থান বিশ্বাস করেন।

আমরা নববিধানবিশ্বাসিগণ এই উভয় ভাবই গ্রহণ করি। এবং বিশ্বাস করি যে, বিশ্বাসীর আত্মা যেমন একদিকে ভগবানের প্রেম-ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়ে শান্তির অধিকারী হন, সেইরূপ অনুগামিগণের জীবনে পুনরুত্থানের জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, আজ আমরা আমাদের এই ভক্ত-সন্তানের জীবনের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছি ও তাঁহার আহ্বান শুনিতেছি। তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে মূর্ত্তিমান হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অহো! আমরা অনুভব করিয়া তাঁহার প্রেমময় জীবনের পূর্ণজ্যোতি আমাদের জীবনকেও আলোকিত করিতেছে, অনুভব করিতেছি।

বন্ধুগণ! ঢাকাতে নববিধানের ব্রহ্মলীলা এক অপূর্ব্ব কাহিনী। যাঁহারা আচার্য্য ৺বঙ্গচন্দ্রের "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই পাপীর জীবনে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইয়াছেন। এবং যাঁহারা মহাজন বা অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন লোক নহেন, তাঁহাদের জন্যও যে ভগবান্ তাঁহার প্রেম, ভক্তি, পুণ্য বিশ্বাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাইয়া আনন্দিত হইবেন।

যাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার জীবন ইহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। বন্ধুগণ, আমি আচার্য্য ৺বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে থাকিবার সুযোগ পাই নাই। তাঁহার জীবনের সাক্ষ্য মাত্র তাঁহার আত্মজীবনীতেই পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ভক্ত ৺দুর্গানাথ ও বিশ্বাসী ৺মহিমচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, আমি তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর ভাবের অনেক পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছি।

দুটি জীবনকেই ভগবান্ আস্তে আস্তে প্রেম, ভক্তি, পুণ্য, বিশ্বাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকা নগরীর বক্ষে বিচরণ করিতে সুযোগ দিয়াছেন। দুজনই দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, ঘরে ঘরে প্রেম ভক্তি বিলাইয়া ও মানুষ ধরিয়া বিচরণ করিয়াছেন। অবশেষে মধুময় জীবন লাভ করিয়া, চতুর্দ্দিকে মধু ছড়াইয়া, আস্তে আস্তে শেষে কেবল প্রেমময়ের ক্রোড়েই শান্তিতে বিশ্রাম করিতেন। ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

তবে তিনি শেষ জীবনে দু'জনকে দুইভাবে কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিয়া, শেষে তাঁহার প্রেমময় বক্ষে আশ্রয় দিয়াছেন। বিশ্বাসী ৺মহিমচন্দ্র অটল বিশ্বাসের অগ্নি জ্বালাইয়া, সংসারের দুঃখ ও বিদ্রূপকে পোড়াইয়া, শেষ জীবনে প্রেম ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে, ভগবানের বক্ষে স্থান পাইয়াছেন। আর ভক্ত ৺দুর্গানাথ বিশ্বাসের দুর্গে বাস করিয়া, রোগক্লিষ্ট শরীরের যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করিয়া, সকলের নিকট হাসি ছড়াইয়া ও সকলকে প্রেম বিলাইয়া, হাসিতে হাসিতে মায়ের বক্ষে স্থান পাইয়াছেন।

বন্ধুগণ, আমরা তাঁহাদের অযোগ্য সন্তান এবং অনুগামিগণ আজ এই পবিত্র দিনে তাঁহাদিগকে কি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারি? কি শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহাদের গ্রহণ-যোগ্য হইবে? আমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন; আমরা কি তাঁহাদিগকে আনন্দ দিতে পারি? এমন যোগ্যতা আমাদিগের আছে? চারিদিকে আঁধার অবিশ্বাসের মায়া বিস্তৃত হইতেছে। পৌত্তলিকতা নানা বেশ ধারণ করিয়া চিদানন্দ হরির মুখ তমসাচ্ছন্ন করিতেছে। জাতিভেদ আভিজাত্যের আকারে ব্রাহ্মসমাজকেও কলুষিত করিতেছে। ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শলাভ নববিধানেও হাসি তামাসার বিষয় বলিয়া কথিত হইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতার আদর্শ ক্ষীণ হইতেছে। ইহা দেখিয়া স্বর্গবাসীগণ কি দুঃখে অভিভূত হইতেছেন না? নিশ্চয় হইতেছেন। একবার অন্তশ্চক্ষু খুলে, বন্ধুগণ, দেখুন, চিতায় ভস্ম নির্ব্বাণ না হইতে হইতে, তাঁহারা দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনাদের নিকট আত্মসমর্পণ ভিক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখুন কেমন প্রেম-নয়নে চাহিয়া আছেন। কত ব্যাকুলতা ঐ চাহনীর মধ্যে। কত স্নেহ, কত মমতা; কি করুণনয়নে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বন্ধুগণ এত প্রেমের প্রতিদান কি আপনারা কিছু দিতে অগ্রসর হইবেন না? তাঁহারা চান ভগবচ্চরণে আত্মদান এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচার। আপনারা যদি এই করুণ দৃষ্টির আকর্ষণে পড়ে থাকেন, তবে আর মোহ এসে আপনাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। আমরা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। আমরাও তাঁহাদের ন্যায় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, নববিধানকে জীবনে ও জগতে জয়যুক্ত করি।

বন্ধুগণ, চেয়ে দেখুন, জগৎটা কিরূপ অসার হয়ে আছে; আমাদের ধর্ম্মজীবনটা কিরূপ স্থবির হয়ে আছে। সাংসারিক বিষয় সকল যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়া থাকি, ধর্ম্মজীবনটাকেও তাহাই করিয়াছি।

হিন্দুগণ বার মাসের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মোৎসব, ভিন্ন ভিন্ন সাধন ভজন, মালা জপ প্রভৃতি ঠিক নিয়মমত করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ঐ সব সময় ছাড়া যেমন আসক্তির মধ্যে ডুবিয়া থাকা, তেমনই ডুবিয়া আছেন। জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। সংসারের যাবৎ কার্য্যের মধ্যে পূজা আহ্নিক ও জীবনটা কার্য্য মাত্র। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও প্রায় তাহাই।

ব্রাহ্মগণও রবিবাসরীয় উপাসনার সময়, কিম্বা বিশেষ উৎসবাদির সময় ছাড়া, ব্রহ্মমন্দিরতলে বসিবার অবসর পান না। এই তো আমাদের অবস্থা, এ দুর্দ্দিনে পরলোকগত ভক্ত আত্মাগণ বড়ই ব্যথা অনুভব করিয়া থাকেন।

তাই বলি, যদি আমাদের প্রত্যাশাগুলি প্রকৃত হয়, তবে আজ আমরা আত্মসমর্পণ শিখি ও এই ভক্তগণের অনুসরণ করিয়া, জীবন্ত ব্রহ্মের উপাসক হইয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করি। আমাদের সমস্ত সাংসারিক জীবন ধর্ম্ম দ্বারা পালিত হউক এবং আমরা জীবন্ত ও উন্নতিশীল ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া ধন্য হই। ধর্ম্মজীবনটা যেন স্তরে স্তরে উঠিতে পারে এবং কেবল অগ্রসর হইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ঋক্‌বেদে 'লোকজয়' একটা কথা আছে। স্বর্গের বিভিন্ন স্তরকে 'লোক' নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং এই লোক সকলকে জয় করিয়া অর্থাৎ দখলীকৃত করিয়া, লোক হইতে উন্নততর লোকান্তরে পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া, কেবল অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান্ আজকার দিনে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীউমাপ্রসন্ন ঘোষ।

—•—

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(বা স্থগিতগতি)

(২)

পূর্ব্ববারে আমরা কেশবচন্দ্রের যে "সতর্কবাণী" উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, তাহা হইতেই আমাদিগের শিক্ষালাভ হইবে যে, এরূপ ভাবে প্রতি ধর্ম্মজীবনের অবস্থা এবং সমষ্টিগতভাবে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা রেলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বোম্বে যাইবার পথে এবং আমাদের পার্ব্বত্য অঞ্চলের পথে দেখিয়াছি যে, যাত্রিগণকে বহুসংখ্যক সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতে করিতে চলিতে হয়। যখনই সুড়ঙ্গগুলির ভিতর দিয়ে যাইতে হয়, তখন ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। মনে বিভীষিকা উপস্থিত হয়, আবার সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইলেই দিব্য আলোক—বিচিত্র দৃশ্য। ব্রাহ্মসমাজ এখন চলিতে চলিতে আমাদিগকে লইয়া নানা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। সাবধান! কোন ভয়ের কারণ নাই। বাহির হইলেই পুনরায় উজ্জ্বল আলোক, তৃপ্তিকর আবেষ্টন (surrounding) এবং অভিনব সৌন্দর্য্য। আমাদিগের দেশের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে দেখিয়া আসিতেছি যে, প্রতি শীত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষাবলীর শুষ্ক অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে; দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের যাবতীয় পত্রাবলীই শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, বৃক্ষের সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বৃক্ষটি মৃতবৎ পরিদৃষ্ট হয়। অপেক্ষা কর, শীত ঋতুর অবসানে কোথা হইতে যেন কি নূতন আবহাওয়ার সঞ্চার হইল, অমনি আবার শুষ্ক তরুও যথাযথরূপে পল্লবে ভূষিত হইয়া নূতন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে লাগিল, ইহা আমরা প্রতি বৎসরই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। তাই ভরসা বিশ্বাস করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগে এক "নব বোধিদ্রুম" এক "অকৃত্রিম অক্ষয়বট"; আমরা সকলেই এই মহা পবিত্র বৃক্ষের পত্রাবলী! স্বয়ং বিধাতা পরব্রহ্ম ইহার গভীরতম মূলদেশে জীবনীশক্তি (vitality) হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে আমাদিগের প্রতি তাকাইয়া নানাজনে নানাভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। অন্য সকলের কথা না বলিয়া, আমরা মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আমাদিগের প্রতি মনোভাবের কথাটিই এখানে গর্ব্বের সহিত স্বীকারকরতঃ নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি যথার্থভাবে আমাদিগকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মেরা বাঙ্গালী জাতির সৈনিক পুরুষ! ইতিহাস দেখাইতেছে যে, যখন কোন বহিঃশত্রু অন্য কোন জাতিকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তখনই সেই দেশ হইতে, সেই জাতি হইতে একদল লোক আক্রমণকারীদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্য লইয়া দলবদ্ধ ভাবে বদ্ধপরিকর হয়, বাধা প্রদান করে; এমন কি, সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দেয়। এইরূপে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে যখন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সমাজ হইতে একদল লোক দলবদ্ধভাবে উত্থিত হইয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্ম (ব্রহ্মবলে বলীয়ান্) বলিয়া ঘোষণা করতঃ, অতি আশ্চর্য্যরূপে আক্রমণকারিগণের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং অসিযুদ্ধে নহে, কিন্তু মসিযুদ্ধে ও তর্কযুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ফেলে। সত্য কথা! অতি সত্য কথা!! এ প্রশংসার সার্টিফিকেট আমরা প্রতিজনে বংশানুক্রমে পুত্র, পৌত্রাদি পর্য্যন্ত "জয়মাল্যের" ন্যায় গলায় পরিধান করিয়া আসিতেছি। ব্রাহ্মসমাজ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে যে, আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ই এই নানাবিধ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সার্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি তাঁহার যৌবনের উপক্রমেই এদেশের পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গে সর্ব্ব প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং সেজন্য তাঁহাকে পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল। ইতিহাস দেখাইতেছে যে, তিনি পুনরায় কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১৮১৫সনে স্বকৃত "আত্মীয়সভা" নামক ক্ষুদ্র দুর্গের অভ্যন্তর হইতে, একদিকে পৌত্তলিকতার ও নরপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় আক্রমণকারী খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই যে, ১৮৩০ সন পর্য্যন্ত তিনি একাকীই এদেশীয় পৌত্তলিকতার রক্ষক ও সমর্থকগণকে তর্কবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহাদের পক্ষে সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ হইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকেও তর্কবাণে জর্জ্জরিত করতঃ পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজার প্রণীত যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তকাবলী আজও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরীতে পরলোকগত প্রবীণ সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র সোম কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত রহিয়াছে, তত্তাবৎই তাঁহার এই সুদীর্ঘকালের সংগ্রামের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রামমোহনের জীবন নানাদিকে সংগ্রাম করিতে করিতেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি শুধু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই নয়, সামাজিক দিক হইতেও সহমরণ রহিত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রায় একাকীই ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; এবং পরিশেষে এ সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া, কলিকাতাবাসীদিগের সমীপে, বাঙ্গালী জাতির সমীপে এবং সমগ্র হিন্দুজাতির সমীপে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, "সাধু যাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়"। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে তিনি সতী-দাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামপরিচালনের সঙ্গে সঙ্গেই, এদেশের বাঙ্গালী সমাজের কৌলীন্যপ্রথা ও তাহা হইতে উৎপন্ন বিষময় ফলস্বরূপ বহুবিবাহ-নিবারণের চেষ্টায়ও ব্যাপৃত ছিলেন। আবার দেখা যায়, একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত সংগ্রামে নিরত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির নানা ভাবে উন্নতি সাধন ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে, পুরুষদের তুল্যাধিকার না হইলেও, কতক পরিমাণে অধিকার পাইবার ব্যবস্থাতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা আমরা আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজার জীবনে দেখিয়া আসিতেছি যে, সংগ্রামের জন্যই যেন তিনি জন্মধারণ করিয়াছিলেন, জীবনের আরম্ভ হইতে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সংগ্রামেই জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার তিরোধানের নয় বৎসর পরে, আবার তাঁহার এই সংগ্রামক্ষেত্রে তদানীন্তন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, অনন্যসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রভাবান্বিত সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রিয় পুত্র, আমাদিগের ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ নবভাবে নবপরিচ্ছদে ভূষিত এবং তাঁহাদের বংশসম্ভূত রক্ষাকবচে সুরক্ষিত হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনিও মহাত্মা রামমোহনের পদাঙ্কানুসরণ করতঃ, ধর্ম্মক্ষেত্রে ও সমাজক্ষেত্রে অভাবনীয় ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজাকে যেমন প্রায়শঃ একাকীই সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দেখিতেছি যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণসহ ২১ জন মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাজ্ঞানী, মহাগুণী, সুতীক্ষ্ণ তর্ক-অস্ত্রে সুবিদ্ধ, সুনামপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত এবং জঙ্গলনিবাসী সাহসী বীর পুরুষ, অদম্য উৎসাহী রাখালদাস হালদার দেবেন্দ্রনাথের "লেপ্‌টেন্যাণ্ট" হইয়া সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্ব প্রথমেই চিরপ্রচলিত কদর্য্য ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া দিলেন। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই অনুজ্ঞা এ দেশীয় যাবতীয় স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া আসিয়াছেন; এ ব্যবস্থানুযায়ী হিন্দুসমাজ অতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। এমন কি, রাজা রামমোহন রায়ও এ ব্যবস্থা মানিয়াই চলিয়াছিলেন। এদেশে দেবেন্দ্রনাথই অকুতোভয়ের সহিত এ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেন। এদেশে কৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন; দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে কোন মানুষ অবতাররূপে পূজিত হইবেন না। যে "ব্রহ্মজ্ঞান" উপনিষদ যুগে ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, এতকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ববিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অনুসরণ করতঃ, "অদ্বৈতবাদ" "সোহহংবাদ" এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদির সাধনায়ই তত্তাবৎ পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথই এ সকল মত উঠাইয়া দিয়া স্বয়ং সাধন করিয়া গেলেন এবং আমাদিগকেও দেখাইয়া ও শিখাইয়া গেলেন যে, "এক শাখী পরে, দু'বিহগবরে সুখে বসবাস করেবে! উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা মাখা, উভে উভয়ে নিরখে।" ইহাই দর্শন করা এবং "এক জন সুরস রসাল লইছে যতনে, দিতেছে আর সখারে; আর জন লভিছে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল, সুখেতে ভোজন করে। (সখা দেখেন কেবল)" ইহাই সম্ভোগ করিবার প্রয়াসী হওয়াই উপনিষদের প্রকৃত সাধনা। দেবেন্দ্রনাথ ইং ১৮৪৫ সনে সাহসভরে প্রচলিত বেদাপ্তবাদ অস্বীকার করিয়া ফেলিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজে এত কাল বেদ "অভ্রান্ত" ও "অপৌরুষেয়" বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও স্বীকৃত হইয়াই চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ লেপ্টেনাণ্ট অক্ষয়কুমার দত্ত সাহসভরে সহসা এ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়া বসিলেন; তাঁহার সহযোগী রাখালদাস হালদারও অক্ষয়কুমারের প্রতিধ্বনি করিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোন্ সেই প্রাক ঐতিহাসিক যুগে, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ মাত্রও পরিলক্ষিত হইত না, সে সময়ের এ মতবাদ, এখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকেতে আর তিষ্ঠিতে পারে না; বেদ অভ্রান্ত, এ কথা আর কেহই বিশ্বাস করিতে পারেনা; বেদ ঈশ্বরের স্বহস্তের লিখিত, ইহা এখন হাস্যজনক বাক্যমাত্র।" এ আক্রমণে হিন্দুসমাজ বিচলিত ও বিস্মিত হইয়া গেল। এমন কি, স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার সংগ্রামক্ষেত্রের প্রধান সহায় লেপ্টেনাণ্ট দ্বয়ের সহিত একমত হইতে অপারগ হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথের প্রেরিত পণ্ডিত চতুষ্টয় পবিত্র কাশীধামে, বেদ পাঠ ও বেদের আলোচনা করিয়া আসিলেন এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও কাশীতে

গিয়া বেদ-পাঠাতে বুঝিতে পারিলেন এবং প্রেরিত পণ্ডিত চতুষ্টয়ও বুঝাইয়া দিলেন যে, অক্ষয়কুমার ও রাখালদাস যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে কোন ভ্রান্তি নাই। দেবেন্দ্রনাথ সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন। এদেশের প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত করতঃ তিনি সর্ব্বপ্রথম শূদ্রাদি সকলের সম্মুখেই বেদপাঠ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং দশ বৎসর কাল সর্ব্ব সাধারণের পাঠের জন্য, বুঝিবার জন্য, বেদ মুদ্রিত করতঃ প্রচার করিয়া ফেলিলেন। ইহা কম সাহসের ব্যাপার নহে। স্ত্রী ও শূদ্রের সাক্ষাতে বেদ পাঠ করিবেই না, এমন কি, যদি কোন শূদ্রের কাণে বেদবাক্য প্রবিষ্ট হয়, তবে সীসা গালাইয়া তাহার কর্ণবিবর বন্ধ করিয়া দিবারই ব্যবস্থা। দেবেন্দ্রনাথ সে সময়ে এক যুগ-প্রলয় ব্যাপার সংসাধিত করিয়া ফেলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তবাদ অস্বীকার করিয়াও জয়ী হইলেন এবং অবশেষে ঘোষণা করিলেন যে, বেদ অভ্রান্ত নহে, ইহা অপৌরুষেয়ও নহে, বেদে অনেক ভ্রান্তি দৃষ্ট হয় এবং ইহাও মানুষের দ্বারাই বিরচিত। দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে, তিনি রাজা রামমোহনের কোন কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নিয়ম-পদ্ধতি সমস্তই তিনি স্বাধীনভাবে নূতন প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এখন ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে আমরা সমাজক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের সংগ্রাম কিরূপভাবে কোন পথে পরিচালিত হইয়া তাঁহার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, ইহাই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দেবেন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জয়লাভের ব্যাপারগুলি দেখাইয়া, তৎপরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত, জলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ও বল বীর্য্যের এবং অফুরন্ত উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি কেশবচন্দ্র সংগ্রামক্ষেত্রে পদার্পণ করতঃ, ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হইয়া, বাঙ্গালী জাতির প্রকাণ্ড জাতীয়-ক্ষেত্রে যে সকল নূতন নূতন অভিনয় দেখাইয়া, কেবল এ দেশবাসীকে নহে, কেবল ভারতকে নহে, সমগ্র জগৎকে বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন, তত্তাবতের উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(প্রাপ্ত)

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

উড়িষ্যা—কটক

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রাদেশিক অনুষ্ঠান প্রত্যেক প্রদেশে এই বৎসরের মধ্যে করিবার প্রস্তাব অনুসারে, উড়িষ্যার পক্ষে ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে কটকে উৎসব করিবার ব্যবস্থা করা হয়। কটকের ব্রাহ্মমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী হন এবং উড়িষ্যার সকল ব্রাহ্মের এবং জন সাধারণের সহিত মিলিত হইয়া, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮ খৃঃ) হইতে ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমারোহের সহিত শতবার্ষিকীর উৎসব সম্পন্ন করেন। রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়ক এম্-বী-ঈ, ও শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী যুগ্মসম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়ারদার ও শ্রীযুক্ত মহানন্দ কর যুগ্ম-সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। উৎকল ব্রহ্মমন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এবং আলোকমালায় সুশোভিত করিয়া উৎসবের স্থান প্রস্তুত হয়। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদা মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীকে উৎসবের প্রধান কার্য্যভার গ্রহণের জন্য, শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়-দিগকে বক্তৃতাদির জন্য, শ্রদ্ধেয় ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা মহাশয়দিগকে নগরসংকীর্ত্তনের জন্য এবং শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাশ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-দিগকে সংগীত ও "সংকীর্ত্তনে উপাসনায়"র জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান করা হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, বৈকালে 'নগরসংকীর্ত্তন' করিয়া উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। উড়িষ্যা ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ভক্ত স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মধুসূদন রাও মহাশয়ের বাড়ী হইতে সংকীর্ত্তন বাহির হয়; বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ভাই নগেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। তাঁহার নেতৃত্বে ও বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা এবং অন্যান্য বন্ধুদের সহযোগিতায় কীর্ত্তনের দল প্রথমে উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাও, ইহার বিশিষ্ট কর্ম্মী ও একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গীয় বিশ্বনাথ কর এবং ভক্ত রাজমোহন বসু মহাশয়দের গৃহ হইয়া, নগরের প্রধান রাজপথ ও বাজারগুলির ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। গত মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত কলিকাতার একটী নগরকীর্ত্তন উড়িয়াতে অনুবাদ করিয়া কীর্ত্তনে গীত হওয়াতে, পথে জনসাধারণের অনেকে যোগদান করেন এবং স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া জমাটভাবে কীর্ত্তন হয়। নগরের প্রধান বাজারগুলি ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময়ে কীর্ত্তনের দল উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং তাহার পরে, শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাশ গুপ্ত প্রারম্ভিক সংগীত করিলে, শতবার্ষিকীর উদ্বোধন-কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাও উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও উৎসবের উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া এবং মহারাণী সুচারু দেবী এবং অন্যান্য সমাগত উৎসবার্থীদিগকে অভিনন্দিত করিয়া, উড়িয়া ভাষাতে মুদ্রিত একটী অভিভাষণ পাঠ করেন এবং মহারাণী সুচারু দেবীকে

কার্য্য আরম্ভ করিতে আহ্বান করেন। মহারাণী সুচারু দেবী ভাবপূর্ণহৃদয়ে সুমিষ্ট ভাষায়, তাঁহার উড়িষ্যার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ এবং উড়িষ্যার জীবনে প্রথমবার আসিবার সুযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া, প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন। আচার্য্যের মহান্ আদর্শ যাহাতে উপযুক্ত ভাবে প্রচারিত হয় এবং তাঁহার প্রেম এবং সার্ব্বজনীন ভাব যাহাতে সকলে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন, এই আশা তিনি প্রকাশ করেন। তাহার পর ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ 'The Message of Keshub'—'কেশবের বাণী' বিষয়ে ইংরাজীতে গভীরতত্ত্বপূর্ণ, অথচ প্রাঞ্জল বক্তৃতা করেন। কিরূপে কেশবচন্দ্র সমস্ত বস্তু ও ভাবকে আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ spiritualize ও universalize করিতেন, তাহা তিনি বিশদভাবে দেখাইয়া দিলেন। ইহারই ভিতর সমন্বয়ের ভাব পাওয়া যায়। এই সমন্বয়ের নিয়ম চিরকাল ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, জাতিতে জাতিতে, আদর্শে আদর্শে, এই সমন্বয়ের ক্রিয়া আবহমানকাল হইতে চলিতেছে। নববিধানে তাহারই বিকাশ এবং প্রকাশ। নববিধান সকল বস্তুকে spiritualize ও universalize করিয়া মহাসমন্বয় সম্ভব করিয়াছেন। এইদিনের বক্তৃতা ও অভিভাষণ ইত্যাদি শ্রোতৃমণ্ডলীকে গভীর তৃপ্তি দান করে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বিকাল ৪টার সময় বালকবালিকাসম্মিলন হয়। প্রায় ১৫০টি বালকবালিকা ইহাতে যোগদান করে এবং তাহাদের পিতামাতা আসিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করেন। আচার্য্যদেবের চতুর্থ কন্যা শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী এইদিনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং বালকবালিকাগণ মিলিত ভাবে একটী সংগীত করিলে পর প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী সংক্ষেপে বালকবালিকাদিগকে আচার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। যাঁহারা পরের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, পরের জন্য জীবন দান করেন, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য দৃঢ়পণ করেন, তাঁহারাই চিরস্মরণীয় হন, লোকে তাঁহাদেরই জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব করে; আর যাহারা স্বার্থপর ভাবে জীবন কাটায়, লোকে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাদের ভুলিয়া যায়। কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর সার্থকতা এই ভাবে বালকবালিকাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বালকবালিকাদিগের জন্য জলযোগ ও কিছু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সভা আলোকিত হইলে, "কল্পতরুর" উদ্যোগ করা হয় এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রিত বালকবালিকাকে ইচ্ছামত খেলনা ও মিষ্টান্নাদি পূর্ণ এক একটী উপহার দেওয়া হয়। এই সম্মিলনীতে বালক বালিকাগণ পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহাদের অভিভাবকগণও আনন্দ লাভ করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন [জোয়ারদার বক্তাকে পরিচিত করিয়া দেওয়ার পর, সুবক্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় সুললিত ও ওজস্বিনী ভাষায় "কেশবচন্দ্র ও বর্ত্তমান ভারত" বিষয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন সংযোগে দেড় ঘণ্টার অধিক কাল বক্তৃতা করেন। কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ হয় এবং কি ভাবে কেশবচন্দ্রে তাহার আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে, নানা ধর্ম্মমত সমন্বিত হয়, কি তেজ এবং উৎসাহ লইয়া কেশবচন্দ্র বর্ত্তমান ভারতে সকল আদর্শ ও চেষ্টার মূলভিত্তি স্থাপন করেন, সুন্দর ভাবে তাহা সকলের মনে গ্রথিত হয়। নববিধানের আদর্শ কি এবং কি ভাবে তাহা ক্রমে আচার্য্যের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, বক্তা তাহাও অতি স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সভাস্থল লোকসমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বক্তৃতার মূল বিষয়গুলি সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সন্ধ্যা ৫টায় কটক টাউন হলে, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর উদ্যোগে এবং উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় বিশ্বনাথ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের একখানি তৈলচিত্র উন্মোচনের সভা হয়। এই তৈলচিত্রখানি উড়িষ্যার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-সমিতি হইতে, এই উৎসব উপলক্ষে কটক টাউন হলে প্রদান করা হইয়াছে। স্থানীয় মূক বধির শিল্পী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী এই ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন। টাউনহলের ভিতরে স্থানাভাবের আশঙ্কায়, মিউনিসিপালিটি বাহিরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সভাস্থল লোকে ভরিয়া যায়। যথাসময়ে এই উপলক্ষে রচিত একটী উড়িয়া সঙ্গীত হইলে পর, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ একটী প্রার্থনা করিলে কাজ আরম্ভ হয়। শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ হইতে তৈলচিত্রখানি কটক টাউন হলকে উপহার দান এবং প্রসঙ্গক্রমে মিউনিসিপালিটির এবং জন সাধারণের উদার এবং আন্তরিক ভাবে সমিতিকে এই উৎসবের আয়োজনে সাহায্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই আয়োজনে যে সমস্ত উড়িষ্যার লোকের আন্তরিক সহানুভূতি রহিয়াছে, তাহা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের উপস্থিতিতে প্রমাণিত, ইহাও প্রকাশ হয়। তাহার পর মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানের উপযোগিতা এবং মাননীয়া ময়ূরভঞ্জরাজমাতা মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর উপস্থিতির সার্থকতা উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে তৈলচিত্রখানি উন্মোচন করিতে আহ্বান করেন। মহারাণী সুচারু দেবী হৃদয়ের আবেগপূর্ণ ভাষায় তাঁহার অন্তরের কথা নিবেদন করেন যে, তিনি উড়িষ্যারই একজন। স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীশ্রীরামচন্দ্রভঞ্জ দেওয়ের সহধর্ম্মিণীরূপে উড়িষ্যা তাঁহার নিজের স্থান, যদিও ইহার পূর্ব্বে কখনও তাঁহার এদেশে আসিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাঁহার পিতৃদেবের আদর্শের চিহ্নস্বরূপ, তিনি তাঁহার তৈলচিত্র উন্মোচন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার নিবেদনের পরে, তিনি সমন্বয়ের

পত্রাঙ্কিত আবরণ সরাইয়া দিয়া চিত্রখানি উন্মোচন করেন—প্রার্থনারত আচার্য্যের মূর্ত্তি পত্রপুষ্প এবং 'নববিধান' পতাকায় শোভিত হইয়া সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সভাস্থ সকল একযোগে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রকাশ করেন। তৈলচিত্রখানি উন্মোচিত হওয়ার পর, উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার মহিলা সদস্য শ্রীযুক্তা সরলা দেবী নানা তথ্যপূর্ণ সুললিত বক্তৃতায় আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং কি ভাবে তিনি সমস্ত দেশের, সকল ধর্ম্মসমাজের ও নারীজাতির উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহিরূপে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাহার পর সভাভঙ্গ হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় উৎসবক্ষেত্রে মহারাণী সুচারু দেবী শতবার্ষিকী উৎসবের বিশেষ উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। যাহাতে সকলে তাঁহার কথা শুনিতে পান, তার জন্য Louad speakerএর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে আগত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই উপাসনায় সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। মহারাণীর উপাসনা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিষ্ট, গম্ভীর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; যোগদানকারী, ব্রাহ্মসমাজের বা তাহার বাহিরের, সকলেই এই উপাসনায় তৃপ্তি লাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদন পাইয়া আনন্দিত হন। অধিকাংশ বাহিরের লোকেরাই ইহাতে যোগ দেন এবং উপাসনার মধুরত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। আচার্য্যের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন আচার্য্যের প্রার্থনা সুমিষ্টভাবে পাঠ করিয়া মহারাণীর উপাসনার সাহায্য করেন।

চতুর্থ দিন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে "সংকীর্ত্তনে উপাসনা" হয়। এই অনুষ্ঠানটী সম্ভব এবং সুসম্পন্ন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র দত্ত নানা অসুবিধা স্বীকার করিয়া আসিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা-ব্যাপী সংকীর্ত্তন হয় এবং সভাস্থ সকলে যোগদান করিয়া গভীর তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করেন। "সংকীর্ত্তন উপাসনা" অনেকের পক্ষে নূতন হওয়াতে, ইহা গভীর আধ্যাত্মিক সম্ভোগের বস্তু হইয়াছিল। মূল সংকীর্ত্তনকারীদের সহিত আরও কয়েকজন যোগদান করিয়া সংকীর্ত্তনে উপাসনাকে আরও জমাট করিয়াছিলেন। উদ্বোধন হইতে আরম্ভ করিয়া, আরাধনা, ধ্যান, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদি সমস্ত কীর্ত্তনের ভক্তিতে সুমিষ্ট হইয়াছিল এবং সম্ভোগকে আরও নূতন করিয়া দিয়াছিল। খোল করতালের শব্দ ভক্তিভাবকে গভীর করিয়াছিল।

উৎসবের পঞ্চম, অথবা শেষ দিনে, ১লা মার্চ্চ, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় নানাধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে উদার ধর্ম্মাদর্শের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাশগুপ্ত সঙ্গীত করিলে পর, ডাঃ ঘোষ প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন এবং এভাবে সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য কি, তাহা বলেন। তাহার পর কটকের উকীল স্বামী বিচিত্রানন্দ দাস হিন্দুধর্ম্ম, বি, এল, পরওয়ার শাস্ত্রী জৈনধর্ম্ম, কটক মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ ই, টি, রাইডার খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং মৌলবী এ, সত্তার ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান বা প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও উদার ভাব প্রদর্শন করেন। মিঃ রাইডার তাঁহার প্রবন্ধে, কেশবচন্দ্রের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যে গভীর যোগ, তাহা উল্লেখ করেন। সর্ব্বশেষে ডাঃ ঘোষ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্বের বিষয়ে কিছু বলিয়া, সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের যে আদর্শ ও স্থান, নববিধানের যে মহামন্ত্র ও বিধানতত্ত্ব, তাহা সহজ ও সুন্দরভাবায় সকলকে বুঝাইয়া দিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি করেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে উকীল শ্রীযুক্ত হরিহর মহাপাত্র জনসাধারণের পক্ষ হইতে শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোক্তাদিগকে এবং বিশেষভাবে মহারাণী সুচারু দেবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী শতবার্ষিকীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে কটকের জনসাধারণ, যাঁহারা অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, কিম্বা যোগদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, উড়িষ্যাবাসী সকলে যাঁহারা যে কোনো ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দান করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যেখানে যাহা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট আছে, উড়িষ্যার তাহা সংগ্রহ করা প্রয়োজন, কেশবচন্দ্রের আদর্শও উড়িষ্যার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, সুতরাং কেশবচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উড়িষ্যার প্রয়োজন ছিল, এই বলিয়া তিনি উপসংহার করেন। এই ভাবে পাঁচদিন ব্যাপী উৎসব শেষ হয়।

সকল দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই উৎসব সকল বিষয়ে সফল হইয়াছে। কটকের জনসাধারণ, ধনী দরিদ্র, সকলেই এই কার্য্যে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন এবং এই উৎসবের ফলে আচার্য্যের এবং তাঁহার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শের কথা জানিবার জন্য অনেকের প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। অনেকেই অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। জনসাধারণের এই আগ্রহ প্রকৃতই আশাজনক। বিশেষ করিয়া কটক মিউনিসিপ্যালিটি উৎসবের উদ্যোক্তাগণের ধন্যবাদার্হ, কারণ তাঁহারা সকল সময়ে, সকল প্রকারে, আবশ্যকে সাহায্য করিয়াছেন এবং উদ্যোক্তাগণের কার্য্যভার লঘু করিয়া দিয়াছেন।

তাহার পর, যাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া অনুষ্ঠানটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন, তাঁহারাও সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যে কটকে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলে শ্রদ্ধান্বিত এবং কৃতজ্ঞ। যাঁহারা বক্তৃতা বা সঙ্গীত-সাহায্যে এই পাঁচদিনব্যাপী উৎসবকে সকল

করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আয়োজনকারীদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

এই উৎসবে কটকের ব্রাহ্মমণ্ডলীর উৎসাহ, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনন্দের সহিত তাঁহারা নিজেদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, উৎসব সফল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও এবং শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও শ্রদ্ধেয়া মহারাণী, শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী ও রাজকুমারী জয়তী দেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিয়া এবং সুন্দররূপে সে ভার সম্পন্ন করিয়া সকলকে সুখী করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ রায় এবং শ্রীমতী প্রীতি রায়ও অতিথি-সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে যাঁহারা যাত্রিনিবাসের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। যাত্রিনিবাসে প্রায় ত্রিশজন যাত্রী ছিলেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার শ্রীমতী শান্তি বসু, শ্রীমতী ইন্দুবিভা রাও, শ্রীমতী রমলা কর, শ্রীমতী প্রতিভা কর, শ্রীমতী সুপ্রভা কর, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহানন্দ কর ও শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ কর আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের যত্ন ও সেবায় সকল যাত্রীদের তৃপ্ত করেন। এক দিকে যেমন এই উৎসব আধ্যাত্মিক সম্ভোগের বস্তু হইয়াছিল, অন্যদিকে ইহা সেবার উৎসব হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে, উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দানের কথা না বলিলে এ বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই উপলক্ষে ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, সকলের নিকট হইতে দান পাওয়া গিয়াছে এবং এই শ্রদ্ধাপূর্ণ দান ও সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য অনুষ্ঠানগুলিতে বিশেষ আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল। কয়েকজনের চেষ্টায় অর্থের অভাব কখনও বোধ করিতে হয় নাই এবং এই চেষ্টা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়ারদার এবং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রমলা জোয়ারদার, শ্রীমতী প্রীতি রায়, শ্রীযুক্ত মহানন্দ কর এবং শ্রীমতী সান্ত্বনা নিয়োগীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ইঁহারা শতবার্ষিকী উৎসব যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। উৎসবের উদ্যোক্তাগণ ইঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—•—

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব

কার্য্যবিবরণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০ই মাঘ, সোমবার, নগরসংকীর্ত্তন; প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি অনুরঞ্জিত ভাবে উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। সংকীর্ত্তনে যেমন ছোট সুর, বড় সুর, সকল সুর মিলিয়া যায়, নববিধানে আমরা যেন তেমনি একখানি সুর হইয়া, সকল ভক্তগণের সুরে সুর মিলাইয়া শ্রীকেশব যেমন নববিধানে ঐকতানবাদন হইলেন। তেমনি আমরা যেন তাঁহার সুরে সুরে মিলাইয়া সমতানে, মম প্রাণে নগরে নববিধান ঘোষণা করিতে পারি, এবং মার তালে তাল দিয়া যেন আমরা নববিধানের মহা সংকীর্ত্তন করিতে পারি। যাহা শুনিলাম গোপনে, ভেরী বাজাইয়া নির্ভয়ে তাহা যেন বলিতে পারি। জীবন্ত মা তাঁহার চির জীবন্ত নববিধানমূর্ত্তিমান শ্রীকেশবকে লইয়া, মৃতদিগকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যে সসন্তানে সপরি-বারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা যেন সদলে তাঁহারি সুরে সুর মিলাইয়া নববিধান-সুধা বিলাইতে পারি। তদ্দ্বারা আমরা আপনারাও বাঁচিয়া যাইব এবং জগৎকেও বাঁচাইয়া ধন্য হইব, এই ভাবে প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় "নব নৃত্য" বিষয়ে আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সংকীর্ত্তনের দল বিধানমুরলী সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের নেতৃত্বে ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া, শ্রীযুক্ত পুলক-চন্দ্র সিংহ রচিত নবসংকীর্ত্তনটি করিতে করিতে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাঙ্গণে যাইয়া উন্মত্ত কীর্ত্তন করেন এবং সেখান হইতে কয়েকটি রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া নবদেবালয়ে আসিয়া জয়োচ্চারণ ও শান্তিবাচন করেন। ভ্রাতাদিগের সঙ্গে ভক্তিমতী ভগ্নীদলও সংকীর্ত্তনে অগ্রগমন করিয়া, ভক্তির উন্মত্ততা বর্দ্ধন করেন। সংকীর্ত্তনান্তে শান্তিকুটিরে প্রীতিভোজন হয়।

১১ই মাঘ, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বহুজ্ঞানগর্ভভাবে ও ওজস্বিনী ভাষায় উপাসনা করেন; এবং সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এই দিন আচার্য্যদেব বন্ধুদিগকে লইয়া প্রায়ই আদি সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনায় যোগ দিতে যাইতেন। এবারেও কেহ কেহ সেখানে গমন করেন। ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া যে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন, তাহার সহিত সমযোগসাধন অদ্যকার উৎসবের বিশেষ সাধন। এই ১১ই মাঘে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা হইতেই নববিধানের অভি-ব্যক্তি ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিধানের প্রসারণ হইল। ইহাই অদ্যকার বিশেষ চিন্তা ও উপলব্ধির বিষয়। (ক্রমশঃ)

—•—

আর্য্যনারী-সমাজ

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নারীদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও ও উন্নতিসাধনের জন্য, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উচ্চ শিক্ষার মধ্য দিয়া যে সকল নারী-চরিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহাদের জীবনের প্রভাব ও সৌরভ এই

মণ্ডলীতে চির জাগ্রত, তাঁহাদের অমূল্য দেবী-জীবন আর্য্যনারী-সমাজের স্বর্গীয় সম্পদ, তাঁহারা চির স্মরণীয় ও চিরজীবী।

আর্য্যনারী-সমাজ বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রকলেবর। অতীত গৌরব শিরোধার্য্য করিয়া ও ইহার উচ্চ আদর্শ বক্ষে লইয়া, এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। দুঃখের বিষয়, আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশন গত বৎসরে নিয়মিত ভাবে হয় নাই। সভ্যাগণের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা আর্য্যনারী-সমাজকে নব উৎসাহে উৎসাহিত করুন, সাহায্য দ্বারা তাহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করুন। শ্রীব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের শত-বার্ষিকী আগতপ্রায়; এই সময়ে যাহাতে আর্য্যনারীসমাজ নব জীবনে পুনর্জীবিত হইয়া, সকলের প্রাণে নূতন আশা সঞ্চারিত করে, তাহার জন্য সকলে যত্নবতী হওয়া প্রয়োজন। এ বৎসরে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া, তাঁহার সুমিষ্ট উপাসনা দ্বারা সকলকে সুখী ও তৃপ্ত করিয়াছেন। এবৎসর যাহাতে অধিবেশনে ভগ্নীগণ নিয়মিতরূপে যোগদান করিতে পারেন, তাহার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি। গত দুই বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

জমা	খরচ
১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদা—৫১৸০	১৯৩৬ খৃঃ—৬৯৸৵০
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চাঁদা—১৯৸৵	১৯৩৭ খৃঃ—৬৮৸৶
মোট জমা—৭১৷৵	১৩৮৸৴

দুই বৎসরের ব্যয়ের তালিকা:—

শ্রীমতী বিভাবতী গুহ ৪৮৲, শ্রীমতী সত্যবালা দেবী ২৪৲, শ্রীমতী তিনকড়ি দেবী ২৪৲, শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ২৪৲, অন্য আটজন বিধবা ৭৷০, গাড়ী ও ট্রামভাড়া ৭৷৶০, মণি অর্ডার ১৷৵, বকসিস ২৷০। মোট ব্যয়—১৩৮৸৴০।

গত দুই বৎসরে আয়ের অধিক ব্যয় হইয়াছে। সভ্যাগণ নিয়মিত চাঁদা দান করিলে কৃতজ্ঞ হইব।

নিবেদিকা
শ্রীমণিকা মহলানবিশ
সম্পাদিকা।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৩০শে চৈত্র, ৩৬নং হ্যারিসন রোডে, ডাঃ জগন্মোহন দাসের জন্মদিন উপলক্ষে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা ও ডাঃ দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

১লা বৈশাখ, শ্রীহট্টে, তত্রত্য সবডেপুটি কলেক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রেমকুমারের জন্মদিনে, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ডাঃ মহিমচন্দ্র চৌধুরী উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শুভবিবাহ—গত ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল), বালীগঞ্জে ১৪নং পাম এভিনিউ ভবনে, শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ জয়ন্তনাথের সহিত, রায় বাহাদুর হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অরুণার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

উৎসব—

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম বার্ষিক উৎসব নিম্ন-লিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে:—১৪ই ফাল্গুন, শনিবার, রাম-নগর বালিকাবিদ্যালয়ে প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও উদ্বোধন এবং সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হয়। ১৫ই প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের মূল মত ও সকল মানুষ যে এক ও অভিন্ন, সে বিষয়ে অতি মিষ্ট উপদেশ হয়; এবং অপরাহ্ণ ৫টায় স্থানীয় পাব্লিক লাইব্রেরীর হলে 'স্বরাজের প্রয়োজন ও যোগ্যতা বিষয়ে' সারগর্ভ বক্তৃতা হয়। ১৬ই প্রাতে প্রেমনিকেতনে উপাসনা, মধ্যাহ্নে ২ ঘটিকায় রামনগর বালিকাবিদ্যালয়ে 'মহিলা-সমিতির' উৎসবে, প্রায় দুইশত মহিলার সমাবেশে, মহিলা-সমিতির শুভ উদ্দেশ্য বিষয়ে উপদেশ, অপরাহ্ণ ৫টায় রামনগর বালিকাবিদ্যালয় হইতে চারিটি কীর্ত্তনের দলযোগে নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের দল নগরের দুইমাইল প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে কীর্ত্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ১৭ই প্রাতে উপাসনা, তৎপর ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা, মধ্যাহ্নে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উদ্যানসম্মিলন ও তথায় একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনী হয়। শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন গ্রামের বহু লোক যোগদান করেন পল্লীসংস্কারমূলক একটি বক্তৃতা ও 'ব্রহ্মশাসনের' ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় শান্তিবাচনান্তে উৎসব শেষ হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই উপলক্ষে শান্তিপুরে যাইয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা সকলের প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহদানে উৎসবকে সফল করেন।

গত ৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) সন্ধ্যায় ৫৩নং কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি লেনে, স্বর্গীয় বসন্তকুমার দাসের গৃহে, বাঁটরা ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গৌরাঙ্গ-উৎসব—গত ৫ই এপ্রিল, সন্ধ্যাকালে, উলটা-

ডাঙ্গা ব্রহ্মমন্দিরে, নববিধান ট্রষ্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "গৌরাঙ্গ-উৎসবে" সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়; ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

পারিতোষিক বিতরণ—বাগনান কল নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক উৎসব, গত ২৬শে মার্চ্চ, তত্রত্য হাই স্কুল হলে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। হাইকোর্টের মাননীয় জজ মৌলবী নাসিম আলি সাহেবকে সভার নেতৃত্বে বরণ করা হয়। শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ মল্লিক প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রার্থনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং অভিনয়াদি করার পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধানভূষণ মল্লিকের কার্য্যবিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায়, বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাথমিক হইতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দিতেছেন, তাহাতেই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালনা করা হইতেছে। এ জন্য গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়। বিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক মাত্র ১৲ খাজনায় প্রায় ৪বিঘা খাসমহল জমি জমা দিয়াছেন। ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। এ জন্যও গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সভাপতি জজ সাহেব গৃহনির্ম্মাণের জন্য ২৫৲ দান করিয়া, স্থানীয় ব্যক্তিগণকে তৎসম্বন্ধে মনোযোগী হইতে উৎসাহিত করেন।

গত ৯ই এপ্রিল, এলবার্ট হলে, কেশব একাডেমী স্কুলের পুরস্কারবিতরণ রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ছাত্রগণের আবৃত্তি, ড্রিল, ব্যায়াম-ক্রীড়াদি সবই সুন্দর হইয়াছিল।

আমরা উভয় বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিশেষ উপাসনা—গত ১০ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। কেশবচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকীর প্রস্তুতি সম্বন্ধে আত্মনিবেদন করেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা প্রায় সকলে যোগদান করেন। বালেশ্বরে শত-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২রা এপ্রিল, চট্টগ্রামের নন্দনকাননে, ৺নবীনচন্দ্র চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক পবিত্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস পাঠাদি করেন। পুত্র শ্রীমান্ সুব্রত চৌধুরী সংক্ষিপ্ত পিতৃজীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। অদ্য এই উপলক্ষে কলিকাতায় বেলগাছিয়ায় পিসীশাশুড়ীর গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, পিসীশাশুড়ী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল), বালেশ্বরে স্বর্গীয় ধ্রুব করের পত্নী স্বর্গীয়া সুমতি করের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্র-কন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভাই নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ কর প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। মাতৃদেবীর আত্মার কল্যাণার্থে পুত্র ও কন্যাগণ বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে ২৲, বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরে ১৲, কলিকাতায় প্রচার আশ্রমে ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১৲ অনাথ আশ্রমে ২৲, কুষ্ঠাশ্রমে ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲, পুরী নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ১৲, মোট ১২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগের কল্যাণ করুন এবং আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

স্মৃতি-সভা—গত ১২ই এপ্রিল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে, স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের ষড়্‌বিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর (M.L.A. Ex-Mayor) সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। মিঃ কে, কে, বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং সভাপতি স্বর্গীয় আত্মার গুণগুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহিরূপে ব্যক্ত করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৯ই চৈত্র, দেউলটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অমলচন্দ্রের পরলোকগতা মধ্যমা কন্যা প্রীতির প্রথম সাম্বৎসরিকে কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে ১৲ এবং সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৭ই মার্চ্চ, গৃহস্থপ্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিকে, ৫।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবী প্রার্থনা করেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ, ৩২নং প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমন্তকুমার চাটার্জ্জির গৃহে, তাঁহার অনুজ ভ্রাতা স্বর্গীয় শিশির-কুমার চাটার্জ্জির পত্নী স্বর্গীয়া পরিমল দেবীর সাম্বৎসরিকে হেমন্ত-বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী উপাসনা করেন এবং হেমন্তবাবু প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

আলীপুরে, ২৮নং নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, গত ১০ই এপ্রিল প্রাতে, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে, পঞ্চম পুত্র অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং ১২ই এপ্রিল, রাত্রে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়-কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা পিতৃস্মৃতিতে ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ১০ই এপ্রিল, ২৪নং তারক চাটার্জ্জি লেনে, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের পালকপুত্র ৺শতদলকৃষ্ণের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং পিসিমাতা (ভাই কালীনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী) বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১১ই এপ্রিল, বালীগঞ্জে ৬৭।১ একডালিয়া রোডে, শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাসের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা এবং বেণীবাবু প্রার্থনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
৮ম সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
29th. April, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩.

প্রার্থনা

মা, তোমার নবশিশু শ্রীকেশবচন্দ্রের নবজন্মশতবার্ষিকী আমরা কেমন করিয়া সম্পাদন করিব, তুমি বলিয়া দাও। তুমি তোমার অপার করুণাগুণে, এই কলির মানবকুলে এমন কুলপাবন সৎপুত্র জন্মদান করিয়াছ। তুমি যেমন তাঁর আদর যান, এমন কে জানে? তাই তুমি, মা, বলিয়া দাও, আমরা কেমন করিয়া তাঁর শততম জন্মোৎসব সাধন করিব। অন্ধ যেমন আলো দেখিতে পায় না, তেমনি তোমার শ্রীকেশবচন্দ্রকে যদিও আমাদের এত নিকটে উদয় করিলে, তথাপি, কই আমরা তাঁহাকে তেমন চিনিলাম? আমরা আমাদের আমিত্ব ও অহংজ্ঞানে তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম না। তাই কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের সর্ব্ব প্রথমে আমিত্ব বিলোপ কর। কেশবচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে আমিত্বহীন করিয়াই, তাঁহাকে সকল মানবের সহিত সদল ও সমযোগী করিলে। আমরাও নীচ 'আমি আমি' করিয়া, অহংকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়া আছি বলিয়াই, দলের মাহাত্ম্য বুঝিতেছি না। এবং সেইজন্যই, দলবলে সাধনা বিনা যে সদল অখণ্ড কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করা হইবে না, কই তাহা বুঝিতেছি? এইজন্যই কেশবচন্দ্রের এক এক ভাব এক এক জন লইতে প্রলুব্ধ হইতেছি। এই করিয়াই যুগে যুগে সাম্প্রদায়িকতা আসিয়াছে। দোহাই ঠাকুর, তুমি আমাদিগকে সে অপরাধ হইতে রক্ষা কর। আমাদের প্রত্যেকের আমিত্ব কল্পনা তিরোহিত করিয়া, যাহাতে আমরা সদলে ও সপরিবারে সমযোগী হইয়া, সদল, অখণ্ড কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে পারি এবং তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞ সমাধান করিতে প্রস্তুত হই, এমন আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন সদল, তেমনি আবার অখণ্ড অর্থাৎ সকলকে লইয়া একজন। আমরাও ব্যক্তিগত আমিত্ববিহীন হইয়া, সকলকার বিশেষত্ব-সম্মানে সদল এবং সকলকে লইয়া একজন হইতে না পারিলে, আমরা কেশবচন্দ্রকে প্রকৃত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিব না। তিনি আমাদের নিকটে বাহিরের সম্মান চান না। আমরা যদি তাঁহাকে জীবনে গ্রহণ করিতে না পারি, কেমন করিয়া তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী করা হইবে? মা, দয়া করিয়া আমাদিগকে এ বিষয়ে যথার্থ কর্ত্তব্যপালনে প্রেরণা দান কর। তোমার প্রত্যাদেশ ও আলোকই নববিধানে আমাদের জীবনপথে একমাত্র নিয়ামক। ইহা বিশ্বাস করিয়া তোমার শরণাপন্ন হই। দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীকেশব-জীবনের কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব

যাহা বিশ্বাস, তাহা জীবনে আচরণ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মানন্দ যাহা চিন্তা করেন, সুস্পষ্ট ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন, যাহা বলেন তাহা কাজে করেন, যাহা নিজে করেন তাহা অন্যকে দিয়ে করান।" বাস্তবিক কেশবচন্দ্র যখন যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনি তাহা কার্য্যে পালন করিয়া, আচরণের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, 'আমি যাহা বলি, তাহা কাজে করি, পরীক্ষিত সত্য ভিন্ন আমি কোন কথা বলি না, আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না।' এই ব্যক্তির প্রত্যেক ইঙ্গিত সত্যেতে পূর্ণ, তাই তিনি অন্যত্র বলেন, 'চিকিৎসকের ন্যায় আমি কাণ দিয়া পরীক্ষা করিতে চাই, ভিতরের ঐক্যতান বাজে কি না?' শ্রীকেশবের অনুসরণ করিতে হইলে, কেবল মুখের কথায় হইবে না, কাজে কর্ম্মে, জীবনের সাধনায় ও আচরণে সত্যের সাক্ষ্যদান করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, 'যে ঈশার মত না হইতে পারিবে, সে যেন ঈশার নাম না লয়।' তিনি বিশেষভাবে সাধুসমাগম-সাধন প্রবর্ত্তন করিয়া দেখাইলেন, কেমন করিয়া সাধুদিগকে আত্মস্থ করিতে হয়। এইজন্য জীবনে, চরিত্রে সাধুচরিত্র-গ্রহণই শ্রীকেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাহাতেই তিনি বলিলেন, "সক্রেটিস আমার মস্তিষ্ক, শ্রীঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, চৈতন্য আমার হৃদয়, ঋষিগণ আমার আত্মা, এবং পরোপকারী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।' এই ভাবে যদি আমরা কেশবচন্দ্রকে জীবনে পরিধান করিতে পারি, এবং সকল মানবের ভিতর তাঁহার প্রতিভা প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

আমিত্বহীনতা

শ্রীকেশবচন্দ্রের আমিত্বহীনতাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। 'কোথায় আমার আমি, আমার আমি আমি জানি না; অনেক দিন হইল, আমার আমি-পাখী এ দেহ-মন্দির হইতে উড়িয়া গিয়াছে। কোথায়, আমি তাহা জানি না, সে আর ফিরিবে না।' বাস্তবিক এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমিত্বশূন্য হইয়াই কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল সাধু মহাপুরুষগণই এই আমিত্বনাশের আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণসাধন এবং শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ আমিত্ব-বলিদানেরই জীবন্ত আদর্শ। শ্রীঈশার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিলেন, 'আমি নাই, ইহাই শ্রীঈশা শিক্ষা দিলেন। ঈশার ন্যায় ঈশা নাই হইতে না পারিলে, আমরা তাঁহার জীবনের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিব না। পাপও জানি না, পুণ্যও জানিনা, তাই ঈশার ন্যায় আমি নাই হইতে চাই।' ইহাই কেশবচন্দ্রের বিশেষ সাধন। এই জন্য তিনি কোন বন্ধুর নিকটে বলিয়াছিলেন, "আমি ঈশার ফুটনোট।"

যেমন কথায় বলে, 'শূন্য ঘরে ভূতের বাসা হয়', তেমনি আমিত্বশূন্য হইয়াই, কেশবচন্দ্র পবিত্র আত্মার দ্বারা অধিকৃত ও পরিচালিত হইবার আদর্শ জীবনে দেখাইয়াছেন। সত্য সত্য আমিত্ব আমাদের সকল অহমিকা এবং সকল পাপের মূল; সকল বিবাদ বিসম্বাদ সাম্প্রদায়িকতা স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মযুদ্ধ এবং মতভেদ, ধর্ম্মভেদ এই এক আমিত্ব হইতে উদ্ভূত। এই জন্য তিনি আমাদের মধ্যে অহংকৃত ব্যক্তিত্বের আভাস দেখিয়া, তাহা নির্ব্বাণের জন্য কতই আকুল প্রার্থনা করিলেন। বাস্তবিক আমিত্বনাশ বিনা আমরা কখনই ধর্ম্মজীবনে সমুন্নত হইতে পারিব না এবং বিনয় ও দীনাত্মতা যে ধর্ম্মলাভের মূলমন্ত্র, তাহা কেমন করিয়া সাধন করিব এবং কেমন করিয়াই বা আমিত্বহীন শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রকৃত অনুসরণ করিতে পারিব? এই আমিত্বহীনতা হইতেই তাঁহার স্বাধীনতা ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা।

পাপ-বোধ

শ্রীকেশবচন্দ্রের মহা বিশেষত্ব 'পাপ-বোধ'। তিনি পাপের সম্ভাবনাকে মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। শরীর যখন আছে, প্রবৃত্তির মূল তাহাতে নিহিত আছে। মানবের অপূর্ণতা, দুর্ব্বলতা হইতেই পাপ-প্রবণতা; তাই এই পাপ-প্রবণতাকে কেশবচন্দ্র ভয়ঙ্কর দেখিতেন, পাপের ক্রিয়া অপেক্ষা পাপচিন্তাকে মহাপাপ গণনা করিতেন। তাই তিনি বলিতেন, 'অপরের চেয়ে আমি ভাল জানি, এই মনে করিলেই অহংকারের পাপ হইল। অপরের ধন দেখিয়া আমার যদি লইতে ইচ্ছা হয়, তবেই চুরি করা হইল; কাহারও উপর যদি রাগ হইল, অমনি নরহত্যা করা হইল। ঈশা কি এখানে আছেন, যেই সন্দেহ হইল, অমনি ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসের পাপ হইল।' এইজন্য তিনি

নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী বলিয়া মনে করিতেন, এবং সবার পাপকে আপনার পাপ-বোধে ছটফট করিতেন। একজন ছাপাখানার কর্ম্মচারী যথাসময়ে বেতন না পাইয়া, তার পর মারা যান শুনিয়া, তিনি নিজেকে নরহত্যার পাপে অপরাধী মনে করিয়া, আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এইরূপ পাপবোধ হইতেই যথার্থ সরল প্রার্থনার উদ্দীপনা হয়, তাই তিনি এই পাপ-বোধকেই জীবনের উন্নতি-লাভের পথ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

বাস্তবিক পাপ আমাদের মনের বিকার, মনের রোগ; রোগ-নির্দ্ধারণ হইলে যেমন রোগনিবারণের ঔষধের ব্যবস্থা হয়, তেমনই পাপবোধ প্রবল থাকিলে আমাদের প্রার্থনারূপ মহৌষধই লাভ হয়। আমরা পাপকে উপেক্ষা করি বলিয়াই, আমাদের পাপের জন্য প্রাণ ছটফট করে করে না, এবং আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া আমরা মার কৃপায় পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হই না। শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রকৃত অনুগমন সাধন করিতে হইলে, আমাদেরও তেমনই পাপবোধ প্রবল হওয়া আবশ্যক এবং নিজের পাপের জন্য যদি যথার্থ আমরা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হই ও পাপের জ্বালা অনুভব করি, তবে অন্যের বিচার করিবারও আমাদের ফুরসৎ হয় না। যে আপনার পাপের জ্বালায় ছটফট করিতেছে, সে কোন প্রাণে অন্যের বিচার করিবে? তাই কেশবচন্দ্র বলেন, আমি সামান্য লোকেরও বিচার করি না। পাপ-বোধই তাঁহার নব নব উন্নতিলাভের সোপান।

শিষ্যপ্রকৃতি

শ্রীকেশবচন্দ্র চির শিষ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন। তিনি জীবনবেদে বলিয়াছেন, 'এই পৃথিবী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন থাকিতে হইবে, ধর্ম্মোপার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। এই জন্যই কখনও আপনাকে শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই। শিষ্য হইয়া জন্মিয়াছি, চিরদিন শিষ্য হইয়া থাকিব। আমি শিখিলেই শিখান হইবে। শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের সকল উন্নতির সোপান এই তাঁহার শিষ্য-প্রকৃতি।

ইহা হইতেই তিনি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে নববিধান নামে ঘোষণা করিতে প্রণোদিত হইলেন। নিত্য নব নব শিক্ষা লাভ করিতে এই মানবজীবন আদিষ্ট; সকলকার নিকট হইতেই, সকল ঘটনা ও সকল অবস্থা হইতেই নব নব জ্ঞান লাভ করিব এবং তদ্দারা নব নব জীবনে পরিপুষ্ট হইব। এই জন্যই বিধাতা আমাদিগকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; তিনি আমাদের অনন্ত গুরু হইয়া শিক্ষাদান করিতেছেন; এবং সত্যই আমরা শিখিয়া জীবনের আচরণ দ্বারা অপরকে শিখাইব, ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। শ্রীকেশবচন্দ্র এই শিষ্যপ্রকৃতিসাধনে সকল শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি যোগভক্তি-শিক্ষার্থীদিগকে, যোগ ভক্তি তত্ত্ববিষয়ে উপদেশদানকালে বলিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে শিখিয়াই তোমাদের শিক্ষা দিব।' ইহা কেশবচন্দ্রের এক অদ্ভুত শিক্ষা। তিনি কখনও গুরুগিরি করিতে প্রয়াসী হন নাই এবং কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে গুরুর ন্যায় শিক্ষা দেন নাই। সম সাধকরূপেই সকলকে বলিতেন, 'আমাদের এইরূপ করা উচিত, কিম্বা এ করিলে কি হয় না?' এবং এইভাবেই তিনি নববিধানের গুরু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন—অর্থাৎ সমযোগে শিষ্যের ন্যায় শিক্ষা-গ্রহণের গুরু।

নবশিশুত্ব

কেশবচন্দ্র আপনাকে নবশিশু বলিয়া পরিচয় দিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন মানবত্বার উৎকর্ষ প্রদর্শনের নিদর্শন দেখাইবার জন্য নিয়োজিত। শিশুই মানবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একদিকে মার গর্ভজাত শিশু মার স্বর্গীয় ভাব পৃথিবীতে দেখাইবার জন্য ভূমিষ্ঠ, আর এক দিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির ও মানব-জীবনের প্রগতির প্রথম সোপান। শিশুর জীবনে সকল স্বর্গীয় ভাব নিহিত এবং মানবত্বের পবিত্র ছবি শিশু ভিন্ন এমন আর কোথায়? এই শিশু-জীবনে স্বর্গীয় মার সকল স্বরূপ প্রতিবিম্বিত; শুদ্ধতা, সরলতা, নির্ভরশীলতা, বিশ্বস্ততা, প্রেম, ভক্তি, এবং নিত্য নব নব গঠনশীলতা শিশুর জীবনে একাধারে সমন্বিত। শিশুর ভিতরে জাতিভেদের, সাম্প্রদায়িকতা বা পাপাসক্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই; তাই শিশুই মানবত্বার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এইজন্য শ্রীঈশা বলিলেন, "ইহাদিগেরই স্বর্গরাজ্য" এবং শ্রীকেশবচন্দ্র এই আদর্শেই আপনার জীবনকে গঠন করিলেন, এবং নববিধানমূর্ত্তিমান নবশিশু হইলেন। জীবনে নব নব উন্নতির নিত্য সম্ভাবনা ও পতন হইতে নিত্য উত্থানের বল মার শিশু লাভ করে।

তাই শ্রীকেশবের নব জন্মোৎসবে এই নবশিশু-জন্মলাভই আমাদের কি আকাঙ্ক্ষণীয় নয়?

বিশ্বমানবত্ব

শ্রীকেশবচন্দ্র সকল মানবকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে প্রেম-যোগে গ্রহণ করিয়া, এক বিশ্বমানব হইলেন। সকল মানব আমাতে;

আমি সকল মানবে, এই মানব-যোগসাধনে, তিনি সিদ্ধি লাভ করিলেন। বাস্তবিক বিজ্ঞান যেমন বলেন, আকাশে গ্রহ নক্ষত্র হইতে সমস্ত বিশ্ব একটী সত্তাধারে নিহিত, এবং পরস্পরের সহিত সমযোগে যুক্ত, শ্রীকেশবচন্দ্র অধ্যাত্মজ্ঞানে নববিধানে সাধন করিয়া অতি নিগূঢ় ভ্রাতৃপ্রেম-সাধনার নিদর্শন দেখাইলেন; ইহাই ধরায় স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের নিদর্শন। মানবে মানবে প্রীতি, ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? ঈশা সাধন করিলেন, 'আমি পিতাতে, পিতা আমাতে', শ্রীকেশবচন্দ্র সাধন করিলেন, 'ভাই আমাতে, আমি ভাইতে, স্ত্রী আমাতে, আমি স্ত্রীতে'; এই ভাবে প্রতিজন যদি আমরা সকলকে আমার আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও গ্রহণ করিতে পারি, তবে কেমন করিয়া কেহ কাহারও বিরোধী হইতে পারিব? স্বর্গে ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি দেবদেবীগণ আত্মিক যোগে এই ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া এক হইয়াছেন। আমরাও কেশবচন্দ্রের সহিত একাত্মতায় সকলে এক হইয়া নববিধানকে জয়যুক্ত করি।

প্রার্থনাশীলতা

প্রার্থনাই শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্মগুরু। মার নিকট শিশুর সরল ক্রন্দন যাহা, শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রার্থনা তাহা। তিনি যাহা কিছু পাইলেন, তাহা এই প্রার্থনা হইতে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা ও পাওয়া এক। মার কাছে যা চাই, তাই পাই; কেননা মা যা চান, তাই আমি চাই। তাই এই প্রার্থনা ও আদেশ কেশবচন্দ্রের নিকট অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই আদেশ তাঁহার স্বাধীনতা, তাঁহার অগ্নিমন্ত্র, তাঁহার যোগভক্তি কর্ম্মজ্ঞানের সমন্বয়, তাহা নববিধানের অনন্ত নবজীবন।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

কত উচ্চ, কত নীচ

মানুষ কত উচ্চ হইতে পারে, আবার মানুষ কত নীচ হইতে পারে, ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশার ক্রুশারোহণযজ্ঞে তাহা যুগপৎ অভিনীত। ব্রহ্মনন্দন স্বর্গস্থ পিতার মানব-প্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। 'পিতা আমাতে, আমি পিতাতে' এই বলিয়া পিতৃ-প্রেমে সন্তান আত্মদান করিলেন। প্রেমের পরীক্ষা দিলেন। বলিলেন, প্রাণ প্রেমের জন্য পিপাসিত; দুষ্ট মানব দিল গরল পান করিতে! পুত্র বলিলেন, আমি রাজরাজেশ্বরের পুত্র; পাষণ্ড মানব দিল তাঁহাকে কাঁটার মুকুট, স্কন্ধে বহাইল ক্রুশকাষ্ঠ! ক্রুশে শুধু বিদ্ধ করিল তাহা নয়, বর্শার আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ করিল; তথাপি সে হৃদয় কাঁদিল, 'পিতা পিতা, ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না, কি করিতেছে।' 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলিয়া ব্রহ্মনন্দন যেমন স্বর্গে পুনরুত্থান করিলেন, তেমনি এই পাপী মানবকেও আশা দিলেন, বিশ্বাস কর, স্বর্গে আমার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে। ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মপ্রেমের আশার নিদর্শন আর কোথায়?

গাধা পিটে ঘোড়া

নববিধান পরিবর্ত্তনের বিধান। পরিবর্ত্তিত জীবনদানের বিধান। পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ গর্দ্দভের ন্যায় নীচাশয়, সে চন্দনের লেপ ধৌত করিয়া ভস্মের সহিত প্রীতি করে; তাহাকে ধর্ম্মের সুচন্দন মাখাইয়া দাও, ভস্মের গাদায় পড়িয়া চন্দনাক্ত দেহকে ভস্ম মাখাইবে, পৃথিবীর ছাঁই ভস্ম লইয়া থাকিতে তাহার প্রীতি। নববিধান-বিধাতা এই নীচ প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বয়ং তাহার স্কন্ধে চড়িয়া, তাহাকে সংসারসংগ্রামে বিজয়ী অশ্বের ন্যায় করিয়া লইবার জন্য অবতীর্ণ। নববিধানে এ অসম্ভব সম্ভাবিত হইবেই হইবে। আমরা যেন ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস করি।

—•—

কেশবচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি

বিষ্ণুপুরাণকার একস্থানে লিখেছেন, যাঁর অন্তরে ভগবান্ বাস করেন, জগতে তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়।

মানুষের দুইরূপ, দুই মূর্ত্তি আছে। এক বাহ্য, আর এক আন্তর।

(১) ভক্তের মুখশ্রীতে, দৃষ্টিতে, হাসিতে, কথার সুরে স্বরে, কাজে কর্ম্মে, চেহারায় যে বাহ্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তাও সুন্দর; তা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়।

(২) ভক্ত অন্তরে যে ভক্তি প্রীতি অনুরাগ, যে মহা আদর্শ, উচ্চ লক্ষ্য ও মহাভাব ধারণ করেন, যে ভাবের প্রেরণায় আত্মসমর্পণ ক'রে, নিজ জীবনকে নিয়মিত করেন, এবং মানব-সমাজের কল্যাণার্থ যে ভাব ও আদর্শ-প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন, সেই ভাব ও আদর্শ দিয়ে গঠিত হয় তার অন্তরের সৌম্যমূর্ত্তি।

এই দুই ভাবেই কেশবচন্দ্র সৌম্যমূর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ ছিলেন। বাহ্যমূর্ত্তি অনিত্য, শরীরের সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু, আন্তর মূর্ত্তি নিত্য। ভক্ত যে উচ্চ লক্ষ্য, মহা আদর্শ, গভীর ভাব মানব আত্মার পরিপুষ্টির ও বিকাশের জন্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তা নিত্য বস্তু; তাতে জগতের নিত্য কল্যাণ।

মহাভাব।—বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির বাহ্য মূর্ত্তি প্রায় বিলুপ্ত; কিন্তু তাঁদের আন্তর মূর্ত্তি—বাসনা-সংযম ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ, পরমপিতার বাধ্য সন্তানের আদর্শ, পরম প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্যের আদর্শ, পরম পতির প্রেমে বিগলিত চিত্তের আদর্শ—তাঁদের নিত্য মূর্ত্তি দিন দিন অধিকতর উজ্জ্বল হচ্ছে, দেশকালের সীমা অতিক্রম ক'রে ও আবর্জ্জনা-মুক্ত হয়ে সকলের শ্রদ্ধার ও গ্রহণের যোগ্য হচ্ছে।

কেশবচন্দ্রের জীবনে, অন্তরে, এই সকল মহাজনগণের মহাভাবের ও মহৎ আদর্শের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব পূর্ণ জীবনের সৌম্যমূর্ত্তি রচিত হইয়াছিল।

সাধন-পথ।—তিনি একাধারে জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত ও যোগী

ছিলেন; সে সকলের ক্রমবিকাশে এবং সমন্বয়ে তাঁর জীবন এক মহাজীবনে পরিণত হয়েছিল। তাঁর জীবনে ভগবানের মহালীলা হয়েছিল,—সকল দেশের, সকল যুগের মহাজনগণের লীলার সমাবেশে, এক মহালীলা—মহাভারত—মহাধর্ম্মরাজ্য—সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছিল।

সে জীবনের কথা "অমৃত সমান"। তার অনুধ্যানে, কথনে, শ্রবণে ও অনুসরণে জীবন ধন্য হয়, পবিত্র হয়, উন্নত হয়। কেশবচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি—আত্মিক মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়েছিল, মহা-সমন্বয়ে।

সাধু ভাব।—এক এক জন মহাজনের এক একটি বিশেষ মহাভাবের শোভাই অতুলনীয়। বুদ্ধদেবের বাসনা-সংযম, বিশ্ব-মৈত্রী ও সকলের মঙ্গলভাবনা, যিশুর পিতৃবৎসল বাধ্য সন্তানের ভাব, মহম্মদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ভাব, শ্রীচৈতন্যের কান্তভাব—এই এক একটি ভাবেই তাঁদের জীবন কি স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত! কেশবচন্দ্র এক হৃদয়ে এই সকল মহাভাবকে ধারণ করেছিলেন, সমন্বিত করেছিলেন।

শাস্ত্র ও সাধন।—কেবল সাধুগণকে নয়, সকল শাস্ত্রের সার সত্য, সকল বিধানের সাধন-সংযম, এক পরম পিতার বিচিত্র লীলারূপে, স্বীয় জীবনে, অন্তরে, সাধনে ও আচরণে গ্রহণ ক'রে, তিনি এক পরিপূর্ণ, ব্রহ্মানুগত জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন।

সাধনপথ।—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—স্বতন্ত্র ভাবে সাধিত হলেও কত সুন্দর, কত মহান—কিন্তু সে সকল একাধারে সম্মিলিত হলে, সেই পরম সুন্দরকে আরও কত উজ্জ্বলরূপে পূর্ণরূপে প্রকাশ করে।

অতুলনীয় আদর্শ।—কেশবচন্দ্রের জীবনে সেই মহামিলন ঘটেছিল। তেমন মিলন, তেমন সমন্বয় জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। কেবল তত্ত্ব নয়, ভাব নয়,—তাঁর চিন্তা, ভাব ও আচরণের মধ্যে সমন্বিত, অনুস্যূত, সাধিত হ'য়ে, জীবন্ত আদর্শ-রূপে তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি—ব্রহ্মানন্দরূপ জগতে প্রকাশিত হয়েছিল। সে মূর্ত্তি নিত্য, ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হবে, ক্রমশঃ অধিকতর বোধ-গম্য ও গৃহীত হবে। তাতে ব্রহ্মের জয় হবে, জগতের কল্যাণ হবে।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

—•—

পরমারাধ্য পিতৃদেব

(গত ১৩ই মার্চ্চ, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

এই মহামন্ত্রই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সাধনা ছিল। বাবা নিজে সর্ব্বদাই অমানী হইয়া সকলকে সম্মান দান করিতেন। কত ব্রত, কত সাধনা অবলম্বন করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তবুও কত বিনয়ের সহিত আমাদিগকেও বলিতেন—"আমি সাধন ভজন কিছুই জানি না, ব্রহ্মকৃপাই আমার একমাত্র সম্বল।" কত বিনয় ও ভক্তিভরে গাহিতেন, "দেহি পদপল্লবং...... ...ত্বং হি মম সাধনং......আমি সাধন ভজন জানি না হে।" বাবার মুখের এ সংগীতটী অতি অল্প বয়স হইতেই আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

বাবা একবার সাধু-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়দিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উপাসনান্তে একে একে সকলের পদ ধৌত করিয়া, গামছা দিয়া সকলের পা মুছাইয়া দিলেন। তৎপর সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহাদিগের আহার হইলে নিজ হস্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিলেন।

হরিনামসুধা বিলাইবার জন্যই বাবার জন্ম। এই নামগুণে পাপী তাপী তরে যায়, আমরা শুনিয়াছি, রোগে শোকে আরাম সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহাও জানিয়াছি; কিন্তু হরিনামে দৈহিক রোগ হইতে চির আরোগ্য লাভ করা যায়, আমাদের প্রপিতা-মহী দেবী তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার পিত্তশূলের বেদনা ছিল, ঐ বেদনা আরম্ভ হইলে অসহনীয় কষ্ট পাইতেন। বহু চিকিৎসায়ও উহা হইতে মুক্তি পান নাই। বাবা বাড়ীতে ছিলেন, সেই সময় একদিন তাঁহার সেই বেদনা আরম্ভ হইল। বাবা তাঁহার ঠাকুরমার এই কষ্ট দেখিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁহার পাশে বসিয়া প্রমত্ত ভাবে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্ত-নের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধার যাতনা দূর হইল। অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হইতে জীবিত কাল পর্য্যন্ত আর কখনও তাঁর সেই বেদনা হয় নাই। ভক্তিমতী বৃদ্ধা কতজনের কাছে আনন্দভরে হরি-নামের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতেন, যে বেদনা কোন ডাক্তার কবিরাজ সারাইতে পারে নাই, আমার সেই বেদনা দুর্গানাথের হরিসংকীর্ত্তনে সারিয়া গিয়াছে।

বাবার ৫৫ বৎসর পূর্ব্বের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত :—

১। হরিময় জগৎ নিরীক্ষণ করিলে প্রাণ মধুরসে পূর্ণ হয়। রসময় হরির প্রভাবে সকলই রসময় বোধ হয়। বৃক্ষ হাসিয়া কথা কয়, তৃণ গুল্ম গুরু হইয়া স্বর্গের সংবাদ প্রচার করে।

২। হে দয়াময় হরি, আজ যে আমায় বড় কৃতার্থ করিতেছ, পাপী উদ্ধারের জন্য আজ স্বর্গ হইতে ধরাধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আজ যে তোমাকে বড় খুসী দেখিতেছি। ভক্ত-প্রাণ হাতে পাইয়া, বুঝি, আজ তোমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে; নৃত্য না করিলে তো এখন তোমার সাধ মিটিবে না। শ্রীহরি, আমার হৃদয়-ঘর তো বড় অপরিষ্কার কর্দ্দমময়। এই পিছল জায়গায় কেমন করে নৃত্য করিবে? তোমার সুন্দর চরণকমলে তো কাদা লাগিবে। তাহা হইলে যে রসভঙ্গ হইবে

প্রাণেশ, এই বেলা তুমি আমাকে সম্মার্জ্জনী করিয়া গৃহ পরিষ্কার কর। আমাকে তোমার প্রেমে গলাইয়া জল কর। সেই জলে গৃহ ধৌত কর। আমাকে গোলাপ জল এবং গোলাপী আতর করিয়া গৃহখানি সুগন্ধপূর্ণ কর। এইরূপ সুসজ্জিত গৃহে তুমি হেসে হেসে নৃত্য কর এবং মধুর সঙ্গীত গান কর। তুমি যদি এইরূপে হৃদয়ঘর আলো করিয়া নৃত্য গীত কর, চতুর্দ্দিকে সেই মধুগন্ধ প্রবাহিত হইবে। দেখিব, তাহা হইলে প্রতিবেশীরা কেমন করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে পারে? হরি, তোমার নৃত্য-গীতের মধুগন্ধ যতদূর যাইবে, ততদূর হইতে আপনা আপনি লোক সকল তোমাকে দেখিতে আসিবে। আমার আর বলিতে হইবে না যে, তোমরা হরি দর্শন কর।

৩। আজ তোমার যে যুগলরূপ দেখিতেছি, যেন দিন দিন ইহা আরো উজ্জ্বলতররূপে দর্শন করিয়া তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি। ভক্তসঙ্গে ভগবানের সেবায় যতই জীবন ক্ষয় হইবে, ততই জীবন কৃতার্থ হইবে। যতই এজন্য নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ততই, আঃ প্রাণ জুড়াইল, এইরূপ বলিব। কেন না ভক্তসঙ্গে ভক্তবৎসল হরির সেবা করিতে যে দুঃখ যন্ত্রণা পাইতে হয়, সেইরূপ মধুমাখা দুঃখলাভ কি আর যার তার ভাগ্যে ঘটে? হরি হে, যদি এবার কৃপা করিয়া আসিয়াছ, তবে শীঘ্র ভক্তির হাট খোল।

৪। আজ সভাস্থলে শ্রীহরির হাতের পুতুলরূপে নৃত্য করিয়াছি। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এই সংগীত গাইতে গাইতে সত্য সত্যই তাঁহার অঙ্গুলীসঞ্চালনে নৃত্য করিলাম। এ জীবনে আর এমন নৃত্য করা হয় নাই। এমন অভিনব সুমধুর রসাস্বাদনও আর এ জীবনে হয় নাই। "হরি বলে দেবগণ নাচে" ইহার অর্থ বুঝিতাম, কিন্তু পাপী নাচে কি প্রকারে, তাহা বুঝিতাম না। ঠাকুর আমাকে নাচাইয়া এবার দেখাইলেন, পাপী কিরূপে নাচে।

বিধানজননী নববিধানে ভক্তকে নূতন বিধান সাজে সজ্জিত করিয়া, তাঁহারই প্রেমামৃত পান করাইয়া, আপনার হাতে ধরিয়াই বিধানক্ষেত্রে নৃত্য করাইয়াছেন। তাঁর জীবনে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানের সম্মিলন, ভক্ত মহাজনদের সম্মিলন, সর্ব্বশাস্ত্রের সম্মিলন দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। ব্রহ্মবলে বলী হইয়া মহাতেজে নববিধানের জয় জীবন দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কত সারতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া, বঙ্গবন্ধু পত্রিকার সম্পাদকরূপে, উপাসনা, সংগীত, বক্তৃতা, কথকতা দ্বারা, কত দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া, কতবার কত দুর্ঘটনা, রোগ বিপদে জীবন বিপন্ন করিয়া, দেশে দেশে হরিনাম হরিভক্তি বিলাইয়াছেন। বাবার জীবন সম্বন্ধে ভীত হইয়া মা কিছু বলিলে, বাবা হাসিমুখে বলিতেন "ভয় কি? এ কার্য্যে যদি জীবন যায়, তবে তো জীবন সার্থক হইবে।" বাবা অতি সুন্দর মৃদঙ্গ বাজাইতেন, মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতেন, "এমন আর শুনি নাই"। যতদিন দেহে শক্তি ছিল, হরি-প্রেমে মত্ত হইয়া মহোৎসাহে ভাই ভগিনীকে হরিপদে আকর্ষণ করিয়াছেন।

উপাসনা, সংকীর্ত্তন, সঙ্গীত, কথকতা, বক্তৃতা প্রভৃতি অতি সরস ও মধুর হইত। বাবার সুকণ্ঠের মধুর সংগীত ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল, তাই উহা মর্ম্মস্পর্শী হইত। উপাসনা অতি গভীর ও রসপূর্ণ ছিল। বাবার সুধামাখা কথকতা কত প্রাণে সুধাবর্ষণ করিয়াছে। প্রত্যেক কথকতায় নিজে নূতন সংগীত রচনা করিয়া গাহিতেন। বাবার মুখে ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত্র, ভক্ত রঘুনাথ, ঈশাচরিত, নিমাইসন্ন্যাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, মেরী ও মার্থা, মীরাবাই প্রভৃতি সম্বন্ধে কথকতা কতবার শুনিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি।

বিশ্বাসের মহাতেজে পূর্ণ হইয়া, ভক্তিসুধাসিক্তকণ্ঠে ওজস্বী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। বাবার বক্তৃতা হৃদয়কে কোন উন্নতলোকে লইয়া যাইত।

বাবা প্রেমমত্ত প্রেম ও ভক্তিভরে যখন সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন তাঁর ভিতরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব দেখিয়া কত জন বলিতেন, "এঁর ভিতরে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখেতেছি।" বাবার অনেক গানে 'গৌরপদধূলির' জন্য প্রার্থনা রহিয়াছে। সত্যই, বাবা গৌরপদধূলি লইয়াই এত সুন্দর, এত মধুর, এত প্রমত্ত হইতেন।

বাবা গৌরবর্ণ, সুগঠিত, দীর্ঘাবয়ব, সুন্দর পুরুষ ছিলেন। বিশ্বাসের জ্যোতিতে ও ভক্তির লাবণ্যে তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যও শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাবার হৃদয় যেমন শুদ্ধ ছিল, দেহখানিও তেমনি শুদ্ধ রাখিতেন। বাবাকে কখনও চিরুণী ব্যবহার করিতে দেখি নাই। স্নানের পর পরিষ্কৃত বসন পরিয়া, চুলগুলি হাত দিয়াই বিন্যস্ত করিতেন, সেইভাবেই সারাদিন যাইত, কখনও বিশৃঙ্খল হইত না। সর্ব্বকার্য্যেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ছিল। ভক্তিভাজন ৺বঙ্গবাবু মহাশয় তাঁহাকে প্রচারের সঙ্গী করিতেন ও বলিতেন, "দুর্গানাথের সুশৃঙ্খল পরিপাটি কাজ না হইলে আমার চলে না।" বাবা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বড়ই স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলেন। ভক্তিভাজন উপাচার্য্য ৺বঙ্গচন্দ্রকে প্রেমভরে লিখিয়াছিলেন, "তোমার দুর্গানাথ আমার দুর্গানাথ।"

আমাদের ভক্ত বাবা শিশু ও ফুলের ভিতর স্বর্গ দর্শন করিতেন। শিশু দেখিলে বাবার স্নেহ ও আনন্দ উথলিয়া উঠিত। প্রাণ ভরিয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া সুখী হইতেন। যখনই যেখানে বাস করিতেন, বাসভবনে একটু ফুলের বাগান করিতেন। ফুলের ভিতর সুন্দর দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিত।

বাবার স্নেহ প্রেম সর্ব্বজীবেই বিস্তৃত হইয়াছিল। যতদিন শক্তি ছিল, পরম যত্নে গো-সেবা করিতেন। যখন অক্ষম হইলেন, তখন ভৃত্যের উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল। ভৃত্য গরুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করাতে, বাবা বড় দুঃখিত হইয়া ভৃত্যকে

বলেন, "তুমি বড় অন্যায় করিয়াছ, আমি আর তোমাকে রাখিতে পারিব না।" প্রতিদিন বিড়াল, কুকুর প্রভৃতিকে স্বহস্তে আহার দিতেন। ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতিও বাবার কি স্নেহদৃষ্টি ছিল! শেষ সময়ে দৌর্ব্বল্যবশতঃ অনেক সময়ই শুইয়া বসিয়া কাটাইতে হইত। তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, এমন সময় দেখিলাম, তাঁহার বিছানায় পিপীলিকা উঠিয়াছে। আমি ঝাড়িয়া ফেলিতে গিয়া কতকগুলি পিপীলিকার প্রাণনাশ করিলাম। ইহা দেখিয়া বাবা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, পিপড়ার কামড়ে আমাদের কিছুই হয় না। তারা কামড়াবে বলে তাদের মেরে ফেলা উচিত নয়। ইহাদেরও বাঁচিবার ইচ্ছা, আশা এবং আনন্দ আছে।" এ কথা শুনিয়া খুবই লজ্জিতা হইলাম। ঘরের ভিতর সর্ব্বদা নানা পাখী আসিয়া কলরব করিত। বাবার কাণে তাহা সুধাবর্ষণ করিত। বাবা পাখীগুলির দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিতেন, "কি! তোমরা আমাকে ব্রহ্মনাম শুনাও?"

বাবা কায়মনোবাক্যে অতিশয় সংযত ছিলেন। বাজে কথা শুনিতে ও বলিতে ভালবাসিতেন না। হরিকথায় পরম উৎসাহ দেখিতাম। সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, গভীর জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের কত উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি। সে সব লিখিয়া পড়িব, সে সময় নাই।

বার্দ্ধক্যবশতঃ যখন বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখনও শিশুর ন্যায় উৎসাহ উদ্যমে উপাসনা, সংগীত, সৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রভাতে বিছানায় বসিয়াই প্রতিদিন মাতৃস্তোত্র পাঠ ও সংগীত করিতেন। দেবালয়ে গিয়া উপাসনা করিতে না পারিলে, গৃহেই দৈনিক উপাসনা করিতেন। অনেক সময়ই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। দিনে কতবারই বলিতে শুনিয়াছি, "আনন্দরূপমমৃতং, মুরতি-মোহন।" আমাদিগকে লইয়া কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করিলে, প্রার্থনার ভাবে পূর্ণ হইয়া নিজে একটী প্রার্থনা করিতেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে হিক্কারোগাক্রান্ত হইয়া এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সেবারই চলিয়া যাইবেন। সেই সময় সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত আমরা আর সকলেই উপস্থিত ছিলাম। আমাদিগকে লইয়া প্রতিদিন উপাসনা করিতেন। দৌর্ব্বল্যবশতঃ মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিত না, কিন্তু অতি কষ্টে কোন রূপে বসাইয়া দিলে, উপাসনা করিতে করিতে এমন অবস্থা হইত যে, কে বলিবে, ইঁহার শরীর এত দুর্ব্বল! শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই অবস্থা দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "ইহা দৈবশক্তি!" একদিনের উপাসনা লেখা হইয়াছিল, সম্পূর্ণ লেখা হয় নাই, তাহা এখানে পড়িতেছি।

উদ্বোধন—মা ভগবতী, মহাসতী প্রকৃতি, আজ তোমা হইতে নব সাজে ভূষিত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করে তোমাকে বরণ করিতে চাইতেছি। তুমি প্রকাশিত হও। তুমি সত্য সত্য আমাদিগকে তোমার সুন্দর নামে, তোমার প্রেমে দীক্ষিত করিয়া ধন্য কর; তুমি কৃপা করে তব পদারবিন্দে আমাদিগকে আশ্রয় দেও। বারবার তোমাকে প্রণাম করি।

আরাধনা—হে সকল কালের আদি, সকলের অন্ত, সকলের মধ্য, স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর তুমি। তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর। তুমি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছ।

সকল জ্ঞানের মূল এই আত্মজ্ঞান। তুমি জ্ঞানদাতা গুরু হয়ে আমাদিগকে জ্ঞান দান করিতেছ। তুমি প্রতিজনকে সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে, অনন্ত অমৃতের পথে লইয়া যাইতেছ। আমরা তোমার পদাশ্রয় লাভ করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ সকল শাস্ত্রই তোমা হইতে উদ্ভূত। সকল শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য তোমার কাছে। হে সর্ব্বজ্ঞ, সকলই তুমি জান, সকলই তুমি বোঝ। তোমার বাণী অভয়বাণী; তাই ভক্ত সকল বাণী পরিত্যাগ করিয়া বলেন, "চল চল ভাই মার কাছে যাই," মার অভয়বাণী শুনে মার পাছে পাছে যাই। মা, তুমিই আমাদের একমাত্র নেতা। মা ভগবতী, আমাদিগকে হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছ।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, তুমি আমাদের একমাত্র সহায়, আশা, ভরসা, আমাদের সর্ব্বস্ব ধন, সর্ব্বসত্তা।

তুমি আমাদের প্রেমময়ী মা। ভালবাসা যে কত, কেউ অনুমান করতে পারে না। মা আমাদের বড় ভাল মা। কি শুভ দৃষ্টান্ত সব আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছ। মা, আমাদের জন্য ঈশা, মুষা, শাক্যসিংহ, হজরত মহম্মদ, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে সৃজন করেছ।

* * *

তুমি সুন্দর, অতি পরিপাটী সুন্দর। এমন সুন্দর কেউ কল্পনা করতে পারে না। রাশি রাশি কবির কল্পনা এখানে পরাজিত হয়। * * *

পৃথিবী পবিত্র হয়েছে। সবাইকে ধন্য করেছ। সবাইকে আনন্দিত করেছ, তাই তোমার এত আনন্দ। তোমারই জয়-ধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ। তোমার কাছেই কেবল আনন্দ, খাই আর বিতরণ করি। ধন্য মা আনন্দময়ী, সকলে ধন্য ধন্য বলি। তোমার আনন্দের সহিত নৃত্য করিতে করিতে তোমার আনন্দ-ধামে গমন করি। ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি।

ধ্যান—আমরা মার ধ্যান করি।

সাধারণ প্রার্থনা—

প্রার্থনা—হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি একাকী আমাকে এ সংসারে আনিয়াছিলে। তুমি কৃপা করে, আমাকে কত দিয়েছ। পুত্র দিয়াছ, পৌত্র দিয়াছ; কন্যা দিয়েছ, দৌহিত্র দিয়েছ, কত সব নাতি নাত্নী। সকলকে তোমার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতেছি। সব তোমার। এই পরিবারময় তুমি প্রকাশ পাইতেছ। সম্প্রতি একটু রোগে ভুগিতেছি। তুমি অন্য লোকে লইবার আয়োজন করিতেছ। সময় হয়েছে, সুন্দর আয়োজন। বেশ

সময়মত তোমার পাদপদ্মে স্থান দিবার আয়োজন করেছ। বহু বংশ বিস্তার করেছি, সকলকে তোমার সেবায় বিলাইতেছি। জয়, জয়, তোমারই জয়।

সঙ্গীত—"ধন্য ধন্য আনন্দময়ী মা তোমায়।"

তখন হইতেই বাবা পরলোকের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে এমন অবস্থা হইল যে, চির সেবিকা কনিষ্ঠা ভগিনী মনে করিলেন, এই বুঝি শেষ। কি করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া, মকরধ্বজ খাওয়াইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাবা কথা বলিবার শক্তি লাভ করিয়া ভগিনীকে বলিলেন, "মৃত্যুতে কোন ভয় নাই, তোমরা ভয় করিও না। আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। তোমরা কাছে থাকিও।" দুইদিন পরে একটু ভাল বোধ করিলেন। পুনরায় ২০শে ফেব্রুয়ারী, অপরাহ্ণ ৪টায় হার্নিয়ার ব্যথা আরম্ভ হয়। ঐ ব্যথায় অনেক সময়ই কষ্ট পাইতেন; যে সব উপায় অবলম্বনে উপশম হইত, ভগিনী তাহা করিলেন। ব্যথা উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অসহায় শিশুর মত পরম জননীকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা, এই যদি আমার মহাযাত্রা হয়, তবে তুমিই আমায় কোলে তুলে লও; আর যদি সুস্থতা দিতে হয়, তুমিই আমায় আরাম দাও। তুমি যেমন কষ্ট দিতেছ, আবার তুমিই আরাম দিতেছ।"

এর মধ্যে ডাক্তারের চিকিৎসায় ভীষণ যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। সারারাত একটুও ঘুম হইল না। এই যন্ত্রণার ভিতরেও পিতৃদেব প্রার্থনা, সঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন। কি সুন্দর-রূপে "দেহি পদপল্লবং, যোগিজনদুর্লভং, ত্বং হি মম জীবনং, ত্বং হি মম ভূষণং" এই সঙ্গীত, বুকের উপর যেন খোল বাজাইতে-ছেন, এইরূপ তাল দিয়া কীর্ত্তন করিলেন। অনন্ত বিশ্বাসের জ্যোতি সকল বেদনাকে পরাজিত করিয়া জরাজীর্ণ দেহে বিভাসিত হইয়া উঠিল।

যতবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'বড় কষ্ট হচ্ছে?' ততবারই হাসিয়া বলিয়াছেন, "মা আমায় আরাম দিচ্ছেন, নইলে আরও কষ্ট হইত।" ভয়ানক যন্ত্রণার সময়ও কেহ সঙ্গীত করিলে দৈহিক যন্ত্রণা দূর হইত, চিত্ত আনন্দে ডুবিয়া যাইত। ক্রমে দৈহিক অনুভব শক্তি শিথিল হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের পরমারাধ্য দেবতা অন্তর্লোক পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন। দিবা-নিশি অবিশ্রাম প্রার্থনা, ধ্যান, স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। যে কেহ তাঁহার কাছে আসিয়াছেন, সকলকেই হাসিয়া হাসিয়া আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন। বাড়ীর দাস দাসী শিশুদিগের আহার নিদ্রা হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পুত্রকন্যাদিগের নামোচ্চারণ করিলেন, মনে হইল, যেন ভগবানের পদে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। তৎপর ঊর্দ্ধে দৃষ্টি উন্মীলন করিয়া, শিশুর ন্যায় মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে, পরমজননীর কোলে আশ্রয় লইলেন। ভক্তশিশুদলে মিলিত হইয়া আজ কত না আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। বিশ্বাসচক্ষু উন্মীলন করিয়া সেই শোভা দর্শন করি। ভক্তপিতার পদধূলি লইয়া আমরাও ভক্তি লাভ করিয়া জন্ম সফল করি, ভগবান্ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র চৌধুরী

(২রা এপ্রিল, চট্টগ্রামে, ব্রাহ্মবাসরে পঠিত)

আমাদিগের পিতৃদেব, ১২৬৮ সালের ২৭শে চৈত্র (ইংরেজী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে), রামনবমী তিথিতে, চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব শীঘ্রই তাঁহার উপর পতিত হয়। অতি অল্প বয়সেই কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে তিনি জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন। তারপর বহু দুর্দ্দিনে বহু কঠোর পরীক্ষা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, পিতা কখনও কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইতে দেন নাই। বরাবর তিনি নিরলস কর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। শক্তিমান যুবা পুরুষও যে কার্য্যসাধনে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, তাহা তিনি অক্লেশে সমাধান করিতেন। পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিদারুণ রোগ-শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ান থাকিয়াও, তিনি স্বভাব পরিবর্ত্তন করেন নাই; যতদূর সম্ভব, সকল কার্য্যকলাপেই স্বাবলম্বন প্রদর্শন করিয়াছেন।

সততা তাঁহার বীজমন্ত্রস্বরূপ ছিল। পরিচিত জনসাধারণ তাঁহাকে সাধুত্বের মূর্ত্তিমান প্রতীকরূপেই জানিত। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা সততার উদাহরণরূপে আলোচিত হইয়া থাকে। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই তাঁহার চরিত্রের এই রূপটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ এই রূপ সত্যনিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে নিতান্তই বিরল। রজতমুদ্রার মোহনীয় আকর্ষণ বহুবার তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, পার্থিব সম্পদ্‌বৃদ্ধির প্রস্তাব তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু কদাপি তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই।

পিতা অতীব সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিশোর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। মাথার উপর তাঁহার কোনো অভিভাবক ছিল না। কিন্তু কদাপি উচ্ছৃঙ্খলতার পাপপঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। বিলাস ও ভোগাভিলাষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করতঃ, তিনি অত্যন্ত নিরাড়ম্বর-ভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন। সরলতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার প্রতি তিনি অত্যন্ত বীত-

প্রভু ছিলেন। দান বা দীন দুঃখীর অভাব নিরসনকেই তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থব্যয়ের প্রকৃষ্টতম পন্থা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কত বিপন্ন ব্যক্তিকে যে তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতেন, তাহা অনুমান করা কঠিন। একদিন অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, পিতা অতি সঙ্গোপনে একখানি ছিন্নচীর পরিধান করিয়া, আপনার নূতন পরিধেয় বস্ত্রখানি জনৈক দরিদ্র বৃদ্ধকে দান করিতেছেন। কত দুস্থ প্রজাকে যে তিনি বৎসরের পর বৎসর খাজনা মাফ দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লীগ্রামের নিরন্ন কৃষককুল আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহার এই মহানুভবতার কথা সতত স্মরণ করে।

পিতা শৈশবাবধি সকলপ্রকার আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনে সন্ন্যাসের স্বরূপ তিনি বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাত্ত্বিক আহার ও সর্ব্ববিধ সদাচারপালনে তিনি ব্রহ্মচারিগণেরও আদর্শস্থল ছিলেন। বেশভূষা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম, সর্ব্বত্রই তিনি শিশুসুলভ সরলতা প্রদর্শন করিতেন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সদ্ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলিকে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, তিতিক্ষা, আড়ম্বরবিহীনতা, বৈরাগ্য প্রভৃতিকে তিনি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বাহ্যানুষ্ঠানের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলনের যোগসূত্র যে নিতান্তই ক্ষীণবল, একথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। এই জনাই সমাজের গণ্ডীর মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ধরা দেন নাই; রাজহংসের ন্যায় নীরাংশ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরভাগটুকু সাগ্রহে পান করিয়াছিলেন।

পিতার চরিতকথায় ঘটনার প্রাচুর্য্য নাই; যে অসামান্য চরিত্রবল ও অপরিসীম ধর্ম্মভাবের দ্বারা তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, এই সুপবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাহাই আমাদের স্মরণীয় বিষয়। তাঁহার গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, সৌম্যমূর্ত্তি প্রথমদর্শনেই সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত; সামান্য বাক্যালাপেই সকলে বুঝিতে পারিত যে, এই বাহ্য স্বরূপের অন্তরালে একখানি সুন্দরতর অন্তর নিহিত আছে, ত্যাগের মহিমা ও সংযমের বিভূতিতে তাহা পরিপূর্ণ। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী, শান্তপ্রকৃতি মনুষ্য বর্ত্তমান যুগে বিরল। আপামর সাধারণকে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। এই সময়ে তাঁহার চক্ষে ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ প্রভেদ থাকিত না। বস্তুতঃ নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি প্রগাঢ় অনুকম্পা ও সহানুভূতি তাঁহার চরিত্রে অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইত। আমরা দেখিয়াছি, বৃষ্টিতে ভিজিলে ভৃত্যের অসুখ হইবে, এই বলিয়া তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া, তিনি স্বয়ং বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ভৃত্যজনোচিত গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; প্রচণ্ড রৌদ্রে তিনি অনাবৃত নগ্নশিরে পথ চলিতেছেন, সঙ্গে ভৃত্য, তাহার মাথায় ছাতা।

১৩৩৭ সালের ৩০শে কার্ত্তিক, আমাদিগের পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই পিতার অটুট স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়ে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। এই সময় যে সমস্ত আত্মীয় বা আত্মীয়স্থানীয় বন্ধুজন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি; তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। বিধাতা তাঁহাকে কঠিন ব্যাধিভার হইতে মুক্তি দিয়াছেন, নশ্বর মানবদেহকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার অমরাত্মা দেবলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, ইহাতে দুঃখ করিবার কোনই হেতু নাই। ১৩৪৪ সালের ১৯শে ফাল্গুন (ইং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ) শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে চন্দ্রের জন্মলগ্নে তিনি স্বর্গলোকে নবজন্মলাভ করিয়াছেন, ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। দুঃখ শুধু এই যে, আমরা তাঁহার অধম সন্তান সন্ততি, মনের মত করিয়া পিতার সেবা করিতে পারিলাম না, আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শিরীষপুষ্পের জন্মঋতুতে যাঁহার আবির্ভাব, রক্তাংশু কিংশুকগুচ্ছের বিদায়বেলায় তাঁহার মহাযাত্রা। আজ তিনি এই গৃহে নাই, প্রভাত সূর্য্যের কিরণলেখায়, নীলাম্বরের মলয়নিশ্বাসে, ঘনশ্যাম বনচ্ছায়ে, পিককণ্ঠের কলকাকলিতে তিনি চিরন্তনরূপ ধারণ করিয়াছেন, প্রকৃতির স্পর্শে তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ, স্মৃতির প্রচ্ছন্নপটে তাঁহার চরণনিক্ষেপ, ধ্যানের অন্তরীক্ষে তাঁহার আত্মপ্রকাশ। অন্তরেন্দ্রিয় সাহায্যে আজ বুঝিতে পারিতেছি, নিকটে থাকিয়াও আজ তিনি বহুদূর—জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর অমর্ত্ত্যলোকে তিনি আজ বিরাজমান—পদ্মরাগ-নীলকান্ত-মরকত-বৈদূর্য্যের জ্যোতির্লেখা তাঁহার নয়নে, দীপক-ভৈরবী-মল্লার-মঞ্জুরাগিণী তাঁহার কণ্ঠে, চন্দনের সুঘ্রাণে তাহার সুরভি-নিশ্বাস, চন্দ্রিকার লাবণ্যে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ। নিকটে থাকিয়াও তিনি আজ বহুদূরে, এবং দূরে থাকিয়াও তিনি আজ সন্নিকটে। গোপন আজ তাঁহার নিকট প্রকট, মনোবাসনা আজ তাঁহার নিকট সুপরিজ্ঞাত, মর্ম্মতলের সুগভীর রহস্য আজ তাঁহার নিকট গ্রন্থপত্রিকার অধীতছত্রের-ন্যায় সহজবোধ্য। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের মনের সমস্ত পঙ্কিলতা নির্ম্মল হইয়া যাক; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আত্মার কল্যাণকামনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হই।

নন্দন-কানন,
চট্টগ্রাম। } সুব্রত চৌধুরী

—০—

নূতন সঙ্গীত

(রাধানগর, রামমোহন মেমোরিয়েলে, ২০শে মাঘ, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস রূপে গীত)

শুধু গেছে রাখিয়া আঁখিজলে মাখিয়া,
তাঁহার সে স্মৃতিটুকু হৃদয়েতে আঁকিয়া ;
গত হল বহু বর্ষ, লভিয়া বহু উৎকর্ষ,
গিয়াছে ত্রৈলোক্যনাথ অমরধামে চলিয়া ।
(এবে) ত্রৈলোক্যপতির সনে লইয়া অমরগণে,
ভুঞ্জিতেছে স্বর্গসুখ একাসনে বসিয়া ;
চিরঞ্জীব নাম যাঁর, সে পবিত্র আত্মা তাঁর,
রহিবে অমরধামে চিরজীবী হইয়া ।
জন্মিয়া সুদূর দেশে, কেশবের সঙ্গে মিশে,
পরব্রহ্মের পরশে গেল সিদ্ধ হইয়া ;
নববিধানসঙ্গীতে মাতায়ে নব্য ভারতে,
ব্রহ্ম উপাসনা দিল উজ্জ্বল করিয়া ।
তাই সে উজ্জ্বল রবি, বিধানের শ্রেষ্ঠ কবি,
উদিল সে সময় এ ভারত উজলিয়া ;
সেই একই সময়ে কেশবচন্দ্র উদিয়ে,
সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোকে দিল বিশ্ব ভরিয়া ।
সে যে বিধাতার দান, প্রকাশিতে নববিধান,
একত্রে আসিল তারা বহু ভক্তে লইয়া ;
হয়ে ব্রহ্ম অনুরক্ত, হল তারা জীবন্মুক্ত,
ভগবৎসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ।
সেই সব ভক্তগণে মাতিয়া নববিধানে,
প্রচারিল যুগধর্ম্ম, ব্রহ্মস্রোতে ভাসিয়া ;
তারপর ক্রমান্বয়ে, সকলে গেল চলিয়ে,
জয় ব্রহ্ম বলি বিশ্বেব্রহ্মালোক জ্বালিয়া ।

শ্রীললিতমোহন দত্ত ।

—•—

জয় বিশ্বেশ্বর, আল্লাহো আকবর,
জিহোবা, ফাদার, ব্রহ্ম হরিসুন্দর
যে যেই নামে ডাকি, এক তোমাকেই দেখি,
বড্ড ভাল মা কেশবের আমার—
কেশবের আমার ।
শাক্য, গৌর, ঈশা, মহম্মদ, মুষা,
কেশবে একাকার যত যুগ অবতার ;
বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর, পুরাণ,
জীবনবেদে সমাধান শাস্ত্র-সুসমাচার ।
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান,
একই মার সন্তান, একই ধর্ম্ম সবার ;
ত্যজি সবে ভেদজ্ঞান, গাই সবে ঐক্যতান,
একেরি মহিমা গান জয় জয় একেশ্বর ।
তোমাতে, তব বিধানে, প্রত্যাদেশ, ভক্তসন্তানে
বিশ্বাস ষোল আনা দানে লভি স্বর্গের অধিকার ;
জয় জয় মার জয়, বিশ্বমানবের জয়,
জয় নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ।

সেবক প্রিয়নাথ মল্লিক

—o—

শ্রীমতী শশিমুখী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

(ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক, ৪ঠা এপ্রিল, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(গত ১৬ই কার্ত্তিকে প্রকাশের পর)

মাতা শশিমুখী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুব্রতানন্দ বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে, ই, আই, রেলওয়ে সেনিটারী ইন্স্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রায় ৬মাস পরে, ভাগলপুর-নিবাসী স্বর্গীয় রামলাল দাসের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর সহিত বিবাহিত হন। সুব্রতানন্দ রেলওয়ের কার্য্য পাবার পর হইতেই এই পরিবারের প্রায় সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, এবং সেই হইতে এই দীন ভক্তপরিবারের ব্যয়াদি সচ্ছলতায় সহিত চলিতে থাকে। স্নেহভাজনীয়া বিনোদিনীর অকাল মৃত্যুর পর হইতে শ্রীমান্ সত্যানন্দকে অধিকসময় বৃদ্ধা মাতার সেবায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে কাশী হইতে একটী পিতৃমাতৃহীনা কন্যা এখানকার বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যভার লইয়া আগমন করেন ; অল্প দিন পরেই তিনি এই ভক্তপরিবারের সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, মাতা শশিমুখী দেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কন্যাটীর নাম কুমারী বীণাপাণি মিত্র। তিনি ৬বৎসর কাল মাতা শশিমুখী দেবীর নিকট থাকিয়া এমনই ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হন যে, মাতাকে ঠাকুর মা, সত্যানন্দ ও সুব্রতানন্দকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহাদের মেয়ের মতন এখানে থাকিয়া মাতা শশিমুখী দেবীর সেবা করিতে থাকেন। প্রায় দুই বৎসরকাল মাতা শয্যাগ্রহণ করিয়া, একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হয়েন। বিশেষভাবে এই সময় মা বীণা-পাণিই মাতাকে খাওয়ান, পীড়ায় ঔষধ ইত্যাদি সেবন করান, সব কাজই করিয়া এই ভক্তপরিবারকে চির ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ সত্যানন্দও মার কাছে থাকিয়া মার সেবা করেন।

ঋষিগণ বলিয়াছেন, "ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘু সত্বরা। পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী ॥" সত্যই মা আমাদের তাঁর ভক্ত পতির ব্রতভাগিনী হইয়া, কঠিন কঠিন পরীক্ষা ও অনাহার, অল্পাহার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কঠোর দারিদ্র্য অকাতরে বহন করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে নিষ্ঠার সহিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। তাঁর প্রায়

নিত্য প্রার্থনা ছিল, "মা! আমি যেন তোমার ভক্ত-সঙ্গে তব শ্রীচরণে অনন্তকাল বাস করিতে পারি।" "দে মা স্থান শান্তি-নিকেতনে, মা তোর পুণ্যময় অভয় চরণে" ঐ সঙ্গীতটী অতি কাতরতার সহিত ভক্তিভাবে গাহিতেন। প্রায়ই ছেলেমেয়েদের জন্ত মা কৃপাময়ীর কৃপা ভিক্ষা করিতেন, "মা! আমি দুঃখিনী মা, এদের কিছু করতে পারলাম না; তুমিই এদের একমাত্র ভরসা, ভক্তের এই ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ কর, এরা যেন তোমার ভক্তের যথার্থ পুত্র কন্যাদের মত হয়। তুমিই এই পিতৃহীনদের পিতা হও, তুমিই ইহাদের রক্ষা কর।" মাতা শশিমুখী দেবীর এই প্রার্থনায় এ অধমের প্রাণকে বড়ই বিচলিত ও বিগলিত করিত। মা আমাদের এখানকার ধনী বড় লোক মেসো মহাশয়ের ও মাসিমার আদরে লালিতপালিত ও বড়লোকের পুত্রবধূ হইলেও, তাঁর ভোগবিলাসে স্পৃহা ছিল না, অভিমান বা অহংকার ছিল না। ভক্ত ফকিরদাস নিজেকে এদেশের সেবক ও মণ্ডলীর দাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, মাতা শশিমুখী দেবীও তেমনি আপনাকে সকলের পশ্চাতে রাখিতেন ও সকলকে মাতৃবৎ স্নেহ করিতেন। ভীষণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যখনই তাঁর শয্যাপার্শ্বে যাইতাম, তখনই জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে? কি খেয়েছ?" আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। নিজের রোগের যাতনা, কষ্ট অতি ধৈর্য্যের সহিত বহন করিতেন। যখনই জিজ্ঞাসা করিতাম, মা কেমন আছেন? বলতেন, "ভাল আছি।" 'ভাল আছি' ভিন্ন প্রায় আর কিছু বলিতেন না। খুব জেদ করে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "শরীরের কষ্ট যন্ত্রণা হচ্ছে বটে, কিন্তু রোগশয্যায় মার কোলে আছি।"

১৩৬৩ সালের ৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, প্রাতে ৮টার সময় হইতে মাতা শশিমুখী দেবীর নাড়ীর অবস্থা খারাপ হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে কুমারী বীণাপাণিকে কত মিষ্ট কথাই বলেছেন, দুগ্ধ চাহিয়া খাইয়াছেন। সত্যানন্দ পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ৯টার পরই আসন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া, আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া, 'মা দয়াময়ী, মা দয়াময়ী!' এই মহানাম কানের কাছে বলিতে লাগিলাম। মা তখন বাকৃশক্তিবিহীনা হইয়াও, এই মহানাম শুনিতে শুনিতে, ঠিক যেন মা দয়াময়ীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। মায়ের আত্মা-পক্ষী দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া, অনন্ত প্রেমরূপিণী মার বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাঁর নিত্য প্রার্থনা, ভক্তসঙ্গে মার শ্রীচরণতলে আশ্রয়লাভ, তাহাই পূর্ণ হইল। মায়ের মহাপ্রয়াণে চারিদিকে হাহাকারধ্বনি উঠিল, দলে দলে এই দেশের নরনারী বিধানকুটীরে সমবেত হইলেন ও ফকিরদাস হাই স্কুলের ও বালিকা-স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ ও শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীগণ সকলেই সমবেত হইয়া মাতা শশিমুখী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। বিধানকুটীরে প্রায় ২৫০শত নরনারী সমবেত হইলে, যথাবিধি প্রার্থনা করিয়া মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানে গমন করিয়া, দেবীর পবিত্র দেহে অগ্নি দান করা হয়। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ উপস্থিত ছিলেন, তিনিই নবসংহিতার [illegible] আবৃত্তি করিয়া অগ্নি দান করেন। মাতার মহাপ্রয়াণসংবাদ তাড়িত যোগে পাইয়া, জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমপ্রভা শ্মশানে আসিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করেন। দেখিতে দেখিতে দেবীর পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইল। জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে!

—•—

অষ্টাধিকশততম মাঘোৎসব

কার্য্যবিবরণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২ই মাঘ, নববিধান ঘোষণার মহাদিন। নববিধানে এইদিন বিশেষ দিন। প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রেরিতদরবারস্থ ভ্রাতৃগণ সমযোগে উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উদ্বোধন করেন, ভাই প্রিয়নাথ আরাধনা ও শান্তিবাচন করেন, ভাই নগেন্দ্রনাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যের 'নবশিশু' বিষয়ক উপদেশ আবৃত্তি করেন। নববিধান মূর্ত্তিমান নবশিশুরূপে অবতীর্ণ। এই বিধানে সকল ধর্ম্মবিধান এবং সকল ভক্ত সমন্বিতরূপে এক অখণ্ড নবশিশুজীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কেবল শাস্ত্রমতনয়, কিন্তু ইহা জীবনের ধর্ম্ম। মানবজীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া নবশিশুজন্ম বা পবিত্রাত্মজাত নবজন্ম দিবার জন্য এই নববিধানের অবতারণা। ইহার ভিতর সকল শাস্ত্র, সকল সাধু, সকল সাধন, সকল মানবচরিত্রের সমন্বয় সমাহিত। ইহাতে যোগ এবং ভক্তি, সংসার এবং বৈরাগ্য, ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শন, সেবা ও ধ্যান সকলই সমন্বিত এবং জীবন্ত ব্যক্তিরূপে মূর্ত্তিমান। ইহা যাহাতে প্রতি জীবনে জীবনে জন্ম লাভ করে এবং বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন এই নববিধান-মূর্ত্তিমানরূপে গঠিত হইলেন, তেমনি আমরাও মার কৃপায় গঠিত হই এবং অখণ্ড দলে নিবদ্ধ হই, ইহাই আরাধনায় ও প্রার্থনায় বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধান-বিশ্বাসীদিগের সম্মিলন হয়। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সভানেত্রী হন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়। শ্রীমতী মণিকা দেবী, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সত্যানন্দ রায়, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ প্রভৃতি আত্মনিবেদন করেন। অনুষ্ঠানান্তে নবশিশু-সন্দেশ বিতরণ হয়।

১৩ই মাঘ, শ্রীদরবারের উৎসব হয়। ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সমযোগে উপাসনা করেন। নববিধান যাহা বিশ্বাসে, তাহা অখণ্ড ভ্রাতৃত্বসমাধানে কার্য্যতঃ সাধনের প্রতিষ্ঠানই শ্রীদরবার। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব এক অখণ্ড মানসত্বে নিমজ্জিত করিয়া, যেন আমরা এই শ্রীদরবারের উপযুক্ত হই, ইহাই বিশেষ প্রার্থনীয়। সন্ধ্যায় শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশন ও আলোচনাদি হয়।

১৪ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস ভাগবতের ভক্তি বিষয়ে সুন্দর কথা কথকতার ভাবে বলেন; তৎপর মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন, এবং ভক্তকন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ আন্তরিক ভক্তিভাবে সকলকার সেবা করেন।

১৫ই মাঘ, বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব হয়। প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমতী মণিকা দেবী শিশুদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পত্নী দেবী শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি পারিতোষিক বিতরণ করেন। ছাত্রছাত্রীগণ সংগীত ও আবৃত্তি আদি করিয়া সকলকার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ভাই নগেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। সভাপতি মহাশয় একটী সুন্দর অভিভাষণ করিয়া বালকবালিকাদিগকে উৎসাহিত করেন। অভিভাষণটি ইতিপূর্ব্বেই ধর্ম্মতত্ত্বে বাহির হইয়াছে। বালকবালিকাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এই দিন প্রাতে অনাথ আশ্রমে, ১২।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে উৎসব হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এবং ভাই প্রিয়নাথ ও হেমলতা দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে ভূরিভোজন হয়।

১৬ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে উপাসনা হয় ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। তাঁহার আত্মনিবেদন বারান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৭ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় সমাধিমন্দিরে ধ্যানান্তে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তনাদি হয়, তৎপরে ভ্রাতা শ্রীমান্ সরলচন্দ্র সেন শান্তিবাচনের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। শান্তিজল ছিটাইয়া ও বিধান-ভোগ বিতরণ করিয়া উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

—•—

সংবাদ।

নববর্ষ—গত ১লা বৈশাখ, নববর্ষ উপলক্ষে, নবদেবালয়ে প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, মহারাণী সুচারু দেবী, শ্রীমতী মণিকা দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

শুভ শুক্রবার—গত ১৫ই এপ্রিল, গুড ফ্রাইডের দিনে, শান্তিকুটীরে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বিশেষ উপাসনা করেন। বাগানে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং মধ্যাহ্নে স্বর্গীয় সাধক শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

জন্মদিন—গত ১৫ই এপ্রিল, শুভ শুক্রবার দিনে, ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিকের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

নামকরণ—গত ৩রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল), কলিকাতায়, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, কেশব একাডেমী স্কুল গৃহে, শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র সিংহের প্রথম সন্তান শিশুকন্যার নামকরণ উপলক্ষে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং শিশুকে "জয়ন্তী" নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিশেষ উপাসনা—ব্রহ্মানন্দের জন্মশতবার্ষিকী সাধনের প্রস্তুতির জন্য নবদেবালয়ে বিশেষ ভাবে প্রতি রবিবার মণ্ডলীগত উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত রবিবার, ২৪শে এপ্রিল, প্রথম বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভ্রাতা হরিসুন্দর বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কয়েকজন ভাইভগ্নী যোগদান করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২রা বৈশাখ, পি ২।২৮।এ কাঁকুলিয়া রোডে, "প্রিয় ভবনে" ৺হরগোপাল সরকারের পুত্র, বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺প্রিয়ব্রত সরকারের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পত্নী দেবী প্রিয় স্বামীর স্মরণার্থ ৫৲ এবং স্বর্গীয় দেবর কিরণগোপাল সরকারের স্মরণার্থ ৫৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে এপ্রিল, ঢাকাতে, অধ্যাপক পূর্ণেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব ৺নরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিনে, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনা করেন এবং পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ঢাকার নববিধান মেডিকেল মিশনে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৬শে এপ্রিল, সাধ্বী সৌদামিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, শান্তিকুটীরস্থ দেবীর প্রকোষ্ঠে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তনান্তে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে এপ্রিল, স্বর্গগত ভাই অমৃতলাল বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, ৫।১।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রিটে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ২৮শে এপ্রিল, হাওড়ায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি লেনে, স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ দান করা হইয়াছে। অদ্য পাটনায় বিনয়কুমারের শ্বশুরের গৃহে, কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। শ্বশুর শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার ও শ্বশ্রূমাতা সুমতি দেবী প্রার্থনা করেন। সম্প্রতি বিনয়কুমারের সহধর্ম্মিণী ও কন্যাদ্বয় সেইখানে আছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশ . বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
15th. May, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জগতের ভাগ্যবিধাতা, ভারতের গতিমুক্তি-দাতা, উদ্ধারকর্ত্তা! নবযুগে ভারতের উদ্ধার জন্য, তুমি কি বিরাট ধর্ম্মের আয়োজন করিয়াছ, ইহা লইয়া কি অদ্ভুত লীলা খেলাই করিতেছ! অতীতের, বর্ত্তমানের, স্বদেশের, বিদেশের সকল সাধনসম্পদ, সকল ধর্ম্মসম্পদ ইহাতে মিলিত করিলে—আমরা দীনহীন পথের কাঙ্গাল, আমাদিগকে স্বর্গের অপূর্ব্ব ধনে ধনী করিবে বলিয়া, পৃথিবীর সকল অভাব যথাসময়ে পূর্ণ করিবে বলিয়া। কিন্তু এই পথে অগ্রসর হইবার প্রথম এবং প্রধান উপায় তোমাতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। প্রাচীন ভারতে রাজর্ষি জনক, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, ধর্ম্মের জন্য, তোমার আদেশপালন জন্য ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমুষা, শ্রীঈশা, শ্রীমহম্মদ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অতীতে কি আত্মসমর্পণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তোমাতে আত্মসমর্পণের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। নববিধানরূপ ধর্ম্মের বিরাট আয়োজন, স্বর্গের অমূল্য, অপূর্ব্ব ধনসম্পদ আমাদের সম্মুখেই; কিন্তু হে অন্তর্য্যামিন্! তুমি দেখিতেছ, তোমার নিকট যথার্থ ধর্ম্মদীক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া, সাধনপথে অগ্রসর হইবার প্রথম ও প্রধান উপায় যে সম্পূর্ণরূপে তোমাতে আত্মসমর্পণ, আত্মদান, পূর্ণ বিশ্বাসে তোমার বাণীর অনুসরণ, তোমার আলোকের অনুবর্ত্তন তাহাতো এখনও আমাদের জীবনে তেমন সম্ভব হইতেছেনা। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি, আমাদের পার্থিব ধন মান, আমাদের জাতিকুল এ পথে আমাদের ভয়ানক প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে কত মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের, আত্মদানের কত অভাব। এই অভাব জন্যই, আমাদের জীবনে, গৃহ পরিবারে এই জীবন্ত বিরাট ধর্ম্মের তেমন প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও জয় সম্ভব হইতেছে না। এ অবস্থায় তব চরণে কাতর প্রার্থনা, তুমি আমাদের ধর্ম্মজ্যেষ্ঠদিগের জীবনে যেমন তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্যের অতীত মহা পরীক্ষার ব্যাপার সংঘটন করিয়া, তাঁহাদিগকে তোমাতে সবশে অবশে আত্মসমর্পণ, তোমাতে আত্মদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলে, আমাদের জীবনেও, যত ভীষণই হউক না কেন, সেইরূপ পরীক্ষা উপস্থিত করিয়া, তোমাতে আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণ, আত্মদান করিতে বাধ্য কর। তুমি আমাদের প্রাণের এই কাতর প্রার্থনা কৃপা করিয়া পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের উচ্চগৌরব

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের বৎসরে, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিশেষ বিশেষ দিক বিশ্লেষণ করিয়া, আপনাপন আত্মিক জীবনের আলোক ও দেব-প্রেরণা অনুসরণে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। আমরা সেইভাবে শ্রীকেশবজীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া ও তাহার শুভ ফল মহাসম্মিলনের ধর্ম্ম নববিধানের জয় ও গৌরব বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান যুগে শুধু পার্থিব ধন, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, সাম্রাজ্য লইয়া যুদ্ধ চলিতেছে না, ধর্ম্ম লইয়া এখনও যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে। যে ধর্ম্ম পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করিবে, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র যদি যুদ্ধক্ষেত্র হয়, তবে কোথায় শান্তির আশা? যেমন পার্থিব বিষয় লইয়া, তেমনই ধর্ম্ম-লইয়া যুদ্ধ পৃথিবীময়। রাজ্য, সাম্রাজ্য লইয়া পৃথিবীতে বড় বড় যুদ্ধ; আবার গৃহে, পরিবারে, সাধারণ লোক-মণ্ডলীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বার্থ লইয়া কত যুদ্ধ। ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষভাবে যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ধর্ম্ম লইয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজের কত ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ বিবাদ। আবার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া ক্রমাগত বিবাদ। শান্তি, প্রীতি, আরাম কোথায়?

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রাণতা ভারতের বিশেষত্ব। তাই বিশ্বপতি যিনি, তিনি এই নবযুগে ভারতকে ধর্ম্মের মিলনক্ষেত্র, পার্থিব অপার্থিব সকল বিষয়ে শান্তি, আরামের ক্ষেত্র ও সকল বিষয়ের মীমাংসাক্ষেত্ররূপে মনোনীত করিলেন। ধর্ম্ম-পিতামহ রাজা রামমোহন রায় এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাকে সকল মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে মহা মিলনের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে, সকল লোকমণ্ডলী মধ্যে কিরূপ উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে, ছোট বড় সকলে কিরূপ উপাসনা-সাধনে, যথার্থ মিলনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন রায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। সেই মহা-সম্মিলনসম্পাদনের উপযোগী মহা উপাসনার প্রবর্ত্তনা, তাহার বিচিত্র বিকাশ প্রকাশ, তাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে। কেশব-জীবনে এই মহামিলনের ধর্ম্মের, সমন্বয়ের ধর্ম্মের নব উপাসনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনা দান করিলেন কে? কেশবজীবনে এই নব উপাসনাপ্রণালীর শিক্ষক কে, গুরু কে, এ পথে পরিচালক কে?

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ গাহিলেন :—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" মহান্ ঈশ্বর সকলের প্রভু। সেই জ্ঞান-জ্যোতিঃ স্বরূপ অনন্তপুরুষ জগতে শান্তি-সংস্থাপন জন্য স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া প্রবর্ত্তনা দান করেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি ঈশাও পূর্ণতর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ব্যাখ্যাতা রূপে, ধর্ম্মমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ পরিচালক রূপে, পবিত্রাত্মাস্বরূপে জীবন্ত ঈশ্বরেরই ধরাধামে আগমন ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে মহান্ ঈশ্বরের প্রবর্ত্তনার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হওয়াতে এবং অল্পাধিক সকল দেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে সাক্ষাৎ পবিত্রাত্মার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হওয়াতে, ভারতে বিশেষ ভাবে এবং অন্যান্য দেশেও সাধারণ ভাবে ধর্ম্মের নামে কত বিসদৃশ অভিনয় অভিনীত হইতেছে। তাই নবযুগে বিশেষভাবে ভারতের উদ্ধার জন্য, ভারতে নবজীবনদান জন্য এবং সাধারণ ভাবে অন্যান্য দেশেও নব জীবন, দেব জীবন দান করিয়া গৃহ পরিবারে এবং সমস্ত বিশ্বের জীবনে স্বর্গরাজ্যপ্রতিষ্ঠা জন্য, মহামিলনের ধর্ম্ম, সমন্বয়ের ধর্ম্ম নববিধানের প্রবর্ত্তকরূপে, সেই ধর্ম্ম-সাধনব্যাপারে উপাসনাপ্রণালীর জীবন্ত গুরুরূপে, শিক্ষক-রূপে, সমগ্র ধর্ম্মজীবনের নেতারূপে, এই নবযুগে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রজীবনে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি মহান্ ঈশ্বরের পবিত্রাত্মারূপে বিশেষ অবতরণ। এই পবিত্রাত্মার অব-তরণে, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়ার শুভফল তাঁহার জীবনে কিরূপ আরম্ভ হইল, জীবনবেদে তাঁহার কথায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মজীবনের নিতান্ত উষাকালে যখন কেশবচন্দ্র কোন ধর্ম্মসমাজভুক্ত হন নাই, কোন সাধু ভক্তের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, যখন অন্তরের কোন অভাব দূরীকরণ-

মানসে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবার তাঁহার অভ্যাসও হয় নাই, জীবনের সেই অপরিপক্ক উদীয়মান অবস্থায়, অন্তরে দেবাসুরের যুদ্ধ মধ্যে পবিত্রাত্মার ধ্বনি হইল, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, তোমার অন্য গুরুও নাই, গ্রন্থও নাই, প্রার্থনায় সকল ফল লাভ হইবে।" তিনি অন্তরের এই বাণী শুনিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন; প্রার্থনার ফলে তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের বাণী-শ্রবণ, প্রত্যাদেশ-সমাগম আরম্ভ হইল। তিনি কথা বলিলেন, সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের নিকটে; তাহার উত্তরে, ঈশ্বর কথা বলিলেন সাক্ষাৎভাবে তাঁহার নিকটে। ক্রমে তিনি ঈশ্বরাদেশে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, ধর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য ঈশ্বরাদেশে বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে এই প্রার্থনা-যোগে তাঁহার জীবনে বিচিত্র ভাবে ব্রহ্মদর্শন, জীবনব্যাপী ব্রহ্মবাণীশ্রবণ এবং জীবনে সকল অবস্থায়, সকল পরীক্ষায় ব্রহ্মবাণীপালন সম্ভব হইল। জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচালনায় ও শিক্ষায় তাঁহার জীবনে নবযুগধর্ম্মের নব নব বিকাশ হইতে লাগিল; সেই নব ভাবের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অনুরোধে, পরমসুহৃদ ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি টাউনহলে "Behold the Light of Heaven in India." বক্তৃতায় ঘোষণা করিলেন, আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচালনায় নবযুগধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছি, নব যুগধর্ম্মের নব নব সত্য ও আলোক লাভ করিতেছি; ভারতের বাহ্য অবস্থা, ভারতের রাজ্যপরিচালনের ব্যবস্থা, সমস্তই এই নবধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। সাক্ষাৎ জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচালনে ক্রমে যতই তিনি নবধর্ম্মের নব নব সত্য লাভ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আপনার দলের কত প্রিয় বন্ধুজন প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলেন, স্বদেশে বিদেশে কত প্রতিবাদ উপস্থিত হইল; কিন্তু তিনি অনুকূল, প্রতিকূল সকল অবস্থায়, সকল পরীক্ষায় অটল থাকিয়া, ঈশ্বরের দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান্ হইয়া, স্বদেশে বিদেশে নবধর্ম্মের নব নব সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। নব ধর্ম্মের মূর্ত্তিমানজীবন আপনি হইয়া, নিজ জীবনে, মণ্ডলীতে, দেশে বিদেশে, সমস্ত বিশ্বে নবধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিলেন, করিয়া আপনি গৌরবান্বিত হইলেন।

সময়ে স্বদেশের নিরপেক্ষ বিশিষ্ট অগ্রণীগণ স্বীকার করিলেন, প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতের ধর্ম্ম হইবে, জগতের ধর্ম্ম হইবে, সময়ে সমস্ত জগতের মীমাংসা-শাস্ত্র হইবে। বিদেশের মহা মনীষী মোক্ষমূলার সাহেব বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দজীবনের ধর্ম্ম ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মতো হইবেই, সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে।

এখন তাঁহার আপনার ধর্ম্মমণ্ডলী যদি তাঁহাদের জীবনে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিতে পারেন, তবেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নববিধানের জয়ে, ব্রহ্মানন্দজীবনের গৌরবরবি বৈশাখের সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র দীপ্ত দান করিতে পারিবে। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার আপনার দেশ ভারত অগ্রে গ্রহণ করিবে, তাহার পরে বিদেশ গ্রহণ করিবে, ইহাই সাধারণ বিধি। ভারতের সর্ব্বসাধারণ মধ্যে, বিশেষ ভাবে ভারতের প্রাচীন হিন্দুসমাজ মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রাচীন হিন্দুসমাজ পরোক্ষ উপাসনার ভিতর দিয়া, গুরু ও পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হইতে বহুদূরে পড়িয়াছে। জীবন্ত ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া-মূলক, ব্রহ্মানন্দ কেশবজীবনের জীবন্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা ভিন্ন, প্রাচীন আর্য্যসমাজের ও সমস্ত ভারতের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। বিশ্ববিধাতার মঙ্গল নিয়মে, ক্রমে ক্রমে স্বদেশ, বিদেশ, সমস্ত পৃথিবী জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ধর্ম্ম, মহা সম্মিলনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, নবজীবনের পথে, স্বর্গীয় সম্মিলনের পথে, শাশ্বত শান্তির পথে অগ্রসর হইবেই হইবে। সমস্ত পৃথিবীময় এই নবধর্ম্ম নববিধানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বোচ্চ গৌরব।

—o—

ধর্ম্মতত্ত্ব

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা

কেশবচন্দ্র বলেন, "ঈশ্বর কাহাকেও উপাসনা করান, কেহ নিজে উপাসনা করে।" বাস্তবিক প্রকৃত উপাসনা আমরা করিতে পারি না, ঈশ্বর আমাদিগকে করান। তিনি যখন আমাদিগকে উপাসনা করান, তখনি আমাদের ঠিক উপাসনা হয়। আমরা যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা খাটাইয়া উপাসনা করিতে চেষ্টা করি,

তখন তাহা মনের কল্পনা মাত্র। তাতে দেবদেবীগঠন যেমন, মনের কল্পনায় উপাসনাও তেমনি। মৃত্তিকার পুত্তলিকা দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহা যেমন জীবনবিহীন নির্জীব, কল্পনার মনগড়া উপাসনা সাধুভাষা-মণ্ডিত হইলেও তাহা জীবনবিহীন। তাই উপাসনা কেবল বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রসূত বক্তৃতা নয় বা কেবল ভাষার লালিত্য নয়। উপাসনা—প্রাণের সহিত সেই প্রাণের প্রাণের পূজা। তিনি স্বয়ং পবিত্রাত্মা হইয়া না করাইলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। তাই যাঁহারা সামাজিক উপাসনা করেন, তাঁহাদের আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, তাঁহারা মনের কল্পনার উপাসনা করিতেছেন, না, প্রাণের দেবতার আরাধনা করিতেছেন। উপাসনার প্রণালী-সম্বন্ধেও অনেকের মধ্যে শিক্ষা ও সাধনার বৈষম্য দেখা যায়। বৈষম্য যাহাতে দূর হয় এবং ঐক্যস্থাপন হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত। এক উপাসনার সাধন বিনা সামাজিক অথবা ঐক্যবন্ধন হয় না।

উপাসনায় অরুচি বা অসহযোগিতা

উপাসনার ঘরে আমরা কয়জনকে পাই শত, সহস্র লোক সিনেমা দেখিতে ছুটিতেছে; আমোদ, আহ্লাদ, বায়স্কোপ যেখানে, সেখানে লোক ধরেনা। বক্তৃতা শুনিতেও অনেকে জোটে, কিন্তু উপাসনার ঘরে কেহ বড় আর আসিতে চাহে না। উপাসনা যদি অর্দ্ধঘণ্টার অধিক হইল, প্রাণ ছটফট করিতে থাকে; এক ঘণ্টার অধিক দীর্ঘ উপাসনা, এই উপাসনা বড় বড় ব্রাহ্মসন্তানদেরও অসহ্য। যাঁহারা এরূপ উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনার বিচার ও তাঁহাদের অসহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী; যাঁহারা এরূপ, তাঁহারা এখনকার মণ্ডলীর উপাসনা করিবার উপযুক্ত নন, এই বলিয়া দণ্ডনীয়। উপাসনার প্রতি অরুচি জন্যই এরূপ বিচার সিদ্ধান্ত হয়, না, যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের অপরাধেই মন্দির উপাসকশূন্য হইতেছে? ইহার নিষ্পত্তি কে করিবে। বাস্তবিক উপাসনা সাধনের ধন; যাঁহারা দৈনিক উপাসনার সাধন অন্নপানের ন্যায় গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের কেমন করিয়া উপাসনায় রুচি হইবে? আহারে অরুচি হইলে যদি আহার না কর, আরও অরুচি বাড়িয়া যাইবে; তেমনি উপাসনা না করিয়া করিয়া উপাসনায় এত অরুচি হইতেছে। তাই অল্প উপাসনাকেও দীর্ঘ উপাসনা মনে হয়, তাই উপাসনায় মনোনিবেশ বা প্রাণনিবেশ হয় না। যাঁহারা উপাসনার কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরও অবশ্য মনে রাখা উচিত, কাহাদের সহিত উপাসনা করিতেছেন। আবার প্রকৃত উপাসনা কেবল লোক গণনা করিলেও হয় না। যাঁহারা উপাসনায় যোগদান করিতে যান, তাঁহারা যদি সমযোগদানের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত না হইয়া যান, কেমনে তাঁহাদের মন উপাসনার বশে থাকিবে? জগন্নাথ দেখিতে গিয়া যে পুঁইমাচা ভাবে, সে তাহাই দেখে, জগন্নাথ দেখিতে পায় না। উপাসনা করিতে চাহিলে, উপাসনা-দেবী স্বয়ং আমাদিগকে উপাসনা দেন। উপাসনার মন্দিরে গিয়া যদি আমরা মানুষ দেখি, আমরা কখনই উপাসনার মহা প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না। অপরের বিচার না করিয়া যেন আত্মবিচার করিতে শিখি।

স্বর্গগত আচার্য্য দুর্গানাথ রায়

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন ভগবদ্ভক্ত আচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। আমাদের চিত্ত গভীর বিষাদের ছায়াতে সমাচ্ছন্ন। তাঁর পুণ্যস্মৃতি ও পবিত্র জীবনের প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার উদ্দেশ্যে, দু'চারিটি কথা নিবেদন করতে চাই। পরিণত বয়সে তাঁর জীবনের পুণ্যজ্যোতিঃ অক্ষুণ্ণ রেখে, তিনি তাঁর জীবন-দেবতার নিকটে চলে গিয়েছেন, ইহাই আমাদের পরম সান্ত্বনার বিষয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনকল্পে সমবিশ্বাসী ধর্ম্ম-মণ্ডলীর সমক্ষে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটি উপস্থিত করার সুযোগ পেয়ে, আমি নিজকে বাস্তবিকই গৌরবান্বিত মনে করি।

শিশু কাল হতেই তাঁর জীবন ও চরিত্রের সম্বন্ধে এক অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলাম, আর তাঁর জীবন-সম্বন্ধেই একটা বিশিষ্ট গৌরব অনুভব করতাম। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মহকুমার অপর একটি গ্রামে আমারও জন্মস্থান। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আমার প্রায় সমবয়সী ও সহপাঠী ছিলেন। পরে বিবাহসূত্রে সম্পর্কান্বিতও হইয়াছিলেন। ভাই দুর্গানাথ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে, সম্পন্ন ভূম্যধিকারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশের সম্পদ, গৌরব, মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, তিনি যৌবনের প্রথম দিকেই জাতিগত সম্মানও মর্য্যাদা পদদলিত করে, জাতিভেদের দৃঢ় শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিয়ে, সংসারজীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন।

নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় ভারতে যে কল্যাণ-কর নব আলোক এনেছিলেন এবং যে আলোকের বিমলপ্রভা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাঙ্গলার সুদূর পল্লিতেও বিস্তার করেছিলেন, টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী কয়েকটি উদীয়মান প্রতিভাশালী যুবক তরুণ জীবনে সেই আলোক প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাই দুর্গানাথ সেই স্মরণীয় ও বরণীয় যুবকদলের ভিতরে অন্যতম একজন ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রতিভাশালী বলেছি, কেন না, গতানুগতিক চির প্রচলিত ও ব্যবহৃত পথে না চলে, নূতন পথ বেছে নেওয়ার বুদ্ধি ও সৎসাহসকেই আমি প্রতিভা বলে মনে করি। সেই উদীয়মান যুবকদলে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় আচার্য্য ব্রজগোপাল নিয়োগী, স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র সেন, ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র, ৺বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, ৺নবদ্বীপচন্দ্র দাস। সেই দলের দুইজন

আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় আজও আমাদের ভিতর রয়েছেন। ভগবানের করুণার ও মাহাত্ম্যর সাক্ষ্যদান করতে, এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের গৌরবস্তম্ভ। তাঁরা একে একে সকলেই চলে গেলেন, শুধু পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয়দ্বয় অসুস্থ জরাগ্রস্ত অবস্থায়, ধর্ম্মাকাশে নির্ব্বাণোন্মুখ তারকার ন্যায়, ব্রাহ্মসমাজের গৌরব অক্ষুন্ন রেখে এখনও মিটি মিটি জ্বলছেন।

এই সব সংসাহসী বীরপুরুষগণ যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা তাঁদের সুদৃঢ়হস্তে তুলে নিলেন, তখন আমরা শিশু, নিম্ন শ্রেণীতে পড়ি। তাঁরা যে বাঙলার মানবসমাজে জীবনের কি মহৎ ও উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমাদের, কি অপর বয়স্ক ও তথাকথিত শিক্ষিত জনসাধারণেরও মনে সে ধারণাই ছিল না। প্রত্যেক সংস্কারকের ভাগ্যে যে নিদারুণ উৎপীড়ন, নিগ্রহ ও অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী, সে সবই তাঁরা অম্লানবদনে সগৌরবে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা তখন মাথায় যে কাঁটার মুকুট পরেছিলেন, কালের মহিমায় সেইটি প্রকৃত রাজমুকুটে পরিণত করেছিল। অন্যান্য ব্রাহ্মদের ন্যায় দুর্গানাথও গৃহ ও সমাজ হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আত্মীয় স্বজনদের স্নেহ, বন্ধু বান্ধবদের প্রীতি, সামাজিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, পারিবারিক সম্পত্তি প্রভৃতি মানবোচিত সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

তাঁর ধর্ম্মমতের জন্যই পিতৃদেব তাঁর শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেও কুন্ঠিত হয়েছিলেন। দেশে গেলে বাসগৃহ বা রন্ধনশালায় প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁদের বাস ও আহারের জন্য অন্য গৃহ নির্দ্দিষ্ট হতো। দাস দাসীগণও তাঁদের সেবা করতে অনুমতি পেতোনা। নিজ হাতেই সমস্ত ছোট বড় কাজ করতে হতো। সমাজের কত রকম লাঞ্ছনাই যে তাঁরা ভোগ করতেন—হাসিমুখে ও অবচলিতচিত্তে,—আমরা এখন তার সম্যক ধারণা করতেও অক্ষম। কিন্তু দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, প্রলোভন, ভয়, শাসন কিছুই তাঁদিগকে বিচলিত করতে পারেনি। চির জীবন তাঁরা সেই ধর্ম্মের পতাকা অকম্পিতহস্তে উত্তোলিত রেখেছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কারকের এই অগ্রদূতগণ তাঁদের ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সংসাহস, বিশ্বাস, ভক্তি ও পুণ্যজীবন দ্বারা এক মহান্ আদর্শ সৃষ্টি করে গিয়েছেন; তাই আজ মনে হয়, এঁরা ছিলেন প্রকৃত বীর ও যোদ্ধা, আমাদের নমস্য পথপ্রদর্শক। যদিও আজ বহুসংখ্যক লোক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু পরিবারে অনেক বিষয়েই সেই ধর্ম্মের আদর্শ গৃহীত হয়েছে ও অনুসৃত হচ্ছে। শিক্ষা, সমাজ, নীতি, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে।

আচার্য্য দুর্গানাথের প্রথম জীবনের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেনি। কিন্তু দূর থেকেই তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্য ও মহিমার কথা অনেক শুনতে পেতাম। তারপর ১৮ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকা এসে, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। তখন হতেই অনেক ক্ষেত্রে মেলমেশা করার সুবিধা ঘটে। তাঁর প্রিয়দর্শন, প্রশান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর ব্যবহার ও চরিত্রের নির্ম্মলতা যে কোন লোকের হৃদয়েই শ্রদ্ধা উদ্রেক করতো। তখন তিনি ছিলেন সপ্ততিপর বৃদ্ধ, কিন্তু তখনও তাঁর ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে দেখেছি বিপুল শক্তি, তেজ ও উৎসাহ। মন্দিরে, দেবালয়ে ও অন্যান্য স্থানে বহুবার তাঁর উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ, বক্তৃতা, সঙ্গীতাদি শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গগত আচার্য্য মহিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে, দেবালয়প্রাঙ্গণে তাঁর শেষ উপাসনা আমিও শুনেছিলাম। সেই মনোরম দৃশ্যের স্মৃতি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে এবং চিরদিনই জাগ্রত থাকবে। ৮৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে, অপর দুজন ভদ্রলোক তাঁর কম্পিত কলেবর একরূপ বহন করে এনে, উপাসনার বেদিতে বসা'য়ে দিলেন। আমি ভাবিলাম, এই জরাজীর্ণ আচার্য্য কি আর বলবেন? কিন্তু ধীরে ধীরে উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার সকল অঙ্গই তিনি এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বলে উপাসনা শেষ করলেন যে, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। তাঁর ভাবোন্মত্ত উপাসনা শুনবার সময় আমি মনে মনে যে শব্দগুলি প্রয়োগের আশা করছিলাম, তার চাইতেও অধিকতর উপযোগী ও ভাবব্যঞ্জক শব্দগুলি প্রয়োগ ক'রে তিনি উপরত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, আর পরলোকের মহিমা ও পরমাত্মার গৌরব কীর্ত্তন করলেন। অন্য সময়ে তাঁর স্মৃতিবিভ্রম ও অসংলগ্ন আলাপের কথা অনেকে দেখেছিলেন; কিন্তু সে দিনের উপাসনায় কোথায়ও কোন ভ্রান্তি বা অসম্বদ্ধ ভাষা বা ভাব পরিলক্ষিত তো হয়ইনি, বরং ভাষা ও ভাবের সম্পদে সকল হৃদয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উপাসনান্তে তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর পদধূলি তুলে মাথায় নিলাম এবং বললাম—"কি সুন্দর উপাসনাই আজ শুনলাম; এখনও আপনি এত মনোরম উপাসনা করতে পারেন, এযে বিস্ময়েরই কথা!" তিনি বললেন,—"দেখ, আমি কি করেছি, কিই বা বলেছি? দয়াময়ী মা আমার মুখে যা তুলে দিয়েছিলেন, আমি শুধু তাই বলেছি।"

পূর্ব্বে বলেছি, পিতার নিগ্রহে উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ তথাকথিত কলেজের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য তাঁর ঘটে নাই। অতি অল্প শিক্ষা নিয়ে তিনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত জীবনই গভীর অধ্যয়নের দ্বারা তিনি অফুরন্ত জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন; কেন না, তাঁর গ্রন্থ ছিল জীবন ও শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং ভগবান। তাঁর প্রণীত ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতগুলি, তাঁর জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ও সাহিত্য-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি যে 'সঙ্গীতাচার্য্য' বলে অভিহিত হয়েছিলেন, এটা শুধু তাঁর একটা

দিকের মহত্বের পরিচয় প্রদান করে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, প্রেমের বিশালতা, চরিত্রের সংযম, শান্ত শিষ্ট ব্যবহার, ত্যাগ, সমাহিত চিত্ত, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী তাঁর জীবনকে প্রকৃত ঋষিত্ব দিয়েছিল। তাঁর দিকে চাইলেই মনে হতো, এঁরাই তো এ যুগের ঋষি! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান" এই উক্তি প্রতিনিয়তই শুনেছি; দুর্গানাথও সেই জ্ঞান, ধ্যান ও রসপান দ্বারা নিজের জীবন আমরণ সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। তিনি যখন মন্দিরে, কি বাহিরে, কি সভা সমিতিতে আসতেন, তখন তাঁর পরিধানে দেখতাম, পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্রাদি, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ; মনে হতো, এই মহাপুরুষের ভিতর বাহির দুটোই যেন নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। কোনরূপ চঞ্চলতা নেই, প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রসাদমণ্ডিত ছিল তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। ব্রাহ্মজীবনের কি উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট আদর্শ!

সেই রমণীয় মূল্যবান আদর্শ দুর্গানাথ রেখে গিয়েছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের পরম সম্পদরূপে। সে অমূল্য সম্পদ শুধু ব্রাহ্মগণ নন, জগতের সকল নরনারী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, অনুসরণ করে, সম্ভোগ করে, তাঁদের নিজ নিজ জীবন সুন্দর, মধুর ও উজ্জ্বল করতে পারবেন। প্রতিদানে আমরা দিব হৃদয়ের অপরিসীম শ্রদ্ধা। Gratitude to the living and honour to the dead. Emerson বলেছেন—The best way to show honour to the dead is by imbibing their spirit and following in their footsteps.

করুণাময় পরমেশ্বর তাঁর এই প্রিয় উপরত আত্মাকে শান্তি দান করুন, আরও মহিমান্বিত করুন এবং তাঁর আদর্শ দিয়ে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ।

সতী জগন্মোহিনী দেবী

ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা সাধক, ভক্ত ত্যাগী ও সেবক ছিলেন, যাঁদের ভোগবিলাসত্যাগ, দারিদ্র্য-ও-লাঞ্ছনা-বরণ, কঠোর সাধন ব্রাহ্মসমাজের শক্তির ও বিকাশের মূল, তাঁদের প্রতি এখনও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। বরং তাঁদের কথা নবীন ব্রাহ্মগণ ভুলে যাচ্ছেন। যদিও অসাধারণ দু'চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিষয়ে বৎসরে একবার করে কিছু আলোচনা হয়, অনেকের সম্বন্ধে প্রায় কোন সাড়াশব্দই হয় না; বিশেষতঃ যে সকল মহিলা, ব্রাহ্মসমাজগঠনে, গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায়, নারী-জীবনের উন্নত নতুন আদর্শ-রচনায়, ধর্ম্মপ্রাণ সাধক ও ত্যাগী স্বামিগণের সঙ্গে, কত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন, তাঁদের কথা খুব কমই শোনা যায়।

ব্রাহ্মিকাগণ এদেশে নারীজীবনের যে নূতন আদর্শ গড়ে তুলেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত সেবিকার স্থান অধিকার করেছেন, সে সকলের মূলে, পথপ্রদর্শক-রূপে বিরাজমান ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবী। তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১লা বৈশাখ ভারতের নববর্ষ। ব্রাহ্মসমাজে এই তারিখটি উচ্চতর অর্থে নববর্ষের দিন। এই তারিখে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন, জাতিভেদের দুর্গে প্রথম গোলাবর্ষণ হয়, সে বড় সামান্য ঘটনা নয়। তার চেয়েও বড় ঘটনা, ১৪ বৎসরের বালিকা বধূ জগন্মোহিনী দেবীর পক্ষে, সম্ভ্রান্ত সেন পরিবারের গুরুজন আত্মীয় স্বজন ও দাস দাসীদের দুর্গ ভেদ করে, সকলের অনুরোধ উপরোধ গঞ্জনা অগ্রাহ্য করে, প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর মতো যুবক স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে পথে বাহির হওয়া। নারীর অবরোধ জীবনের সকল প্রকার উন্নতির প্রতি-বন্ধক; সেই অবরোধ এখনও লক্ষ লক্ষ নারীকে কেবল জ্ঞান ধর্ম্ম হতে নয়, মুক্ত আলো বাতাস হতেও বঞ্চিত রেখেছে। বহু প্রাচীন, সেই অবরোধের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে, পথে বেরিয়ে, জগন্মোহিনী দেবী সেদিন যে পথ খুলে দিয়েছিলেন, সেই পথেই ক্রমশঃ অন্যান্য মহিলাগণ পদার্পণ করে, ব্রাহ্মসমাজ এবং নারী-জীবনের উন্নত আদর্শ গঠন করেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ১লা বৈশাখ বিশেষ দিন। নবযুগের সিংহদ্বার উদ্ঘাটনের দিন, স্মরণীয় দিন।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেছিলেন। তার মূলে বহু পরিমাণে তাঁর পত্নীর সহায়তা এবং তাঁর ধর্ম্মবন্ধু-গণের পত্নীদের সহায়তা। কেবল পুরুষদের দিয়ে পরিবার বা সমাজ গড়ে না। এই মহিলাগণের কাছে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মিকা-গণ যে কত ঋণী, তা বলে শেষ করা যায় না। গৃহহীন, অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা নাই, চারিদিকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা,—এরূপ অবস্থায় যাঁরা নীরবে স্বামীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ধর্ম্মসাধনে সহায় হয়ে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান জগন্মোহিনী দেবী।

১লা বৈশাখ, ভোরে বাড়ী হতে বাহির হয়ে আসা, সংগ্রামের আরম্ভ মাত্র। সেদিনকার আনন্দ উৎসবের মধ্যেই সংবাদ পেলেন যে, তাঁদের নিজ গৃহে আর স্থান হবে না। ভগবান তার ব্যবস্থা করলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের উভয়কে পুত্র এবং পুত্রবধূর ন্যায় নিজের গৃহে গ্রহণ করলেন। সে গৃহের পর্য্যাপ্ত সমাদরের মধ্যেও কেশবচন্দ্রের গুরুতর ব্যাধির জন্যে, জগন্মোহিনী দেবীকে কয় মাস কম সংগ্রামে দিনপাত করতে হয় নাই।

কয়েক মাস পরে আবার তাঁরা কলুটোলায় পৈত্রিক বাড়ীতে স্থান পেলেন। কিন্তু সেখানে যে ১৫ বছর কেটেছিল, সেকালের মধ্যে কেশবচন্দ্র যেমন জ্ঞানে ধর্ম্মে, সম্মানে প্রতিপত্তিতে দেশ বিদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর পত্নীকে সেইরূপ সেই প্রাচীন পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে থেকে, পতির ভাবের ভাবুক ও

পথের পথিক হওয়ার জন্যে যে কিরূপ অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সকল বিষয়ে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

কেশবচন্দ্র বড় লোকের ছেলে, বাহির হ'তে দেখলে তাঁর বাসগৃহ, পোষাক, খাওয়া দাওয়া, বড়লোকের মতই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু সে সময় কেশবচন্দ্র নিজ গৃহে থেকেও উদাসীন সন্ন্যাসীর মত ছিলেন। গৃহে থেকেও প্রায় অরণ্যবাস। বাড়ীর কর্ত্তাদের যেমন ব্যবস্থা ছিল, তাঁরও সেইরূপ খাওয়া পরার ব্যবস্থা ছিল। যা পেতেন, খেতেন পরতেন, হাত খরচের জন্যে যা পেতেন, তার সবই গৃহহীন প্রচারক বন্ধুদের সাহায্যের জন্যে দিতেন; নিজের জন্যে বা পত্নী ও সন্তানদের জন্যে তাঁর কোন চিন্তাই ছিল না। তিনি "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান", এবং সমাজ-গঠন, সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচার নিয়েই মত্ত। একদিকে তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, অন্যদিকে তিনি কর্ম্মস্রোতে ভাসমান।

কিন্তু, একান্নবর্ত্তী প্রাচীন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরে, স্বামীর অনুগামিনী হতে গিয়ে, জগন্মোহিনী দেবীর কিরূপ অবস্থা হয়েছিল? দীর্ঘকাল ঘোর সংগ্রাম ও পরীক্ষার মধ্যে থেকে, অসাধারণ সংযম সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের দ্বারা তাঁকে নব আদর্শের অনুসরণ করতে হয়েছিল। নিজের বাড়ীতে পরের মত থাকা কি কষ্টকর। কেশবচন্দ্র বাড়ীর ছেলে, ধর্ম্ম মানে না, জাত মানে না, কোথায় যায়, কোথায় খায়—সে সব মাপ; কিন্তু জগন্মোহিনী ঘরের বউ হয়ে বাড়ীর বাহিরে গেলেন, ঠাকুরবাড়ীতে বাস করলেন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গিনী হলেন, সে অপরাধের মাপ নাই। তিনি হলেন বাড়ীর মধ্যে একঘরে, জাতিচ্যুত! বাড়ীর আর সকলে একত্রে ওঠে বসে, খায় দায়; তাঁর সঙ্গে কেউ মেশে না, বসে না,—তাঁদের খেতে হয় নিজের ঘরে স্বতন্ত্র। তার উপর কথা শুনতে হয়, যে সকলের কত বস্ত্র অলঙ্কার, স্বামীর দেওয়া উপহার, তাঁর সে সব কিছুই নাই, তাঁকে স্বামীও দেখতে পারেন না, ইত্যাদি!

এক পরিবারের অন্তর্গত থেকে, এক বাড়ীতে বাস করে, সকল বিষয়ে এমন বৈষম্য, এমন তাচ্ছিল্য বিদ্রূপ কি কষ্টকর। অন্ন বস্ত্রাদি সকল বিষয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের পরিবার বাড়ীর অন্যকর্ত্তাদের ব্যবস্থার অধীন ছিলেন, নিজের বাড়ীতে যেন আশ্রিত পরের মত বাস করতে হোত।

বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়ে, বউ ঝী, সকলের সাজসজ্জা, খাওয়া দাওয়া বড়লোকের বাড়ীর যোগ্য; কিন্তু কেশবচন্দ্রের পত্নীর এবং সন্তানদের জন্যে বস্ত্রাদির ব্যবস্থাও অন্য রকম। জগন্মোহিনী দেবী স্বয়ং চিরদিন বস্ত্র অলঙ্কারাদি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; কিন্তু একবাড়ীর সন্তানদের মধ্যে এমন পার্থক্য, নিজের ছেলেমেয়েদের এমন অনাদর দেখে কোন মার প্রাণ ব্যথিত না হয়? সে কেমন পার্থক্য?—

বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েরা ভাল পোষাক পরে, আনন্দ করতে করতে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে, তাঁর ছেলেমেয়েদের তেমন পোষাকও নাই, নিমন্ত্রণও নাই, তারা এক ঘরে, অনাদৃত। অন্য ছেলেরা গাড়ীতে স্কুলে যাচ্ছে, তাঁর ছেলে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে!

বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে, ছেলেমেয়েরা সকলে এক জায়গায় খেতে বসেছে, একজন মহিলা তাঁর ছেলেমেয়েদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিলেন, অন্যত্র বসতে বল্লেন!

সাদাসিধে সাধারণ বস্ত্রাদিও যথেষ্ট ছিল না; কিন্তু পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলে, নিজের এবং সন্তানদের বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। বস্ত্রাদির এমন অভাব হোত যে, এক এক দিন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ভিজে সেমিজ পরেই স্কুলে যেতে হয়েছে! তবু কথা শুনতে হোত!

কেশবচন্দ্র অধিকাংশ সময় বাহিরে, সাধন ভজন প্রচার প্রভৃতি নানা কাজে ব্যস্ত, তাঁকে কিছু বলবার সময় হোত না। যদি কোন দিন বলতেন কোন অভাবের কথা, যেমন "সুনীতির যে কাপড় নাই", তাহলে "হাঁ হাঁ" করেই চুপ করতেন, কথাও চ'লত না, প্রতিকারও হোত না।

কয়েক বছর পরে যখন কেশবচন্দ্রকে বাড়ীর ও সম্পত্তির তাঁর নিজের অংশ পৃথক করে দেওয়া হ'ল, তখন হতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষের হাতে টাকাকড়ী থাকত; তিনি মাসে মাসে যে জিনিষ পত্র ও টাকা জগন্মোহিনী দেবীর হাতে দিতেন, তাতে তিনি নিজে স্বাধীন ভাবে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারতেন, পূর্ব্বের মত অভাব ছিল না; কিন্তু বরাবর টানাটানি করেই সংসার চালাতে হয়েছে, খাওয়া পরার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, বাড়ীর অন্যান্য সকলের তুলনায়, তাঁর ছেলেমেয়েরা হীন ভাবেই থাকতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বয়স বেড়েছে, কিন্তু টাকা বাড়ে নাই। কেশবচন্দ্রের অধিকাংশ অর্থ সমাজের নানা কাজে ব্যয় হোত। 'ভারতাশ্রমে' বাসের সময়ও জগন্মোহিনী দেবী বেশভূষা ও আহারাদিতে অন্যান্য অনেকের তুলনায়, অতি সামান্য ভাবেই থাকতেন। অসাধারণ সরলতা বশতঃ এ সকল বিষয়ে তাঁর মান অভিমান ছিল না।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করেও, সকলের উপহাস অগ্রাহ্য করে, তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যপালনে অটল ছিলেন। কলুটোলার বাড়ীতে দীর্ঘকালব্যাপী দৈনিক উপাসনা আরম্ভ হল, তিনি প্রতিদিন সেই উপাসনায় যোগ দিতে লাগলেন। রবিবার মন্দিরের উপাসনায় নিয়মিত রূপে উপস্থিত হতে লাগলেন; ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাঁদের নিয়ে বসে প্রার্থনাদি করেছেন; বয়স্কা মহিলাদের জন্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তিনি তাতে বালিকার মত পাঠ অভ্যাস করতে লাগলেন।

"ভারত-আশ্রম" স্থাপনের পর, কেশবচন্দ্র যেমন ধর্ম্মানুরাগী বন্ধুগণকে, সাধক ও প্রচারকগণকে নিয়ে নব নব ব্রতনিয়ম-সাধন

ও সেবার আয়োজনে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তেমনি জগন্মোহিনী দেবীও ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবে, ধর্ম্মাত্মা পতির সহধর্ম্মিণী ও অনুগামিনীরূপে, নারীদের মধ্যে ব্রত নিয়ম সাধন কীর্ত্তন উপাসনাদি করবার জন্যে মেয়েদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ও চেষ্টায় "আর্য্যনারী-সমাজ" "ভগ্নীদল" প্রভৃতি গঠিত হয় এবং "পরিচারিকা" নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান কেবল আলোচনার জন্যে স্থাপিত হয় নাই, দেহ মন আত্মার উন্নতির জন্যে বিবিধ ব্রত নিয়ম সাধন, আহারাদি বিষয়ে সংযম, বেশভূষায় সরলতা, পারিবারিক উপাসনায় নিষ্ঠা, সন্তানদের সুশিক্ষা, অতিথিসেবা, দাসদাসীদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার—এমন কি তাদের নিয়েও উপাসনা করা, সন্তানদের সঙ্গে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা ইত্যাদি কেবলমাত্র আলোচনার বিষয় করে রাখেন নাই, আচরণে পরিণত করে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে কত সময় নিয়মপূর্ব্বক ভোরে "মাতৃস্তোত্র" পাঠ, সন্ধ্যায় নবসংহিতা ও কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও উপদেশ পাঠ করতেন। সন্তানদের সঙ্গে ব্রত গ্রহণ করতেন; তাদের জন্মদিনে অতি হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করতেন।

কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবনের প্রথমে বৈরাগ্য ও অরণ্যবাসের পর, "ভারত আশ্রম" স্থাপন করে, ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিত্তিতে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করতে প্রবৃত্ত হন। "সুখী পরিবার" হতে আরম্ভ করে "নবসংহিতা" পর্য্যন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবার গঠনের প্রয়াস, বিধি নিষেধ, নিয়ম প্রণালী নির্দ্দেশ, সে সকলকে জগন্মোহিনী দেবী নিজ জীবনে, নিজের পরিবারে সন্তানদের মধ্যে, এবং ব্রাহ্মিকাদের জীবনে ও পরিবারে কাজে পরিণত করবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করেছেন।

গতানুগতিক ভাবে নিয়ম রক্ষা করে, তিনি ধর্ম্ম সাধন করতেন না। ধর্ম্মসাধনে কেশবচন্দ্রের ন্যায় তিনিও নব নব ভাব ও প্রণালীর সমাবেশ করতেন। সংযম ও বৈরাগ্য তো তাঁর জীবনব্যাপী সাধারণ সাধন ছিল। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পর, সংযম, শুদ্ধাচার, বৈরাগ্য অনেক বেড়েছিল। এক দিন কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, ধর্ম্মের জন্যে আসক্তি ছাড়তে হয়, মেয়েদের চুলের প্রতি বড় আসক্তি। সেই কথা শুনার কয়দিন পরে, একদিন উপাসনার পর, নিজের চুল কেটে ফেল্লেন।

একবার তিনি নিয়ম করেছিলেন, পারিবারিক উপাসনায় এক সপ্তাহ এক এক দিন কেবল একটি স্বরূপের আরাধনা হবে; আবার কোন সময় নিয়ম করেছেন, উপাসকগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে পর পর বিভিন্ন স্বরূপ অবলম্বনে আরাধনা করবেন।

ব্রাহ্মিকাগণের সঙ্গে উপাসনাদি করবার জন্যে তিনি একটি ঘর স্বতন্ত্র রেখেছিলেন। তার নাম ছিল যোগের ঘর। সে গৃহে বহুকাল প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় মহিলাদের সঙ্গে উপাসনা করতেন।

একবার মঙ্গলপাড়ার দুই পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও গালাগালি হয়। তিনি সে সংবাদ পেয়ে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, মঙ্গলপাড়ায় গিয়ে এক বাড়ীতে পাড়ার সকলকে উপাসনার জন্যে ডাকলেন। তাঁর প্রার্থনার পর, যাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, তাঁরা দুজনে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, আবার সদ্ভাব স্থাপন হল।

কত শোকার্ত্ত গৃহে গিয়ে উপাসনাদি করে, তিনি শোকদগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনা দান করেছেন। এ সকল কাজ তিনি প্রায় গোপনে করতেন। বাহিরের কেও জানতে পারতেন না। এ সকল তাঁর জীবনের একটু আভাস মাত্র। মনে রাখতে হবে, তিনি কে ছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের বধূ, জগদ্বিখ্যাত নেতার পত্নী, দশটি সন্তানের মাতা, বৃহৎ পরিবারের গৃহিণী, ব্রাহ্মিকাগণের কেন্দ্রস্বরূপ, অথচ শত অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে বাস।

কেশবচন্দ্র পত্নীর সঙ্গে "যুগল-সাধন" ব্রত নিয়েছিলেন। সে সাধন কঠিন ব্রত-নিয়মে পূর্ণ। পতি-বিয়োগের পর জগন্মোহিনী দেবী আরও ব্রতপরায়ণা হয়ে, প্রায় ১৪ বছর যাপন করেন। প্রাতঃস্নানের পর দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ব্যাপী উপাসনা, বহুক্ষণ ব্যাপী ধ্যান, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, স্বপাকে এক সন্ধ্যা আহার, তাঁর নিত্য কাজ হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসাধনে, পরিবারসাধনে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণতা বিধানে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর মূলে বহু পরিমাণে জগন্মোহিনী দেবীর নীরব অথচ সজীব সহায়তা। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ, ব্রাহ্মসমাজের ছেলেমেয়েরা যত এরূপ জীবনের সংস্পর্শে আসবেন, ততই সমাজের কল্যাণ। এরূপ সংগ্রামপূর্ণ, সাধনময়, সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার নির্ম্মল জীবন দিয়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্মে পরিণত হয়েছে, এবং ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের আধার হয়েছে।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(৩)

(ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক ও নৈতিক সংগ্রাম)

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাইবার প্রাক্কালে, একদিন তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন। সে সময়ে এ ব্যবহারের মর্ম্ম দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে না পারিলেও, পরবর্ত্তী সময়ে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার সংগ্রামক্ষেত্রের যাবতীয় ভার দেবেন্দ্রনাথকেই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়টি উপলব্ধি করিবার পর হইতেই,

তিনি বীরোচিত সাহসভরে, উড্ডীয়মান 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিজয়নিশানটি ধারণ করতঃ, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও লিখিতেছি যে, মহাপুরুষ-দিগের (Greatmen) লোক চিনিবার শক্তিও অসাধা-সাধারণ। পরবর্ত্তিকালে কেশবচন্দ্রের জীবনে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দুই তিনটি মাত্র উল্লেখ করিতে চাই। নববিধানের পতাকাটি তিনি কোন একদিন (নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার দিন) উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। (কোন একদিন, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোন সময়ে এ ঘটনাটি উপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন।) উপাধ্যায় নিশানটি কোন বন্ধুর হস্তে দিয়া, কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কেশবচন্দ্রের নিকটে গেলেন। কেশবচন্দ্র উপাধ্যায়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি নববিধানের নিশান কোথায় রাখিয়া এখানে এসেছ।" এই কথায় উপাধ্যায় চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবালয়ে গিয়া নিশান হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই যে কেশবচন্দ্রের উপাধ্যায়হস্তে নিশান-সমর্পণের ব্যাপার, উপাধ্যায় তখন হইতেই ইহার গুরুত্ব বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং আজীবন ঐ পতাকাটি তিনি দৃঢ়ভাবেই ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আমার পূজ্যতম বঙ্গচন্দ্র রায়ও প্রায় ঐরূপ সময়েই, ঢাকার নিমতলীতে যখন আমি সপরিবারে বাস করিতাম, তখন বলিয়াছিলেন। তিনি যখন বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ, সর্ব্বপ্রথম প্রচারব্রত-গ্রহণের পরে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গনকরতঃ বলিয়াছিলেন যে, "আজ আমি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে আলিঙ্গন করিতেছি।" সেখানে বঙ্গবাবুর সঙ্গে ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্র রায় গিয়াছিলেন; একজন বলিলেন, এই যে ময়মনসিংহের শরৎবাবুও এখানে এসেছেন। কেশবচন্দ্র উত্তর করিলেন যে, "এক বঙ্গচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেই সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে আলিঙ্গন করা হয়।" বঙ্গচন্দ্র আজীবন ঐ ব্যাপারের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিতেন এবং পূর্ব্ববঙ্গেরই চন্দ্ররূপে নববিধানের স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতির সভা-পতিরূপে, শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও কেশবচন্দ্রের লোকে চিনিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, অমৃতলাল, গিরীশচন্দ্র, প্যারীমোহন প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে, যে যে বিষয়ের উপযুক্ত, কেশবচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহাদিগের প্রতি তত্তাবত্তের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা এখানে প্রবন্ধোচিত নহে বলিয়া, আর সবিস্তার উল্লেখ করিলাম না।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মক্ষেত্রে সংগ্রামের বিষয়-গুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। আজ এখানে তাঁহার সমাজসংস্কারের ব্যাপারে ও নৈতিকক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তি-প্রয়োগের বিষয় বলিতে চাই। বর্ত্তমান সময়ের ঘটনানাবলী দেখিয়া বিচার করিলে হইবেনা; শতবর্ষ পূর্ব্বে, সেই ১৮৩৯ সন হইতে বঙ্গদেশের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার চিত্রপট সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে ১৮৩৯ সন হইতে আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হয় এবং ১৮৪৩ সনের ৭ই পৌষ হইতে "ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার সভ্য বলিয়াই ইনি ব্রাহ্ম" ইহা ঘোষিত হয়। ১৮৪৫ সনে দেবেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে "ব্রাহ্ম-সম্মিলন" সংগঠিত করিয়াছিলেন এবং উহা পল্‌তার পরপারবর্ত্তী গিরেটিতে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই দিনই সেখানে জগদ্দলের রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মেরা যখন জাতিভেদ অস্বীকার করেন, তখন জাতিভেদের পরিদ্যোতক উপবীত-ধারণের কোন প্রয়োজন নাই। এই সময় হইতেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়, দেবেন্দ্রনাথও ঐ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনিও উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং সে সময়ে তিনি তাঁহার সহযোগী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, অসবর্ণ বিবাহ পর্য্যন্ত সমাজসংস্কারে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তদানীন্তন কালে বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম বক্তা সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ই কার্য্যতঃ জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন ১৮৫১ সনে তাঁহার কর্ম্মস্থল গাজীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহাধ্যায়ী স্বনামপ্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় কতিপয় বন্ধুসমভিব্যাহারে নদীপথে নৌকাযোগে গাজীপুরে যাইতেছিলেন; সে সময়ে তাঁহাদের গাজীপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, একদিন বন্ধুগণ আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন কথোপকথনচ্ছলে একজন বলিয়া ফেলিলেন যে, আহা! আমরা কি ভণ্ডামীটাই না করিতেছি। দুই বেলাই মাঝিদের রান্না খাইতেছি, অথচ গলায় ধপধপে পৈতাটি ঝুলাইতেছি। এ কথাগুলি রামতনুবাবুর প্রাণে যেন শেলবিদ্ধবৎ অনুভূত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে স্বীয় উপবীতটি নিক্ষেপ করিয়া ফেলিলেন। আমরা ক্রমে দেখাইব যে, দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ের আন্দোলন হইতেই ক্রমশঃ ইহা পরিপুষ্ট হইতে চলিয়াছিল এবং পরিশেষে ১৮৫৭ সনে কেশবচন্দ্র এ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, ইহা যেন, ঐ সেই ১৮৬৪ সনের ৬ই অক্টোবর, ২০শে আশ্বিন, বুধবার দিবসে পূজার পঞ্চমী তিথিতে প্রচণ্ড বটিকাবর্ত্তের ন্যায়, সমস্ত বঙ্গদেশকে আন্দো-লিত করিয়া তুলিয়াছিল। (ঐ ঝড় আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে। ঐ পূজার সময় আমি আমার খুল্লতাত স্বর্গগত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত টাঙ্গাইলের রুকনী গ্রামে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। খুড়া মহাশয় দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য করিতে গিয়াছিলেন এবং আমি তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।)

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গও এদেশে সর্ব্বপ্রথমে পর্দ্দাপ্রথা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূই স্বামীর সহিত সর্ব্বপ্রথম লাটসাহেবের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য এক পুত্রবধূ ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন, পরিবারের মহিলাবর্গ খোলা গাড়ীতে নগরে বেড়াইতে বাহির হইতেন, তিনি তাঁহার কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। এ সকল অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহাকে শাসন করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না, ভয় প্রদর্শন করিতেও কেহ সাহসী হইত না। তবে ইহাও লিখিত আছে যে, একদিন তাঁহার এক অতি নিকট আত্মীয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "দেবেন্দ্র, তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা ছাদে বেড়ায়, আমাদের তাহা দেখে লজ্জাবোধ হয়; তুমি কি নিষেধ করিয়া দিতে পার না?" দেবেন্দ্রনাথ ভদ্রভাবেই উত্তর দিলেন, "কি করিব, এখন কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে নবাবী আমল আর নাই, বিধাতাই এ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার কাজ তিনিই করিবেন।" বর্ত্তমান সময়ে এই যে মহিলাগণের পোষাক পরিচ্ছদ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের বাড়ী হইতেই ইহার সূচনা। সে সময়ে বেথুন স্কুলে মেয়ে পাঠাইলে সমাজচ্যুত হইতে হইত। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার মেয়ে দুইটিকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন এবং সেজন্য তিনি সে সময়ে সমাজচ্যুতও হইয়াছিলেন। কলিকাতার পরেই বঙ্গদেশে বারাশতে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন ঐ বিদ্যালয়ের উদ্যোগকর্ত্তাগণ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সমাজের যখন এরূপ অবস্থা, তখন দেবেন্দ্রনাথ এই সকল পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া, সমাজক্ষেত্রে বীর পুরুষের ন্যায় নির্ভীকভাবে অবস্থিত ছিলেন।

পিতৃশ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের কঠোর সংগ্রাম। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডেই দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন; এ সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। যথাযথ ভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেলে, তাঁহার শ্রাদ্ধের দিবস নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে। তখন স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ পরামর্শ প্রদান ও আয়োজন করাইতে লাগিলেন, যেন দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মহাধুমধামের সহিত বিশুদ্ধ হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়, নচেৎ অখ্যাতির কথা। পূর্ব্ব দিনও দেবেন্দ্রনাথ নীরব। অনেক পীড়াপীড়ি চলিতে লাগিল, দেবেন্দ্রনাথ বিনীতভাবেই বলিলেন, "আমি পৌত্তলিকতার সংস্রব রাখিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিব না। আমি যখন ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন অপৌত্তলিক ভাবেই এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিব।" বাড়ীতে ও নগরে এ জন্য তুমুল আন্দোলন, দেবেন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন না। তাঁহার সংকল্প টলিল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল আয়োজন যথারীতি পূর্ণ হইয়াছে, সকলেই দেবেন্দ্রনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; এমন সময়ে দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন এবং তাঁহারই বিরচিত কয়েকটি মন্ত্র দ্বারা যাবতীয় দানসামগ্রী উৎসর্গ করতঃ, পুনরায় উপরে চলিয়া গেলেন। সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার ছোট ভাই যথারীতি হিন্দুমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই ব্যাপারে কেহই আর সেদিন সেখানে আহারাদি করিলেন না। পরদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি "বেহ্ম বেহ্ম" না কর, তবে আমরা আজ তোমার বাড়ীতে আহারাদি করিব। দেবেন্দ্রনাথ যেন সহজেই বলিয়াছিলেন, "যদি তাহাই হইবে, তবে আর এত করিলাম কেন?" এই যে তাঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, ইহাই আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের পত্তনভূমি, ইহারই উপরে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলী আজও দাঁড়াইয়া আছেন। আজ ধন্য সেই লালা হাজারীলাল, একমাত্র যিনি এ কঠোর সংগ্রাম-সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ও যাঁহার একটি মাত্র কথাতেই দেবেন্দ্রনাথ অবিচলিত ছিলেন।

ভাই ভগ্নীগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন, যদি তখন দেবেন্দ্রনাথ প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্নকরতঃ হিন্দুসমাজভুক্তই থাকিতেন, তবে কি আজ নগরে নগরে এতগুলি ব্রহ্মমন্দির মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারিত, অথবা ব্রাহ্মনামে আখ্যাত এক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এই আমাদিগের মণ্ডলী এত আশ্চর্য্যভাবে আজ নূতন অভিনয় দেখাইয়া জগৎকে বিস্মিত করিত?

দেবেন্দ্রনাথের পৈত্রিক ঋণ-পরিশোধ তাঁহার এক নৈতিক বলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আজ যে "সাধু সাধু" বলিয়া তিনি জগতে ঘোষিত হইতেছেন, ইহা অসম্ভব হইত, সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যদি তাঁহার পরামর্শদাতাগণের কথায় মহাজনদিগকে প্রতারিত করিতেন; তবে তাঁহার সেই কলঙ্কই ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইবার পক্ষে এক প্রবল অন্তরায় হইয়া পড়িত। রাজা রামমোহন সর্ব্বপ্রথম নিশান উড়াইয়াছিলেন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্", দেবেন্দ্রনাথ সত্য রক্ষা করতঃ দ্বিতীয় নিশান উড়াইলেন "সত্যমেব জয়তে", তৃতীয় নিশানটি ভক্ত কেশবচন্দ্র একমাত্র ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়াই উড়াইয়া গিয়াছেন "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—•—

প্রার্থনা

(২৮শে এপ্রিল, স্নেহের বিনয়কুমারের তৃতীয় সাম্বৎসরিক দিনে)

নববিধানের নবীন ঠাকুর! তোমার বিধানে যতই দিন যাইতেছে, ততই তুমি নবীনত্ব প্রকাশ করিতেছ। ভাবুকের প্রাণে নিত্য নূতন ভাব আসে। সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হইতেছে, এবং সরোবরে প্রতিদিন প্রভাতে নতুন কমল ফুটিতেছে। কবির কবিত্বে

ইহা প্রতিদিনই নতুন ভাবে ফুটিয়া উঠে। তোমার নববিধানে দেখিতেছি, পরলোক-সম্বন্ধে নিত্য নূতন তত্ত্ব।

আজ এই সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে বুঝিতেছি যে, এ অনুষ্ঠান, তৃতীয়বর্ষেও নবীনত্বপূর্ণ। তোমার বিধান ক্রুশের বিধান। ক্রুশ ব্যতীত বিধানের নূতনত্ব সাধক তাঁহার সাধনায় অনুভব করিতে পারেন না। আজ এই দিনে তুমি ক্রুশের বিধান উপস্থিত করিলে। তুমি তোমার হিন্দু, খৃষ্ট এবং ইসলাম বিধানেও ক্রুশের নবীনত্ব প্রকাশ করিয়াছ। শ্রীঈশার ক্রুশে যে নবীনত্ব ফুটিয়া উঠিল, তাহা প্রতিদিনের জীবনেই নূতন।

তোমার বিধানের মহানন্তাপালনে হাসিতে হাসিতে শ্রীঈশা জীবন উৎসর্গ করিলেন। একদিকে শত্রুদত্তে ক্রুশে বিদ্ধ হইতেছেন এবং অপরদিকে সেই শত্রুদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক" তাঁহার এই প্রার্থনা চিরদিনই পৃথিবীতে নবভাবে প্রস্ফুটিত হইবে। ইসলাম বিধানে সেই যে সাধক হোসেন হাসেন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদান করিলেন, তাহারও নবীনত্ব কোনদিন যাইবে না। প্রাচীন হিন্দুসাধকও বৎসরের শেষ দিনে অর্থাৎ পুরাতন ও নব বর্ষের সঙ্গমস্থলে আসিয়া, মহাদেবের নামে পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া শোণিত দান করিলেন। শোণিতদানের বিধান কোনদিন পুরাতন হয় না। আজ এই অনুষ্ঠানে উপলক্ষে, তোমার নববিধানে পরার্থে শোণিতদানের নূতন বিধান অনুভব করিতেছি। তোমার স্নেহের সন্তান বিনয়কুমার পাশ্চাত্য মহিলার প্রাণের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ পূর্ণ করিবার জন্য, তাঁহাকে লইয়া অদৃশ্য বিমানপথে হঠযোগীর মতো চলিয়া গেলেন এবং সেই স্থানে তোমার বিধানে উভয়েই জীবন উৎসর্গ করিলেন।

তোমার নববিধানে ইহা এক ক্রুশের বিধান। প্রেমিক সন্তান তোমার প্রেরিত মহাপ্রেমে আত্মবলি দিলেন। আজ তুমি এই অনুষ্ঠানে আর এক নূতনত্বের বিশেষ অধ্যায় প্রকাশ করিলে। বৎসরের এই মাসে শ্রীঈশাও ক্রুশে প্রাণদান করিলেন, আর এই মাসেই তোমার প্রেমিক সাধক বিনয়কুমার অন্যের জন্য প্রাণ দান করিলেন; প্রাচীন হিন্দুসাধকও শ্রীমহাদেবের নামে এই সময়ই শোণিত উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। চৈত্র ও বৈশাখের সঙ্গমক্ষেত্রে আসিয়া, পুরাতন ও নূতন বর্ষের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া, তোমার নামে তাঁহারা শোণিত উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ বলিতেছি, তোমার বিধানে সমস্তই বিচিত্রতায় পূর্ণ। আজ আর আমরা প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিব, জানি না। এই যে তোমার প্রেমিক সাধক বিনয়কুমার প্রাণদান করিয়া গেলেন, ইহা আমাদিগের নিকট বেদবেদান্ত ও উপনিষদ্ হউক।

তোমার নববিধানের সাধক ভক্ত বলদেবনারায়ণ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রবেশ দ্বারে আসিয়া, সেই সুদূর পারস্য এবং তুরস্ক ভূমিতে ইসলামবাদীদিগের ভিতরে নববিধান প্রচার করিতে করিতে, সেই স্থানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং ইসলামবাদীদিগের সমাধিক্ষেত্রে মহাসমাধিতে সমাহিত হইয়াছেন।

তাই আজ বলিতেছি, জীবনে ক্রুশের বিধানে সাধনা ভিন্ন তোমার নববিধান আমাদিগের মধ্যে পূর্ণ হইবে না। তুমি তোমার এই বিধানে আমাদিগকে নবভাবে দীক্ষিত কর। তাঁহারা যেমন এই দীক্ষায় নবজীবন লাভ করিয়াছেন এবং স্বর্গের শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ জীবন এবং শান্তি লাভ করি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

নূতন সঙ্গীত

রাগিণী—ইমন ভূপালী; তাল—আড়া।

("অনন্ত অপার তোমায় কে জানে" সুরে)

আজি মধুর মধুর বহে বায়;
দেব মানব আজি মিলি সমস্বরে
তোমার মঙ্গলগীতি গায়।
উৎসব-মন্দিরে হেরি একি রঙ্গ,
শুষ্ক মরুভূমে সলিলতরঙ্গ,
পুলকে পূরিত সর্ব্বজন-অঙ্গ,
(তব) প্রেম-স্রোতে ভেসে যায়।
যারা মোহ ঘোরে সম্বৎসর ধ'রে
ছিল অচেতন ভুলিয়ে তোমারে,
একিহে অপূর্ব্বলীলা ধরিয়ে তাদের
জাগালে মাতালে মহা মহোৎসবে;
এ প্রেমরহস্য কেমনে বুঝিবে
মোহান্ধ মানব এ ধরায়।
পাপী সাধু দুঃখী ধনী নির্ব্বিচারে
প্রেম-সুধা ঢালি দিতেছ সবাকারে,
ঘুচিল ভাবনা পাপের যাতনা,
জড় সম প্রাণে জেগেছে চেতনা;
ধন্য ধন্য নাথ প্রণমি তব পায়॥

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর গুপ্ত।

—•—

সংবাদ।

শুভবিবাহ—গত ১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল), স্বর্গীয় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণের (I.C.S.) সহিত, মজঃফরপুর জি, বি, বি, কলেজের অধ্যক্ষ, স্বর্গগত ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের জামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নীলিমার শুভ বিবাহ, কলিকাতায়, পি ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডস্থ ভবনে, সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন এবং শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বরকন্যাকে উপদেশ দান করিয়া প্রার্থনা করেন। ভগবান নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

পারিতোষিক বিতরণ—গত ১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল) ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, সুনীতিশিক্ষালয়ের পুরস্কার-বিতরণোৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জীকিউটিভ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখার্জি সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রদ্ধেয়া মিসেস কে, সি, দে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন করেন। প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচনকালে মহারাণী সুনীতি দেবীর সুন্দর জীবনের সদ্‌গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তিনি যাহা বলেন, তাহা আগামীবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। মেয়েদের আবৃত্তি এবং অভিনয়াদিও সকলের হৃদয়গ্রাহী ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি।

বিদেশ-যাত্রা—স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র, স্বর্গীয় মনোগতধন দের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসু ইছাপুর গান ফেক্টরী হইতে, উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ, গত ১১ই মে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহার কল্যাণকামনার্থ, গত ৩০শে এপ্রিল, ২।৩ বি, পণ্ডিতিয়া রোডে শ্বশ্রূমাতাদের গৃহে, এবং ৮ই মে, ১৬নং বমরাম বসু ফার্ষ্ট লেনে ভ্রাতাদের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন। এই উপলক্ষে প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী অরণ্যশোভা অনাথাশ্রমে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন। মা সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার প্রিয়তম সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন এবং তাঁর শুভ ইচ্ছা ইঁহার জীবনে পূর্ণ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই বৈশাখ, বালীগঞ্জে, ৬।২বি, একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, পুত্রদের গৃহে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৭ই মে (২৪শে বৈশাখ) কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে, তত্রত্য রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন ডাঃ বিবেকমোহন সেনের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র) স্বর্গীয় বিজয়মোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন ও প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ), ১৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় স্বপ্রকাশচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ৯ই মে, সোমবার, আলিপুরে, ৩০নং নিউ রোডে, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেনের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

পাটনার সংবাদ—শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার লিখিয়াছেন;—

বিগত ৯ই মে তারিখে আমাদিগের প্রবাসকুটীরে, আমাদিগের স্নেহাস্পদ ভ্রাতা অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেনের পারলৌকিক দিনে, বিশেষ উপাসনা হয়; আমি উপাসনা করিয়াছিলাম। এই দিনে আমাদিগের পরিবার হইতে আরও দুইটী শিশুসন্তান পরলোকে চলিয়া যান। আমার হাবড়াস্থ চতুর্থা কন্যা শান্তিদায়িনীর পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পুত্র করুণাকুমারের এবং আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা যমজ কন্যার এগার মাসের শিশু জীবন এইদিনে নিঃশেষিত হইয়াছিল। এই তিন জীবনের সঙ্গমক্ষেত্রে আসিয়া ভগবানের নিকট বসিতে হইয়াছিল। আরাধনান্তে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুমতি দেবী ঐ দিনের ভাবোপযোগী প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

উৎসব—কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:—

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪৫, রবিবার—সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। ৫ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় সঙ্গীত, ৮॥০টায় উপাসনা, ১০॥টায় কেশবাশ্রমে সমাধিপার্শ্বে উপাসনা, সন্ধ্যায় ৬টা হইতে ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ, আলোচনা ও সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। ৬ই প্রাতে ৮টায় কেশবাশ্রমে উপাসনা এবং তৎপরে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা। ৭ই প্রাতে ৮টায় সাধারণব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলন। ৮ই প্রাতে ৮টায় কেশবাশ্রমে শান্তিবাচন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ নন্দী ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হন।

কৃতজ্ঞতা-দান—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ লিখিয়াছেন:—

আমি গত জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে রোগাক্রান্ত হইয়া, পরবর্ত্তী আষাঢ় শ্রাবণে শারীরিক পীড়ায় সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। পীড়ার কঠিন আক্রমণের সময় মঙ্গলপাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ নন্দন অতি যত্নপূর্ব্বক আমার চিকিৎসা করেন এবং তাঁহার চিকিৎসায় কঠিন পীড়ার আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করি। এজন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দান করি। তিনি আমার পরিবার মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, ডাকিলেই আসিয়া চিকিৎসা করেন, এবং তাঁহার চিকিৎসায় সুফল লাভ করিয়া আমরা শারীরিক বিষয়ে বহু পরিমাণে নিশ্চিন্ত; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ। আমার পীড়ার কঠিন আক্রমণের সময় শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধু ডাক্তার জগন্মোহন দাস অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া আমাকে সৎপরামর্শ দান করিয়াছেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রও দিয়াছেন। আমার পীড়ার প্রথম দিকে এবং শেষদিকেও শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধু ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র কিছুদিন চিকিৎসা করেন, তাঁহার চিকিৎসায়ও অনেকটা ফল লাভ করি। এজন্য তাঁহাদের উভয়কে কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে ধন্যবাদ দান করিতেছি। হোমিওপ্যাথী ডাঃ শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অতি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়া, আমাদের পরিবারের একটী কন্যাকে দীর্ঘদিনের কঠিন জ্বরের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; এজন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকেও ধন্যবাদ দান করি। এই দীন সেবককে যাঁহারা সেবার ভাবে চিকিৎসা দ্বারা সাহায্য করিলেন এবং করিতেছেন, করুণাময় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করুন, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

৭৩ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। } ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ 30th. May, 1938 { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, জীবন্ত মা তুমি, আমাদের আর্য্য ঋষিগণ তোমাকে ব্রহ্মনামে সম্বোধন করিতেন। ইহুদি ঋষিগণ তোমায় জিহোবা নাম দিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধদেব শূন্যরূপে তোমাকে দেখিয়াছিলেন। স্বর্গস্থ পিতা বলিয়া ব্রহ্মনন্দন যিশু তোমার আরাধনা করেন। শ্রীমহম্মদ 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া তোমার নমাজ করিতে শেখান। শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাকে শ্রীহরি ভগবান নামে অভিহিত করেন। পৌরাণিক শাক্তগণ তোমাকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বিধান নববিধান লইয়া তুমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছ, নববিধানের নবশিশু শ্রীকেশবচন্দ্রকে তুমি বিশেষ ভাবে সর্ব্বসমন্বয়রূপিণী চিন্ময়ী মাতৃরূপে দেখা দিয়াছে; তাই তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া, স্বকর্ণে তোমার বাণী শুনিয়া, তোমাকে মাতৃরূপে আরাধনা করিলেন। এবং আমাদিগকেও তুমি তাঁহার সহিত সমযোগে, তোমাকে মাতৃরূপে পূজা করাইতে শিখাইয়াছ; তাই আমরা তোমাকে জীবন্ত মা বলিয়া ডাকি। তুমি যেমন শ্রীকেশবকে প্রার্থনা করাইলে, তেমনি আমাদিগকে প্রার্থনা করাও, আমরা প্রার্থনা করি। তুমি তো আমাদিগকে তোমার নববিধানে স্থান দিয়াছ, কিন্তু তোমার নববিধান কি এবং নববিধানের প্রকৃত সাধনা কি, আমরা তো এখনো সম্যক্‌রূপে শিখিতে পারিতেছি না। পুরাতন বিধানের শিক্ষা সমন্বিত করিয়া, নববিধানের নব শিক্ষার প্রবর্ত্তন তুমি করিয়াছ; কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও, আমাদের সেই প্রাচীন পুরাতন সংস্কার অনুসারে পুরুষকারসাধ্য সাধনা করিয়া ধর্ম্মলাভ করিব, এই সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাই যেন আমরা নববিধানের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তুমি দয়া করিয়া তোমার নববিধানের নবালোকে পবিত্রাত্মার আলোক প্রকাশ কর। আমরা ব্রাহ্মসমাজে যেমন ব্রহ্মবাদী হইয়া আসিয়াছি, তেমনি আমরা মতে নববিধান মানিয়া নববিধানবাদী হইয়াছি; কিন্তু নববিধানবিশ্বাসী তো হইতে পারিতেছি না। তুমি যে জীবন্ত মা হইয়া আমাদিগকে জন্ম দিয়াছ এবং আমাদের জীবন স্বয়ং গঠন করিবার জন্য, নববিধানের নবজীবন দেবার জন্য যে নবশিশু কেশবের সঙ্গে মিলাইয়াছ, কই ইহা আমরা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেছি? প্রকৃত বিশ্বাস দিয়া যেমন শ্রীকেশবকে বিশ্বাসী করিলে এবং স্বয়ং তাঁহাকে নবশিশু করিয়া গঠন করিলে, আমাদিগকে তেমনি প্রকৃত বিশ্বাসী কর এবং তোমার নববিধানমূর্ত্তিমান নবশিশু কর। আমাদের সাধ্য সাধনায় আমরা পুরুষকার লাভ

করতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের আমিত্ব অহংকার উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে প্রকৃত নববিধান গ্রহণ করিতে দিতেছে না। তাই শ্রীকেশব বলিলেন, অহংকারের জন্য আমরা প্রকৃত নববিধান শিক্ষা করিতে পারিতেছি না। ইহা আমাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে দাও। সম্পূর্ণ-রূপে যাহাতে আমরা তোমাকে মানিয়া, তোমার কৃপার ভিখারী হইতে পারি, এমন বল দান কর। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের হাতে নয়, মার হাতে, ইহা যেন বিশ্বাস করি। আমাদের সাধনাও যাহা করিতে হইবে, তাহাও তুমিই করাইবে। আমরা নিজ খেয়ালে যেন কিছুই না করি। শিশু যেমন উপার্জ্জন করিতে জানে না, মাই তাহাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেন এবং তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা দিয়া মনের মত গঠিত করেন, তেমনি তুমি আমাদিগকে করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। নববিধান সমন্বয়ের বিধান, ইহাতে তুমি আমাদের স্বাধীনতা ও বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, তোমারই সম্পূর্ণ কৃপার অধীন করিয়া গড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া তোমার শরণাপন্ন হই, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

কেশবচন্দ্রের জয়লাভ

"জয়লাভ আমার কপালে লেখা" শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন বলিলেন, জীবনের ইতিহাসে তাহা দেখাইলেন। শ্রীকেশবের নিন্দাকারী বিরোধিগণ তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা লইয়া তাঁহার নিন্দাবাদ রটাইতেছেন; শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার কয়েকটি নিন্দাবাদের অপনোদন করা আবশ্যক।

কেশবচন্দ্র বাল্যজীবনে বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, এই ঘটনা লইয়া তাঁহার বিরোধিগণ কল্পনার তুলি দিয়া কতই কথা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সহকারী, নিকট আত্মীয়, সহপাঠী এবং সহচর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রের সম্পাদক রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীকেশবচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা দিতে ছিলেন, একজন সহ-পরীক্ষার্থী পার্শ্ব হইতে তাঁহার প্রশ্নোত্তর দেখিয়া লিখিতে-ছিলেন। কেশবচন্দ্র সর্ব্বদাই যখন যাহা করিতেন, তাহাতেই পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়া থাকিতেন, তাই তাঁর সহ পরীক্ষার্থী কি করিতেছিলেন, তিনি জানিতে পারেন নাই; পরীক্ষাদর্শক উভয়কেই অপরাধী মনে করিয়া, পরীক্ষার হল হইতে তাড়াইয়া দেন। শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় এবং আত্মসম্মানবশতঃ বিনা প্রতিবাদে হল হইতে চলিয়া আসেন।"

এই ঘটনা লইয়া তাঁহার নিন্দাকারিগণ যতই নিন্দা করুন, তিনি এখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিহার করেন, আর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই, কিম্বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন নাই।

ধন্য বিধাতার বিধান, যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাড়িত হইলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ধার ধারিলেন না, তাঁহার তিরোধানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার রেনল্‌স্ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, কেশবচন্দ্রের ন্যায় মানুষ তৈরী করা। কেশব-শাক্যমুনির ছাঁচে গঠিত। উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নতলস্থ কোনও ব্যক্তি যেমন পর্ব্বতের উচ্চতার সম্যক পরিমাণ করিতে পারে না, তেমনি শ্রীকেশবচন্দ্রের সমসাময়িক লোক আমরা তাঁহার মহত্বের পরিমাণ করিতে একেবারেই অক্ষম, ভবিষ্যদ্বাসীরা তাহা কতক পরিমাণে পারিবে। হে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রগণ, তোমরা কেশবচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ কর, তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা কর এবং তদ্দ্বারা কেশবচন্দ্রের স্বদেশবাসী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হও। যে দেশে কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহামানব জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের ভবিষ্যৎ অতি মহৎ ও উজ্জ্বল।"

শ্রীকেশবচন্দ্র বাংলাভাষা ভালরূপ শিক্ষা করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'বাল্যকালে আমার তেমন ভাষা শিক্ষা হয় নাই। ভাষা নিবদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিতাম না।' কিন্তু পরে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকটে নিজমুখে বলিয়াছেন, আমি কেশবের বাংলা শিখতে ব্রহ্মমন্দিরে যাই।' সত্যই তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় উপদেশাদি দিয়াছেন এবং পরে লিখিয়াছেন, যাহা বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গলার আদর্শ। প্রতাপচন্দ্র একবার কেশবকে বলিয়াছিলেন, "কেশব, তুমি ত কখনও বাঙ্গলা চর্চ্চা কর নাই; কিন্তু এমন করে বাঙ্গলা ভাষা কি করে বল?"

কেশব হাসিয়া বলিলেন, "কি করে বলি, তাহা আমি জানি না। যাহা আসে, তাহাই বলি ; তাহা বংলা হয়, কি হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না।" বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের যাহা কিছু, সকলই অলৌকিক এবং ঈশ্বরনিঃশ্বসিত।

তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা সম্বন্ধেও ইংলিশম্যানের সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন, "His Cceronean Speech."—এমনই তাঁহার বাগ্মিতা। ভারতবাসী যে এমন ইংরাজী ভাষায় ইংরাজদিগের চিত্তাকর্ষণকারী বক্তৃতা করিতে পারে, তাহা শুনিয়া ইংলণ্ডবাসী মনীষিগণও অবাক হইতেন। একজন ইংরাজ সম্পাদক বলিয়াছেন—"When Keshub speaks, the world hears"—কেশব যখন কিছু বলেন, সমস্ত বিশ্ব তাহা শ্রবণ করে। এ সকলই কি তাঁহার সম্বন্ধে জয়লাভের পরিচয় নয় ?

শ্রীকেশবচন্দ্র মাতৃদেবী ও অভিভাবকগণের ইচ্ছায় বাল্যজীবনে বালিকাপত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় ; তাই তিনি বিবাহের পর হইতে নিজ অন্তঃপুরস্থ শয়নাগারে শয়ন করিতেন না, বহিঃপ্রাঙ্গণে থাকিতেন। স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশুনাই ছিল না। দেবী জগন্মোহিনীও নিতান্ত বালিকা, যখন বিবাহ হয়, তাঁহার বয়স নয় বৎসর। ১১ বৎসর পর্য্যন্ত, উভয়ের দেখাশুনা হয় নাই, বিবাহের দিনের পর হইতে কেউ কাহারও মুখ দেখেন নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরাদেশে কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," তাই স্ত্রীকে পত্রদ্বারা লিখিয়া পাঠাইলেন, "তুমি আমার ধর্ম্মের সঙ্গিনী হইবে কিনা ? যদি সংসারের সুখ সম্পদ নিয়া থাকিতে চাও, থাকিতে পার। আমার সঙ্গের সঙ্গিনী যদি হও, সকলই পরিত্যাগ করিবে, আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পাবে না। যদি আমাকে চাও আমার অনুসরণ কর, আমার সঙ্গে চল।" প্রথম পত্রেই সতীর মন বিচলিত হয়, সংকল্প করিলেন, স্বামীর অনুগামিনী হইবেন; কিন্তু সকলেই বাধা দিলেন, তাই একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন শুনিয়া, আবার পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সকলে মানা করিলেন, সতী কাহারও বাধা মানিলেন না। স্ত্রীর উপর জয়লাভ করিয়া আচার্য্যব্রত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উভয়ে সংসার হইতে তাড়িত হইলেন ; ধর্ম্মের সংসার পত্তন করিবার জন্য যিনি আদিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট, পার্থিব সংসার কেন তাঁহার স্থান হইবে ? তাই কলুটোলার বাড়ীতে তাঁহাদের আর স্থান হইল না। তাঁহাদিগকে কিছুকাল মহর্ষিগৃহে বাস করিতে হইল ; কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল, যে কলুটোলার বাড়ী হইতে তাঁহারা তাড়িত হইয়াছিলেন, সেই বাড়ীতেই তাঁহারা প্রথম ব্রাহ্মানুষ্ঠান অবাধে সম্পাদন করিয়া বিজয়ী হইলেন। সে সময় যাঁহারা তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। অবশ্য তাঁহারা কিছুদিন পরে পুনরায় বাড়ীতে আসিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া দেন ও জাতিচ্যুতভাবে ব্যবহার করেন ; কিন্তু পরিণামে যখন কমলকুটীরে আসিয়া কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপরিবার স্থাপন করেন, তখন কে না তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন ? এমন কি, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণও একদিন ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন, "তুই কেশব সেনের বাড়ী খাস্ নি, জাত যাবে।" পরে তিনি চীৎকার করিয়া বলেন, "তোরা বলগে যা, আমি কেশব সেনের বাড়ী খাইয়াছি ও আমার জাত গিয়াছে।" ইহাও কি হিন্দু কুসংস্কারের উপর ও সংসারের উপর কেশবচন্দ্রের জয়লাভের নিদর্শন নয় ?

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্বর্গে প্রবেশের পূর্ব্বে শুদ্ধিপ্রক্রিয়া
(Purgatory)

"আমাদের সমাজের প্রত্যেক সভ্য মৃত্যুর পরেই তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যাইবেন, এ বিষয়ে নিঃসংশয়। এতদপেক্ষা বিপৎকর মোহ আর কল্পনাও করা যাইতে পারে না। আমরা প্রতিজনই পুণ্যনিলয় স্বর্গে গমন করিতেছি, ইহা উপহাসের কথা। এরূপ অসঙ্গত অনুমানের যুক্তি কি ? আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমরা মানুষকে ভালবাসি এবং তাহাদের সেবা করি, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে যত্ন করি, আমরা উৎসাহী ; সুতরাং যাই আমরা নশ্বরদেহ ত্যাগ করি, অমনি একেবারে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করি, এই তাঁহাদের যুক্তি, এ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃষ্ট প্রাবেশিক-পত্র! স্বর্গে যাওয়ার অতি অদ্ভুত সহজ পথ! পৃথিবীতে আমরা যে সকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিয়াছি, ঈদৃশ সহস্র ব্যক্তি স্বর্গের বাহিরে প্রবেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, শোধন ও পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্য দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন, এই দৃশ্যটি একবার দেখিতে না পাইলে, আর কিছুতেই এ সকল লোকের ভ্রম ঘুচিতে পারে না। পৃথিবীর ভাল লোকদের পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা যদি তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কম্পিতকলেবর হইতেন এবং জ্ঞানলাভ করিতেন। যে কোন ব্যক্তি একটি সামান্য পাপ করিয়াছে, তাহাকে কি ভীষণ

সুনিশ্চিত শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, সে বিষয় কেমন অল্প লোকেই চিন্তা করে। যে কোন আত্মা কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা বা অসত্যপ্রিয়তা লইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গের দ্বাররক্ষক বলেন, 'এখন নয়, এখন নয়; যতদিন না সম্মুখবর্ত্তী শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমিতে দণ্ডভোগ করিয়াছ, তোমার পাপ সম্যক্ ধৌত হইয়া গিয়াছে, তত দিন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিধানে তোমায় উপস্থিত করা হইবে না।' যদি জীবনে একবার কেবল আমরা একটি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, একটি দাতব্যোচিত ব্যক্তিকে স্বার্থপরতাবশতঃ উপেক্ষা করিয়া থাকি, ক্রোধ বা বিদ্বেষের বিক্ষেপে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে তৎপরিমাণে শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির প্রতিবিধান আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। যদি আমাদের সময়, সামর্থ্য, উপকরণ বৃথা নষ্ট করিয়া থাকি, সেগুলির হিসাব স্বর্গদ্বারের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকে দিতে হইবে। অনুদার, অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, অক্ষমী কেমন করিয়া পাপ লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিবে। কোন মানুষ যদি ছয়টি মিথ্যা লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে ষাটটি মিথ্যা লইয়া একজন মিথ্যাবাদী কেন স্বর্গে প্রবেশ করিবে না? অপবিত্র চিন্তা লইয়া যদি মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করে, এক জন ব্যভিচারী কেন প্রবেশ করিবে না? যে দশবার ক্রোধ করিয়াছে, সে যদি প্রবেশ করে, তবে একজন নরহন্তা কেন প্রবেশ করিবে না? আমাদের আচার্য্যেরা, প্রচারকেরা এবং সাধকেরা মনে করেন, তাঁহারা যাহা তাহা করিয়াও, তাঁহাদের ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নিশ্চয় স্বর্গে যাইবেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেশ ভাল, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের কথা স্মরণ করুন এবং শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজও তাঁহাদের হৃদয়ে অহংকার আছে, ক্রোধ আছে বা অপর কোন নীতিঘটিত কলঙ্ক আছে; সুতরাং তাঁহাদের পাপের পরিমাণানুসারে তাঁহারা অবশ্য দণ্ডভাজন হইবেন। যদি এখানে আমরা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হই, সোজা স্বর্গে যাইতে পাইব না।" (কেশব)

—•—

অভিভাষণ

(৩০শে এপ্রিল, স্বর্গীয় মহারাণী সুনীতি দেবীর তৈলচিত্র-উন্মোচনে সুনীতি শিক্ষালয়ে, মিসেস্ কে, সি, দের অভিভাষণ)

সভাসদ্মণ্ডলী ও ভদ্রমহিলাগণ—

আজ আপনারা আমার প্রতি যে দায়িত্বপূর্ণ গৌরবমণ্ডিত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতাভরে আমার হৃদয় সহজেই নমিত হয়ে পড়ছে। এই কর্ত্তব্য যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হলে শোভন হ'ত; তবে যাঁর তৈলচিত্র উদ্ঘাটন করতে আপনারা আমাকে ডেকেছেন, তিনি আমাকে তাঁর নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। কাজেই নিজের অক্ষমতা ভুলে গিয়ে, আমি এই কর্ত্তব্যকে বরণ করে নিয়েছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, এই সম্মানজনক কার্য্যের ভার আমার উপর আপনারা দিয়াছেন। সেজন্য সকলের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজ আমার মনে দুঃখ ও আনন্দ, দুই সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে; কারণ যাঁর স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্য আজ এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে, তাঁকে আমরা চিরদিনের মত হারিয়েছি, একথা আজ অন্তরে নূতন করে দারুণ ব্যথা দিচ্ছে। তবে আনন্দ হচ্ছে এই দেখে, যে তাঁর স্মৃতি চিরদিন জাগিয়ে রাখবার জন্য এই সম্বর্দ্ধনা হচ্ছে। তিনি যে কত মহান্, কত উচ্চ ও উদারচেতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য; তাঁর অসীম গুণের দু'একটা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এখানে বলব।

কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে, তিনি কোন স্কুল বা কলেজে না পড়ে, শুধু বাড়ীতে পড়েই অসাধারণ শিক্ষিতা বলে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি বইও লিখে গেছেন। তাঁহার আরো একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল কথকতায়। অমন মধুর কথকতা আজও কাহারও মুখে শুনিলাম না। আমার মনে হয়, তিনিই প্রথম বাঙ্গালীর মেয়ে বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে নিজের অসাধারণ প্রতিভার বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইজন্যই ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া ও কুইন মেরীর সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা জন্মেছিল এবং তিনিই 'মেরীর' নামে বিলাতে যে চাঁদা তোলা হয়, তাহার সভানেত্রী হয়ে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ ক্ষমতাবলে C.I. উপাধি লাভ করেছিলেন। বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে আর কাহারও এ উপাধি আছে কিনা, আমি জানি না। পরন্তু তিনি যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যা এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন জগদ্বিখ্যাত পিতার উপযুক্ত সন্তান, তাহা তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রচার করবার অসামান্য ক্ষমতা ও প্রতিভা থেকেই বুঝা যেতো। আমি বিলাতে তাঁহার নিজের নববিধান সমাজ স্থাপনা করতে এবং সেই সমাজে সকলের সঙ্গে উপাসনা করতে দেখেছিলাম। সেইদিন তাঁর কি সুন্দরমূর্ত্তি দেখেছিলাম, আমি জীবনে কখন তা ভুলতে পারব না। শ্রীভগবানের স্বর্গীয় জ্যোতিতে সেদিন তাঁর প্রতিভামণ্ডিত মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—মনে হয়েছিল, সেই শুভক্ষণে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার আত্মার সম্মিলন সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর উদারতার পরিচয়—তাঁর পিতার বসতবাড়ী তিনি নিজে কিনে নিয়ে "ভিক্টোরিয়া ইন্ষ্টিটিউসন"কে দান করে গিয়েছেন। যুগপ্রবাহের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন যে, অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাদের শিক্ষার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারলে, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি, দেশের বা সমাজের কল্যাণ, অসম্ভব। তিনি বুঝেছিলেন যে,

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মবিস্মৃত জাতির পুনরুত্থানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি জানতেন যে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, স্ত্রীজাতির মানসিক উৎকর্ষসাধনের উপর।

তাঁর সকল কার্য্যের মধ্যে দৃঢ়তা অথচ নম্রভাব দেখা যেতো, সেইটাই তাঁর জীবনের বিশেষত্ব ছিল। তার গুণের কথা আর কত বলব? শুধু তিনি কেন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সকল পুত্র ও কন্যাদের মধ্যেও এই গুণ বিশেষ ভাবে দেখতে পাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হউক।

কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী

(কটক, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর উড়িষ্যা প্রদেশীয় উৎসব উপলক্ষে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও মহাশয়ের অভিভাষণ)

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, উড়িষ্যা কেশব-শতবার্ষিকী জন্মোৎসব সভার অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

কি কার্য্যোপলক্ষে আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাহা আপনারা জানেন। সেই কাজটি আরম্ভ করাইবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। উপযুক্ত কথা দ্বারা আমার ভাব সকল আপনাদের নিকট ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব এবং আমি এ কাজটি করিতে নিতান্ত অনুপযুক্ত। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ভক্তিভাজন মধুসূদন রাও মহাশয় উৎকল ব্রাহ্মসমাজে দীর্ঘকাল আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রাণ ভক্ত কবি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যে মহাত্মার শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আয়োজন উপলক্ষে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি আমার পিতৃদেবের নিকট আশৈশব শুনিয়াছি। পরে তাঁহার বাঙ্গলা ও ইংরেজী লেখাও কিছু পিতৃদেবের নিকট এবং কিছু নিজেও পড়িয়াছিলাম। বিশেষতঃ তাঁহার Lectures in India এবং Lectures in England বই পড়িতে বড় ভাললাগিত। এমন ভাষা ও ভাব, চিন্তা ও যুক্তির সমাবেশপূর্ণ বক্তৃতা আর কখনও পড়ি নাই। এখানে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা তাঁহার অমূল্য বইগুলি পড়িয়া নিজের ধর্ম্মজীবনে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

মানুষ পরম দেবতার সন্তান, দেবভাব মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃই আছে। সেইজন্য আমরা যেখানে মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্বকে ফুটিয়া বাহির হইতে দেখি, সেখানে আকৃষ্ট হই এবং ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকি। সেজন্য যে মহাত্মা শতবর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার আগত জন্মোৎসব উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সাধ্যানুসারে আয়োজন করা হইয়াছে।

এখানে আমরা তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন আলোচনা করিয়া, নিজেদের জীবনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিব এবং যে জীবনদেবতা তাঁহার সকল কার্য্যের মূলে, অন্তরের অন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে স্বর্গীয় শোভায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই পরম দেবতাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব, এই আশা।

অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজ এই সভায় স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র কন্যা এবং দৌহিত্রাদিগের কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। শ্রদ্ধেয়া মহারাণী সুচারু দেবী যেমন অন্য প্রদেশে, তেমনি উড়িষ্যাতেও সুপরিচিতা। তিনি উৎকলের প্রধান গড়জাত ষ্টেট ময়ূরভঞ্জের স্বর্গগত মহারাজা শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা Theistic Conferenceএ মহারাজা সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার অভিভাষণ শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সমগ্র উৎকলে পুণ্যশ্লোক প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্র আজও বদান্যতা, মহানুভবতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সুবিদিত। আজ এই উৎসব অনুষ্ঠানে সভানেত্রীপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মহারাণী সুচারু দেবীর মত উপযুক্ত আর কে আছেন? অতএব আমি তাঁহাকে এই সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবার জন্য, সাদরে ও শ্রদ্ধাভরে অনুরোধ করিতেছি।

ঢাকায় কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর

প্রারম্ভিক উৎসব

ঢাকায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী বৎসরের উৎসব উপলক্ষে প্রারম্ভিক উৎসবে, কলিকাতা হইতে আগত বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বি, সি, ঘোষের উপাসনা ও ও বক্তৃতার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা নববিধানমন্দিরে, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩৮খ্রীঃ, রবিবার, সন্ধ্যা ৬াটায় উপাসনা করেন। প্রথম সংগীত –'অপরূপ-রূপধারী' ইত্যাদি। সংগীত কীর্ত্তন হইলে পর এইরূপে উদ্বোধন হয়:—"বিধানজননী তাঁর অসংখ্য অনন্তরূপ দেখাবার জন্য উপাসনায় ডাকেন। তাই সাধুদল তাঁর অপরূপরূপ দেখেছিলেন। তিনি নববিধানের ভক্তদলের কাছে অপরূপরূপ প্রকাশিত করেছিলেন। তিনি ডেকেছিলেন সকলকে, সব ভক্তদলকে। তাই ভক্তদল আমাদের জন্য তাঁদের সাধনা রেখে গেলেন। স্বর্গের দেবদেবীগণ এই সাধনা করেছিলেন। তাঁর স্বর্গের দেবদেবীদের সাধনা আমাদের সাধনা হবে বলে, এই সাধনা আমাদের জন্য রেখে গেলেন। আজ স্বর্গের দেবদেবীদের সঙ্গে

ভক্তদলের সঙ্গে উপাসনা করি। বিধানের সব ভক্তের সঙ্গে উপাসনা করি। বিধানের সব ভক্তের সঙ্গে বিধানবাহক নবভক্তদলদের আজ দেখতে হবে, তাঁদের সঙ্গে মিলতে হবে। বিধানের সব ভক্ত ও নবভক্তদলের সঙ্গে মিলে, সকল সাধু সাধ্বীর সঙ্গে মিলে বিধানজননীর আরাধনা করি।"

আরাধনার পর সাধারণ প্রার্থনা এইরূপ হয়:—"সব সত্য তুমি প্রেরণ কর। আমরা সত্যকে খণ্ড খণ্ড করি। তাই আমাদের মধ্যে এত ভেদ, এত বিবাদ। তুমি কিন্তু বল, সবকে পূর্ণ অখণ্ড সত্য কর। ভেদবুদ্ধিতে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করে, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করি। তুমি নববিধানের আলোক দিয়ে বল, সব সত্যকে অখণ্ড করে, পরস্পরকে অখণ্ড কর। তাই আমরা অখণ্ড সত্য ও অখণ্ড মানবকে গ্রহণ করবো। তোমার সব সত্যকে নূতন করে গ্রহণ করি, পরস্পরকে নূতন করে গ্রহণ করি। তোমাকে আরো ভাল করে, পরস্পরকে আরো ভাল করে গ্রহণ করি। সংসারে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, সমাজে, ধর্ম্মে তাই ধর্ম্মীদের ভেদবুদ্ধি দূর কর। সব গ্রহণ করি। নববিধান সকল দেশে, সকল জাতিতে পাঠিয়ে দাও।"

তৎপর গান হয়—"এক অদ্বৈত ব্রহ্ম মা আমাদের।" ইহার পর আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে "সিদ্ধাবস্থার যোগ" পাঠ হয়। তদনন্তর উপদেশের সার মর্ম্ম এইরূপ—"সিদ্ধাবস্থায় বিধান-সাধকদের কাছে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের True Faith এসে ছিল। True Faith তাঁর জীবনে ও তাঁর সহসাধকদের জীবনে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বিশ্বাস যখন জেগে উঠেছিল, তখন বলেছিলেন—'বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি'। এই বিশ্বাস তাঁদের জীবনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের তিনটী চিহ্ন। প্রথম—শব্দ—যেমন শাস্ত্রপ্রমাণ। ২য়—অনুমান। ৩য়—প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দয়ানন্দ সরস্বতী কেশবের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করতে পারলেন না। তা হলেও, কিন্তু তিনি এলবার্ট হলে 'শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। রামমোহনও এই সব প্রমাণ প্রথম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু পরে গ্রহণ করেছিলেন।

"পণ্ডিতবর্গের কাছে শব্দ শাস্ত্ররূপে আসে। তারপর তর্ক, যুক্তি ও বিচার সেই সকল শাস্ত্রের প্রতি আরম্ভ হয়। ইঁহাদিগকে Rationalist বলে। Rationalistগণ তর্ক যুক্তির সাহায্যে অনুমান করেন। এই অনুমানের রাজ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন। তাই তাঁকে Rationalist বলা হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তি তর্কেতে যা পেতেন, তাই নিতেন। আর যা যুক্তিতর্কবিরোধী, তা তিনি পরিত্যাগ করতেন। মহর্ষি আর একটা কথা এই rational stageএ দাঁড়িয়ে বলিলেন, সেটা হচ্ছে, 'সার পাওয়া'। মহর্ষি তাই যুক্তি-তর্ক-বিচারে যতটা সার পেতেন, ততটা তিনি গ্রহণ করতেন; ব্রহ্মানন্দ কেশব কিন্তু বলিলেন, যাতে সার পাওয়া যায় না, তাকেও গ্রহণ করিব, সাধন করিব, ছাড়িব না। বিধানের আলোকে আমরা দেখি, ঋষিদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার কাছে শব্দ। ইঁহাকেই বড় একজন জার্ম্মেণির পণ্ডিত বলিলেন rumor, অন্যের শব্দগুলি আমার কাছে rumor ভাবে আসে। আবার rumorগুলি যখন যুক্তিযোগে দেখি, তখন অনুমান হয়। আর সেই অনুমান যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন দর্শন হল। বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা আমার কাছে শব্দ হয়ে আসে। তিনি এমনি করে আমাদের শব্দ-প্রমাণ দেন। আর স্বয়ং তিনি নিজেই হচ্ছেন প্রত্যক্ষ দেবতা। শব্দ-প্রমাণ তাঁর, অনুমান-প্রমাণ তাঁর, আর প্রত্যক্ষপ্রমাণও তাঁর। যেমন 'ঈশ্বর করুণাময়' এই শব্দে বিশ্বাস আমরা করি, আর তাঁর সেই করুণা যখন আমরা জীবনে দেখি, তখন হ'ল সেটা অন্তর্দৃষ্টি। আরো গভীর বিশ্বাস যখন হয়, তখন vision হয়। এইরূপে পৃথিবী তাঁর রচনা, ইহা শব্দমাত্র হয়ে আসে, সেটাকে আমরা বিশ্বাস করি। আর এই বিশ্বাস করে যখন অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাবে এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রতি অণুপরমাণুতে, নক্ষত্রপুঞ্জে, বিশাল জলধিতে, অনন্ত আকাশে, সমস্ত জীবের মধ্যে, সকল মানবজাতিতে তাঁকে দেখি, তখন সেটা vision হয়। আর এই দেখা যতই চলতে থাকে, ততই vision নূতন হয়ে উঠে। এই নূতন visionএ নরনারী নূতন, সংসার, সমাজ, জাতি, বিশ্বমানব, সমস্ত জীব ও প্রকৃতিরাজ্য নূতন। তাই ১৮৭০ সালে যে faith inside ছিল, ১৮৮০ সালে সেই faith vision হল।" তৎপর এইরূপে প্রার্থনা হয়—"বিধানজননী আমাদের বিশ্বাস অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত কর, আর সেই অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন দিয়ে আমাদের দর্শনকে নূতন কর।" তৎপর ধন্য "ধন্য ধন্য পরম চৈতন্য পুরুষ প্রধান শ্রীহরি" এই সংগীতটি হইবার পর উপাসনা সমাপ্ত হয়।

২৮শে মার্চ্চ, সোমবার, প্রাতে ৮টার সময় দিগবাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের গৃহে দাসমণ্ডলীতে উপাসনা হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:—প্রথম গান—"চল শুভক্ষণে, মিলে প্রাণে প্রাণে"। উদ্বোধন—"ব্রহ্মনাম করতে করতে হরিনাম এল, হরিনাম করতে করতে নববৃন্দাবন এল। বিশ্বাসীর জীবন মনস্তীর্থে উঠে বড় হয়। এই ইন্দ্রিয়ময় জগতে রূপরসের মধ্যে প্রবৃত্তি সকল জেগে উঠে, ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে, সাধককে চঞ্চল করে। এই প্রবৃত্তির জগৎ ছাড়িয়ে মনস্তীর্থে এসে, বিশ্বাসীর জীবন শান্ত হয়। আর যা নাম নিলে চিত্ত তীর্থ হয়। এই রকম করে ইহপরলোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিধানজননী নববৃন্দাবনের নবভক্তকে, ভক্তদলকে, আর এই পরিবারের সেই ভক্তকে নিয়ে এল। ভক্তদলের সঙ্গে মিলে আমরা তোমার আরাধনা করি।" তৎপর গান হয়, "মা বলে তোমায় ডাকিব।" ইহার পর আরাধনা হয়। তদনন্তর স্তোত্র-পাঠের পর যে উপদেশ হয়, তার সার মর্ম্ম এইরূপ:—"তাঁদের যেমন করে তিনি তাঁর কাছে নিয়েছিলেন, তেমনি করে তিনি আমাদের নিতে চাইছেন বলে, এই উপাসনায় জননী আমাদের

ডাকলেন। 'চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং' এই কথা বিধানজননী তাঁদের বুঝিয়েছিলেন। বিশুর পবিত্রতা, শ্রীবুদ্ধের সাধন, শ্রীচৈতন্যের মাতোয়ারা হরিনাম চিত্তকে মহাতীর্থ করে তোলে। চিত্ত এইরূপে মহাতীর্থ হবে, সেখানে সকল সাধুর সমাগম হল। জনক, নানক, কবির, দাদু প্রভৃতিকে তিনি ডেকে এনেছিলেন, এই চিত্ত-মহাতীর্থে। তাঁদের প্রাণের বিশ্বাস ও ভক্তি নিষ্ঠা আমাদের প্রাণে সংক্রামিত হল ও হবে।" প্রার্থনা—"বিধানজননী, দাও, এই ভক্তি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা আমাদের প্রাণে দাও। এই গৃহের গৃহস্বামীকে আমাদের জীবনে, আমাদের সন্তানদের জীবনে, নগরবাসীর জীবনে জীবিত কর।" ইহার পর "এত আপনার এ সংসারে কে আছে আমার" এই সংগীতটী হইবার পর উপাসনা সমাপ্ত হয়।

তৎপর সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময়, নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে "জীবনের ধারা" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা হয়, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—"শ্রীবুদ্ধ বল্লেন, 'এক ব্যক্তি হাটে গেল ও দুধ কিনিল এবং সেই দুধ এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া গেল; কিছু বিলম্বে দুধ লইতে আসিয়া দেখিল, দুধ দই হইয়া গিয়াছে। সে তখন যাহার নিকট দুধ রাখিয়াছিল, তাহাকে বলিল, ইহাকে কিরূপে দুধ করিতে পারা যায়? সে বলিল, দই দুধ হয় না। আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, সকলে বলিল, দই কখন দুধ হয় না।" Energy heat হচ্ছে, irreversibility এটাকে বলে। চিত্ত-নিয়মের কথা তিনি বললেন—মনের গতি চিন্তা, চিন্তা হতে ইচ্ছা জাগে। সমাজে থাকিতে হইলে কর্ম্ম নিয়ম আসে। ওখানেও উপায় ও উদ্দেশ্য এই বিচার চলছে। সুফল যদি পেতে চাই, তবে ধর্ম্মনিয়ম পেতে হয়। Lord Russel গণিতজ্ঞ দার্শনিক। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বুদ্ধের মতামত সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন। তিনি বলিতেছেন, মানুষের তিন রকম জীবন—১। Life of instinct, ২। Reason, ৩। Mind. এবং Life of mind এর জীবনে Life of spirit প্রকাশিত হয়। এইরূপে instinct হচ্ছে তামসিক, reason হচ্ছে রাজসিক এবং mind হচ্ছে সাত্ত্বিক। শ্রীবুদ্ধ নিজের মতকে নৈরাত্ম্য বলিতেন। তিনি তাঁর অন্তিমকালে আনন্দকে বল্ছেন—'তুমি আত্মশরণ হও, আত্মদীপ হও, আত্মকাম হও।' এই হচ্ছে সাত্ত্বিক জীবন। এই সাত্ত্বিক জীবনে প্রবেশলাভ হলে, তখন আর পরিণামচিন্তা থাকে না। মারা যাই যাইব, তবু কর্ত্তব্য যা, তা করিব। Sigmond Froyed বলছেন, আমাদের জীবনে একটা যেন শক্তি, spirit, ক্ষমতা বলে কিছু রয়েছে। এটা হচ্ছে অচেতন জড় প্রকৃতি, মূল প্রকৃতি, একটা নীচু ধাপের জীবন। এই জীবনটাই ক্রমে অহংরূপে জেগে উঠে। এই অহং তার অবস্থার বাহিরের সহিত একটা ব্যবস্থা করে। এই অহং এর—এই Egoর মধ্যে Supper Ego রয়েছে। Ego নিজের স্বার্থ নিয়ে থাকে, Supper Ego নিজের স্বার্থ হতে পরার্থ জাগিয়ে দেয়। Supper ego দ্বারা আমরা সমাজে বিরোধ ছেড়ে দিয়ে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারি, শান্তি সংস্থাপন করতে পারি। এই রকম করে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনেরা যা চিন্তা করেছিলেন, আধুনিকেরাও সেই চিন্তা করেছেন। কিন্তু এই তিনটী জিনিষ আমাদের মধ্যে থাকে। তাতে আমাদের প্রত্যেকেই অবস্থা ও কালে তিন রকমের মানুষ। আমরা প্রত্যেক মানুষ তিন রকমের stage এর ভিতর দিয়া চলেছি। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। যে রাজসিক সে সাত্ত্বিক হয়, আবার যে সাত্ত্বিক সেও রাজসিক হয়। সাত্ত্বিক যদি নেশা করেন, আবার রাজসিক ও তামসিক হবেন। আত্মিক জীবন প্রবৃত্তিমধ্যে শক্তি যোগায়। সাধুর ধর্ম্মসাধনের শক্তি, তা প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া আসে। ধর্ম্মে বাসনা জাগিয়ে, আর যা কিছু তার প্রতি ক্রোধ জাগিয়ে এবং ধর্ম্মের জন্য লোভ জাগিয়ে, আত্মিক জীবন মানুষকে ধর্ম্মের উপর তুলে দিতে থাকে। Froyed বলেছেন, Ego আছে, কিন্তু Suppea ego মানুষের egoকে দমন করে। Prosocial, antisocial এই সব মতকে নববিধানে সমঞ্জসীভূত করিতে পারি। নববিধানের সাধু সাধ্বীদের নিকট হতে শিখেছি, তামসিক অবস্থা হতে রাজসিক অবস্থায় এবং রাজসিক অবস্থা হতে সাত্ত্বিক অবস্থায় উঠা যায়। অজ্ঞান্ত মানুষের সংসর্গ হলেই তামসিক অবস্থা হতে রাজসিক অবস্থায় আমরা যাই। যেমন বাগানে গিয়ে গাছের ফল দেখিলে লোভ হয়। কিন্তু একজন নারী যদি স্বীয় সন্তান ক্রোড়ে লইয়া উপস্থিত হয়, তবে তারও লোভ হয়। কিন্তু ফলটি পেড়ে সে নারী একাকী খেতে পারে না, সন্তানকে অর্দ্ধেক দিয়ে নিজের খেতে ইচ্ছা হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মাচরণ বেশী করে হয়েছে, তারতে সব রকম সভ্যতা আছে। বিভিন্ন সভ্যতাকে প্রকাশ করে, এমন বিভিন্ন সমাজ ভারতে রয়েছে। সব রকমের ধর্ম্ম ভারতে আছে এবং এই সব ধর্ম্মের বহু সম্প্রদায়ও রয়েছে। যখন এক সমাজের সহিত আর এক সমাজের, এক ধর্ম্মের সঙ্গে আর এক ধর্ম্মের সংঘর্ষ জেগে উঠে, তখন জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ দ্বারা পরস্পরকে উচ্ছেদ না করে, বিভিন্ন প্রকারের কাজ পরস্পরকে দিয়ে যে সমাজ গঠন হল, তা হিন্দুসমাজ। এই হিন্দুসমাজ কালক্রমে পরে স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে, আপনার উচ্ছেদ-সাধন আপনি করে। ইসলাম এখানে সমস্যা, কারণ ইসলাম এখানে সকল জাতিকে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করিবার জন্য গ্রহণ করেছেন। Self-interest হতেও যেখানে পরস্পরকে গ্রহণ করা, পরস্পরকে স্বীকার করা যায়, সেইখানেই সাত্ত্বিক জীবন। সকলকে অধিকার দিতে হবেই ; কেন, এ প্রশ্ন আর এখানে নাই। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেছেন, 'নববিধান একটী চাবি।' বিধানে দেখ্ছি, মূলে প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হচ্ছি ; এইরূপে চালিত হয়ে, তামসিক হতে রাজসিক এবং রাজসিক হতে সাত্ত্বিক অবস্থায় চলেছি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—•—

দাদুর প্রার্থনা

(গত ৩০শে এপ্রিল, কল্যাণীয় বিজয় ও স্নেহের নীলিমার শুভবিবাহ উপলক্ষে)

অনন্ত সাগর মন্থন করিয়া দেবতা যে কয়েকটী মানবরত্ন বর্ত্তমান যুগে উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সন্তানগণ! তোমরা তাঁহাদের অংশ, তাঁহাদেরই বংশ, তাঁহাদের সন্তান—আমি প্রার্থনা করি, তোমরা পিতৃধনে অধিকারী হও।

তাঁহারা ছিলেন বিশ্বাসী, যে বিশ্বাস পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করে; যে বিশ্বাস কঠোর পাষাণকে জীবনপ্রদ অমৃজলে পরিণত করে; সেই বিশ্বাস, যে ভগবানের ইঙ্গিত লাভ করিয়া, আত্মনির্ভরকে সম্বল করিয়া নতুন সংসার রচনা করে, নতুন সংস্কার গঠন করে, নতুন সমাজ সৃষ্টি করে এবং নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় শত সিংহের বল ধারণ করিয়া নির্ভয়ে একাকী সত্যের পথে বিচরণ করে, এবং পরিণামে জীবনে সত্যের জয় ঘোষণা করে, সেই বিশ্বাস! সন্তানগণ! তোমরা সেই বিশ্বাসের অনুসরণ কর।

আজ তোমরা বিবাহিত হইলে। তোমাদের পূর্ব্বযুগে পতি ছিলেন আশ্রয়, পত্নী আশ্রিতা, পতি প্রতিপালক, পত্নী প্রতিপালিতা, পতি সর্ব্বে-সর্ব্বা প্রভু, পত্নী আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সেবিকা। এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এযুগে পতি পত্নীর সম্বন্ধ পারস্পরিক, পরস্পর পরস্পরের বিশেষ ভার গ্রহণ করার অর্থ বিবাহ। একজনের ভাব যেখানে অন্যের অভাব পূর্ণ করে—একজনের জ্ঞানে যেখানে অন্যের অজ্ঞানতা দূর করে—একটী জীবনের শৃঙ্খলা অন্যের জীবনকে যখন নিয়ন্ত্রিত করে, একজনের উদারতার দ্বারা যখন অন্যের ত্রুটী সংশোধন করা হয়, একজনের নীতি যেস্থানে অন্যের জীবনে সুনীতি সঞ্চার করে, একজনের সুখশান্তি দিয়া যখন অন্যের সুখশান্তি বর্দ্ধিত করা হয়, তাহারই অর্থ বিবাহ। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহায় হও এবং তোমাদের মধ্যে যাহা অপূর্ণ আছে, তাহা পূর্ণ হউক।

বিবাহ এদেশে ধর্ম্মব্রত। এই ব্রত পালন করিয়া এবং নিত্য সাধন করিয়া, তোমরা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কর, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য, সংযম ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এই বিবাহিত জীবন। মানবজীবনে ইহা বিধাতার অনিবার্য্য বিধান।

দুটী আত্মার বিভিন্ন ভাব রুচি শিক্ষা ও সংস্কারজনিত বৈষম্যের ভিতর সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার বিবাহিত জীবনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তোমাদিগের পূর্ব্ব মাতৃগণ ও পিতৃগণ যে পথে গমন করিয়া পৃথিবীতে তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়াছেন, তোমরা যে তাঁহাদের অনুসরণ করিলে, এজন্য তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ আজ তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে; তোমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

আজ তোমরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের সহকর্ম্মী ও সহ-কর্ম্মিণী হইলে; কেননা বিধাতার ইচ্ছা যে, তোমরা সৃষ্টির সহায় হইয়া ইহাতে নূতন রূপ দান করিবে—তোমরা তাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবে—তোমরা নূতন প্রেরণার উদ্বোধন করিবে—তোমরা নূতন সংস্কার গঠন করিবে; বিধাতার ইহাও ইচ্ছা যে, তোমাদের মিলিত জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃথিবীতে নূতন আদর্শ গঠন করিবে।

সন্তানগণ! তোমাদের এই নূতন পথে যাত্রা শুভ হউক! তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক! তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক! তোমাদের লক্ষ্য স্থির ও দৃঢ় হউক! তোমাদের গৃহ সুখ ও শান্তির আলয় হউক! তোমাদের মিলিত জীবনে কঠোর কর্ত্তব্যবোধের অনুশাসনে নব নব শক্তি, এখন যাহা হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা জাগিয়া উঠুক! তোমাদের মহামিলন সার্থক হউক! ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমাদের সহায় হউক!

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমন্মহর্ষির উক্তি

("কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী"-স্মরণে "বঙ্গবন্ধু—মাঘ, ২য় পক্ষ, ১৮০৫ শক" হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তদনুগামীদের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহর্ষির নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত হইল)

"ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর, আমরা কয়েকজন প্রধান আচার্য্য (শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ভবনে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বড়ই কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ সহকারে গ্রহণপূর্ব্বক যে সকল গভীর কথা বলিয়াছিলেন, পাঠকবর্গকে আমরা তাহার কয়েকটি কথা উপহার দিতেছি। তিনি আচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিলেন যে, 'কোথায় আমি অগ্রে যাইয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিব, না তিনি যাইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

" 'যে বলে আমার আত্মা শরীরে স্থিতি করিতেছে, সে তো মৃত্যুগ্রাসেই নিপতিত রহিয়াছে। যিনি বলেন, আমার আত্মা পরমাত্মাতে সংস্থিত, তাঁহার উপর মৃত্যুর অধিকার নাই।'

" 'তোমরা ধর্ম্মজীবন কোথায় পাইলে? ব্রহ্মানন্দ যদি তাঁহার জীবন দেখাইয়া তোমাদিগকে আকর্ষণ না করিতেন, তোমরা কি এরূপ হইতে পারিতে? তিনি তো তোমাদের সামান্য বন্ধু নন। তিনি তোমাদিগকে কেমন শুভসংবাদ দিয়াছেন। অন্তরস্থ যিনি, তিনি তোমাদের মা বাপ, গুরু প্রভু, সখা সুহৃদ, তাঁহার সংবাদ

তোমাদিগকে ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রতি তোমরা কি দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে? তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য তোমাদের কি দিবার আছে? এজন্য তোমাদিগকে প্রাণদান করিতে হইবে; প্রাণদান করিয়াও তোমাদিগকে এই ভাবিয়া চিরলজ্জিত থাকিতে হইবে যে, এমন মহোপকারী বন্ধুর প্রতি অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ব্যতীত তোমাদের আর কিছু দিবার নাই।'

"'আমি যখন ব্রহ্মানন্দকে পাইয়াছিলাম, সাত রাজার ধন পাইয়াছিলাম, মাণিক পাইয়াছিলাম। যখন প্রথমতঃ দুজনে মিলিত হইয়া, এই এখন যেখানে বসিয়া আছি, এখানে বসিয়া রজনী এক কি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত আলাপাদি করিতাম; কিরূপে যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহার সঙ্গে আমার যে যোগ, তাহা কখনও ছিন্ন হইবার নহে।'

"'আমি তোমাদিগকে এই অবসরে একটি মনের কথা বলিতেছি, ইহা কখনও ভুলিও না। রাজদরবারের ন্যায় ঠাকুরেরও আমদরবার ও খাসদরবার আছে। আমদরবার এই বাহ্যাকাশ। খাসদরবার—অন্তরাকাশ। দুই দরবারেই রাজাধিরাজের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভূমিস্বরূপ রাজসিংহাসন আছে। খাসদরবারের রাজসিংহাসন আত্মা। খাসদরবারের লোকেরা আত্মাতে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। কিন্তু আমদরবারের—লোকেরা সহজে খাসদরবারে যাইতে সক্ষম নহে বলিয়া, কি রাজাধিরাজকে—আকবরকে দেখিবে না? আমদরবারে কি তাঁহার উচ্চ রাজসিংহাসন নাই যে, তদুপরি তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া, আমদরবারের লোকেরা কৃতার্থ হইবে? সেই সিংহাসন কি? প্রাচীন ঋষিরা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত সূর্য্যদেবই সেই সিংহাসন। দূর হইতে আমদরবারের লোকেরা সেই সূর্য্যে রাজাধিরাজকে দেখিয়া সহজে প্রণাম করে এবং কৃতার্থ হয়। আমদরবারের লোকদিগকে খাসদরবারে টানিয়া আনা যায় না। যথাসময়ে তাহারাও খাসদরবারে আসিবে।'

"'খুব সহিষ্ণু হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তোমাদিগকে পাইয়া মনের আনন্দে কথা বলিতেছি। তত্ত্বগ্রাহী লোকের নিকট তত্ত্বকথা আপনা আপনি বাহির হয়। প্রাচীরের নিকট তো এ সব কথা বলা যায় না।'

"বিদায় গ্রহণ করিবার সময় যখন আমরা প্রণত হইলাম, তিনি আনন্দের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(৪)

সমরক্ষেত্রে মহাত্মা কেশবচন্দ্রের অবতরণ

(নিজ পরিবারেই সমর আরম্ভ)

কেশবচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভেই ঈশ্বরের আহ্বান শুনিতে পান এবং ঐ ঈশ্বরবাণীর অনুযায়ী চিরজীবন পরিচালিত হইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি বিশ্বাস করি যে, স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগের সকলের প্রতিনিধি হইয়াই যেন লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন যে, "আদেশানুগতো ভক্তঃ কেশবঃ ব্রহ্মসেবকঃ"। নানাবিধ অবস্থার ভিতর দিয়ে কিছুদিন চলিবার পরে, ১৮৫৭ সনে ব্রাহ্মসমাজের এ সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ঠিক এই সময়েই আবার ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে গঙ্গাবক্ষে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করতঃ, সেথানে আর অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নগামী হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। শুভক্ষণে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। উভয়েই উভয়কে চিনিয়া লইলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে যে, ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন ও ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ হইতে তিনিও যেন এমন কিছু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই অকুতোভয় স্বীয় পরিবারেই সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা রামমোহন নিজ পরিবারে থাকিবার সময়েই পৌত্তলিকতার সহিত সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও দেখাইয়া গিয়াছেন যে, পিতৃশ্রাদ্ধের সময়েই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রও যেন তাঁহাদের উভয়ের পদচিহ্ন দেখিয়াই সমরক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। সে সময়ের সে সমরক্ষেত্র তাঁহার নিজ গৃহ। তাঁহাদের কুলগুরু পরিবারস্থ যুবকবৃন্দকে মন্ত্রদানে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন; যথানির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কয়েকজন স্নানান্তে যথারীতি পট্টবস্ত্র পরিধানকরতঃ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র আসিলেন না। তাঁহার খোঁজ পড়িয়া গেল, দেখা গেল, তিনি বাহিরের এক প্রকোষ্ঠে স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এ অনুষ্ঠানের বিষয় বলা হইল, কিন্তু তিনি নীরব; কিছুক্ষণ পরে তিনি গুরুসমীপে ও অভিভাবকদিগের সমীপে নিজের আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, এক উচ্চ আদর্শের পথে পদার্পণ করিতে দৃঢ়সংকল্প; এ জন্য দীক্ষার এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে নিজের অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলেন। এ সময়ে কেশবচন্দ্রের দীক্ষা-প্রত্যাখ্যানে যে কি একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! সেই রাত্রিতে অভিভাবকগণ কেশবচন্দ্রের মুণ্ডপাত করিতে প্রয়াসী হইয়া-

ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন অভিভাবকগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দীক্ষার স্থানে লইয়া যাইবার জন্ম উদ্যত, তখন ভগবান্ স্বয়ং কেশবের উদ্ধারের নিমিত্ত গুরু-মুখে অবতীর্ণ হইয়া বলাইয়াছিলেন যে, "এইরূপ পীড়ন করিয়া দীক্ষা দেওয়ায় কোন ভাল ফল হইবেনা, আমি ইহার বিরোধী। এ বৎসর থাক, বালককে আগামী বৎসর দীক্ষা দিলেই হইবে। উঁহাকে সময় দাও।" এ ঘটনাটি সপ্রমাণ করিতেছে যে, কেশব-চন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে 'ধর্ম্মপিতা' বলিবার যথার্থ অধিকারী। কেশবচন্দ্র তাঁহার আত্মিক পুত্র! দেবেন্দ্রনাথও পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির সমক্ষে বিনীতভাবেই বলিয়াছিলেন যে, "যখন তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন পৌত্তলিক ভাবে পিতার শ্রাদ্ধ কিছুতেই সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।" পরবর্ত্তী সময়ে ইঁহাদের উত্তরের এই "অটল বিশ্বাসের দৃঢ়তা" শত শত ব্রাহ্মদিগের জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছিল। পণ্ডিত শাস্ত্রী পিতার আদেশ অমান্য করিয়া, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা করিতে অস্বীকার করাতে, পিতা তাঁহাকে প্রহার করিয়া-ছিলেন; তবুও শিবনাথ স্বীয় অটুট বিশ্বাস রক্ষা করিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৬৪ সনে, কলিকাতা হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী গোবিন্দপুর গ্রামে, দ্বারকানাথ বিশ্বাস নামক একটি গরিব ভদ্র লোক ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুযায়ী (অপৌত্তলিক ভাবে) করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্মকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গ্রামে লইয়া যান। এ অনুষ্ঠানান্তে তাঁহাকে যে উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা মানব-সমাজে এক অসম্ভব ঘৃণিত ব্যাপার। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসরক্ষার জন্য গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক যত প্রকারের নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা এখন স্মরণ করিতেও বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার মুখে বিষ্ঠা দান ও বলপূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করাইতে চেষ্টা করিবার বিবরণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিয়া, পরবর্ত্তী সময়ে অনেককে উৎসাহিত করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, ৩০০০০৲ টাকার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এবং পশ্চিম বঙ্গের স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইবার জন্য এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী সময়ে বহু ব্যক্তিই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত, নানাভাবে নির্য্যাতন ও অপমান ভোগ করিয়াও, স্বীয় বিশ্বাস অটল রাখিয়াছিলেন! আমি আমার "ব্রাহ্মসমাজে ৬০ বৎসর" পুস্তকে এ সকল বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। এখানে বলিতে চাই যে, আমার সমবয়সী ব্যক্তি বা সমকালীন লোক এখন ব্রাহ্মসমাজে বিরল। "জনসাধারণ চিরদিনই শক্তের ভক্ত ও নরমের যম"; ইহার বহু প্রমাণও ব্রাহ্মসমাজে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানেও যাঁহারা জীবিত থাকিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সত্যমেব জয়তে" নিশান ধারণ করিয়াই আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রচারক অখিলচন্দ্র রায় ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ-যোগ্য।

এখানে পুনরুক্তি-দোষ পরিদৃষ্ট হইবে জানিয়াও, পুনরায় লিখিতেছি যে, দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে যখন রাজা রামমোহন রায়কে তাঁহাদের বাড়ীর দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন রামমোহন শুধু এই মাত্রই বলিয়া ছিলেন যে, "আমাকে নিমন্ত্রণ।" রাজার এই উক্তি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল এবং যথাসময়ে তিনিও পৌত্ত-লিকতায় আর যোগদান করিবেন না, এ অটল সংকল্প তাঁহার নিয়ত জাগরূক ছিল, এবং ইহা হইতেই তিনি পৌত্তলিকভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এই অদৃশ্য ভাবের প্রভাবেই কেশবচন্দ্রও দীক্ষা-গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিধাতার বিধান বলিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র ঘোষণা করিয়া-ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে ইহারই প্রতিধ্বনি করতঃ, পণ্ডিত শাস্ত্রীও ইহাকে শুধু বিধাতার বিধাতার বিধান বলিয়া নয়, "ইহা এক নূতন বিধান" বলিয়া প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আহা! কোথায় থাকিত ব্রাহ্মসমাজ, ইহা কি আকারই বা প্রাপ্ত হইত, যদি দেবেন্দ্রনাথ সে সময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ পৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করি-তেন। আজ যে আমরা এদেশে 'বিবেকের স্বাধীনতা' নানাভাবে প্রতিনিয়ত ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, ইহা কি সম্ভবপর হইতে, যদি কেশবচন্দ্র সে সময়ে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন? এ বিষয়েও তিনি তাঁহার ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথেরসমীপে, দীক্ষা-প্রদানের আয়োজন উদ্যোগ চলিবার সময়ে, উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "এরূপ গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও নেওয়া নিরাপদ নহে; এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেরই স্বাধীন ইচ্ছায় পরিচালিত হওয়াই কর্ত্তব্য। আর এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে আত্মবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।" এ ঘটনায় কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের শক্তি, আত্মার আগ্রহ জ্বলন্ত ভাবে প্রতিভাত হইতেছে।

কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পারিবারিক সংগ্রাম, তাঁহার সস্ত্রীক কলুটোলার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, জোড়াসাঁকো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে আগমন। ইহা ৭৬ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। সে সময়ে সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা স্মরণ করতঃ, এ ঘটনা যে কিরূপ সংগ্রামপূর্ণ ছিল, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কলুটোলার বৈদ্যপরিবার সে সময়ে কত উচ্চ স্থানে আসীন! সেই পরিবারের কুলবধূ দিবা ভাগে স্বামীর সহিত বাহির হইয়া, তদানীন্তন কালে অহিন্দু বলিয়াই খ্যাত

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত! ইহা এক অসাধারণ ঘটনা! যত প্রকারের বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবার, তাহার অনুষ্ঠান সত্বেও, কেশবচন্দ্র—"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা" "যায় যাক থাকে থাক ধন মান প্রাণ রে, পিতারে ধরিয়া রব পর্ব্বতসমানরে"—সর্ব্ব প্রকারের বাধা অতিক্রম করতঃ, পত্নীর হাত ধরিয়া চলিয়া আসিলেন। কি দুর্জ্জয় মনের বল, কি অটল সংকল্প! তাঁহার অন্তস্তলের অসীম বীরত্ব প্রদর্শিত হইল। এ সংগ্রামে কেশবচন্দ্র বিজয়ী হইলেন। এ ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি ইঁহাদের উভয়কে অন্তঃপুরে বসাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে অগ্নি, কেন তুমি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়-কোটরে আবদ্ধ রহিয়াছ? তুমি উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়, ভারতভূমির মোহান্ধকার ও কলুষিত বায়ুকে বিনাশিত কর। পৃথিবীকে এক দাবানলে আবেষ্টন কর। এই ভাবের আর্ত্তনিনাদে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। হে ঈশ্বর, তুমি আমায় আশ্বাস দিলে ও কোমল হস্তে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলে। এতদিন পরে তোমার প্রসাদে, তোমার প্রেরিত সাধুজনকে দর্শন করিয়া, আমার আশা বৃদ্ধি হইল। সেই সাধু যুবা, যিনি আজ আমার আলয়ে সস্ত্রীক আসিয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন, তাঁহার সঙ্গে যতই সহবাস করি, ততই আমার আশা বর্দ্ধিত হয়। তিনি, যিনি আমার অভিন্নহৃদয়, যিনি একহৃদয়, যিনি ঈশ্বরের পবিত্র ব্রহ্মানন্দ নিয়তই পান করিতেছেন, যিনি আমার পুত্র হইতে প্রিয়তর। আমি যত লোকের সঙ্গে সহবাস করিয়াছি, এমত পবিত্র, এমত দৃঢ়ব্রত, এমত জ্ঞানালোকে ধর্ম্মালোকে বিভূষিত ব্রহ্মপরায়ণ কোথাও দেখি নাই। তিনি আজ সস্ত্রীক হইয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন। এক্ষণে, হে পরমাত্মন্! তুমি যে সাধু সজ্জনকে এই পৃথিবীর উপকারের নিমিত্ত এখানে প্রেরণ করিয়াছ, তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে বল বিধান কর। তাঁহাকে জ্ঞান ও প্রীতি ও পবিত্র ভাবে দিন দিন উন্নত কর। তোমার কৃপাতে ইনি আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হইয়া আমার সহায়তা করুন।"

ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে ১৮৬২সনের, ১লা বৈশাখ (১৭৮৪ শক) আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবার সময়, যে কয়েকটি কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইতেছে এবং এই কয়েকটি কথা আমাদের ও ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের পক্ষে এক উজ্জ্বল আশা উদ্দীপিত করিতেছে ও চিরদিনই করিবে:—

"ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণে আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন, তাঁহার আদেশেই আমিও তোমাকে এই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শুভফল বিস্তার কর। এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটি মাত্র সত্যও বিনষ্ট হইবেনা! যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবেনা। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রিগণ অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে।"

আগামীতে কেশবচন্দ্রের সংগ্রামে কৃতিত্বলাভের বিষয়গুলি যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে যত্নপর হইব। কাজ কয়েকমাস হইল, আমি হৃৎপিণ্ডের অসুখে অসুস্থ। মরণের পারে দাঁড়াইয়া আছি, নৌকায় উঠিতে পারিলেই হইল। অনেক লিখিবার আকাঙ্ক্ষা এখনও আছে, জানিনা, বিধাতা আমার মনোবাঞ্ছা কতদূর পূর্ণ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

নামকরণ—গত ২০শে মে, (৬ই জ্যৈষ্ঠ), কুমিল্লা জিলায় কালীকচ্ছ গ্রামে, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দীর বাড়ীতে, তাঁহার পৌত্র, তাঁহার নিরুদ্দেশ পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমারের শিশুপুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে; পৌত্রের পিতামহ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "অলখকুমার" নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে পিতামহ কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১৲ ও ঢাকা নববিধান সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীহরি শিশুর মঙ্গল করুন।

গৃহ-প্রতিষ্ঠা—গত ২২শে মে, কাশীপুরে, ২৯নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পুত্র ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির পিতৃভবনের কম্পাউণ্ডে নব নির্ম্মিত গৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ গৃহকে ও গৃহের অধিবাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই মে, ৭২নং থিয়েটার রোডে, ডাঃ রজতচন্দ্র সেনের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ডাঃ সেন "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ কণ্ডে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই মে, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির গৃহে, তাঁহার অনুজ ভ্রাতা এবং স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখার্জ্জির মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় মেজর এস্, এন্, মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী মনোরমা চাটার্জি ১৲ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার মুখার্জি ৩৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। শ্রীমতী মনোরমা চাটার্জি ২৩শে মার্চ্চ পিতৃসাম্বৎসরিক দিনের জন্যও ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই মে, ২৪নং তারক চাটার্জি লেনে, শ্রীমতী সরলা ভড়ের ঠাকুরমার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী পৌত্রীকে লইয়া উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পৌত্রী শ্রীমতী সরলা ভড় প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। পুত্র শ্রীযুক্ত হাজারিলাল ভড়ও এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৮ই মে, ১৪০।বি, হরিশ মুখার্জি রোডে, টাঙ্গাইলের স্বর্গীয় সাধক কালীকুমার বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসুর গৃহে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ১৲, কনিষ্ঠা কন্যা প্রফুল্লকুমারী দাস ২৲ এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ২৭শে মে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রেরিতপ্রবর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, শান্তিকুটিরে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের লাইব্রেরী হলে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। মিসেস দেবজীবন ব্যানার্জি, অধ্যাপক মন্মথমোহন বোস, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং সভাপতি প্রভৃতি ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত মহাপুরুষের সর্ব্ববিধ মহজ্জীবনের উচ্চাদর্শের কথা বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন।

গত ২৯শে মে, কলুটোলায়, ৩৪নং রামকমল সেন লেনে, কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত ১৫ই মে, রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। তিনি অদ্য উপদেশে শ্রীবুদ্ধের ও শ্রীমহম্মদের জীবন বিষয়ে বলেন।

পুরীর-সংবাদ—গত ২১শে মে হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত তিন দিন ব্যাপী শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞ পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে মার অলৌকিক কৃপায় সম্পন্ন হইয়াছে। পুরীর কালেক্টর মিঃ এস্. এন্. রাও উৎসবের উদ্বোধন করেন। উড়িষ্যার সহৃদয় গভর্ণর স্যার হ্যাভাক বাহাদুর শতবার্ষিকীর শুভকামনা করিয়া পত্র লেখেন। "His Excellency trusts the centenary celebration will be a success and will do much to further the cause of peace and good will for which it was intended." ময়ূরভঞ্জের মহারাজমাতা শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীও তার যোগে সহানুভূতি এবং শুভকামনা করেন। নূতন সার্ব্বজনীন সংগীত যোগে প্রথম দিনের কার্য্য আরম্ভ হয়। তরুণ ভগ্নীগণ মধুরকণ্ঠে সংগীত করেন। ভাই প্রিয়নাথ ইংরাজীতে প্রার্থনা করেন ও অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন আচার্য্যের মহজ্জীবন সম্বন্ধে ইংরাজীতে সুন্দর বক্তৃতা করেন। পর দিন দুইবেলা উপাসনা ও মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হয়। প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ এবং সন্ধ্যায় অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় উপাসনার পূর্ব্বে ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা ও প্রেমসঙ্ঘের যুবকগণ সংগীত করেন। তৃতীয় দিনে সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সভা হয়। ভাই নগেন্দ্রনাথ কীর্ত্তন ও প্রার্থনাযোগে সভা আরম্ভ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ জমীদার এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় প্রচারক রেভারেণ্ট মিঃ রাইডার, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী এবং সভাপতি মহামানব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের গুণকীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা করেন। ভাই প্রিয়নাথ সভাপতি এবং বক্তা, যাঁরা এই যজ্ঞে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, এই যজ্ঞের শান্তিবাচন-প্রার্থনা করেন। একটী নবরচিত সংকীর্ত্তন গীত হইলে সভাভঙ্গ হয়। স্থানীয় এবং কলিকাতা হইতে আগন্তুক অনেকগুলি ভাই ভগ্নী যজ্ঞে যোগদান করেন এবং বিশেষভাবে বায়ুপরিবর্ত্তনকারী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রীগণ উপস্থিত হইয়া নব ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এই যজ্ঞের আমূল বিবরণ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গত ১৪ই মে, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ 'প্রেমাশ্রমের' বহিঃপ্রাঙ্গণে, বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ও পরিনির্ব্বাণ দিনে শ্রীবুদ্ধ-সমাগম সাধন হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন পাঠাদি করেন এবং ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন সংগীত করেন। যে কয়েকটি নববিধান পরিবার এখন পুরীতে অবস্থান করিতেছেন, সকলেই প্রায় যোগদান করেন। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীতে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। নবশ্রীক্ষেত্রে কয়েকটি দরিদ্রকে ভিক্ষায় ভোজন করান হয়।

নিবেদন

কোনও নববিধান সাধক সাধিকা যদি সাধনার্থে পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অবস্থান করিতে চান, এবং প্রেমাশ্রমের ও এখানকার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনের ভার লইতে স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে নবপর্ণকুটীরে একখানি ঘর ও রান্নাঘর দেওয়া যাইতে পারে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের নিকট অনুসন্ধান করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
১১শ সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
16th. June, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপালক, বিশ্বরক্ষক! কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকল জীবের প্রাণে সঙ্গলিপ্সা তুমিই দিয়াছ। সঙ্গ ভিন্ন কেহ জীবনধারণ করিতে পারেনা, সঙ্গ হইতে জীবনপথে কত সহায়তা লাভ হয়। সঙ্গ হইতে কত কল্যাণ, কত শুভ, কত তৃপ্তি। সঙ্গে শান্তি, আরাম ও আনন্দ। যদি সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখীর সঙ্গ প্রয়োজন, তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের পক্ষে কত সঙ্গের প্রয়োজন। মানুষকে যদি স্বর্গীয় জীবনের নিয়তি দিয়া প্রস্তুত করিয়া থাক, তবে তুমি জান, তাহার স্বর্গীয় জীবনলাভের পক্ষে, স্বর্গের পথে, সঙ্গী সাথীর কত প্রয়োজন। তুমি জানিয়া, বুঝিয়া, মানুষ না চাহিতেও তাহার জন্য স্বর্গের পথে বাছা বাছা সঙ্গ দান করিয়া থাক। 'বিভু! না চাহিতে দিয়েছ সকল।' না চাহিতে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সঙ্গ দিয়াছ, না চাহিতে স্বর্গের পথে আত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয় সঙ্গ যোগাইতেছ। এই নবযুগে আমাদের স্বর্গের পথে কত উৎকৃষ্ট সঙ্গী সাথী দিয়া এ যুগকে ধন্য করিয়াছ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যেমন সদল সাধু মহাজনদিগকে পাঠাইয়া পৃথিবীর সঙ্গ-ক্ষুধা-নিবারণের উপায় করিয়াছ, এই নবযুগে সদল শ্রীকেশবচন্দ্রকে পাঠাইয়া, ভক্ত-সঙ্গ-ক্ষুধা, সাধু-সঙ্গ-ক্ষুধা কতই নিবারণ করিয়াছ। তাঁহাদের পৃথিবীতে স্থিতিকালে যেমন এই সদর নববিধানক্ষেত্র কলিকাতায় জমাট দলের সমাগম হইয়াছিল, মফঃস্বলের বিশেষ বিশেষ সহর ও পল্লিতেও, বৃক্ষরাজির উত্থান ও বৃদ্ধির ন্যায়, কত বিশ্বাসিদল ও পরিবারের উত্থান এবং বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। নববিধানের বিশিষ্ট প্রেরিতদল একে একে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সদর মফঃস্বলের বিশ্বাসী সাধকদলও একে একে প্রায় অনেকেই এখন স্বর্গগত। ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সকল প্রেরিতদল ও সাধুভক্ত স্বর্গস্থ হইয়াও আমাদের নিত্য সঙ্গী, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার এবং তাঁহাদের সঙ্গ সহায়তা ভিন্ন কি নববিধানবিশ্বাসী মণ্ডলী বাঁচিতে পারে? মানিলাম, তোমারই কৃপাতে, তোমারই শিক্ষাতে সেই স্বর্গীয় দলকে আমরা ধর্ম্মজীবনপথে যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গী ও সহায়রূপে পাইতেছি; কিন্তু তাঁহারা তো আত্মিক জগতে অশরীরী আত্মিক সঙ্গী। তাঁহাদের সঙ্গ ও সহায়তা-লাভের জন্য এবং আমাদের নিত্য উপাসনা ও সাময়িক অনুষ্ঠান সকলে তোমাকে ভাল করিয়া লাভ ও সম্ভোগ করিবার জন্য, আমাদের পক্ষে শরীরধারী সমবিশ্বাসী, সহসাধক, সহকর্ম্মীর সঙ্গ সহায়তার যে বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এত দুর্ব্বল, এত অভাবগ্রস্ত,

এত অশিক্ষিত যে, সমবিশ্বাসী সাধক ও সহব্রতধারীদের সঙ্গ সহায়তা উপাসনায়, আলোচনায়, অনুষ্ঠানে না পাইলে, আমরা যে বড় নিরুপায়। ধর্ম্মপথে দেহধারী, সমবিশ্বাসী, সহসাধকশ্রেণীর সঙ্গ সহায়তা ভিন্ন কিছুতেই আমাদের চলিতেছে না। কিন্তু সর্ব্বত্রই বর্ত্তমানে আমাদের এত লোকের অভাব, এত সঙ্গের অভাব, তাহা তুমিই ভাল জান। তাই তব চরণে কাতর প্রার্থনা, তুমি এখানে এবং অন্যত্র সমবিশ্বাসী সহসাধকদল বৃদ্ধি করিয়া, সাধনপথে তাঁহাদের সঙ্গ-সহায়তা-দানে করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

শ্রীকেশবজীবনে অদ্ভুত প্রচার-প্রচেষ্টা

স্বর্গের বিমল সত্য সাধকের প্রাণে উদ্ভাসিত হইলে, সাধক তাহা প্রাণে চাপিয়া রাখিতে পারেন না। কোন না কোন আকারে তাহা জগতের কল্যাণার্থ সাধকের প্রাণের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহির হইবেই হইবে। কেন না, যাহা স্বর্গের, তাহা সর্ব্বসাধারণের। যথার্থ সাধক ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া, জীবনলব্ধ পরমতত্ত্ব জগতের নিকট ঘোষণা করিয়া আপনি ধন্য হন, জগৎকে ধন্য করেন।

কোন্ সুদূর অতীতে ঋষিযুগে ভারতের পুণ্যাকাশে কোন ঋষি কর্ত্তৃক ধ্বনিত হইয়াছিল, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে হমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যখ্যা এই ভাবে করিয়াছেন যে, "প্রাতঃকালের সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় অকৃত অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া, নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মবাদী কহিতেছেন যে, হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা! দ্যুলোক ও ভূলোকবাসী দেব ও মনুষ্যেরা! শ্রবণ কর; আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" কোন্ আদিকালে ভক্ত নারদ বীণা-যন্ত্রে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া হরিনামকীর্ত্তনে জগৎকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ অনেকে মৌখিক প্রচার করেন নাই, জীবনলব্ধ পরমতত্ত্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশের জন্য অমরকীর্ত্তিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ হস্তে সেতারাদি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সংগীত-যোগে সাধন করিয়াছেন, সংগীতকে প্রচারের বিশিষ্ট উপায় মনে করিয়া সংগীতেই পরমতত্ত্ব সকল নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং "গানাৎ পরতরো নহি" ধ্বনিতে সাধনে ও প্রচারে সংগীতের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে শ্রীবুদ্ধের জীবনে ছিল প্রবল প্রচার-পিপাসা। তিনি বলিতেন, পৃথিবীর একটী লোকের স্বর্গ গমন বাকি থাকিতে, তাঁহার স্বর্গগমন হইবে না। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের স্বদেশে বিদেশে এত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ ভক্তদল ভক্তিগ্রন্থ ও সংকীর্ত্তনকে প্রচারের বিশেষ উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রচারের যে আবেগ ছিল, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের জীবনে সেরূপ আবেগ দৃষ্ট হয় না; তাঁহাদের অনেকের জীবন সাধনপ্রধান ছিল, প্রচার-প্রধান নহে। বিদেশী মহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীঈশা ও শ্রীমহম্মদের জীবন বিশেষ ভাবে প্রচারপ্রধান।

প্রচার-প্রচেষ্টায় শ্রীকেশবের সঙ্গে শ্রীঈশার জীবনের একটী বিশেষ বিষয়ে মৌলিক মিলন আছে। প্রচারক্ষেত্রে শ্রীঈশা বলিতেন, "আমি কিছু বলি না, আমার ভিতর দিয়া স্বর্গস্থ পিতা যাহা বলেন, আমি তাহাই বলি।" শ্রীঈশা অহংকে উড়াইয়া দিয়া, পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। শ্রীঈশা ঘোষণা করিয়া গেলেন, "আমি গেলে ঈশ্বর পবিত্রাত্মাকে পাঠাইবেন, পবিত্রাত্মা সকলকে পূর্ণ সত্য, সমগ্র সত্যতে লইয়া যাইবেন।" "The Holy spirit will come and lead you to all truths." শ্রীকেশবের ধর্ম্মজীবন পবিত্রাত্মার পরিচালনেই আরম্ভ, এবং তাঁহার জীবনের সকল প্রচার পবিত্রাত্মার বাণীতে। শ্রীকেশবও বলেন, "আমি কিছু বলি না, পরম পিতা যাহা বলান, তাহাই বলি। আমার প্রচারের বিরুদ্ধে কথা বলাও যাহা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলাও তাহা।" শ্রীমহম্মদের প্রচারে উদাম, উৎসাহ ছিল শ্রীকেশবজীবনের প্রচারে উদম্য উৎসাহ।

আমাদের ভারতের ঋষি আত্মা, যোগী আত্মাগণও 'অহং'কে বিলুপ্ত করিয়া, পরমাত্মাতে যোগস্থ থাকিয়া, পরমাত্মার বাণী আপনাদের রসনা-যন্ত্রে বহন করিয়া প্রকাশ করিতেন। এ বিষয়ে শ্রীকেশব ভারতের প্রাচীন ঋষি আত্মা, যোগী আত্মাদের সঙ্গে ও বিদেশী ঋষি আত্মা, যোগী আত্মা শ্রীশার সঙ্গে একপ্রাণ। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীঈশা,

শ্রীমহম্মদ যেন মাতৃগর্ভেই প্রেরিত প্রচারকের জীবনের গঠন পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের আরম্ভেই প্রচারকের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অন্যব্রত ছিল না, কেবল প্রচার। শ্রীকেশবও এই শ্রেণীর প্রেরিত প্রচারক। তাই তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারকের একটা লক্ষণ হইল—"Once a Missionary is ever a Missionary." যে একবার প্রচারব্রতধারী হইল, সে আজীবন প্রচারক, সে অন্যব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শ্রীকেশবজীবনের অদ্ভুত প্রচারপ্রচেষ্টার বিশেষ কথা এখন বলিব। তিনি তাঁহার প্রচারক্ষেত্রে প্রচারের উপায়রূপে পূর্ব্বপ্রচলিত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রায় সকল উপায়কেই অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সমাজে অদ্ভুত প্রচার-সমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার যৌবনে "Good will fraternity" নামক সভা গঠন করিয়া সমবয়সী-দিগের মধ্যে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমে অন্তরে যতই নব নব সত্যের উদ্গম হইতে লাগিল, রাস্তার ধারে ধারে কাগজ লাগাইয়া বিশেষ বিশেষ বাণীপ্রচারে প্রচারোৎসাহের পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিছুদিন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন, সেখানে তাঁহার প্রচারোদ্যম খণ্ড খণ্ড পুস্তিকা-প্রণয়নে ও প্রচার ব্যাপারে প্রকাশিত হইল। ক্রমে ঈশ্বরাদেশে প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ জন্য বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তখন হইতে ইংরেজি বক্তৃতাতে ও বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশে তাঁহার কি অদ্ভুত প্রচারশক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পবিত্রাত্মার জ্বলন্ত প্রত্যাদেশে তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ, তাঁহার জীবন্ত ঈশ্বরের স্বর্গীয় বাণীতে তাঁহার বাণী। তাঁহার টাউন হলের বক্তৃতার তুলনা কোথায়? মহোচ্চ পর্ব্বত হইতে যেন জলপ্রপাতের প্রবলবেগময়ী সহস্র ধারা বিনির্গত হইয়া দিকদেশ প্লাবিত করিয়া দিত, যাহার ঘাত প্রতিঘাতে সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইত। আধ্যাত্মিক উচ্চ ধর্ম্ম ছিল তাঁহার প্রধান প্রচারের বিষয়, সেই ধর্ম্মের ভিত্তিতে শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার, পারিবারিক জীবন, মাদকদ্রব্যনিবারণ ও সর্ব্বসাধারণের উচ্চনৈতিক জীবনকে তিনি প্রচারের বিষয় করিয়াছিলেন। এত বিচিত্র ব্যাপার লইয়া আর কে প্রচার করিয়াছেন? স্ত্রী-শিক্ষার জন্য জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়, যুবকদের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় এ সকলই ছিল তাঁহার বিশেষ প্রচারক্ষেত্র।

পূর্ব্বের সাধু মহাজনগণ প্রত্যেকে এক একটী স্বর্গের বিশেষ ভাবের প্রতিনিধিরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বিশেষ বিশেষ বিষয় ছিল তাঁহাদের প্রচারের লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীকেশব মহা শিষ্যপ্রকৃতি লইয়া, সকল সত্যের ও অনন্তধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ যিনি, তাঁহার চরণে কাল দেশের অতীতভাবে সকল সত্য ও অনন্ত ধর্ম্মলাভের জন্য হইয়াছিলেন ভিখারী। তাই তিনি জগতে পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত ধর্ম্মের সকল ভাবের ও বর্ত্তমান যুগের বিরাট সমন্বয়ধর্ম্মের নব নব সত্য, নব নব আলোক লাভের হইলেন একাধারে অধিকারী। তাঁহার জীবনে যেমন বিবিধ ধর্ম্মভাবের অদ্ভুত সমন্বয়সাধনা, তেমনই বিবিধ ধর্ম্মভাবের অদ্ভুত প্রচার। হিন্দুসমাজের কত অগ্রণী তাঁহাকে বলিলেন, কেশবচন্দ্র হিন্দুর হিন্দু; গোঁড়া প্রবীণ খ্রীষ্ট মিশনারী প্রকাশ্য সভায় বলিলেন, কেশবচন্দ্র আমা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর খৃষ্টিয়ান; এরূপ শুনা গিয়াছে, তাঁহার সেবকের নিবেদন পাঠ করিয়া, কাশীর এক বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, এ নূতন বেদ। খ্রীষ্ট বিষয়ে তাঁহার টাউন হলের উক্তি সকল পাঠ করিয়া, শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্‌সিপাল ও বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক প্রকাশ্য বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা খৃষ্টবিষয়ক কেশব-চন্দ্রের উক্তি পাঠ করিয়া খৃষ্টকে নবভাবে গ্রহণ করিতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকে, খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রকে, মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্রকে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিখধর্ম্মশাস্ত্রকে আপনার ও আপনারা ধর্ম্মসমাজের শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার সমাজের সহকর্ম্মী বিশেষ বিশেষ প্রেরিত প্রচারক দ্বারা, ঐ সকল বিভিন্ন শাস্ত্রের গভীর চর্চ্চা, সে সকল শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা ও অনুবাদ, বিশেষ ভাবে দুরূহ আরবী ভাষায় লিখিত মুসল-মান শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ কি বিপুল আকারে করাইয়া, সেই সকল ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের প্রচারকার্য্যের অভূতপূর্ব্ব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। একজন শিক্ষিত মৌলবী প্রকাশ্য সভাতে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি মূল কোরাণ শরিফ পাঠাদির দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের তেমন বিশদ ও গভীর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, যেমন নববিধান সমাজের অনুবাদিত বঙ্গভাষায় কোরাণ শরিফাদি পাঠ করিয়া লাভ করিয়াছেন। প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্রের Oriental Christ পাঠে

ধর্ম্ম হল সকলের ধর্ম, মানবধর্ম্ম। কেশবচন্দ্রের কাছে এইটা শিখেছি। তিনি ধর্ম্মকে দেশকালের উপর তুলে দিতেন। কেশবচন্দ্র বলিলেন—'ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ মানুষ যে রকম করে বুঝেছে, সেই রকম করে তাঁর মূর্ত্তি দিয়েছে।' সেটা হল concept. গীতাতে উল্লেখ আছে, যে যেখানে উপাসনা করে, সে আমার উপাসনা করে। উপাসনা করে কে? আত্মা করে। পরমাত্মারই উপাসনা হয়, আর কাহারও উপাসনা হয় না। যদি কোন সাধকের সম্মুখে মূর্ত্তি থাকে, আর যদি সে উপাসনা প্রকৃত হয়, তবে সে মূর্ত্তি superfluous। সরস্বতী হচ্ছে ঈশ্বরের বিষয়ে ধারণা, তাই তাহা বর্জ্জন করতে পারি না। কিন্তু ধারণার উপাসনা হয় না, conceptএর কখন উপাসনা হয় না। এইরূপে কেশবচন্দ্র বহু মূর্ত্তির conceptকে গ্রহণ করলেন এবং অনন্তের পূজায় তাদের rehabilitation করিলেন। আমি জীবিত—খাই, বাঁচি, কাজ করি, সন্তান উৎপাদন করিতে পারি; আমি Automatic Machine করতে পারি। কিন্তু প্রাণ দিয়ে জন্ম দিতে পারি না। তিনি প্রাণ দিয়ে জন্ম দেন, তিনি God the Father। ঈশ্বরের সন্তান যিনি, তাঁতে ঈশ্বরের গুণ আছে। তাই তিনি God the Son। আর এই ঈশ্বরের গুণ সর্ব্বত্র দেখে, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সন্তানদের স্বীকার করে, সেই সন্তানদের যখন অখণ্ডাকারে বিশ্বাস করি, তখন Christ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এই মত, এই রকম করে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এই রকম করে কেশবচন্দ্র প্রত্যেক ধর্ম্মের যে বিশ্বাস, তা গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন চিন্ময় রাজ্যের পরিচয় পেলেন, তখন তিনি সত্যকাম, সত্যপ্রিয় হলেন। কৃষ্ণনগরের বক্তৃতায় পাদ্রী বলিলেন, কেশব খৃষ্টধর্ম্ম হতে চুরি করেছেন; কেশব তখন বলিলেন,—"আমি ঈশ্বরের পুত্র, যেখানে সত্য আছে, সবে আমার অধিকার আছে।" যে চিন্ময় রাজ্যের পরিচয় পায় সে সেই এক স্থান হতে সকল স্থানে সত্যকে পায়। অনেকে বলেন, তিনি মহম্মদের কাছ হতে, বুদ্ধের কাছ হতে, নানকের কাছ হতে, রামকৃষ্ণের কাছ হতে পেয়েছিলেন। কেশব বলিলেন, 'আমি Blotting paper. যার কাছে যা সত্য আছে, আমি শুষে নিই। ঈশার ভেতর দিয়েছেন, আমার জন্য; রামকৃষ্ণের ভেতর দিয়েছেন আমার জন্য, আমিই নেবো বলে।' এই হল কেশবের attitude, এই attitude নিয়ে যখন তিনি মানবের সম্মুখে দাঁড়ালেন, তখন তিনি ইতিহাসে, সমাজের সমস্ত অবস্থার মধ্যে, ব্রহ্ম পরাত্মা ভগবানের হাত, তাঁরই পরিচালনা দেখলেন। তিনি বিলাত হতে ফিরে এলেন, মানবধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। W. C. Bonerjee বলেছিলেন—"তিনি positivist.' ব্রহ্মের পূজা তাঁদের কাছে তত স্থান পেল না। দেবদেবীর পূজা, মহাত্মার পূজা কেশবচন্দ্রের মনে লাগিল। সাধু সাধ্বীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দাও, এই বলে যে উপাসনা করিতেন, তার নাম হ'ল সাধুসমাগম। ঈশ্বর সাধুদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ সাধুদের উপাসনা নয়, এটা সাধুদের সমাগম, সাধুদের গ্রহণ ও আত্মসাৎ। কেশবচন্দ্র এইরূপে সকল সাধুকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিলেন। কেশব ঈশাকে গ্রহণ করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিলেন। সেইজন্য তিনি বলিলেন,—

"Jesus is my will, Chaitanya is my heart."

সব সাধুকে, সব জীবনকে, সব দেবদেবীকে গ্রহণ করে, তিনি বললেন, 'আমি নব দুর্গার নব সন্তান।' কেমন করে গ্রহণ করা যায়? চিন্ময় যে অনন্ত, অফুরন্ত, তাই তাঁর মধ্যে সব গ্রহণ করা যায়। এই রকম করে তিনি সব ধর্ম্মকে, সব মতকে, সব রীতিকে universalise করিলেন। এই সময় সকলে বলিলেন, 'কেশব জাতিনাশা।' বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিলে কেশব বিধবা বিবাহ দিলেন, কিন্তু কেশব যখন অসবর্ণ বিবাহ দিলেন, তখন আর বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হতে পারলেন না। অসবর্ণ বিবাহ কাদের মধ্যে হল? নিজের দুই মেয়ের কোচ রাজবংশের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আজ আমরা হরিজনের কথা বলি, কিন্তু তিনি যে এইরূপে দুই মেয়েকে বিবাহ দিয়ে, বহুপূর্ব্বেই সে সময়কার দিনে হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। যদি ভারতকে আবার জাগতে হয়, যদি আবার উন্নত হতে হয়, তবে কেশবের সাধনাকে ভারতকে গ্রহণ করতে হবে।

ইহার পর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস বক্তাকে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হতে ধন্যবাদ দান করেন এবং তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—•—

নববিধানে নবসংহিতা

বিধাতার বিধানে যুগে যুগে যখন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিধান আসিয়াছে, তখনই তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে তাঁহার সংহিতাও আসিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট প্রাকৃতিক জগৎও সংহিতা-শূন্য নহে। তাঁহার সেই সংহিতায় সৃষ্ট জগতে অণু পরমাণুও এক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে আবদ্ধ। তাঁহার সৃষ্ট গ্রহ উপগ্রহ এবং সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, এমন কি, ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডও তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। তাঁহার এই সংহিতার নিকট সমগ্র জড় জগৎ এক অস্ফুটভাবে তাঁহারই নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছে। তাঁহার এই নিয়মে কোন দিন জড় ও জীবজগৎ তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মে বাহিরে যাইতে পারে না। এমন কি, আকাশের পাখী এবং সরোবরের কমল তাঁহার সংহিতা পালন করিতেছে। পাখী রজনীর শেষে প্রভাতের আলোকে ডাকিয়া উঠে এবং কমলও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাকাশের সূর্য্য কোন দিন পশ্চিমাকাশে উদিত হয় না। তাঁহার এই অখণ্ড নিয়মে যুগে যুগে যেমন এক একটি ধর্ম্মবিধান আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহার প্রেরিত প্রবর্ত্তকের ভিতর দিয়া উপযোগী সংহিতাও প্রেরণ করিয়াছেন। এই নিয়মে তাঁহার হিন্দু বিধানে ঊনবিংশ সংহিতা আসিয়াছে। শিখধর্ম্মেও পঞ্জাবে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ আসিয়া সময়োপযোগী সংহিতা প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় বিধানে সিনাই পর্ব্বতে প্রত্যাদিষ্ট মুষার ভিতর দিয়া যে তাঁহার দশাজ্ঞা আসিয়াছিল, তাহার ভিতরেও তাঁহার সংহিতা এবং শ্রীঈশা পর্ব্বতশিখর হইতে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার সংহিতা। প্রাচীন খৃষ্টীয় বিধানে Leviticus নামে এইরূপ সংহিতা আসিয়াছিল। বর্ত্তমান ইউনিটেরিয়ান অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসমাজ আমাদের নববিধানের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া, নবসংহিতার আদর্শে এক সংহিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাই আজ বলিতে আসিলাম, আমাদের নববিধানে নব শিশু শ্রীকেশবের ভিতর দিয়া যে নবসংহিতা আসিয়াছে, তাহাও বিধাতার সময়োপযোগী প্রেরণা। এই প্রেরিত বস্তু সম্বন্ধে শ্রীকেশবের যে ব্যস্ততা আসিয়াছিল, তাহা ধর্ম্মজগতের নিকট এক অখণ্ড মহা সংহিতা। তাঁহার মহাপ্রস্থানের অনতি পূর্ব্বে তাঁহার ভিতরে যে প্রেরণা আসিয়াছিল, সেই প্রেরণারই নববিধানে নবসংহিতার জন্ম। তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে এই প্রেরণা পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই। বিধাতার বিধানে সেই বস্তু সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তিনি সেই মুদ্রিত প্রুফটি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এবং জীর্ণ শীর্ণ দেহে প্রস্থানের সপ্তাহের পূর্ব্বে সেই প্রুফ দেখিয়া গেলেন। আজ তাই বলিতে আসিলাম, বিধাতার এই প্রেরিত বস্তু হইতে আমরা যদি একটুও দূরে পড়িয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার নববিধান ও নবসংহিতা আমাদিগের নিকট গৃহীত হইল না। আজ তাই আমি জীবনের পঞ্চাশীতিতম বর্ষে আসিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বর্ত্তমানে আমাদিগের ভিতরে যে অনাস্থা ও প্রতিকূল বাতাস প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র নববিধান-পরিবারের সমক্ষে এক সঙ্কটের যুগ আসিয়া পড়িতেছে। দেখিতেছি, অনেক স্থানে পৃথিবীর স্বার্থ ও সুবিধার নিকট তাঁহার নবসংহিতা কোন্ স্থানে গিয়া পড়িতেছে। আজ এ সম্বন্ধে প্রাণের আবেগে ও আকাঙ্ক্ষায় ২।১টি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিধাতার নববিধানে দীক্ষা বস্তু এক সাধারণ বস্তু নহে। সকল বিধানে দীক্ষাগ্রহণ এক অপরিহার্য্য বিধান। এই দীক্ষা মানবজীবনে এক মহা প্রস্তুতিসাপেক্ষ। প্রস্তুতি ভিন্ন প্রকৃত দীক্ষাগ্রহণ অসম্ভব। মানবজীবনের প্রত্যেক অধ্যায় প্রস্তুতি-সাপেক্ষ। দেখিতেছি, আমাদের পরিবারে ক্রমে ক্রমে দীক্ষার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তার ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। যতই দিন চলিয়া যাইতেছে, ততই এ প্রভাব মৃত অক্ষরে পরিণত হইতেছে। আজ এই স্থানে আমি আমার জীবনের ২।১টি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার যুবকজীবনে আমাদের কালনায় খ্রীষ্টীয় ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনের ছাত্র তখন আমি; সেখানে পঠিত বাইবেল গ্রন্থের কিছু কিছু সত্য অবগত হইয়া, খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের জন্য তৎকালীন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ খৃষ্টবাদী রেভারেণ্ড বৈকুণ্ঠনাথ দে মহাশয়ের নিকট খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া, অধ্যক্ষ মহাশয় ক্ষণিক নীরবতার পর আমাকে বলিলেন, "অপেক্ষা কর, বাইবেলের আরও নিগূঢ় সত্য শিক্ষা কর।" আমি তাঁহার সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিরস্ত হইলাম, এবং বাইবেলের আরো সত্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। তাহার পর জীবনের ইতিহাস অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। সেই ইতিহাসের বাহুল্যতা হেতু আর এখানে উল্লেখ করিলাম না। তাহার পর যখন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত প্রাণের একটা ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করিতেছিলাম, সেই সময়ে অর্থাৎ বিবাহের পরে ১৮৭৯ সালে ভাদ্রোৎসবের সময় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণের জন্য শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের নিকট আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নিকট হইতেও পূর্ব্বোক্ত রূপ উপদেশ আসিয়াছিল। তখন এমন একটা আলোক পাইলাম যে, ধর্ম্মে পূর্ণ ও অটল বিশ্বাস না হইলে দীক্ষা-গ্রহণের সময় আসে না। এখন দেখিতেছি যে, সাধনশীল সাধকদিগের সেই অভিজ্ঞতা উপেক্ষিত হইতেছে। এখন ব্রাহ্মপরিবারে, সেই ধর্ম্ম-নীতি ও ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরিবারের অভিভাবকদিগেরও কোন দৃষ্টি নাই। এমন কি, অনেক পরিবারে পারিবারিক উপাসনারও ব্যবস্থা নাই। পৌত্তলিক হিন্দু পরিবারে জীবনের অনেক সময় কাটাইয়া যে ভাব দেখিয়া আসিলাম, ব্রাহ্মপরিবারে সে ভাবেরও অভাব হইতেছে। ধর্ম্মশিক্ষা-ও-উপাসনাবিহীন সন্তানসন্ততিগণ কোন দিকে চলিয়া যাইতেছে! এই ত গেল বর্ত্তমান পারিবারিক জীবনের মৌলিক ইতিহাস। বর্ত্তমান ব্রাহ্ম পরিবার সেই প্রস্থানোন্মুখ আচার্য্যদেবের প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সেই সাধনাসম্ভূত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ নবসংহিতা এখন কোথায় চলিয়া যাইতেছে! পরিবারের সন্তানসন্ততিদিগের মধ্যে দীক্ষা শিক্ষার কথা অনেক দূরের সমস্যা। এখন দেখিতেছি যে, অনেক স্থানে বিবাহের ন্যায় আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানেও নবসংহিতা পুরাতন কাগজ পত্রের মত উপেক্ষিত। বিবাহের পাত্রপাত্রীনির্ব্বাচনে বিধাতার আলোক ও আজ্ঞাপালন সম্বন্ধে পৃথিবীর স্বার্থ ও সুবিধার ছায়া আসিয়া পড়িতেছে। এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানেও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে না। বিবাহ সম্বন্ধে পৌর্ব্বাহ্লিক অনুষ্ঠান সমূহও কোন্ সুদূর-পরাহত বস্তুর মত উপেক্ষিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীদিগের সম্মতিসূচক প্রকাশ্য notice অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান-জ্ঞাপক বিজ্ঞাপন এবং তদনুযায়ী উপাসনারও ব্যবস্থা হইতেছে না। বর্ত্তমান ব্রাহ্ম পরিবারের এই ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত করিতে গিয়া, আরো হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে, বিবাহক্ষেত্রে কোন

কোন স্থলে অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত অপ্রস্তুত ও অদীক্ষিত পাত্রকে আনিয়া পাত্রের আসনে বসান হইতেছে। ইহার যে কি পরিণাম, তাহা সাধক ও সাধিকাগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার পরিণাম ফল যে কিরূপ হইতেছে, তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সেই সব পরিবারের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণকে এখন তাঁহাদের হঠকারিতা হেতু অনুতাপ করিতে হইতেছে। আজ আর এ সম্বন্ধে কোন্ চিত্র দিব, তাহা জানিনা।

আজ এই পত্রের উপসংহারে বলিতে আসিলাম যে, আমার এই পঞ্চাশীতি বর্ষের আর্ত্তনাদ কি আমাদিগের পরিবারের সাধকসাধিকাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিবে? যে নববিধান 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর', এই বাণীর ভিতর দিয়া ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভিতরে আসিল এবং যে নবসংহিতা তাঁহার মহাপ্রস্থানের অনতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, আজ কি সেইবস্তু আমাদিগের ভিতরে এইরূপে ব্যবহৃত হইবে? সাধক ও সাধিকা ভাই ভগ্নীগণ! যখন বিধাতার বিধানে আমাদিগের ভিতরে নূতন পরিবার গঠনের ভার আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর আমাদিগের উদাসীনতার সময় নাই। আমাদিগকে নববিধানের নূতন পরিবার গঠন করিতে হইবে। বিধাতার নববিধান ও নবসংহিতা এই গঠনের একমাত্র উপাদান।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(৫)

১৮৬০ সন হইতে কেশবচন্দ্র এই বিশাল সংগ্রামক্ষেত্রের জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ-সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করতঃ চারিদিকে বিতরণ করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে 'Religion of Love', "প্রেমের ধর্ম্ম" এবং 'Signs of the Time' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লিখিত এই "প্রেমের ধর্ম্মে" তিনি ঠিক যেন ঐ সেই ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মের ন্যায়ই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। এবং কেশবচন্দ্র এদিকে আবার নব যুগের নানা লক্ষণ বর্ণনা করতঃ স্বদেশবাসীদের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ধর্ম্মপিতা মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠিক ঐ সেই বৈদিক ঋষির ন্যায়ই নির্ম্মল আকাশে অগণ্য তারকারাজি সন্দর্শন করে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এ বিশ্ব কোন পরিমিত হস্তের রচিত নহে; অনন্ত, অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার, নির্ব্বিকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই এ বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা। তাঁহার এ বাণীও দিক্‌দিগন্তে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখন আবার ১৮৫৭ সনে, কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার সময় হইতে ক্রমশঃ ভক্তিভাজন উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, অঘোরনাথ গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, অমৃতলাল বসু ও সংগ্রামপ্রবণপ্রকৃতি-বীরকেশরী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহারথিগণ আসিয়া তাঁহাদের সহকর্ম্মিরূপে ব্রাহ্মসমাজের এ সমরভূমিতে দাঁড়াইয়া গেলেন। ইঁহাদের সকলের সম্মিলনের ফলে এক মহাশক্তি জাগ্রত হইয়া চারিদিকে তাহা অপরূপ কার্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র ১৮৬০ সনে নব্য বঙ্গের যুবকগণকে সম্বোধনকরতঃ ঘোষণা করিলেন যে, "Young Bengal, this is for you"—হে নব্যবঙ্গের নব্য যুবকগণ, এ ধর্ম্ম তোমাদের জন্যই সমাগত।

কেশবচন্দ্রের প্রত্যেক কথা সে সময়ে নূতন বলিয়াই সকলে আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন। নব্য শিক্ষিতগণের প্রাণে তাঁহার কথাগুলি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র নব্যমণ্ডলীকে নবভাবে অনুপ্রাণিত করিবার নিমিত্ত নানাদিকে নানাভাবে তাঁহার বাণী প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ আহ্বান বৃথা যায় নাই, ক্রমশঃ নব্যদলের যুবকগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে, অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া যেমন চারিদিক হইতে পতঙ্গদল আসিয়া আত্মাহুতি দেয়, তেমনি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধিধারিগণ, যাহাদিগকে সে সময়ের ফুটন্ত ফুলের সহিত (Flowers of the University) তুলনা দেওয়া হইত, দলে দলে আসিয়া অকুতোভয়ে আত্মাহুতি প্রদান করিবার জন্য, বীর সেনানীরূপে সমরাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। ইঁহারা সকলেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং এদেশের যাবতীয় প্রকারের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আমরা সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, মানুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, তবুও তাহাদের প্রাণের বদ্ধমূল সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। আবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে ও দিবে যে, এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনায়াসেই সর্ব্বপ্রকারের সংস্কার অক্লেশে অকুতোভয়ে পরিত্যাগ করতঃ সৈনাবেশে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কত কত ব্রাহ্মণকুলজাত যুবকগণ মান, অপমান, নির্য্যাতন, উৎপীড়নের ভয় এবং সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ও না করিয়া, জাতিভেদের পরিদ্যোতক উপবীত অনায়াসেই পরিত্যাগ করতঃ আচণ্ডাল সকলকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, "জাতিভেদ মানিনা" ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, 'যবনান্ন' গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। (পরবর্ত্তী সময়ে যখন কেশবচন্দ্র ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তখন প্রথম প্রথম কোন মুসলমান হোটেল হইতে তাঁহার আহার্য্য আনীত হইত)। ১৮৬৬ সনে কেশবচন্দ্র সদলে আদিসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া

পড়িবার পরেই, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-গৃহে প্রবেশের দিনে প্রাতে বিধাতার কৃপায় বীরোচিত আকৃতি-ও-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সৎকর্ম্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভারতবাসীদিগকে সম্বোধন করতঃ ঘোষণা করিলেন :—

"কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ,
নয়ন খুলিয়া দেখ, শুভ উষা আগমন।
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গলজলধি জলে হতেছে চিরমগন।
সযতনে, ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণস্বরে,
ডাকেন ভারতমাতা পরি উজ্জ্বল বসন।
উঠ বৎস, প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কালরাত্রি অবসানে, উদিল সুখ-তপন॥
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধরে,
বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন।
নরনারী সমুদায়ে, এক পরিবার হয়ে,
গল-বস্ত্রে পূজ তাঁরে যাঁ হতে পেলে এ দিন॥"

এই দিনে বীরভাবপ্রবণ, অকুতোভয়ী, অদম্য উৎসাহী, উপবীত-পরিত্যাগী, অদ্বৈতকুলজাত বিজয়কৃষ্ণও আশার বাণী শুনাইলেন—

"এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখরজনী,
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জর জর,
পাঠাইলেন স্বর্গরাজ্য মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি মায়পাশ বীরপরাক্রমে।
উর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
জয় জগদীশ বলে, কর সবে জয়ধ্বনি॥"

কেশবচন্দ্র ১৮৬০সনে যে নব্যবঙ্গের যুবকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, "Young Bengal, this is for you" এতদিনে তাহার সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ৫০০শত বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে যেমন তিনি ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে সকলকেই হরিনামে মাতাইয়াছিলেন, তাহার ফলে ভক্তিভাজন রূপ ও সনাতন নবাব সরকারের অতি উচ্চপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক "পথের দীন" হইয়াছিলেন, রঘুনাথ মহাধনীর সন্তান হইয়াও কেমন এক অমানুষিক বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সহিত একীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজপুত্র জগাই মাধাই সে সময়ে (রাজা শুভানন্দের দুই পুত্র ছিল, রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। স্বনামপ্রসিদ্ধ জগাই বা জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র, এবং মাধাই বা মাধব জনার্দ্দনের পুত্র) এমন দুষ্কর্ম্ম ছিল না, যাহা এই দুই ব্রাহ্মণতনয় করিতে কুণ্ঠিত হইত। তাহারাও আকৃষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য পড়িলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, নানা জাতির ছোট বড়, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, এক হরিনামে মত্ত হইয়া এক ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন; ইঁহাদের সঙ্গে যবন হরিদাস আসিয়া এমন এক অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহা সে সময়ে কল্পনাতেও কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। হরিদাসের জন্মস্থান যশোহর জেলায় বনগাঁ মহকুমায় বুড়ন গ্রামে, তাঁহার পিতার নাম মলয়কাজি। হরিদাস বৈষ্ণবসমাজে ব্রাহ্মণের সমতুল্য আসন পাইয়াছিলেন, এবং বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে অন্য প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা আছে)

এখানে প্রাসঙ্গিকরূপে ভক্তিভাজন ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের অভিনয়ের উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পবিত্র গঙ্গাতীরে নবদ্বীপধামে হরিনামের মাহাত্ম্যে ও প্রভাবে যে এক মহা নাটক অভিনীত হইয়াছিল, আবার সেই ভাবে ৫০০ বৎসর পরে যুগের, কালের, সমাজের, দেশের ও জাতির শিক্ষা ও দীক্ষার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উনবিংশ শতাব্দীতে "এক ব্রহ্ম চিদানন্দ, এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই" "সেই একেরই সব লীলাখেলা, আর দ্বিতীয় নাই" এই ব্রহ্মপ্রেমে প্রমত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে উন্মত্ত একদল সুশিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ মিলিয়া পবিত্র গঙ্গাতীরস্থ মহানগরী কলিকাতাতেও সেইরূপ এক অপূর্ব্ব অভিনব নাটকের অভিনয় দেখাইয়াছেন, আজও দেখাইতেছেন। এই উভয়ের তুলনামূলক ঘটনা-পরম্পরা পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া, ইহার পরে দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, চিরজাগ্রত, চিরক্রিয়াশীল ও অসীম পরব্রহ্মকে লইয়া, "অরূপ চিন্ময় হরি, নহেন কভু দেহধারী" "এক হরি পরিত্রাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পাতা, নিত্য জাগ্রত বিশ্ববিধাতা, অপরূপ নিরাকার" এই নূতন কথা, নূতন ভাব প্রচার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া, বঙ্গভূমিতে ঐ সেই পুরাতন ভক্তিবিধানের স্ফুরণ ও নূতনতর ভক্তি প্রতিভাত হইয়াছে।

ক্রমশঃ আয়োজন ও উদ্যোগের পরে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১১ই মাঘ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্থাপনসময়ে সর্ব্বপ্রথম নগর সংকীর্ত্তনে ঘোষিত হইল :—

"তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন, পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ,
খুলে মুক্তিদ্বার সকলেরে করেন আহ্বান।
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী ধনী,
মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি,
সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।

তোরা আয়রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর ॥"

মুদ্রিত কাগজে এই সংকীর্ত্তনটি নগরের পথে পথে বিতরিত হইয়াছিল। এদিন বুধবার ছিল, শ্রদ্ধাস্পদ অসাধারণত্যাগী কর্ম্মঠ পুরুষ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আদিসমাজের উপাসনায় যেমন প্রতি বুধবার যোগদান করিতেন, তেমনি ভাবে এদিনও গিয়াছিলেন। উপাসনান্তে ফিরিবার সময়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামিতেছিলেন, কয়েকজন বাবু ঐ মুদ্রিত সংকীর্ত্তনের কাগজ হস্তে নামিতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয়! দেখছেন না, কেশবচন্দ্র সেন কি এক মহাব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন; এতগুলি ভদ্রলোকের ছেলে ইতর সাধারণের সহিত মিলিয়া খালি পায়ে, এই মুদ্রিত গানটি হাতে করিয়া, এই সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ দিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছে। খোলের বাজনা ও করতালের ধ্বনির সঙ্গে গায়কগণের কণ্ঠস্বর মিলিয়া কি যে এক অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর মাতাইয়া তুলিয়াছে।" শিবনাথ একখানি কাগজ চাহিয়া হাতে লইলেন, গ্যাসের আলোকে পড়িতে লাগিলেন, যখন পড়িলেন—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাতবিচার"। শিবন মহানন্দে নাচিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া ফেলিলেন যে, "তাইতো, আমার প্রাণ যা চায়, এত তাই; আমি এখনই সেখানে যাইতেছি।" এইবার শিবনাথ ধরা পড়িলেন। পরবর্ত্তী ভাদ্রোৎসবে উপবীত পরিত্যাগ করতঃ, অন্যান্য ২০ জনের সহিত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাড়িত বেগে এই সংকীর্ত্তনের সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল। শিক্ষিত লোক যে সংকীর্ত্তনকে এতদিন "নেড়ানেড়ীর" কাজ বলিয়াই ঘৃণা ও উপেক্ষার ভাবেই দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই কিনা আজ শত শত উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, কত ধনী মানিগণ, রাজপথে নগ্নপদে লজ্জা সরম পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে ও মহা উৎসাহে গাহিয়া ফিরিতেছেন! ইহা উনবিংশ শতাব্দীতে এক নূতন ব্যাপার! কেশবচন্দ্র মহা উৎসাহিত। আবার তাঁহারা অন্যদিন নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন :—
("আবার আবার সেই কামানগর্জ্জন")

"কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে,
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।
কর ব্রহ্মজয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্মকৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরে, প্রবেশ রণাঙ্গণে।
লোকভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি,
প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।
সাধিতে পিতার কাজ, পরহে সমর সাজ,
বাজাও বিজয় ভেরী, গভীর গরজনে।
নির্ম্মলবিবেক হয়ে, বল অকপট হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি দয়াল নামবিহনে ॥"

এই ভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করতঃ, যথাসময়ে অন্যদিনে সকলকে লইয়া গাহিতে গাহিতে চলিলেন :—

"করে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী,
চল যাই, ও সেই শান্তি-নিকেতনে।
সংসার-সংগ্রামে, কি আর ভয় এ জীবনে,
ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে।
তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম,
মত্ত হয়ে এ ব্রহ্মানন্দরসপানে ॥
প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে,
বিধাতার মঙ্গল বিধানে।
উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি,
প্রেমালোক দেখ প্রেমনয়নে ॥"

এই সংগ্রামক্ষেত্রে যাত্রার এ সংকীর্ত্তন তখন এ দেশের প্রায় প্রতি নগরে নগরেই ঘোষিত হইয়াছিল এবং ইহা দ্বারা যে উদ্দীপনা কলিকাতাতে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গ এদেশের সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত হইয়াছিল।

ভাই ভগিনী! ব্রাহ্মসমাজ কিসের জন্য কাহার সঙ্গে এদেশে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন? উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, যে ভারতভূমি সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জ্ঞানালোকে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছিল, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের ন্যায় যে ভারতভূমি হইতে ব্রহ্মাগ্নি উদ্গীরিত হইয়া সমস্ত জগৎকে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, সে ভারত অতি সুদীর্ঘকাল নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যে ভারত বেদগানে মুখরিত হইত, তাহা এখন নীরব, নিস্তব্ধ। প্রাচীন বাইবেল পর্য্যন্ত আজও সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া আসিতেছে যে, "জ্ঞান-স্রোত ও জনস্রোত পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছিল।" সেই ভারত আজ মৃতকল্প! ভারতের ঋষিই সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করতঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এ বিশ্ব কখনও কোন পরিচিত হস্তের রচিত নহে। এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, অসীম পুরুষই ইহার স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা।

বেদ জগতের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। আজও সেই পবিত্র ঋক্‌বেদ, অথর্ব্ববেদ ও উপনিষৎ সমূহ একস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, পরব্রহ্মই আদি সত্য, আদি কারণ, তিনিই প্রাণরূপে জগতে পরিব্যাপ্ত। ভারত তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছে। আজ ভারত নিজদের ঈশ্বর নিজেরাই নিয়ত প্রস্তুত করিতেছে। ভারত আজ "ঈশ্বরস্রষ্টা।" আজ ভারতকে সভ্যদেশ, সভ্যজাতি "God-making India" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে! ভারতই সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের একত্ব ঘোষণা করিয়াছিল, পর সময়ে সেই এক হইতেই তিন, ক্রমশঃ তিন হইতে তেত্রিশ, ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে

তেত্রিশকোটি দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে; তবু আজও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। ইহার প্রতিফলও ভারত যুগ যুগান্ত হইতে পাইয়া আসিতেছে। শতবর্ষ অতীত হইল, ব্রাহ্মসমাজের পিতামহ অসাধারণ জ্ঞানী, রাজা রামমোহন রায় এ দুর্গতি দেখিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। তিনিই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলিয়া উঠিলেন, "হায়! তোমরা কি করিতেছ? এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা, এক অদ্বিতীয়, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার, নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম। তোমরা বহুর পরিবর্ত্তে সেই একেকেই ভাব, যিনি জলে স্থলে শূন্যে সমান ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার কথাগুলি তখন চমকপ্রদ হইলেও লোকে ইহার প্রতি কর্ণপাত করিলনা। তাঁহার পরে আসিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি এই নবযুগে ভারতের ঐ সেই প্রাচীন ঋক্‌বেদীয় ঋষিরই যেন আত্মজ! তিনিও গভীর নিশীথে আকাশপানে দৃষ্টিগত করতঃ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন, এবং ঘোষণা করিলেন ঠিক সেইভাবে, যে ভাবে ঋগ্‌বেদের প্রাচীন ঋষি ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে ভাবে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এ সুদৃশ্য জগৎ কখনও কোন পরিমিত হস্তের বিরচিত নহে। এক অদ্বিতীয়, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, অসীম পুরুষই ইহার স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা। সেই পরম পুরুষ আমাদিগের প্রতি আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন, তোমরা আত্মাতে সেই পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ কর।" শুধু ইহা ঘোষণা করিয়াই বিরত হইলেন না, কিন্তু জীবনেও সাধনা করতঃ দেখাইয়া গিয়াছেন। উপনিষদের ঋষি বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় সুস্পষ্টই দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়াছেন। 'ওঁ সত্যং' বলিবা মাত্র আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে এ যুগে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়া শুনিয়া কয়েকজন ব্যক্তি মাত্র আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কোরাণে লিখিত আছে, যে দিন মহাপুরুষ মহম্মদের পার্শ্বে আসিয়া মহাবীর ওমর দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই দিন হইতেই প্রকাশ্য ভাবে পৌত্তলিকতার দুর্গাভিমুখে সংগ্রাম ঘোষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজেও দেখিলাম, কেশবচন্দ্রের চারিপাশে দলে দলে সুশিক্ষিত যুবক-প্রৌঢ়-নির্ব্বিশেষে নানা জাতীয় নরনারীর সম্মিলন সংঘটিত হইলেই, ইঁহারা সকলে মিলিতভাবে সেই ভারতের চিরগৌরব, প্রাচীন উপনিষদের একেশ্বরবাদ প্রচার করতঃ, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানসম্পাদনার্থে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মই প্রাচীন একেশ্বরবাদ। মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্তও এদেশবাসীদিগকে শুধু বলিয়া নহে, লিখিয়াও গিয়াছেন, "প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে"। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করতঃ যাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন, প্রাচীন কালের ভগীরথের ন্যায় স্বজাতীয়দিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রয়াসে, ব্রাহ্মসমাজ হিমালয় হইতে ব্রহ্মস্রোত ভারতের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করাইতে যত্নপর হইলেন। ইঁহারা ভারতবাসীদিগকে শুনাইতে লাগিলেন, "সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে। আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে; জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে বিশ্বাস করে। অনন্ত গুণাধার, প্রশান্তমূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে; পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজগুণে, দীনহীন বলে দয়া করে। অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদি-কন্দরে; জ্ঞান-প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে ত্রিতাপ হরে

কেশবচন্দ্র ১৮৬৯ সনে বোম্বের প্রার্থনা-সমাজের সুপ্রশস্ত হলে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, "ভারত আবার এই ব্রহ্মনামে সঞ্জীবিত হইয়া, ঐ মুক্ত, সঞ্জীবিত ও স্বাধীন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত করমর্দ্দন করিবে, আবার তাঁহাদের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিতে থাকিবে। তাঁহাদের সহিতই একই উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইবে। এবং সেই একেশ্বরবাদ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াই, ভারতের কায়িক, মানসিক, আত্মিক ও আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে।" তাঁহার এই ঘোষণার পূর্ণতাসাধনের নিমিত্তই ব্রাহ্মসমাজ দৃঢ়সংকল্প। এই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৌত্তলিকতা, নরপূজা, অবতারবাদ, অভ্রান্ত মহাপুরুষবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ, পৌরোহিত্যবাদ, মধ্যবর্ত্তিবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত স্বর্গবাদ, নরকবাদ, শমনবাদ, সয়তানবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের সমাজক্ষেত্রে নানাভাবে বিভক্ত নানা সম্প্রদায়ের ও নানা জাতীয়তা বিলোপ সাধন দ্বারা, সকলকেই এক মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া, জাতিভেদের বিলোপ সাধন করিতে কৃতসংকল্প। এজন্য যাহা যাহা এ কার্য্যসাধনের প্রতিকূল হইয়া প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিতেছে, তত্তাবতের বিলোপ সাধন করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'একটী কথা

(পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত-প্রচারক স্বর্গগত ভাই দুর্গানাথ রায়ের লিখিত—ভাদ্র, ১ম পক্ষ, ১৮০৫ শকের "বঙ্গবন্ধু" হইতে উদ্ধৃত)

সঙ্গীত অতি সুমিষ্ট সামগ্রী; স্বয়ং ভগবান্ ইহার ভিতরে অমৃতরস পুরিয়া রাখিয়াছেন। ঠাকুর আপনি সঙ্গীতের ভিতরে রসরাজরূপে রমণ করেন। ভক্তমাত্রই সঙ্গীতের সমাদর করেন। সকল কালে, সকল দেশের সাধু মহাজনগণই সঙ্গীত-যোগে ব্রহ্ম-যোগানন্দরস পান করিয়াছেন। যেখানে হরিভক্তি, সেখানেই সঙ্গীতের সুমিষ্ট ধ্বনি। ভক্তকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীত যেমন এক

দিকে আকাশ ভেদ করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করে, তেমনি ইহা হইতে নিম্নদিকে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হইয়া সন্তপ্ত ধরাকে সুশীতল করে। এমন সুখপূর্ণ মধুর সঙ্গীতরসপানে কাহার না লালসা হয়। বিশেষতঃ পৃথিবীতে যখন নববিধান সমাগত হয়, তখন সঙ্গীত নববেশে নব পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক নবরসে জন-চিত্ত বিনোদন করে। তখন আপামর সাধারণ সকলেই সঙ্গীত-যোগে বিভুগুণ কীর্ত্তন করে। এই জন্যই আমরা বিধানমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, বিধানভুক্ত প্রতি ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় ভাবে পরিচালিত হইয়া সঙ্গীত করিয়া থাকেন।

কিন্তু বলা বাহুল্য যে, অনেকের সঙ্গীতের সুর অথবা তাল, মান, লয় বোধ কিছু মাত্রই নাই। অথচ তাঁহারাও ভাব হইলেই যথেচ্ছা সুর পরিচালন করিয়া সঙ্গীত করিতে থাকেন। এইরূপ সঙ্গীত যিনি যখন করেন, তিনি অবশ্যই আপনার ভাবে কিছুটা চরিতার্থ হন। এইরূপে ব্যক্তিগত চরিতার্থতা এবং উপকারও হইতে পারে। কিন্তু যখন পাঁচজন বন্ধু মিলিত হইয়া সমবেত-ভাবে বিভুগুণ কীর্ত্তন করেন, যখন সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনায় বাদ্যযন্ত্রাদির সহিত সুর তাল ঐক্য করিয়া সঙ্গীত করা হয়, তখনও যদি যার যার ভাবে এক একজন যথেচ্ছা সুর পরিচালনা করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করেন, তাহলে সঙ্গীতের মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হয়। এইরূপে যখন সমবেত সঙ্গীত সংকীর্ত্তনের জন্য সকলে মিলিত হন, তখন প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় অধিকার বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

এই বিষয়ে আমরা কয়েকটী সৎপরামর্শ দিতে চাই। (১) সকলেরই সঙ্গীতে যোগ দেওয়া আবশ্যক নহে। কাহারও কাহারও শ্রোতা হওয়াও আবশ্যক। বস্তুতঃ ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত যিনি সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তাঁহার দ্বারাও সঙ্গীত বিলক্ষণ মধুর ও জমাট হইয়া থাকে। ইহা কাল্পনিক কথা নহে, আমরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ভক্তিমান শ্রোতার নিকট বসিলে সঙ্গীত আশাতীতরূপে সুমিষ্ট ও ভক্তিরসোদ্দীপক হইয়া উঠে। সুতরাং যাঁহারা অন্যের সুরে সুর মিলাইতে অক্ষম, তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তিযোগে সঙ্গীত শ্রবণ করাতেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হয়।

(২) যাঁহাদের স্বর আছে, গান করিবার শক্তি আছে, রাগ রাগিণী বোধ আছে, তাঁহাদেরও যথেচ্ছা গান করা কর্ত্তব্য নহে। দলস্থ কোন্ ব্যক্তি ভগবান কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সংগীত-যোগে সকলের সেবা করিতে মনোনীত, তাহা বুঝিয়া সেই ব্যক্তির অনুগত থাকিয়া, তাঁহার অধীন থাকিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংগীত করিতে হইবে। সংগীত আরম্ভ হইলে যখন ভাব হইল গান করিলাম, যখন ভাব শুকাইল তখন পরিত্যাগ করিলাম, অথবা ক্রমতঃ গান ধরিলাম, যতক্ষণ না আপনার মন ভাবরসে পূর্ণ হইল, ততক্ষণ গান করিলাম, এরূপ করিলে বড় অন্যায় হয়।

(৩) যিনি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন, তাঁহার সেই যন্ত্রটি অতি যত্নে রক্ষা করা আবশ্যক। সেই যন্ত্র বাদ্য সম্বন্ধে যতদূর উন্নতি-লাভ সম্ভব, ততদূর উন্নতি লাভ করিতে যত্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ যিনি মৃদঙ্গ বাজাইয়া থাকেন, মৃদঙ্গবাদ্যে পরিপক্কতা লাভ করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বপযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে করতাল, মন্দিরা, একতারা প্রভৃতি যিনি যাহা ব্যবহার করেন, তিনি সেই যন্ত্রটি এমন ভাবে ব্যবহার করিবেন, যদ্দ্বারা সত্য সত্যই সংগীতের ভিতরে মধুর ভক্তিরসের স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে।

(৪) সংগীতকারী প্রতি ব্যক্তিরই এই কয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন কণ্ঠের স্বর, বাদ্যযন্ত্রের সুর এবং তাল ইহার একটি যেন অন্যটিকে অতিক্রম না করে; কিন্তু সকলেই সমভাবে সুপারিপাটিরূপে এক মাত্রায় চলিতে থাকে। তাহা হইলেই সংগীতের উদ্দেশ্য সফল হয়।

হৃদয়, মন, প্রাণ, ইচ্ছা সমুদায়কে সবলে আকর্ষণপূর্ব্বক হরিপাদপদ্মে অর্পণ করাই সংগীতের কার্য্য। তালমানসঙ্গত মধুর সমবেত তানযুক্ত ব্রহ্মসঙ্গীতই তাদৃশ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম। কিন্তু যে সংগীতে সেরূপ সমতান না থাকে, তদ্দ্বারা মন ব্রহ্মেতে আকৃষ্ট না হইয়া বরং সেই দেবপদভ্রষ্ট হইয়াই পড়ে।

অতএব বিনীতভাবে আমাদের নিবেদন এই, যাঁহারা নব-বিধানমণ্ডলীতে সংগীতাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কে সংগীতের কোন বিভাগে ব্যবহৃত হইবার জন্য স্বর্গের মনোনীত, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া লউন। তাঁহাদিগের দলের মধ্যে কে সংগীতের অগ্রণীরূপে ব্যবহৃত হইতে প্রেরিত, তাহাও নিঃসংশয়-রূপে অবগত হউন। এইরূপে আপনার এবং অপরের ব্রত পরিজ্ঞাত হইয়া, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরিকে আসরে বর্ত্তমান দেখিয়া সংগীত করিলে, নিশ্চয়ই সহজে দেবভোগ্য অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু একথা সকলেরই স্মরণ থাকা প্রয়োজন—যেখানে একতা, মিলন, সেখানেই স্বর্গ। যেখানে অনৈক্য, বৈষম্য, সেখানেই নরকের অন্ধকার। তবে সংগীতের একতা হইলেই সকল সময় স্বর্গলাভ হয়, এমন বলা যায় না। কেননা শুদ্ধ ভক্তিই সংগীতের প্রাণ। কিন্তু সংগীতের গোলযোগে নিশ্চয়ই স্বর্গের বিরুদ্ধভাব প্রকাশিত হয়। আশা করি, আমাদের পাঠকগণ এবিষয়ে প্রার্থনাশীল ভাবে ঠিক হইয়া চলিতে মনোযোগী হইবেন।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৯ই জুন, ভারতেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

পুরীর-সংবাদ—গত ২৯শে মে, পুরীর নবশ্রীক্ষেত্রস্থ প্রেমাশ্রমে নবদেবালয়ে প্রাতঃকালে উপাসনাকালে, শ্রীকেশবানুজ শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে উপাসনা ও প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় সামাজিক উপাসনাতেও পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। ৩১শে মে, ভাই প্রিয়নাথের কন্যা শ্রীমতী সুনীতির শিশু কন্যা অনুমণির সাম্বৎসরিক দিন-স্মরণেও উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ এই দুইদিন উপাসনা করেন। ৫ই জুন, সামাজিক উপাসনায় অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন "নববিধানের সহজ সাধন" বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪নং তারক চাটুর্জ্জির লেনে, কুমারী সরলা ভড়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী উপাসনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কন্যা সরলা দাতব্যাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dspensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandar Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ১২শ সংখ্যা।
১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
1st. July, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, আদিযুগে আমাদের আর্য্য ঋষিগণ তোমাকে কেবল নিরাকার সত্তারূপে উপলব্ধি করেন। মধ্যযুগে তোমাকে নিরাকার ব্যক্তিরূপে পূজা করেন। বর্ত্তমান যুগে তুমি সেই নিরাকার নিরাকার থাকিয়াও, চিন্ময়ী মা হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। তুমি আদ্যাশক্তি হইয়াও, ব্যক্তিরূপে তুমি যে বর্ত্তমান ; তাই তুমি স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়া এই বিশ্ব সৃজন করিলে, মানবসন্তান প্রসব করিলে। এই মানবকে তুমি তোমারি প্রকৃতিতে, তোমারই প্রতিকৃতিরূপে গঠন করিলে। তোমাকে কেবল সত্তারূপে যাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, তাঁহারা তোমাকে কেবল নির্গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট তুমি ব্যক্তিরূপে, মাতৃরূপে প্রকট হইলে, তাঁহারা তোমাকে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল গুণময়রূপে না দেখিয়া আর পারিলেন না। তোমাকে ব্যক্তিরূপে পূজা করিবার জন্যই তুমি মানবসন্তান প্রসব করিয়াছ এবং তোমারই গুণে, তোমারই সত্তায় তাহাকে ভূষিত করিলে। তাই তোমার মানবসন্তান বলিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে।" বাস্তবিক তোমাকে দেখাইবার জন্যই তুমি মানবজন্ম দান করিয়াছ। যুগে যুগে তোমার এক এক মানবসন্তান, এক এক প্রকৃতির আদর্শজীবন প্রদর্শন করিলেন। তোমার এক এক স্বরূপে এক এক জনকে বিশেষভাবে তুমি গঠন দান করিয়াছ। তাই কেহ তোমার সত্য-স্বরূপে সত্যবান্, কেহ জ্ঞানস্বরূপে জ্ঞানবান, কেহ অনন্তস্বরূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, কেহ প্রেমস্বরূপে প্রেমাধার, কেহ অদ্বৈতস্বরূপে অদ্বৈত, কেহ পুণ্য-স্বরূপে পবিত্র, কেহ আনন্দস্বরূপে আনন্দরূপে আত্মপরিচয় দিলেন। এবং মানবশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-রূপেও কেহ জ্ঞানে মস্তিষ্ক, চক্ষুরূপে দ্রষ্টা, কর্ণরূপে শ্রোতা, রসনারূপে বক্তা, হস্তরূপে কর্ম্মী ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইলেন। বর্ত্তমান যুগে এই সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন পূর্ণ মানবসমাধানে তুমি এক অখণ্ড মানবরূপে যাঁহাকে জন্ম দান করিলে, তাঁহাকে তুমি নববিধান-প্রবর্ত্তকরূপে শ্রীকেশবচন্দ্র নামে অভিহিত করিয়াছ। এই কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞ-সমাধানের জন্য তুমি যে আয়োজন করিতেছ, তজ্জন্য তোমাকে আমরা অবনতমস্তকে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করি। কেশবচন্দ্রের নিকট তুমি মাতৃরূপে প্রকট হইয়া, স্বয়ং তাঁহাকে বিশ্বমানবরূপে গঠিত করিয়াছে, ইহাই তো তিনি স্বীকার করিলেন। সকল মানুষ যে এক

অখণ্ড মানুষ, ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া, আপনার স্বতন্ত্র আমিত্ব তোমাতে এবং মানবত্বে বিসর্জ্জন দিলেন। তাই তাঁহার জীবন, তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাবস্থাপন্ন মানবের সহিত সমযোগে যুক্ত। একদিকে তিনি যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবতারদিগকে আত্মস্থ করিলেন, তেমনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের, সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত সমযোগে যোগী হইলেন। তাই হিন্দুর সহিত হিন্দু, খ্রীষ্টানের সহিত খৃষ্টান, মুসলমানের সহিত মুসলমান, বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণব, বালকের সহিত বালক, নারীর সহিত নারী, বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধ, যুবার সহিত যুবা এবং একাধারে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ হইলেন। অস্বাভাবিকতা, অলৌকিকতা পরিহার করিয়া, স্বাভাবিক সরল সহজ ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সর্ব্বশ্রেণীর, সকল ধর্ম্মের, সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মানবের সঙ্গে আমরা সমযোগে, শ্রীকেশবের শততম জন্মোৎসব-সাধনায় ধন্য হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন শুভাশীর্ব্বাদ দান কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইয়া নববিধানে জয়লাভ

শ্রীকেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরাদেশে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে উপবীতধারী ব্রাহ্মণগণই উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদাভিষেকে তাঁহারা শতই ঈর্ষান্বিত হইলেন। শ্রীকেশবের আত্মা নিত্য উন্নতিশীল, ব্রাহ্মসমাজের নিত্য নব নব উন্নতিবিধানের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। ব্রাহ্মসমাজ নব নব সংস্কার-প্রবর্ত্তনে নিত্য উদ্যুক্ত। জাতিভেদনিবারণ, ব্রাহ্মণগণের জাতীয় উপবীতচিহ্নত্যাগ ইত্যাদি সামাজিক সংস্কার করিতে যখন প্রবৃত্ত হইলেন, রক্ষণশীল দল তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। যদিও ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মপ্রাণতায় একেবারে মুগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি রক্ষণশীল দলকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কেশবচন্দ্রের বাড়াবাড়ি সহিতে পারিলেন না। কাজেই কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইতে হইল। কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজরূপে ব্রাহ্মসমাজকে প্রসারিত করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মোদ্যম, কার্য্যোদ্যম, সংস্কারোদ্যম, সাধনোদ্যম শতধা বর্দ্ধিত হইল। যদিও মহর্ষির সহিত কেশবচন্দ্রের বাহ্যতঃ বিচ্ছেদ হইল, কিন্তু মহর্ষি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, "শ্রীকেশবচন্দ্রের আর নাগাল পাই না। আমরা এক এদেশীয় ঋষিদিগের ভাবগ্রহণে মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু কেশবচন্দ্র এদেশীয় ঋষিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন এবং আরব দেশীয় মহামনীষীদের সঙ্গে সমন্বয়সাধনে উন্মত্ত হইয়াছেন।" তাঁহার আত্মজীবনীতেও স্বীকার করিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের আমল। কেশবের আমল আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীকেশব তাড়িত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-গঠনে শ্রীকেশব জয়লাভ করিলেন। আবার যখন শ্রীকেশব বাহিরের কার্য্যসংস্কার অপেক্ষা অন্তরের গভীর যোগ ভক্তির উন্মত্ততায় উন্মত্ত হইলেন, যখন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং আদেশবাণী শ্রবণে সঞ্জীবিত হইলেন, তখন যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের বেদী-চ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময়ে কুচবিহারের বিবাহ-ঘটনা তাঁহার জীবনে এক অলৌকিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিল। এই বিবাহঘটনা লইয়া তাঁহার বিরোধিগণ কতই তাঁহাকে নিন্দিত এবং কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহার ভিতরে বিধাতার অনির্ব্বচনীয় লীলা অনুধাবন করিলে অবাক হইতে হয়। সকল প্রকার মনের সংস্কারবিবর্জ্জিত হইয়া যদি ইহার ভিতর বিধাতার লীলা আমরা অধ্যয়ন করি, আশ্চর্য্য হইয়া যাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রথম হইতে বিধাতার বিধানবিশ্বাসী। যখন বিবাহ আইন লিপিবদ্ধ হয়, শ্রীকেশবচন্দ্র প্রস্তাব করেন, প্রকৃতির ইঙ্গিতই বিবাহের বয়সের ঈশ্বরের ইঙ্গিত; কিন্তু পার্থিব আইন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বয়সের নির্দ্ধারণ করিতে হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাই বয়স নির্দ্ধারণ হয়। শ্রীকেশবচন্দ্রের অন্তরের আলোক তাহাতে সায় না দিলেও, তিনি আইন করিবার জন্য বয়সের নির্দ্ধারণে সায় দেন। শ্রীকেশবচন্দ্র তাই কুচবিহারবিবাহের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইলেন। তিনি যে বাগ্‌দানে সম্মতি দেন, তাহা যে ঈশ্বরাদেশে, ইহা অভ্রান্ত সত্য। তিনি ধর্ম্মতঃ প্রকৃতির ইঙ্গিতকেই ঈশ্বর-

নির্দ্দিষ্ট বয়স বলিয়া চিরদিন বিশ্বাসী ; কিন্তু যদিও তিনি বাগ্‌দানে সম্মতি দেন, আইন বজায় রাখিবার জন্য, যতদিন না রাজা রাণী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদিগকে স্বামী স্ত্রী রূপে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে দেন নাই। সুতরাং ঈশ্বরের ইঙ্গিত এবং রাজবিধি উভয়েরই সম্মান তিনি রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে ধর্ম্ম এবং সামাজিক অনুষ্ঠানসাধনে সমন্বয়বিধানে, তিনি পরিণামে সর্ব্বসমন্বয় নববিধানলাভে ধন্য হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি হইতে তিনি তাড়িত এবং মুক্ত হইতে না পারিলে, হয় তো এত সহজে নববিধানের অভিব্যক্তি হইত কি না, জানিনা। তাই ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ভাঙ্গিয়া ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে প্রসারিত করিয়া, মানবসমাজকে সমুন্নত করিবার জন্য, অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বভৌমিক, অনন্ত উন্নতিশীল নববিধানলাভে কেশবচন্দ্র বিজয়ী হইলেন।

আশাচন্দ্র কেশবচন্দ্র ঈশ্বরাদেশে কুচবিহারে "সুনীতির সহিত সুনীতি, আলোক এবং পরিত্রাণ প্রবেশ করিবে" এবং নববিধানের নব ইস্রায়েল রচিত হইবে, এই আশাতেই কুচবিহার বিবাহ দান করেন। হিন্দুরাজ্যে জাতিভেদনিবারণ, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তন, বহুবিবাহকারী রাজবংশে এক পত্নী গ্রহণ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং নানাপ্রকার রাজ্যসংস্কার বিধান কি কেশবচন্দ্রের অন্যতম জয়লাভ নয়?

ধর্ম্মতত্ত্ব

দলবল

দলেই বল। নববিধান সদল অখণ্ড, তাই এ বিধানসাধন দলবল বিনা হয় না। তৃণও যদি পাঁচটি একত্র হয়, তাহা সহজে ছিন্ন হয় না। যদি হিংস্রপশুসঙ্কুল পথে যাইতে হয়, দলে বলে যাইলে নিরাপদ। তাই সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য যে নববিধান, তাহাতে সদল সাধনের বিধান বিহিত। এইজন্য পবিত্রাত্মার বিধান নববিধানের প্রবর্ত্তককে সদল অখণ্ডরূপে মূর্ত্তিমান করিয়া ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "যে সদল অখণ্ড, তাহাকে কি কেহ বিদল করিতে পারে?" "Behind the visibe I, there is an invisible we. Like an editor, I am always we."—"এই দৃশ্যমান আমির পশ্চাতে অদৃশ্য আমরা। সম্পাদকের ন্যায় আমি সর্ব্বদাই আমরা।" যদি আমরা নববিধান সাধন করিতে চাই, আমাদিগকেও বিশ্বাস-যোগে আমরা হইতে হইবে। এবং তাহা হইতে হইলে, যিনি আমাদের মধ্যে "আমরা" রূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন, তাঁহার সহিত কায়মনোবাক্যে অধ্যাত্মযোগে যাহাতে আমরা এক হইতে পারি এবং সর্ব্বদা দলে বলে বলীয়ান হই, ইহাই সাধন করিতে হইবে। দলবল বিনা আমরা নববিধান-সাধনে কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না, এবং সংগ্রামেও জয়লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

চক্ষের দৃষ্টি

বিধাতা আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন, আমরা যাহা চক্ষে দেখিব, তাহার ভিতর তাঁহাকে দেখিব, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা চক্ষু পাইয়া দৃশ্যমান জগতে কেবল জড় প্রকৃতি দেখি, এবং বিভিন্ন বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া কতই অবিচার করি, আপন পর সুন্দর কদাকার বিচার করি বা মায়ার মোহে মুগ্ধ হই। সেই জন্য উপাসনা সাধন বা ঈশ্বরের দর্শন ধ্যান চিন্তা করিতে হইলে, আমরা বাহিরের চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধকার বা নিরাকার দেখিতে প্রয়াসী হই। চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরদর্শনে সিদ্ধিলাভ করিলে, তবে আমরা চক্ষু খুলিয়া ঈশ্বরদর্শনের সাধনে সক্ষম হইতে শিখি। এইজন্যই বৃদ্ধবয়সে বুঝি বিধাতা বাহ্য চক্ষের দৃষ্টি হরিয়া লয়েন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা বাহ্যদৃষ্টিহীন হইলেও, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বময় ঈশ্বরের জীবন্ত দর্শন লাভ করেন।

ব্রহ্ম-অনুভূতি

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আসন্নপ্রায়। যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, এই উপলক্ষে "উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব" সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। উপনিষদের সাধনপথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, কেশবচন্দ্রের রচনাবলী হইতে সাহায্য ব্যতিরেকে লেখকের পক্ষে এই কার্য্য সম্ভবপর নহে বলিয়া, তাঁহার সহায়তা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে। ফলতঃ তাহাতে উপনিষদের সাধনপথ বোঝা যাইবে ও কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও বেশী করিয়া জানা যাইবে। উপনিষদের ধর্ম্ম ও কেশবের ধর্ম্মজীবন জগতের কোন প্রকার সাধনধারার প্রতিকূল নহে, বরং অনুকূল বলিয়াই জানিয়াছি ও সেই কারণে এইরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের সাধকবৃন্দের উল্লেখ আসিয়া পড়িবে। এই গুরুতর কার্য্যে সমস্ত ধর্ম্মবিধানের যিনি জননী, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের কবি, সাধক ও দার্শনিকগণ উপনিষদ হইতে জীবনের যাহা কিছু সত্য, সুন্দর ও মধুময়, তাহা আহরণ করিয়া জগৎকে উপহার দিতেছেন। উপনিষদ সকল প্রকার মনুষ্যের আনন্দের খনি। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে উপনিষদে প্রবর্ত্তিত কেবলমাত্র সাধনপথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই।

সেইজন্য সেকালের তপোবনে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সে যুগের সাধনপথগুলি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সকল মনুষ্যের উপকারে লাগিবে, এই আমাদের বিশ্বাস। জগৎ উন্নতিশীল; সেইজন্য যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উন্নতির মধ্যে আমরা বর্ত্তমান সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সে সমস্তই অনুকূল হইবে। কিংবা যদি কোন প্রকারে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়, সে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার সদ্‌বুদ্ধি ও সাহস মানুষ যে রাখে, তাহা বলা বাহুল্য। অতীতের মধ্যে যাহা কিছু চিরন্তন, তাহা দ্বারা বর্ত্তমানকে পুষ্ট করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া, জাতীয় জীবনে ও সাধকবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক।

উপনিষদের ঋষিগণের আশ্রমে ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীদিগের জীবনের ধারা অনুধাবন করিব। যাঁহারা কেবল মন্ত্র বা অনুষ্ঠানের সমন্বয়কার্য্যে আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের জীবনকথা আমরা স্মরণ করিতে চাহি না। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ্ডারী বলিয়া পরবর্ত্তী কালে বিবেচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে জানিব। উদাহরণস্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবৃত ব্রহ্মচারী সত্যকামের জীবনকাহিনী সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ করিতে চাই।

কিশোর বয়সেই সত্যকাম আপন মাতাকে জানাইল যে, সে গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচারী হইবে। চিরদুঃখিনী ও অনাথিনী হইলেও, মাতা জবালা প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। গুরুগৃহে প্রবেশের সময় ছাত্রকে আপন বংশপরিচয় দিতে হইত। সত্যকাম নিজ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, গুরু গোত্র পরিচয় চাহিলে সে কি উত্তর দিবে। জননীর সে উত্তর উপনিষদে বিবৃত আছে। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় তাহা এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত!"

সত্যকাম গৌতম ঋষির তপোবনে গিয়া তাহাই জানাইল। গৌতমের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন :—

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি—বালকেরে করি আলিঙ্গন।
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

সত্যকামকে ঋষিপ্রবর উপনয়ন দিয়া সন্ধ্যাবন্দনার শিক্ষা দিলেন ও চারিশত কৃশকায় গাভীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। সত্যকাম জানাইল যে, যতদিন না গাভীর সংখ্যা এক সহস্রে পরিণত না হইবে, ততদিন সে আশ্রমে ফিরিবে না। এবং ইহার পরে কয়েক বৎসর বনান্তরে যাপন করিল। তথায় সত্যকাম পশু পক্ষী অগ্নি প্রভৃতির নিকট হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধে যে গভীরতত্ত্ব জানিলেন, তাহা উপনিষদে বর্ণিত আছে। পরিশেষে সময় আসিলে পর, তিনি গৌতমের আশ্রমে ফিরিলেন। গৌতম তাঁহার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্রহ্ম-অনুভূতি হইয়াছে ও সেই কারণে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার নিকট হইতে অনুশাসন গ্রহণ করিলে?" সত্যকাম বলিলেন, "কোন মনুষ্যের কাছে নয়। আমি ত কেবলমাত্র আপনার কাছেই শিক্ষালাভের অভিলাষ রাখি। লোকমুখে শুনিয়াছি যে, আচার্য্যের নিকট যে বিদ্যালাভ হয়, তাহাই মঙ্গলপ্রদ।" তখন সত্যকাম যে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে জানাইলেন ও গৌতম ঋষি সেই সেই বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিলেন। সত্যকামের ব্রহ্মানুভূতি ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইল।

উপনিষদ হইতে সত্যকামের কাহিনী যেরূপ পাইয়াছি, তাহাই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবৃত করিলাম। এক্ষণে এই জীবনবৃত্তান্ত হইতে ব্রহ্মসাধনার পথসম্বন্ধে আমি যাহা নিজ মনে জানিয়াছি, তাহা বলিতে চাই। সত্যকাম পিতৃস্নেহে বঞ্চিত; কাজেই নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে পিতার নিকট সে কোন শিক্ষা পায় নাই। মাতা জবালার নিকট হইতে সে অবশ্য মাতৃ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল ও সত্যপরায়ণতা শিক্ষা করিয়াছিল এবং জগতে ইহার বেশী কোন জননীই আপন সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারেন না। গুরুগৃহে যাইবার পূর্ব্বেই সত্যকামের হৃদয়ে তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যপালনের ইচ্ছা যে প্রবল হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। গুরু সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা দিলেন। শিল্পী যেমন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মসঙ্গীতের ভিতর দিয়া, চিত্রময় অরণ্যতীর্থে, সত্যকাম এইবার একাকী ব্রহ্মানুভূতিতে মগ্ন হইলেন। সত্যকামকে পথ বলিবার কোন আত্মীয় বন্ধু নাই, কোন পুস্তক নাই, কোন অবলম্বন নাই। অথচ তিনি ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ করিলেন। পশু পক্ষী, আকাশ বাতাস তাঁহার অন্তরের আকুলতায় সাড়া দিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার "সত্যযুগের সরলতা" শীর্ষক উপদেশে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। তিনি বলিতেছেন :—"ইহাই বাস্তবিক কবিত্বের সময়, এই সময় তাঁহাদিগের নিকট জগৎ নূতন, এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। কি বৃক্ষ, কি স্রোতস্বতী, কি পক্ষী, কি সমীরণের মধুর হিল্লোল, প্রত্যেকেই উপদেষ্টার ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মকৃপার পরিচয় দেয়।" (আচার্য্যের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড) ফলতঃ সত্যকামের হৃদয় ব্রহ্মসহবাসে পুণ্যময় হইল। তাঁহার অভিজ্ঞতা শাশ্বত জীবনের পাথেয়স্বরূপ সঞ্চিত হইলে পর, তিনি আবার গুরুগৃহে ফিরিলেন ও যাহা অনুভব করিয়াছিলেন সে স্থানে, তাহারই পুনরাবৃত্তি গুরুর নিকট শ্রবণ করিলেন।

এই আখ্যান হইতে সাধনপথ সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে চাই :—

(১) জগতে প্রত্যেক মনুষ্যই ব্রহ্মকৃপা অনুসারে ব্রহ্মা-

নুভূতি পাইবার অধিকারী। জাতিকুল অথবা ধনমান ব্রহ্মা-নুভূতির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

(২) যিনি জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সমস্ত অভাব মিটাইতেছেন, তাঁহাকে জানাইলে পর তাঁহাকেই গুরু করিয়া, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া জীবের যে অনুভূতি জন্মায়, তাহাকে ব্রহ্ম অনুভূতি বলে।

(৩) ব্রহ্ম-অনুভূতির জন্য সাধকের কিছুই আবশ্যক নাই। তবে বয়সোচিত চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যার প্রয়োজন হইবে।

(৪) ব্রহ্ম-অনুভূতি লাভ হইলে পর, জগতের আচার্য্যদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে অনুমোদন অর্থাৎ verfication পাওয়া যায়।

উপনিষদগুলি হইতে অন্বেষণ করিলে পর সত্যকামের মত দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম। দেশবিদেশের ধর্ম্ম-ইতিহাসে ব্রহ্মসাধনার এইরূপ পথেরই পরিচয় আমরা পাই। উদাহরণস্বরূপ আমরা খ্রীষ্টের ধর্ম্মজীবন স্মরণ করিতে চাই।

একদিকে আমাদের দেশের জবালার পুত্র সত্যকাম ও অপর দিকে ইহুদী দেশীয় মেরীতনয় যীশুর জীবনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পাই। অথচ পার্থক্যও বিদ্যমান। যীশু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই মেরী জানিলেন যে, ঈশ্বরতনয় তাঁহার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিশু যীশু জন্মাইবার পর প্রাচ্যদেশের ঋষিগণ সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদসূচক অভি-নন্দন জানাইয়াছিলেন। বালক যীশুর ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া, তৎকালীন শাস্ত্রবিশারদগণ অবাক হইয়াছিলেন। এ সকল ঘটনা দ্বারা যীশু কিন্তু কোন কালেই বিচলিত হন নাই। বরং সর্ব্বমানবের অধিকারসূত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তিনি জীবনের সার জানিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "Blessd are the poor in spirit : for their's is the kingdom of heaven।" সেইজন্য সাহসপূর্ব্বক সরলহৃদয়ে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, সত্যকাম ও যীশু দুইজনই গোত্রহিসাবে ব্রহ্মসাধক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কত বৎসর লোকালয় হইতে দূরে তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যপালনে ব্যাপৃত ছিলেন। দুইজনই ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মসাধনের আদর্শ শিষ্যদিগের নিকট আপন জীবন দ্বারা প্রচার করিতে ব্যস্ত। সত্যকাম যেমন নিজ ছাত্র উপকোশলকে কোন মন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন না, যতক্ষণ না উপকোশল স্বীয় জীবনে ব্রহ্ম-অনুভূতি লাভ করিলেন, সেইরূপ খৃষ্টও নিজজীবনে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও, আপন শিষ্যত্বে কয়েকটী মাত্র ব্রহ্ম-সাধককে বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সত্যই ব্রহ্ম-অনুভূতির দ্বারা পূর্ব্ব হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃত অনুরাগী হইতে পারিয়াছিলেন। সাধু পিটার ও অন্যান্য শিষ্যদের সহিত খৃষ্টের কথোপকথন বাইবেলে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"Now Jesus asked his disciples, saying, 'Whom do men say that the Son of man is ?' And they said, 'some say John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets.' He saith unto them, 'But whom say ye that I am ?' And Simon Pater answered and said "Thou art the Christ, the son of the living God.' And Jesus said unto him, 'Blessed art thou, Simon Barjonah : for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.'" (St. Matthew xvi 13-17)

খ্রীষ্টের এই শেষ উক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। খ্রীষ্ট নিজেও যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে নিজ জীবনের গতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আদেশলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার শিষ্য পিটারও সেইভাবে ঈশ্বর-প্রেরণা লাভ করিয়াই তাঁহার নিকট, তাঁহার কার্য্যের সহকারী হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাই বারবার বলিতে চাই যে, শুধু উপনিষদে কেন, খৃষ্টের বাণী অনুসারেও ধর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্রহ্মকৃপা ছাড়া হইতে পারে না; জগতের কোন আচার্য্য ইহা শিক্ষা দিতে পারেন না, তবে ব্রহ্ম-অনুভূতি লাভ হইলে পর, ধর্ম্মগুরুদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে অনুমোদনবার্ত্তা পাওয়া যায়।

সত্যকামের পর, যীশুর পর, ব্রহ্মজ্ঞানী সম্প্রদায়ের আলোচনা করিতে গিয়া, আমার কেশবচন্দ্রের কথা বার বার মনে আসে। তাঁহার নিজ ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে জানাইতে গিয়া জীবনবেদ গ্রন্থে কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, ধর্ম্মজীবনের উষাকালে কি পুস্তক পড়িতে হইবে, কি আলোচনা করিতে হইবে, কাহার কাছে যাইতে হইবে, কিছুই তিনি জানিতেন না। সে অবস্থায় তিনি শুধু প্রার্থনাই করিতেন ও নিজ মনে অনুভব করিতেন, প্রার্থনাই তাঁর "সবেধন নীলমণি"। এই অবস্থায় কেশব জানিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর।" (জীবনবেদ, প্রথম পরিচ্ছেদ) কেশব বলিতেছেন, "এইরূপ করিতাম, ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম। সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা।" যিনি "জাগ্রত জগদ্‌গুরু," তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিয়া ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করিলেও, কেশব জীবনবেদ গ্রন্থের শেষ দিকে "শিষ্যপ্রকৃতি" অধ্যায়ে জানাইতেছেন, "কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী গুরু, মৎস্য গুরু, সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি।........ প্রাণী মাত্রই আমার গুরু, বস্তুমাত্রই আমার শিক্ষক, মনুষ্য-প্রকৃতির নিকটেও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি। চক্ষু খুলিলে বিদ্যালয় দেখিতে পাই, চক্ষু বন্ধ করিলে আরও প্রকাণ্ড বিদ্যালয়।" তবেই বোঝা গেল, সত্যকাম ও যীশু যেভাবে ধর্ম্ম

অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কেশবও আধুনিক কালে সেই পথেই যাইয়া সুফল লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকৃপা যেমন সত্যযুগে ও পরবর্ত্তী কালে সাধকের সম্বল ছিল, কলিকালেও মনুষ্যের সেইরূপ চরম অবলম্বন।

কেশবচন্দ্র কিন্তু নিজ জীবনের বৃত্তান্ত ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-অনুভূতি যে সকল সময়েই কার্য্যকারী হইবে, তাহা বিশ্বাস করিতেন ও সর্ব্বকালের জন্য "প্রচারক কে" শীর্ষক উপদেশে যে ঐতিহাসিক বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। কেশব বলিতেছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রত বাহিরের উপদেশের অপেক্ষা করে না। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন ব্যক্তি কিংবা পুস্তকের ধর্ম্ম নহে। ইহা ব্রহ্ম-সংরচিত এবং তাঁহারই দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং ব্রাহ্ম প্রচারকগণ কোন মনুষ্যের নিকট শিক্ষা পান নাই, অথবা পৃথিবীর কেহই তাঁহাদিগকে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। ঈশ্বর তাঁহাদের গুরু, ঈশ্বর তাঁহাদের প্রবর্ত্তক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করেন।" (আচার্য্যের উপদেশ, তৃতীয় খণ্ড)

অতএব কেবলমাত্র ব্রহ্মসাধকের ব্যক্তিগত জীবন প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতিতে আবদ্ধ বলিলে চলিবে না। জগতের সকল ধর্ম্ম-সমাজের মণ্ডলীগত আধ্যাত্মিক জীবনের গতিবিধিও ব্রহ্মকৃপার উপর সকল সময়ে নির্ভর করিয়াছে ও করিবে। কোন মনুষ্য বা পুস্তকের উপর ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ও কেবল-মাত্র নিজ অনুভূতিই ধর্ম্মজীবনের পথস্বরূপ, ইহাই কি আমরা উপনিষদ হইতেও শিক্ষালাভ করি না?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ ব্যানার্জ্জি

—•—

আত্মনিবেদন

(৮ই এপ্রিল, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের নিবেদনের সারাংশ)

স্বর্গভোগের স্পৃহা মানবচরিত্রের একটী বিশেষত্ব। মৃত্যুর পরে, এই দেহের অবসানে স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায়, মানুষ ইহ জগতে কত কঠোর ব্রতপালন করেন, কত তীর্থ দর্শন, কত দেবদেবীর মন্দির দর্শন, কত যাগ, যজ্ঞ, হোম, কত পশুবধ, কত উপবাস, কত কঠোর দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন। শিক্ষা ও সভ্যতার স্তরভেদে, এ সমস্ত স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যে যেমন নানাবিধ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, স্বর্গভোগীর আদর্শের মধ্যেও তেমন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রিটিশ দ্বীপে এক শ্রেণীর লোকের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহারা মনে করিতেন, যুদ্ধ করা স্বর্গলাভের উপায় বিশেষ। যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে পারিলে, তাঁহারা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবেন এবং সেই স্থানে মদ্য পান করিয়া ও মাংস আহার করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিবেন। ভারতবর্ষেও সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির কিম্বদন্তি বিদ্যমান আছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও ধর্ম্মের জন্য সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে পারিলে, স্বর্গ-প্রাপ্তির বিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টানগণ স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য জেরুজেলাম তীর্থভ্রমণ, জর্ডন নদীর জলে অভিষেক এবং নানাবিধ ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন। এই সমস্তের ফলস্বরূপ পুনরুত্থানের দিনে যখন তাঁহা-দিগকে ঈশ্বরের নিকটে সমবেত করা হইবে, যিশু ঈশ্বরের নিকটে তাঁহাদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিবেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবেন। মুক্তিপ্রাপ্ত নরনারী স্বর্গে পরম সুখে বসবাস করিবেন, আর যে সমস্ত অবিশ্বাসী নরনারী যিশুকে বিশ্বাস করেননি। যিশু তাঁহাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবেন না। এ সমস্ত নরনারীর স্থান হইবে অনন্ত নরকে। এই নরক কি ভীষণ স্থান। সে স্থানে নরকের অগ্নিতে এ সমস্ত লোক দগ্ধ হইবে, যন্ত্রণা ভোগ করিবে, সেই নরকে বিষধর সর্পের দংশনে বিষাক্ত দেহে আর্ত্তনাদ করিবে, কিন্তু কেহই মরিবে না।

মুসলমানের স্বর্গ—মুসলমান সম্প্রদায়ও স্বর্গভোগের জন্য অতি কৃচ্ছ্র সাধন ও তীর্থ ভ্রমণ করেন। মক্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন, ত্রিশরোজা, কোর্বাণিতে গো মেষ প্রভৃতি জন্তুর জীবননাশ, এতদ্ভিন্ন কাফেরকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা, এবং ধর্ম্মের জন্য কাফেরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জীবনপাত করা পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বর্গে যাবার উপায় বিশেষ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই সংস্কারের জন্য তাঁহারা খৃষ্টানের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, হিন্দুদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। অনেক হিন্দুদেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছেন এবং অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভঙ্গ করিয়াছেন ও অনেক শাস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভীষ্ট স্বর্গ এক সুন্দর স্থান, সে স্থানে দুগ্ধের নদী প্রবাহিত, স্বর্গে গেলে তাঁহারা এই দুগ্ধের নদীতে অবগাহন করিবেন এবং সুন্দরী পরিদিগের সেবা প্রাপ্ত হইবেন। আরও নানাবিধ শারীরিক সুখ সুবিধা স্বর্গে প্রাপ্ত হইবেন। খৃষ্টানদিগের পুনরুত্থানের দিনের ন্যায়, মুসলমানদিগেরও আখেরির দিনে সকলেই কবর হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে সমবেত হইবেন, তাঁহাদের বিচার হইবে। ঈশ্বরের পার্শ্বে হজরত মহম্মদও উপবিষ্ট থাকিবেন। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী ব্রত নিয়ম পালন করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গে যাইবেন, আর যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা অনন্ত নরকে যাইবেন। খৃষ্টানদিগের নরকের ন্যায়, এই নরকও বিশেষ কষ্টকর স্থান।

আমাদের দেশেও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন তীর্থদর্শন, যেমন গয়া, কাশি, মথুরা, বৃন্দাবন, পশুপতিনাথ, চন্দ্রনাথ, পুষ্কর, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি; নানাবিধ পীঠস্থান, যেমন কামাখ্যা, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি; একাদশী ব্রত, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত, অষ্টমী স্নান, নিত্য গঙ্গাস্নান ইত্যাদি; শত শত তীর্থদর্শন, ব্রতপালন, কৃচ্ছ্রসাধন, নানাবিধ পূজা ও অগণন ছাগ, মহিষ প্রভৃতির জীবননাশ; গঙ্গাযাত্রা, অন্তর্জল, বৈতরণী প্রভৃতির অনুষ্ঠান। নেপালে অবস্থানকালে আমি দেখিয়াছিলাম যে, এক ধীরাজ ভিন্ন, মহারাজা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে এই দৈহিক মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গায় লইয়া যাইতে হয়, এবং নাভিদেশ পর্য্যন্ত বাগমতি, কি বিষ্ণুমতির জলে নিমজ্জন করিয়া রাখিতে হয়। যদি কোনও চিকিৎসকের ভুলে এই গঙ্গাযাত্রা না ঘটে, তাহা হইলে অনেক সময়ে চিকিৎসককে বিপদে পতিত হইতে হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে দেহের অবসান হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এই স্বর্গের শ্রীমন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ অবস্থান করেন। স্বর্গবাসিগণ নিত্য এই যুগলরূপ দর্শন করেন। স্বর্গেতে মন্দাকিনী নদী আছে, কল্পতরু আছে। এই কল্পতরুর নিকটে যেই ফল প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। এই স্বর্গে কামধেনু আছে। এই ধেনু নিত্য দুগ্ধবতী, যখনই দুগ্ধ চাওয়া যায়, এই ধেনু হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্বর্গেতে অপ্সরাবৃন্দ আছেন, নৃত্যগীতে তাঁহারা সর্ব্বদা স্বর্গবাসিগণের মনোরঞ্জন করেন ইত্যাদি বিবিধ সুখের স্থান স্বর্গ। যাঁহারা পৃথিবীতে যথানিয়মে ধর্ম্মকার্য্য করেননি, তাঁহারা নরকগামী হন। কিন্তু আমাদের এই দেশের নরক খৃষ্টান কিম্বা মুসলমানদিগের নরকের ন্যায় অনন্ত কালের জন্য নহে। আমাদের এই দেশে পাপানুযায়ী কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল নরকভোগের পর বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে। এই নরক-ভোগও হয়ত যমের দেশে নরককুণ্ডে অবস্থান। সেই নরককুণ্ডে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া, তপ্ত লৌহদণ্ডের দ্বারায় আঘাত, বিষাক্ত সর্পের দংশন প্রভৃতি নানাবিধ কঠোর শাস্তি; আবার বার বার পৃথিবীতে আগমন এবং এই স্থানে নানাবিধ, জীব, জন্তু, কীট, সরীসৃপের জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা-ভোগান্তে সর্ব্বশেষে নরক হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি। অনন্তকালের জন্য নরকভোগ আমাদের দেশের ভাবানুমোদিত নহে। পাপের শাস্তিভোগ এবং তৎপরে বৈকুণ্ঠলাভই এই দেশের ভাবানুমোদিত।

এই যে স্বর্গভোগের বিভিন্ন আদর্শ, তাহার মধ্যে একটি সত্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। সেই সত্য হচ্ছে, স্বর্গেতে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন। পৃথিবীর যত ধর্ম্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, এবং এই ভারতবর্ষের যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলেই স্বীকার করেন যে, স্বর্গেতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটিবে। ঈশ্বরের বিদ্যমানতা ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শন ভিন্ন স্বর্গের অস্তিত্ব বর্ণিত হয়নি। এই ঈশ্বর-দর্শন, তাঁহার বাণীশ্রবণ স্বর্গভোগের একটি বিশেষত্ব।

আবার নরকভোগের বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যেও একটি সত্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। খৃষ্টান ও মুসলমানের অনন্ত নরক-ভোগই হউক, আর ভারতীয় ধর্ম্মের যমপুরির নরকবাসের কঠোর শাস্তিই হউক এবং বার বার নরক-ভোগের জন্য পৃথিবীতে আসা যাওয়া হউক, এই বিভিন্নপ্রকারের নরকভোগের যন্ত্রণার মধ্যে একটি সত্য সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই অসাধারণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিলেও মানবের মৃত্যু হয় না। নরকের মধ্যে মানব অগ্নিতে দগ্ধ হউক, কিম্বা বিষাক্ত সর্প কর্ত্তৃক দংশিত, কি বার বার এই পৃথিবীতে আসা যাওয়া করুক, মানব মরে না, মানব অমরই থাকে। মানবের অমরত্ব সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

এই যে অমর মানব আমি, এই আমি কে? আমার সম্বন্ধে যদি আমার ধারণা স্থির হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গ কোথায়, তাহাও স্থির হইবে; সেই স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য, আমি কোন্ মন্দিরে বসিয়া উপাসনা করিব, মসজিদে যাব কি মন্দিরে যাইব, কোন্ শাস্ত্র পাঠ করিব, বেদপাঠ করিব, কি বাইবেল পাঠ করিব, কি কোরাণ পাঠ করিব, কি ললিতবিস্তর পাঠ করিব, কোন্ তীর্থ পর্য্যটন করিব, মক্কা যাইব, কি জেরুজেলামে যাইব, কি শ্রীবৃন্দাবন যাইব, কি বুদ্ধগয়ায় যাইব, আপনা হইতে স্থির হইবে।

আমিত্বের অনুভূতি হইতে এই অমর আমি জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। অর্থাৎ আমি, 'আমিই', আমি তুমি নহি, কিম্বা তিনি নহি। এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, উপগ্রহ, কিম্বা এই পৃথিবীর অগণন জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, তরু লতা, পশু পক্ষী, মানব এই সমস্তের অন্য কিছুই আমি নহি, অন্য কোনটাই আমি নহি, আমার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সর্ব্বদাই অনুভূত হয়। এর পরেই দেখা যায়, এই জড়দেহও আমি নহি। আমার চক্ষু, আমার কর্ণ, আমার নাসিকা, আমার হস্ত, পদ, আমার ফুস্ফুস, আমার হৃদ্‌যন্ত্র, এরূপ ভাষাই ব্যবহার করি; কখনও বলি না যে, এই চক্ষুই আমি, এই কর্ণই আমি, এই হস্ত পদই আমি। এ গুলি সমস্তই আমার, কিন্তু এর কোনটাই আমি নই। এগুলির এক একটি বিনষ্ট হইলেও আমিত্বের অনুভূতি থাকিয়া যায়।

এর পরের বিষয়টি হচ্ছে, এই যে আমার স্বতন্ত্র অনুভূতি, এই অনুভূতির বহির্বিকাশ হচ্ছে আমার এই সৃষ্টিকে অবগত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই সৃষ্টিকে তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাতে বিদ্যমান। আমার এই কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারায় অনুভূত দৃশ্যজগৎ, কিম্বা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতির সীমার বাহিরের তথাকথিত অদৃশ্য জগৎ, সমস্তই অবগত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে বিদ্যমান। আমি যে শুধু আছি, তাহা নয়, আমি জ্ঞান, আমি চৈতন্য। এই জ্ঞান ভিন্ন, চৈতন্য ভিন্ন আমার অস্তিত্ব থাকে না।

আমি জ্ঞান, আমি চৈতন্য। আমি জ্ঞান বলিয়া, আমি এই বিশ্বের সহিত পরিচিত হইতেছি। আমি জ্ঞান বলিয়া, আমি স্ত্রী পুত্রের সহিত পরিচিত হইতেছি, ধর্ম্মমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইতেছি, পশুপক্ষী, তরুলতা, কীট পতঙ্গের সহিত পরিচিত হইতেছি। যতই পরিচিত হইতেছি, ততই ইহাদের জন্য ভালবাসা জাগিতেছে। তাই শৈশবে মাতাকে, পিতাকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে ভালবাসিলাম, ক্রমে স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গকে ভালবাসিলাম, পশু পক্ষী, তরুলতাকে ভালবাসিতে প্রাণ ব্যাকুল হইল। দেখিতে পাইতেছি, এই ভালবাসা ভিন্ন আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। যেমন জ্ঞান ভিন্ন 'আমি'র অস্তিত্ব থাকেনা, তেমনি প্রেম ভিন্ন 'আমি'র অস্তিত্ব থাকে না। আমি যেমন জ্ঞান, আমি তেমন প্রেম। এই প্রেম আমার অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ। যেমন জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে আমার অস্তিত্ব থাকে না, প্রেমকে পরিত্যাগ করিলেও আমার অস্তিত্ব থাকে না।

প্রেমের মধ্যে লুক্কায়িত একটী অবস্থা আমার মধ্যে অনুভূত হয়। সেইটি হচ্ছে পবিত্রতা, শুদ্ধতা। নানা ভাষায় তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছে; কোথায়ও বলা হইয়াছে, নিষ্কাম প্রেম। অর্থাৎ আমি যে ভালবাসি, ইহার প্রতিদানে আমার কাম্য বিষয় কিছুই নাই। এই যে স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসা, এই যে মানবজাতিকে ভালবাসা, এই যে তরুলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গকে ভালবাসা, ইহার প্রতিদানে আমার কোনও কাম্য বিষয় নাই। ভালবাসাই আমি, প্রেমই আমি, এই আমার প্রকৃতি। যেমন জলের প্রকৃতি তৃষ্ণা দূর করা, যেমন আলোর প্রকৃতি আঁধার দূর করা, তেমনি আমার প্রকৃতি জগৎকে ভালবাসা, জগৎকে প্রেম করা। আমার প্রেমের স্রোত অন্যের সহানুভূতি কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হয় না, কিম্বা অন্যের ঘৃণা বা অবজ্ঞার দ্বারায় প্রতিহত হয় না। এই প্রেমই বিশুদ্ধ প্রেম। এই প্রেমই আমি।

বিশুদ্ধ প্রেম প্রাণে জাগ্রত হইলে, আমার স্বীয়রূপ আরও বিকশিত হয়। সেইরূপ হচ্ছে আনন্দ। আমি যে আছি, ইহার প্রমাণ যেমন জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, তেমনি আনন্দ আমার অস্তিত্বের আর এক প্রমাণ। এই আনন্দের বিকাশে যখন স্বীয় রূপ বিকশিত হয়, তখন শোক, তাপ, দুঃখ দৈন্য আমা হইতে দূরে অপসারিত হয়। তাই ঋষিরা বলিলেন যে, আনন্দ হইতে উৎপত্তি, এই আনন্দেই আমার স্থিতি, এবং এই আনন্দের দিকেই আমার গতি।

এই যে স্বর্গকামী অমর মানব, আমি দেহ নহি, রক্তমাংসও আমি নহি। এই যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এই সমস্তও আমি নহি। কাজেই আমার কাম্য স্বর্গে শরীরের খাদ্য ও পানীয় থাকা সম্ভব নহে এবং ইন্দ্রিয়-সুখপ্রদ সংগীত, নৃত্য থাকাও সম্ভব নয়। আমি জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও আনন্দ। আমি পার্থিব জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে গঠিত নহি। আমি অনন্ত সচ্চিদ্ আনন্দ হইতে উৎপন্ন। সৎ চিৎ আনন্দের মধ্যে স্থিতি করাই আমার জীবন ও স্বর্গবাস।

যদি সৎ, চিৎ, আনন্দের মধ্যে বাস করাই আমার স্বর্গভোগ হয়, তাহা হইলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, এই স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য আমি কোন্ মন্দিরে, মস্‌জিদে বসিয়া পূজা উপাসনা করিব? এবং আমার সাথীই বা কে? এবং কোন শাস্ত্রই আমি পাঠ করিব, যেই শাস্ত্র আমাকে মুক্তির কথা শুনাইবে?

আমি যে সৎ, চিৎ, আনন্দ হইতে জাত, সমস্ত মানব-মণ্ডলী সেই সৎ চিৎ আনন্দ হইতে জাত। এই সমস্ত বিশ্বও সেই সৎ চিৎ আনন্দ হইতে উৎপন্ন। অনন্ত সচ্চিদানন্দসাগরের মধ্যে আমরা যেন এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎ চিৎ আনন্দের বুদ্‌বুদ। জলবুদ্‌বুদে যেমন জলের সমস্ত গুণ ও রূপ বিদ্যমান, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত সৎ চিৎ আনন্দের গুণ ও রূপ বিদ্যমান। 'আমি'র এইরূপ দেখে কেহ বলেছেন, 'সোঽহং'—আমিই সেই; কেহ কেহ বলেছেন, মানব ঈশ্বরের প্রকৃতিতে রচিত। আমি সেই মন্দিরে বসিয়া সৎ চিৎ আনন্দের পূজা করিব, যে স্থানে এই সৎ চিৎ আনন্দ প্রকাশিত আছেন। ইহা দেব দেবীর মন্দিরই হউক, গির্জ্জাই হউক, আর মস্‌জিদই হউক, নদীতীরই হউক, গভীর অরণ্যই হউক, আর আমার আপন গৃহই হউক, কিম্বা কর্ম্মক্ষেত্রই হউক, যে স্থানে অনন্ত সচ্চিদানন্দের সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়, মিলন হয়, সেই আমার মন্দির। যদি সচ্চিদানন্দের প্রকাশ ও বিদ্যমানতা অনুভূত না হইল, তাহা হইলে মক্কার মস্‌জিদই বা কি, আর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরই বা কি, আর এই ব্রহ্মমন্দিরই বা কি। এ সমস্তই ইষ্টকের স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই আমরা বলি যে, এই সুবিশাল বিশ্বই ব্রহ্মের মন্দির। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর জল, স্থল, পর্ব্বত, মরু, এ সমস্তের যে স্থানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিকাশ দেখা যায়, তাহাই ব্রহ্মমন্দির। চন্দ্রালোক-পুলকিত পূর্ণিমা রজনী, তিমির ঢাকা অমাবস্যা রাত্রি, এই দুই ব্রহ্মমন্দির। ব্রহ্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট মন্দির নাই। সমস্ত বিশ্বই তাঁহার মন্দির।

এই বিশ্বমন্দিরে বসিয়া আত্মা যখন পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, তখন আত্মা পরমাত্মার নিকট হইতে পরিত্রাণের বাণী শুনিতে পায়। এই যে ঈশ্বরের বাণী, ইহাই মানবের শাস্ত্র। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণের মধ্যে আত্মা যে পরিমাণে পরমাত্মার বাণী অনুভব করে, তাহাই আত্মার পরিত্রাণের শাস্ত্র। এ জন্য সকল শাস্ত্রই আমার পরিত্রাণের বাণী শুনায়, কিন্তু কোনও শাস্ত্রেরই সকল লেখা আমার পরিত্রাণে অভ্রান্ত বাণী নহে।

এই পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দের দর্শন এবং তাঁহার বাণীশ্রবণই আমার স্বর্গভোগ এবং এই সচ্চিদানন্দ হইতে দূরে বাস করা এবং তাঁহার বাণীতে বধির হওয়াই আমার নরকবাস। এই স্বর্গ ও নরকবাস এই পার্থিব দেহে অবস্থান কালেও হইতে পারে এবং

এই পার্থিব দেহের অবসানেও হইতে পারে। এমন কি, দিবসের মধ্যে অনেকবার আমি স্বর্গবাস করিতে পারি, আবার অনেকবার স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে বাস করিতে পারি। যত দীর্ঘ সময় আমরা সচ্চিদানন্দের সন্নিধানে থাকিব এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া চলিব, তত দীর্ঘকাল আমরা স্বর্গে বাস করিব। যত তাঁহার সন্নিধানে থাকিব, এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া চলিব, ততই আমরা তাঁহার স্বভাব প্রাপ্ত হইব, ততই আমাদের "আমির" সচ্চিদানন্দ রূপ বিকশিত হইয়া, অনন্ত সচ্চিদানন্দের দিকে অগ্রসর হইবে। দয়াময় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা তাঁহার সান্নিধ্য সম্ভোগ ও তাঁহার বাণী নিত্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাতে বসবাসরূপ স্বর্গ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হই।

শ্রীজগন্মোহন দাস।

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মবিবাহানুষ্ঠান

১৮৬১ সনের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বপ্রথম বিবাহ। এ বিবাহে দেবেন্দ্রনাথের পৌত্তলিকতার সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ বিবাহে হিন্দুরীতি সবই প্রায় রক্ষিত হইয়াছিল। বিবাহসভায় দানসামগ্রী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অর্ঘ্য, অঙ্গুরীয় ও বস্ত্র দ্বারা কন্যাকর্ত্তা দেবেন্দ্রনাথ বরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। নূতন অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "যে ধর্ম্মের ভিত্তি কোন শাস্ত্রের উপরে নয়, সে ধর্ম্ম হইতে কোন অনুষ্ঠানপদ্ধতি রচিত হইয়াও তাহা কাজে পরিণত করা, এ যাবৎ পর্য্যন্ত কোন সভ্য দেশেই সম্ভবপর হয় নাই।" খ্রীষ্ট ও বাইবেল ছাড়িয়া কোন অনুষ্ঠান ইউরোপে হইতে পারে, ইহা ইউরোপীয় সভ্যদেশ আজ ভাবিতেও পারে না। কোরাণ শরিফ ছাড়িয়া মুসলমান অনুষ্ঠান হইতেও পারে না। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে খুব জোরের সহিতই বলিয়াছিলেন যে, "যে ধর্ম্ম সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্ম্ম হইতে কোন অনুষ্ঠানপদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার বিষয় পৃথিবীর কোন দেশে দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষেই এই কেবল নূতন সৃষ্টি।" এটিই ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের দান। পরবর্ত্তী সময়ে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজেই অর্থাৎ ইহার যাবতীয় পূজা অনুষ্ঠানপদ্ধতিই সম্পূর্ণরূপে নবভাবে বিরচিত ও অনুষ্ঠিত। সর্ব্বপ্রকারের বিরুদ্ধভাববিবর্জ্জিত হইয়া নিরপেক্ষতার সহিত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সহজেই পরিদৃষ্ট হইবে যে, কে বচন্দ্রের বিরচিত নবসংহিতাতে প্রাচ্য মানব-পরিবারে যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ ও তত্তাবৎ কার্য্যতঃ অনুষ্ঠান করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে সমস্তই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন ও স্বর্গগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও যাহা স্বীকার করতঃ সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এ যুগে এক নূতন বিধান, ইহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন গ্রন্থের বা কোন মহাপুরুষের নামের ও ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে না। ভারতবর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি।

এইরূপে কন্যার বিবাহ প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে বিষম সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ বিবাহের পরে তাঁহার আত্মীয়স্বজন একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন যে, "পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুযায়ী আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি আশার অতীত ফলপ্রদান করিয়াছেন। আমি যে জীবিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠান আমার পরিবারে করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্তলিকতার গন্ধও রহিল না। ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি গণেন্দ্র পর্য্যন্ত সে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না।" তিনি এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন যে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রত কি কঠিন ব্রত। তিনি বসু মহাশয়কেও ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সামাজিক প্রথানুসারে অনুষ্ঠানাদি করিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ীই কন্যার বিবাহ দিবেন, ইহা জানিয়া পুনরায় লিখিয়াছিলেন যে, "তিনি ইচ্ছা করিলে স্বীয় কন্যার বিবাহ অসবর্ণ পাত্রের সহিতও দিতে পারেন।"

যাহা হউক, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ কর্ণেল ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের (কৃষ্ণধন ঘোষ) সঙ্গে দিয়াছিলেন, এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় সাধু অরবিন্দ ঘোষ এবং মিঃ বিনয় ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র। এবং তৎপর তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ স্বনামপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত দিয়াছিলেন। রংপুর সহরে জলনিষ্কাষণের নিমিত্ত তদানীন্তন সিভিল সার্জ্জেন ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের পরিকল্পনানুযায়ী একটি ক্যানেল আছে। উহা কে, ডি, ঘোষের ক্যানেল বলিয়া সুপরিচিত। আমার সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি খুলনাতে ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের সহিত বেশ করিয়া পরিচিত হইয়াছিলাম। বরোদাতে তাঁহার পুত্র অরবিন্দ ঘোষের সহিত ও কোচবিহারে বিনয় ঘোষের সহিত খুবই পরিচিত হইয়াছিলাম। মিঃ বিনয় ঘোষের দ্বারা আমি অনেক সময়ে উপকৃত ও সম্মানিত হইতাম।

১৮৬৭ সনে দেবেন্দ্রনাথ আরও দুইটি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রথমটি তাঁহার পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ। দ্বিতীয়টি তাঁহার ৫র্থ কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর বিবাহ। এই উভয় অনুষ্ঠানেই বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া এবং শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা দর্শন করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় চোখের জল ফেলিয়াছিলেন। এ শ্রাদ্ধে তিনি ১০২টি ভোক্তা উৎসর্গ করেন, এও এক নূতন ব্যবস্থা। কন্যা-বিবাহের অনুষ্ঠানে এবার তিনি সপ্তপদী গমন এক অনুষ্ঠান যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। আমি ঢাকা নগরে মুনসেফ বাবু যতীন্দ্রকুমার বসুর মেয়ের বিবাহ স্বর্গগত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সম্পাদিত হইবার সময়ে উপস্থিত ছিলাম; এ বিবাহেও সর্ব্বশেষে সপ্তপদীগমন হইয়াছিল। যে সাতটি মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা ঋগবেদের, উহাতে পৌত্তলিক কিছুই নাই। প্রথমটি বিবাহসভায় উপস্থিত ব্যক্তি-গণকে লক্ষ্য করিয়া, এবং অন্যগুলি কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত। ঐ সকল মন্ত্রগুলি পড়িলে বা শুনিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল মন্ত্র বাল্যবিবাহের মন্ত্র নহে। যাহা হউক, আমরা দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুদৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুযায়ী সম্পন্ন করতঃ, একদিকে বিশ্বাসের পরিচয় ও অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী

(পুরী)

শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, আমাদের দেশের গণিত অতি আশ্চর্য্য গণিত, এদেশের গণিতের সঙ্গে তাহার কিছুই মেলে না। বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের বিধান যেমন নূতন, তাঁহার গণিতশাস্ত্রও নূতন। আমরা কত বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া গণিতাঙ্ক কষিয়া অনুষ্ঠানাদি করিতে যাই, কিন্তু ভগবানের গণিত সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য।

পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে শ্রীকেশবচন্দ্রের যে জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞ সম্পন্ন হইল, তাহা সত্যই তাঁহার আশ্চর্য্য গণিতের প্রমাণ। আমরা কয়েকজন গণ্যমান্য সভ্যের পরামর্শ অনুসারে প্রথম যে দিন স্থির করিয়াছিলাম, জানিনা, কেন সে দিনে শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন কিছুই হইয়া উঠিল না; বুদ্ধি বিচার না করিয়া, বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে দিন স্থির হইল, ২১শে মে হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত শতবার্ষিকী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। আয়োজন, উদ্যোগ কিছুই নাই; বিশেষ ভাবে সাহায্য-দাতারও অভাব। ভিতরে ভিতরে প্রতিবন্ধকতা করিবার ও শীতল জল ঢালিবার বন্ধুরও অভাব হইল না। আশ্চর্য্য নববিধান-বিধাতার কৌশল, অনির্ব্বচনীয়-রূপে যথাসময়ে স্বয়ং তিনিই সমুদায় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন; ভক্তের মান যে ভগবান রক্ষা করেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করিলেন। কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল, আমার মাকে তোরা চিনলি না।" সত্যই সেই কেশবজননী তাঁহার নবভক্তের নবজন্মযজ্ঞ অলৌকিকরূপে সম্পাদন করিলেন।

কলিকাতা হইতে কেশব-জন্মশতবার্ষিকীর সম্পাদক অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন সপরিবারে পুরীতে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হন। রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় সপরিবারে ও সবান্ধবে, মিসেস হরিসুন্দর দাস সপরিবারে এবং মাননীয়া মিসেস জে, সি, মুখার্জ্জি পুরীতে আগমন করেন। জামসেদপুরের শিক্ষাধ্যক্ষ মিঃ জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এবং আরও কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজের পরিবার আগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে বারিপদা হইতে ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বালেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় বন্ধু ডাক্তার দিনকর রাও, কলিকাতা হইতে আগত বাবু ননীভূষণ দাস গুপ্ত প্রভৃতি বেশ উৎসাহ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে যুবকবন্ধুদের, বিশেষ করিয়া শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনের উৎসাহ ও সহায়তায় সকল প্রকার আয়োজনই হইয়া উঠিল। স্থানীয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুগ্রহে দুইটি সামিয়ানাও পাওয়া গেল। উৎসবে বাহিরের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সময়াভাবে অনেকে আসিতে পারেন নাই। শেষ মুহূর্ত্তে কটক হইতে শ্রীমতী প্রীতিকণা রায় সপরিবারে ও অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী আসিয়া আমাদের উৎসবানন্দ বর্দ্ধিত করেন। ভক্তকন্যা ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা সুচারু দেবী তারযোগে এবং অন্তরের অধ্যাত্ম প্রেরণায় আমাদিগকে পরম উৎসাহিত করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র স্বদেশানুরাগের ও রাজভক্তির সমন্বয়প্রবর্ত্তক, তাই তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞে রাজপ্রতিনিধি উড়িষ্যার গবর্ণর Sir John Hubbuck শুভাগমন করিয়া যজ্ঞের উদ্বোধন করেন, সাধ হইয়াছিল; অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করায়, তিনি আগমন করিতে অক্ষম হয়েন, কিন্তু নিম্নলিখিত উৎসাহকর বাণী প্রেরণ করিয়া আমাদের যজ্ঞের উদ্বোধন করেন:—"I trust the Centenary Celebration will be success and will do much to further the cause of peace and good will, for which it was intended." তাঁহার প্রতিনিধিরূপে মাননীয় কলেক্টর Mr. M. S. Rao, I.C.S. শুভাগমন করিয়া, গবর্ণর বাহাদুরের বাণী ঘোষণা করিয়া, উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কুমারী গীতা দাস এবং কুমারী

দীপ্তিমা সেন সুমধুরকণ্ঠে নবরচিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়সংগীত করেন, ভাই প্রিয়নাথ ইংরাজীতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করেন—

"Glory to God in the Highest and on earth peace and Good will toward men."

হে সর্ব্বমানবের উপাস্য, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যে যে নামেই তোমাকে পূজা করি না কেন, তুমি এক অদ্বৈত; ঈশার নিকট তুমি স্বর্গস্থ পিতারূপে দেখা দিয়েছ, মুসার নিকট 'আমি আছি', ঋষিদিগের নিকট 'অহমস্মি' এবং আরবের ধর্ম্মনেতার নিকটে 'আল্লাহো আকবর'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। বর্ত্তমান নবযুগে শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকটে মাতৃরূপে দেখা দিলে, তাই তোমাকে কেশবজননীরূপে আমরা ডাকিতেছি। তুমি কেশবচন্দ্রকে মূর্ত্তিমান বিশ্বমানবরূপে স্বয়ং গঠন করিয়াছ। যাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এক এক ধর্ম্মবার্ত্তা লইয়া পাঠাইয়াছিলে, তাঁহারা ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন; কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে মানবাদর্শরূপেই অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আদর্শ জীবনে আত্মস্থ করিয়া প্রকৃত পূর্ণ মানবত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান এবং বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত সমযোগসাধনায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-জীবন প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মে অখণ্ড মানবত্বের জন্ম, মানব-ভ্রাতৃত্বের সমাধান; অতএব তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা যেন তাঁহার আদর্শগ্রহণে নবজন্ম লাভ করি। তুমি এই নবজন্মযজ্ঞসুসম্পাদনে আমাদিগকে সক্ষম কর।

সভাপতির আহ্বানে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন শ্রীকেশবচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের ব্যাখ্যান করিয়া, অতি সুন্দর সুললিত ইংরাজী অভিভাষণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ পরে প্রকাশিত করা হইবে। সভাপতিকে এবং গবর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর (২১শে মের) কার্য্যাবলী শেষ হয়।

(ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

শুভ জন্ম—গত ২২শে জুন, ৯নং ষ্টার লেনে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের প্রথমা কন্যার (শ্রীমান্ অজয়কুমারের) প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মা শিশুকে ও শিশুর পিতা-মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মদিন—গত ১৬ই জুন, মঙ্গলবাড়ীতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের তৃতীয় কন্যা কবিতার জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। মাতার আকস্মিক মৃত্যুমুখ হইতে জীবনরক্ষার জন্যও ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করা হয়।

গত ২৮শে জুন, ৪০।১এ মনোহর পুকুর ফাষ্ট লেনে, শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের কন্যা শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়ের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

নামকরণ—গত ১৩ই জুন, ১৪০ বি হরিশ মুখার্জি রোডে, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর পৌত্র, শ্রীমান্ ডাঃ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর শিশু পুত্রের শুভনামকরণ উপলক্ষে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "দীপেন্দ্রভূষণ" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ৬ই জুন, কটকে মধুভবনে, স্বর্গীয় প্রশান্তকুমার রাওয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর সহিত কাঁথিনিবাসী স্বর্গীয় বরেন্দ্রকুমার মাইতির পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অনিলবরণ মাইতির শুভবিবাহ হইয়াছে। অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী আচার্য্যের কাজ করেন।

গত ১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন), চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের সহিত, কলিকাতা-নিবাসী ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শোভার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ এই নবদম্পতিযুগলকে শুভাশীষ দান করুন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত ৯ই জুন, সপ্তগ্রামে (ধুবড়ি) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকারের একমাত্র কন্যাটী, একটী মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই, হঠাৎ পরলোকে চলিয়া যাওয়াতে, পিতামাতা বড়ই শোকাহত হইয়াছেন। এক বৎসরও হয় নাই, এই কন্যাটীর বক্ষের ধন পুত্র সন্তানটীকে নিদারুণ ব্যথা দিয়া ভগবান্ তুলিয়া নিয়াছিলেন। এখন মাকেও তুলিয়া লইলেন। এই পরিবারে শোকের উপর আর একটি শোকের আঘাত পড়িয়াছে। গত ২২শে জুন, গিরিধিতে ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকারের পত্নী শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী সরকার একমাত্র দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রকে রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

গত ১১ই জুন, ৺হরচন্দ্র মজুমদারের পৌত্র, শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র মজুমদারের পুত্র, উদীয়মান যুবক, St. Stephens কলেজের ছাত্র, সকলের অতিপ্রিয় শ্রীমান্ নিশীথচন্দ্র ১৯ বৎসর বয়সে, দিল্লীতে যমুনার জলে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া পরলোকগমন করাতে, পিতামাতা ও পরিবারবর্গ নিরতিশয় শোকে মুহ্যমান হইয়াছেন। গত ২১শে জুন, ইঁহার আত্মার কল্যাণার্থ ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে পিতা সন্তানের পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই জুন, হাওড়ায়, ১৯নং কুচিল সরকার লেনে শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাসের মাতামহী দেবী ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ, ১৮ই জুন ঐ গৃহে উপাসনাদি হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ সন্তোষকুমার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মা সকলকে তাঁর নিত্য প্রেম-ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই জুন, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, অনাথাশ্রমে ৫৲, এবং অন্ধ স্কুলে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৪ই জুন, ১৪০বি হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, শ্রীমান্ বিভূতি-ভূষণ বসু ও ডাঃ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ২৲, ডাঃ ধীরেন্দ্রভূষণ ২৲ এবং শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ ২৲ মাতৃস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। ১৬ই জুন, ঐ গৃহে, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় দুর্গাদাস বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে বিধুবাবু প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৪ই জুন, ১৫৮এ অপার সার্কুলার রোডে, শ্রীযুক্ত বিবেকমোহন সেহানবিশের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই জুন, ১৩।১এ বৃন্দাবন মল্লিকের ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা (স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ৺সুশীলচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ভগ্নী শ্রীমতী স্নেহলতা রায় ২৲ এবং সন্তোষের পত্নী শ্রীমতী সান্ত্বনা দত্ত ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ২৩শে জুন, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবী স্বর্গীয়া নিত্যকালী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ভাই গোপাল-চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই অখিলচন্দ্র মাতৃদেবীর আত্মার উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করেন। সন্ধ্যায় শান্তিকুটীরে সাপ্তাহিক উপাসনায়ও ভাই প্রিয়নাথ মাতৃচরণে ভক্তি কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দান করেন। এই উপলক্ষে সেবিকা হেমন্তকুমারী ভাই অখিলচন্দ্রের সেবার জন্য ১৲ টাকা দান করেন।

দক্ষিণ ভারত—দক্ষিণ ভারতে পালনী পর্ব্বতস্থ প্রাকৃতিক শোভাময় কোডাই ক্যানাল সহরে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী দের গৃহে, ১৬ই মে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ২০শে মে, ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গগমন দিনোপলক্ষে, ১৫ই জুন সাধ্বী অঘোরকামিনী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ এবং ১৮ই জুন বিধানগায়ক সর্ব্বজন-প্রিয় শ্রীমদ্ মনোমতধন দের পরলোকগমন স্মরণ করিয়া, পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া সংগীত, শাস্ত্রপাঠ ও ব্রহ্মোপাসনা হয়। প্রতিদিনই সেবিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী উপাসনা করেন। ৺মনোমতধন দের স্মরণার্থে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত ভগ্নী শ্রীমতী হেমলতা দেবী নববিধান প্রচারফণ্ডে ১৲ ও পাটনা ঋষি কেদারনাথ গ্রন্থাগারে ১৲ ও ভগিনী বনলতা প্রচারফণ্ডে ৫৲ দান করিয়াছেন। গত ১৮ই জুন, কলিকাতার বালীগঞ্জে ২৩।১ডি ফার্ণ রোডে, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দের গৃহে, স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিকে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন।

শিলং সংবাদ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব শত-বার্ষিকী গত ৮ই জুন হইতে ১২ই জুন পর্য্যন্ত সমারোহের সহিত শিলং নগরে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ ১১জন ভ্রাতা এই উপলক্ষে এখানে আসায় উৎসব খুব জমাট হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী এবার কয়েকমাস হইতে শিলংএ বাস করিতেছেন। জন্মোৎসব শতবার্ষিকী ব্যতীতও, স্বাস্থ্য ভাল থাকায়, তিনি স্থানীয় নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর কার্য্য করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা সুব্রতা দেবীও স্বামী ও কন্যাসহ কয়েকমাস হইতে এখানে বাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত এলাহাবাদ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে, কলিকাতা হইতে ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় বিহারীলাল সেনের পুত্রবধূ ও লেঃ কর্ণেল জ্যোতি-লাল সেনের পত্নী বেলা দেবী পুত্র কন্যাগণসহ, রায় বাহাদুর ললিত-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মাননীয়া লেডী সিংহ, স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিকাশেন্দ্রনারায়ণ, শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পিয়ো, কটক হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্তা ভক্তিলতা চন্দ, ঢাকা হইতে স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদারের পৌত্র পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি সকলেই জন্মোৎসব-শতবার্ষিকী সপ্তাহে শিলংএ ছিলেন। ইঁহারা সকলে এবং কলিকাতা হইতে আগত বন্ধুগণ, স্থানীয় জন-সাধারণও স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া এই পুণ্য অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন ও উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। শিলং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন মহাশয়ের উৎসাহ ও আন্তরিকতা সকলের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ই ও ২৬শে জুন প্রাতে লাবান ব্রহ্মমন্দিরে ও ১৯শে জুন সন্ধ্যায় পুলিশবাজার ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ১৭ই জুন সন্ধ্যায় পুলিশবাজার ব্রহ্ম-মন্দিরে "মানব জীবন ও আধ্যাত্মিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ২৬শে জুন সন্ধ্যায় পুলিশবাজার ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় শিলং কাৎচারাল এসোসিয়েসনে "Out look of modern science" শীর্ষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। } ১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲
17th. July, 1938

প্রার্থনা

হে জগন্নাথ! জগন্মন্দির তোমার বাসগৃহ, জগন্মন্দির তোমার পূজা বন্দনার প্রশস্ত স্থান। সমস্ত জগতেই তোমার পূজা বন্দনা হইতেছে, তোমার নামকীর্ত্তন, গুণ-কীর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যে পুণ্যভূমি ভারতে যেমন বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র নামে তোমার পূজা বন্দনা, নামকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন হইতেছে, এমন আর পৃথিবীর কোন অঙ্গে, কোন দেশে হইতেছে? কেপ কুমরিণ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত, পঞ্চনদ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত কত পূজা-মন্দির, কত সাধনাশ্রম, সজন নির্জ্জনে কত গুণকীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, ধ্যান, ধারণা, যোগ তপস্যার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান। এমন ভোগবিলাসিতা, এমন বাহ্যাড়ম্বরের যুগেও, এখনও বঙ্গভারতের পল্লিতে পল্লিতে, ছোট বড় নগরে সহরে, কত মত্ততার সহিত প্রাতঃ সন্ধ্যায় তোমার পূজা বন্দনা, নামকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তনে নানাশ্রেণীর বিশ্বাসী ভক্ত সাধক সাধিকাগণ প্রমত্ত। পৃথিবীর সকল সাধু ভক্তের ভাব লইয়া, বিশেষ ভাবে ভারতের বঙ্গের আর্য্যজাতির যোগ তপস্যা, ধ্যান ধারণা, প্রমত্ত নামকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, পাঠ প্রসঙ্গের ভাব লইয়া, হে জগত্রাতা! তোমারই স্বর্গের গূঢ় ব্যবস্থায়, এই নবযুগে নববিধানের সাধন ভজন, পূজা বন্দনা, যোগ তপস্যার ব্যবস্থা। ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবন সেই পূজা বন্দনার জীবন্ত প্রতীক। যখনই আমরা শুভমুহূর্ত্তে তোমার শরণাপন্ন হই, তোমারই ভিতর দিয়া পূজা বন্দনা বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তগণের পূজা-নিষ্ঠা, পূজানুরাগ, পূজামত্ততা আমা-দিগকে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের জীবনে নব বিশ্বাস, নব ভাব, নব সরসতা দান করে। কে কোথায় একান্তমনে তোমাকে ডাকিতেছন, একান্তভাবে তোমার ভাবের ও প্রত্যাদেশের অনুবর্ত্তন করিতেছন, তাহার খবর আমরা না জানিলেও, তাঁহাদের আত্মিক জীবনের প্রভাব, বিনা তারে সংবাদ পাওয়ার ন্যায়, আমরা তোমারই ভিতর দিয়া, কত ভাবে, কত মুহূর্ত্তে লাভ করিয়া প্রভাবান্বিত হই, উদ্বুদ্ধ হই, তাঁহাদের আত্মিক জীবনের সঙ্গে মহা যুক্ত হই। তথাপি, হে অন্তর্য্যামিন্, তুমি দেখিতেছ, আমাদের মধ্যে কত শুষ্কতা, কত অবিশ্বাস, পূজা বন্দনায় কত উদাসীনতা! বর্ষার বারিবর্ষণের ন্যায় তোমার কৃপা-বৃষ্টি অনবরত আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, অথচ বৈশাখের শুষ্ক কঠিন ভূমির ন্যায় আমাদের চিত্তের কঠোরতা শুষ্কতা! আমাদের ব্রহ্মমন্দিরে, আমাদের দেবালয়ে, আমাদের নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে, পূজা বন্দনার স্থানে, হায়! এত

লোকশূন্যতা। আশা উৎসাহের এত অল্পতা! এজন্য কাহাকে দোষী করিব? কাহাকে অনুযোগের ভাগী করিব? আমরা সকলেই এ বিষয়ে গূঢ়ভাবে অপরাধী। আমরা সকলে এবং প্রত্যেকে অপরাধ স্বীকার করিয়া, কাতরপ্রাণে তব চরণে প্রার্থনা করিতেছি. তুমি আমাদিগকে যে দণ্ড দিবার, সে দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, শোধন করিয়া, আমাদের বালক বৃদ্ধ সকলের প্রাণে নব জাগরণ দান কর, নব আশা বিশ্বাসে সকল প্রাণ পূর্ণ কর; পূজা বন্দনার মূল্য ও মহিমা গৌরব নবভাবে আমাদের প্রাণে উদ্ভাসিত করিয়া, তোমার নিজগুণে আমাদিগকে পূজা বন্দনা ধ্যাণ ধারণার ব্যাপারে আকৃষ্ট কর, প্রমত্ত কর। এ সকল বিষয়ে ক্রমে উচ্চ সিদ্ধি দান করিয়া, শ্রীকেশবের উপাসনার জীবন আমাদের মধ্যে মূর্ত্তিমান কর। তোমার অযাচিত কৃপাগুণে এ সময়ে আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীকেশবচন্দ্র আচরণে আচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শুধু ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর কার্য্যে আচার্য্য নহেন, তিনি শুধু টাউন হলে বা অন্যত্র বক্তৃতা কি উপদেশদানে আচার্য্য নহেন, তিনি নিজ জীবনের ছোট বড় সকল আচার ও আচরণে নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের মূর্ত্তিমান আদর্শ হইয়া আচার্য্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সম্পর্কে কথা আছে, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" নবযুগে নবধর্ম্মবিধানে একথাটীর জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত কেশবচন্দ্র। তিনি গৃহ পরিবারে, মণ্ডলীগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, স্বদেশে বিদেশে, জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশকে অনুবর্ত্তন করিয়া, সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম জীবনে প্রদর্শন করিলেন। শুধু উপদেশদানে নয়, কিন্তু জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে উচ্চ ধর্ম্মবিধি প্রতিপালন করিয়া, আপনার আচার ও আচরণকে বর্ত্তমান মণ্ডলীর ও ভবিষ্যৎ বংশের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখিয়া গেলেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিব।

ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে, ধর্ম্মজীবনের প্রবল উত্তাপময় মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত, কলুটোলার বৃহৎ সেনপরিবারের মধ্যে কত বিপরীত, বিরুদ্ধ সঙ্গ-স্পর্শে ছিল তাঁহার বাস। এমন প্রতিকূলভাবাপন্ন বৃহৎ সেনপরিবারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে, তিনি আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণসহ বাস করিতেন। সেই গৃহখানিই ছিল তাঁহার সাধনক্ষেত্র, উপাসনার স্থান, অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবেরও সম্মিলন-ক্ষেত্র। চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, এমন কোলাহলময় বৃহৎ পরিবারে, এমন প্রতিকূলভাবাপন্ন লোকমধ্যে বাস করিয়া ও তাহারই মধ্যে অপগণ্ড শিশু পুত্র কন্যাগণ লইয়া যে গৃহে বাস, সেই বাসগৃহকেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। সেখানেই কত নব নব দেবালোক, দেব-প্রেরণালাভ, সেখানেই নব যুগধর্ম্মের মৌলিক সুসংবাদ সকল প্রাপ্তি, সেখানেই ব্রহ্মাগ্নিতে অগ্নিময় জীবন, সকল পরীক্ষায় অপ্রতিহত জীবন লাভ, সেইখানেই নববিধানের আদর্শ চরিত্রগঠনের আরম্ভ ও তাহার উচ্চ পরিণতি। তিনি জীবনে দেখাইলেন, জীবন্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার প্রত্যাদেশের অনুবর্ত্তন করিলে, উচ্চ সাধন ভজনের জন্য, যোগ তপস্যার জন্য, প্রাচীনকালের সাধকদিগের ন্যায় গিরিগুহা, কি নির্জ্জন বনভূমির আশ্রয়, কি কোন কৃচ্ছ্রসাধনের প্রণালীগ্রহণ প্রয়োজন হয় না। ধ্যান ধারণা কর মনে, ঘরের কোণে, উপাসনা প্রার্থনার স্থান কর আপনার নিত্য বাসগৃহে, স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গকে অনুকূল করিয়া লও, যথা প্রয়োজনে মিলিত উপাসনা, বন্ধু-সম্মিলন, সৎপ্রসঙ্গ, পাঠাভ্যাস সকলই কর আপনার ক্ষুদ্র বাসগৃহে, সকল বিষয়ে আড়ম্বরশূন্য সহজ সরল স্বাভাবিক পথ অবলম্বন কর। তাঁহার ধ্যান ধারণার আড়ম্বরশূন্য স্বাভাবিকতার একটী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে, শাস্ত্রী মহাশয় কেশবচন্দ্রের বেশ প্রিয় পাত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ইংরেজি শিক্ষার ভার কিছুদিনের জন্য শিবনাথ বাবুর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন বিশেষ প্রয়োজনে শিবনাথবাবু আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে তাঁহার বাসগৃহে খুঁজিতে আসিয়াছেন। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পাইয়া, শিবনাথবাবু কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায়? দেবী জগন্মোহিনী শিবনাথ বাবুকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, ঐ তিনি অনতিদূরে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

ব্রাহ্মসমাজের কয়টী পরিবার সচ্ছল অবস্থাপন্ন?

কয়টী পরিবার আপনার বাসগৃহকে বৃহদায়তন করিয়া, উপাসনা, ধ্যান ধারণা, যোগ তপস্যার জন্য তাহাতে স্বতন্ত্র ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারেন, এবং নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বচ্ছন্দে আত্মিক জীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন? অধিকাংশ পরিবারই অল্প আয়-সম্পন্ন, অনেকের ভাগ্যেই কলিকাতা ইত্যাদি বৃহৎ সহরে উপাসনা ধ্যান ধারণার জন্য স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না; তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে আপনার নিত্য শয়ন ঘরে বা তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র স্থানে নিত্য উপাসনা, ধ্যান চিন্তন, যোগ তপস্যাদি উচ্চ কর্ত্তব্য করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কলুটোলার গৃহের নিত্য উপাসনা, ধ্যান ধারণা, যোগ তপস্যা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের আচরণ কত শিক্ষাপ্রদ, উৎসাহপ্রদ।

তাঁহার আচরণে গুরুগিরি প্রকাশ না পায়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্কতা লইতেন। কোন ব্যক্তি বিশেষ তাঁহার নিকট কোন ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখনই তাঁহাকে তাহার উত্তর দিতে রাজি হইতেন না। তিনি বলিতেন, যখন শিক্ষার্থিভাবে অনেকে মিলিত হইবেন, তখন এ বিষয়ে কথা বলা যাইবে। তিনি জানিতেন, দলগতভাবে শিক্ষার্থিগণ উপস্থিত হইলে, সেই দলগত জীবনের ভিতর দিয়া পবিত্রাত্মার ক্রিয়া সহজে প্রকাশিত হয়, তখন সেই পবিত্রাত্মাধীনে যে কথা তিনি বলিবেন, তাহা পবিত্রাত্মার কথা হইবে, তাঁহার আপনার কথা হইবে না, অতএব তাঁহার সে কথায় গুরুগিরি হইবে না। আমাদের জীবনে তাঁহার এ আচরণের অনুসরণ কি সর্ব্বদা আমরা করিতে পারি? কোন ব্যক্তি বিশেষ আসিয়া আমাদের নিকট ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে, আমরা তো আগ্রহ সহকারে সচরাচার তখনই এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হই; বরং এমনও ঘটে, একজন ধর্ম্মবিষয়ে কনিষ্ঠভাবাপন্ন লোক উপস্থিত হইলে, আমরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের কত কূট প্রশ্ন উত্থাপন করি এবং গুরুগিরি করিয়া তাহাকে কত কিছু শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হই। জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই, আমাদের জীবনে গুরুর ভাব, শিক্ষকের ভাব যত প্রবল হইয়াছে, শিষ্যের ভাব, শিক্ষার্থীর ভাব তত জাগিয়া উঠে নাই; তাই প্রশ্ন হইয়াছে, গুরু হইলাম, শিষ্য হইব কবে? কেশবচন্দ্র আপনাকে চিরশিষ্য, চিরশিক্ষার্থিরূপেই দেখিতেন।

কোন দূরসম্পর্কিতা বা অসম্পর্কিতা মহিলা শ্রীকেশবের নিকট কোন কাজ উপলক্ষে উপস্থিত হইলে, তিনি আপন সহধর্ম্মিণীকে নিকটে রাখিয়া সেই মহিলার সঙ্গে কথা বলিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি একাকী কোন নারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলে, তাঁহার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাঁহার সেরূপ আচরণ অনুসরণ করিয়া অন্য কেহ পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেইজন্যই তাঁহার সেরূপ সাবধানতা-গ্রহণ।

"Judge not others lest ye be judged." শ্রীঈশার এই মহাবাক্য কেশবচন্দ্র যেমন জীবনে প্রতিপালন করিয়া দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এ যুগে এমন আর কে রাখিয়াছেন? তিনি কাহারও বিচার করেন নাই, তিনি কাহারও কাল দিক দেখেন নাই। তিনি যেমন সাধু-বিচারে বিরত থাকিয়া সকল সাধুদের দেব দিক গ্রহণ করিতেন, তেমনি তিনি সামান্য লোকেরও মন্দ দিক দেখিতেন না, ছোট বড় সকলের ভাল দিক্ই দেখিতেন ও গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, "কাহারও কাল দিক দেখিতে আমি নই।" তিনি বলিতেন, "আমার হৃদয় ব্লটিং কাগজের মত, গুণ দেখিলেই টানিয়া লয়।" মানবসমাজে বাস করিতে গেলে, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়; শ্রীকেশবের এ বিষয়ে আচরণ অনুসরণ করিলে, জীবনে কত নিরাপদ অবস্থা উপস্থিত হয়। আমরা অনেকে পরের দোষ দর্শন ও পরের বিচার করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়াছি যে, কেশবচন্দ্রের এই আচরণের প্রশংসা করিয়াও, তাঁহার এ আচরণ অতি নিরাপদ জানিয়াও, আমরা কত সময় পরের দোষ দর্শন করিয়া, বিচার করিয়া, জীবনে কতই ক্ষতিগ্রস্ত হই, শেষে হয়ত কতই অনুতপ্ত হই। শুনিয়াছি, তাঁহার একটি চাকর এক সময় তাঁহার গৃহের একটি সামগ্রী চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল, সকলে তাহাকে পুলিশে দিতে উদ্যোগী হইল; কিন্তু তিনি তাহাকে লইয়া উপাসনা-গৃহে গিয়া প্রার্থনা করিলেন। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন, এবং চাকুরীতে বাহাল রাখিয়া গৃহেই স্থান দিলেন।

নিত্য উপাসনা হইতে গৃহের ছোট বড় পারিবারিক কার্য্য তিনি ধর্ম্মের উচ্চ বিধি অনুসারে নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য নিয়মিত অর্থাগম ছিল না, সর্ব্বদা বিধাতার উপর নির্ভর করিতেন, যখন যেরূপ অর্থাগম হইত, সেইরূপে গৃহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

অনেক সময় অর্থের অনাটন জন্য ছেলেমেয়েদের জন্য যে কাপড় খরিদ হইত, তাহা তাহাদের মনোমত না হইতে পারে, এইজন্য তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া কাপড় উপস্থিত করিয়া বলিতেন, এবার ঠাকুর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার দান বলিয়া পরিধান কর। তাঁহার পরলোকের বহুদিন পরে কোন উৎসব-ক্ষেত্রে নবসংহিতার বিধিপালন বিষয়ে কথা উঠিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে স্বর্গগত ভক্তের ভক্ত আমাদের ভক্তিভাজন উমানাথ গুপ্ত বলিলেন—কেশবচন্দ্র অগ্রে পারিবারিক জীবনে নবসংহিতার বিধি অনুসারে জীবন যাপন করিয়াছেন, পরে নবসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, কার্য্যশৃঙ্খলায়, কার্য্যোৎসাহ ও কার্য্যোদ্যমে ছিলেন ইউরোপের ভাবাপন্ন; তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে, সাধনের বিচিত্রতায়, আহারে পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন আদর্শ হিন্দু। তিনি আপনার জীবনের ও সহকর্ম্মীদিগের জীবনের উচ্চ সাত্বিকতা ও গূঢ় শুদ্ধতা সাধন ও বৃদ্ধি জন্য, নিজে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া কত কষ্ট-স্বীকারে স্বপাক আহারের ব্রত গ্রহণ ও পালন করিয়াছেন। তিনি এই ভোগবিলাসিতার যুগে, ধর্ম্মজীবনে এই সাত্বিকতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, ভবিষ্যবংশও এই দৃষ্টান্ত স্মরণে গ্রহণে ধন্য হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া আমরা আশা উৎসাহে উৎফুল্ল। তাঁহার আবাল্য বন্ধু সহধর্ম্মী সহকর্ম্মী ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন—"তিনি বর্ত্তমান হিন্দুজাতির বিশেষ ধর্ম্মোৎকর্ষ হেতু প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" শ্রীকেশবচন্দ্র নবসংহিতাতে ব্যবস্থা করিলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি আপনার গৃহে পারিবারিক নিত্য উপাসনার জন্য পারিবারিক দেবালয়ের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার অন্তিম সময়ে, আপনার গৃহের এক অংশে, প্রাণের সাধ্য নিত্য উপাসনার জন্য, মাতৃপূজার জন্য নবদেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া বিধি-পূর্ণতার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন। সত্যই তিনি আচরণে আচার্য্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব

ব্রহ্মের উপাসনা

শ্রীকেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য যাহা আনিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মের উপাসনা-পদ্ধতি সর্ব্বপ্রধান। সকল ধর্ম্মের সকল সাধনার একত্র সমন্বয় সমাধান করিয়া এই উপাসনা-পদ্ধতি রচিত। কোন ধর্ম্মে ঈশ্বরের দিকে মন উদ্বুদ্ধ করা প্রধান সাধন, কোন ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্বরূপ-নিরূপণ প্রধান সাধন, কোন ধর্ম্মে মন চিন্তন, কোন ধর্ম্মে ধ্যান, কোন ধর্ম্মে নাম-জপ, কোন ধর্ম্মে প্রার্থনা, কোন ধর্ম্মে শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি প্রধান সাধন, কীর্ত্তনও কোন ধর্ম্মে সাধনের অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট। এই সমুদয় সাধনপ্রণালী একত্রে সমাহৃত করিয়া, নববিধানের উপাসনা-পদ্ধতি কেমন সুন্দররূপে রচিত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মেরই সাধনা এই উপাসনা-প্রণালীতে নিবদ্ধ। শ্রীকেশবচন্দ্রের বিশ্বমানব-প্রাণ কেমন আশ্চর্য্যরূপে এই উপাসনা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পূজা এবং তাঁহার প্রভাবে পূর্ণ মানবজীবনগঠনলাভে এমন উপাসনা-প্রণালী কোথাও নাই। এই উপাসনাই বর্ত্তমান যুগের নববিধানের শ্রেষ্ঠ দান। এই উপাসনা-সাধন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মানব মধ্যে অধ্যাত্ম ঐক্যবন্ধনের একমাত্র উপায়। পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আমরা যেন নিষ্ঠার সহিত এই উপাসনা সাধন করি।

বিবাহ বা উদ্বাহ

বিবাহের মৌলিক অর্থ বিশেষ ভাবে বহন। উদ্বাহের অর্থ ঊর্দ্ধদিকে বহন। বাস্তবিক নরনারী উদ্বাহিত হইয়া, পরস্পরকে উন্নত স্বর্গীয় জীবনের দিকে বহিয়া লইয়া যাইবেন, ইহাই বিবাহের প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। নীচ শারীরিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা অথবা কেবল সাংসারিক জীবন যাপন করার জন্য বিবাহ নয়। নরনারী পরস্পরের আত্মায় আত্মায় মিলিয়া, পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় করিয়া, ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় সংসারে স্বর্গের পরিবার স্থাপন করিবেন, ইহারই জন্য বিবাহ। সংসারকে ধর্ম্মের সংসার এবং বিশ্বসৃষ্টির সমৃদ্ধি সাধনের জন্য ঈশ্বর নরনারীকে বিবাহ দান করেন। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণের জন্য বিবাহ। নববিধান বিশেষ ভাবে আত্মায় আত্মায় মিলনের বিধান এবং সংসারে স্বর্গস্থাপনের বিধান; তাই ঐ বিধানে বিবাহ আমাদের পরিত্রাণের সহায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনের বিধি ছিল, নববিধানে বিবাহ করিয়া সংসারে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করাই সর্ব্বোচ্চ সাধন এবং পরিত্রাণ।

—০—

ব্রহ্ম-অনুভূতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আবার বলি, উপনিষৎ ছাড়া পরিষ্কার ভাবে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই না। দর্শনশাস্ত্র ত এ পথের কোন বার্ত্তাই দিতে সক্ষম নহে। স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'The Intellectual ideal of the Vedanta Philosophy' নামক পুস্তকে ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন—"In the whole domain of the intellect there is nothing deeper and more wonderful than the mystery

of the intuitive Genius. It may be doubted whether psychological analysis will be able to trace it back to its ultimate elements or exhaustively formulate the laws by which it is governed." সেইজন্য আমরা চক্ষু বুজিয়া উপনিষদের বাণী স্মরণ করিতে চাই। কেবলমাত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৮ হইতে ২১ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতে চাই :—"যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সেই পুরাতন এবং আদি ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। মন দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। ইঁহাতে নানাত্ব নাই। যে ইঁহাতে নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। এই অপ্রমেয় ধ্রুব আত্মাকে একধা দর্শন করিতে হইবে। তিনি বিরজ, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, অজ, মহান্ এবং ধ্রুব। ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা সাধন করিবেন, বহু বাক্যের সাধন করিবেন না, কারণ ইহা কেবল বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র।"

স্থিরচিত্তে বিষয়টি ভাবিতে হইবে। কেবল মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মসাধন উপনিষদের পথ নহে। তাঁহার "নানাত্ব" দেখিলে জানিতে হইবে, তাঁহাকে দেখা হইল না। প্রথমে প্রজ্ঞা সাধন করিয়া পরে ভগবৎলাভ উপনিষদের সাধনপথ নহে। প্রথমে তাঁহাকে অবগত হইয়া পরে প্রজ্ঞাসাধন করিতে হইবে। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন। এইভাবে ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। কেশবচন্দ্রও বলিতেছেন, "আমি বিশ্বাস করি না, একজন স্রষ্টা আকাশে, আর আমি একাকী পৃথিবীতে পড়িয়া আছি। আমার হাতের ভিতরে তাঁর হাত, আমার রসনার ভিতরে তাঁর রসনা, আমার প্রাণের মধ্যে অনন্ত প্রাণবায়ু।" (জীবনবেদ, ৫২ পৃঃ) "আচার্য্যের উপদেশ" গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে "ত্রিবিধ যোগ" শীর্ষক উপদেশে কেশব দেখাইতেছেন, "দর্শন" "শ্রবণ" ও "স্পর্শ" দ্বারা মানুষ যেমন সংসারকে জানিতেছে, সেইরূপ আত্মারও এইরূপ ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইতে জীব সক্ষম। উপনিষদ হইতে পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, মন দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মন নিযুক্ত না থাকিলে, বাহ্য জগতে অথবা আধ্যাত্মিক জগতে, কোথাও দর্শন, শ্রবণ বা স্পর্শ সম্ভব নহে। অতএব মন যে এই ত্রিবিধ উপায়ে কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহা ভুলিলে চলিবে না। তবে বাহ্য জগতে শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলি মানুষকে নানাদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে বলিয়া, কিছুই ভাল করিয়া জানা যায় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে এই শক্তিগুলি কার্য্যকারী হইলে, মানুষকে সেই এক পুরাতন পুরুষের দিকে টানিয়া লইয়া যায় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে কার্য্যতঃ কোন বিবাদ নাই।

এক্ষণে এই শক্তিগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে প্রণোদিত হইয়া যে সময়ে স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত থাকে, তাহাই ব্রহ্মানুভূতির প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া জানিতে হইবে। উপনিষদ বলেন, প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য সাধক পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্যভাবে অবস্থিতি করিবেন। (বৃহদারণ্যক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণ) এই সঙ্গে যখন মনে হয়, খ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শিশুর মত হইতে হইবে, তখন প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের ঐক্য দেখিয়া, খ্রীষ্টের বাণী হইতে উপনিষদের মহিমা বুঝিতে ইচ্ছা করে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাণী এ সম্বন্ধে খুবই সুস্পষ্ট। তিনি জীবনবেদ পুস্তকে বলিয়াছেন, "মাকে খুব ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছেলে মানুষের ভাব আসে। রাজাধিরাজের পূজাই যদি কেবল কর, বৃদ্ধ হইয়া যাইতে পার। মার পূজা করিয়া কখনও বৃদ্ধ হইবে না। মার কোলে যতদিন থাকিব, মার স্তনাপান যতদিন করিব, ততদিন বালকই থাকিব, বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইব; সেখানেও শিখিব মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয়, এই মন্ত্র, 'এই শাস্ত্র।'" (পৃঃ ১১৯)। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, উপনিষদের যুগেও ব্রহ্মসাধকগণ সন্ধ্যাবন্দনার সময় নিয়মিত ভাবে মাকে মা বলিয়াই ডাকিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা আরাধনা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন :—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥"

এইবার ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে 'ভূমা' অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধে যেরূপ জানিতে পারি, তাহা বিশেষ করিয়া মনে করিতে চাই :—"যাহাতে (সাধক) অন্য কিছুই দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই সেই ভূমা। আর যাহাতে সাধক অন্য বস্তু দর্শন করে, অন্য বস্তু শ্রবণ করে এবং অন্য বিষয়ে জানিতে পারে, তাহা অল্প অর্থাৎ ব্রহ্মের বিপরীত।" কেশবচন্দ্রও নিজ উপদেশাবলীতে বার বার নিজ উপলব্ধি হইতে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম-অনুভূতির পথ তিনটি,—ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শ। যিনি এই সকল বিষয়ে সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহাকে শ্রীকেশবের নিকট হইতে ইহা বুঝিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করি। এক্ষণে আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই তিনটি উপায়ের মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি সাধকের জীবনে সহায় হইয়া থাকে? হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় সম্ভব। কিন্তু উপনিষদের বাণী অনুসারে যখন শিশুপ্রকৃতি অবলম্বন না করিলে ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব নহে, তখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে শিশুপ্রকৃতি বুঝিতে চাই।

শিশু সর্ব্বপ্রথমে মায়ের কোলের স্পর্শ বুঝিতে পারে। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, প্রথমে জননী তাহাকে স্পর্শ করেন, শিশু পরে সে স্পর্শ অনুভব করিতে পারে। ক্রমশঃ মায়ের কোলের অনুরূপ কোল চিনিয়া লয়। মাকে জানে না, মায়ের মত যাহারা ভালবাসে, তাহাদের কাহাকেও জানে না। শুধু চেনে স্পর্শটুকু,

সেই স্নেহস্পর্শ না পাইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না। ক্রমশঃ স্পর্শের সহিত পরিচিত হইয়া শিশু মায়ের মুখনিঃসৃত বাণী শুনিতে থাকে, ইহলোকে তাহার মত অমৃতময়ী ভাষা পরে আর কোথাও খুঁজিয়া পায় না। তারপর মাতৃমুখ দর্শন করিবার জন্য শিশু ব্যস্ত হয়। এই দর্শনের দুইটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় সে অপলকনয়নে মায়ের দিকে দেখিতে ভালবাসে। পরে এক সময় আসে, যখন সে নিজে মাকে দেখিয়া খুসী হয় না; বরং সব সময়েই চায় যে, মাও তাহার দিকে চাহিয়া থাকুক। অথচ তাহার চক্ষু ফুটিবার পূর্ব্বে তাহার মাতার চক্ষুই তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এইরূপ পরিপূর্ণ-ভাবে মাতৃদর্শন হইলে পর, শিশু আবার মায়ের উচ্চারিত কথাগুলি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে মাতৃশ্রবণে সে পারদর্শিতা লাভ করে। এক্ষণে মাতৃস্পর্শ, মাতৃশ্রবণ ও মাতৃদর্শন সহজ হইলে পর শিশু যখন মায়ের গলা ধরিয়া, মায়ের মুখ চুম্বন করিয়া, মায়ের নিকট শেখা কথাগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে, তখন মাতা ও শিশু উভয়েরই জীবন ধন্য হয় এবং জগৎ পুণ্যময়, প্রেমময় ও শান্তির আবাসস্থল হয়।

কেশবচন্দ্রের উপদেশাবলী পড়িয়া আমার মনে হয়, ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মসাধকের সান্নিধ্যলাভও ঠিক এই প্রকারেই হয়। ব্রহ্ম ত এক হিসাবে আমাদের জননীর জননী। শুধু ইহলোকে কেন, মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও মরণের পরেও তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে নিত্যকালের জন্য অবস্থান করে। তাঁহার স্নেহদৃষ্টি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া, আমাদের জীবনে ঘটনার পর ঘটনায় জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। তারপর আমরা যখন তাঁহার নিকটে চাই, "তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝখানে", তখন সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা। সবশেষে ব্রহ্ম-বাণী যখন কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যায় ও তাহার সুর, লয় ও তান আমাদের প্রাণে ও কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে, "এ জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর।" ব্রহ্ম আমাদের প্রণাম লইয়া তৃপ্ত হন, আমরা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুগ্ধ হই। তবে কি আমরা ব্রহ্মকে জানিয়া লইলাম? না, ব্রহ্মকে জানা হইল না, ব্রহ্মকে চেনা গেল মাত্র। অথবা ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মকে চেনাও গেল না, কিন্তু তিনি সাধককে চিনিয়া লইলেন ও এইরূপ ব্রহ্মানুভূতির উপর সাধকের ভবিষ্যৎ জীবন চিরটা কাল নির্ভর করিবে। মাতৃস্নেহ যখন সকল মানবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন ব্রহ্মকৃপা কি সকল মনুষ্যের সহায় নহে?

ব্রহ্মানুভূতি আমাদের জীবনে কেমন করিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহা জানিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মানুভূতির সম্যক জ্ঞান কি ভাবে কমিয়া যায়, তাহা জানিলে ব্রহ্মসাধক সতর্ক হইতে পারিবেন ও নিজ অবস্থার সময়োচিত পরীক্ষা করিতে পারিবেন। আমাদের নিজ জীবনে সহজ অবস্থায় আমরা আত্ম অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি করিয়া বিস্মৃত হই, তাহা দেখা যাউক। মানুষ যখন নিদ্রা যায়, সে সময় প্রথমে চক্ষু কার্য্য বন্ধ করে, পরে কিছুই শুনা যায় না এবং শেষে কোথায় কি অবস্থায় আছি, তাহাও ভুলিয়া যাই। ব্রহ্মানুভূতি সম্বন্ধেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। প্রথমে ব্রহ্মদর্শন বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ "বিশ্বাসচক্ষু" আর কার্য্য করে না। পরে ব্রহ্ম-বাণী শ্রবণ ঘটেনা অর্থাৎ বিবেকের আজ্ঞাও আর অন্তরে পৌঁছায় না। শেষে ব্রহ্মস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হই অর্থাৎ স্বাভাবিক বৈরাগ্য-ভাব নষ্ট হইয়া গেলে, জাগতিক আসক্তির কূপে পতিত হই। প্রত্যেক ব্রহ্মসাধকের এই তিনটি বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, যাহা আধ্যাত্মিক চক্ষু, আধ্যাত্মিক শ্রোত্র ও আধ্যাত্মিক স্পর্শশক্তি বলিয়া পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম, তাহা বিশ্বাসচক্ষু, বিবেকবাণী ও বৈরাগ্য নামে সাধকের চির সহায় বলিয়া পরিগণিত হইল। "বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য" এই তিনটি শব্দ হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাসে পৌরাণিক যুগে ব্যবহৃত হইলেও, উপনিষদে এই সকল অবস্থার পরিচয় পাই ও লোকহিতার্থে এই প্রসঙ্গে কেশবের নির্দ্ধারিত শব্দগুলি আমরাও প্রয়োগ করিতেছি। উপনিষদে এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে যেমন লক্ষণ বর্ণিত দেখিতে পাই, তাহার সহিত ঐক্য থাকিতেছে কিনা, তাহা সুধী পাঠকবৃন্দ বিচার করিবেন।

এক্ষণে এই তিনটি শব্দের অর্থ সংক্ষেপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বাসের অর্থ "ঈশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছুতে বিশ্বাস নাই।" (আচার্য্যের উপদেশ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৭)। বিবেক সম্বন্ধে জানা যায়, "অহোরাত্র প্রহরীর ন্যায় বিবেক সত্যের আলোক ধারণপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতেছে এবং প্রেয়ের পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে।...... জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এ তিনকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করিয়া সমুদয় জীবন পরব্রহ্মে সমর্পণ কর, ধর্ম্মের প্রত্যেক আদেশ পালন কর, সকল কার্য্যেতে সত্যের অনুসরণ কর, বিবেক এই নিয়ম সহকারে মনোরাজ্য শাসন করে।" (আচার্য্যের উপদেশ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০—২১)। বৈরাগ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মসাধক বলিয়া থাকেন, "বৈরাগ্য মৃত্যুকে বিনাশকরতঃ ইহলোক ও পরলোককে একত্রীভূত করিয়া অনন্তজীবনের স্রোত অসীমরূপে প্রসারিত করে। ইহার নিকট এ জীবন অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্রকণা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অনন্তসাগরের একটি তরঙ্গমাত্র; সুতরাং ধীর ব্যক্তিরা ইহলোককে সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া, এখানে অনন্তকালের জন্য সম্বল আহরণ করেন।" আচার্য্যের উপদেশ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫)।

এইবার যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলি। যদি বিশ্বাসকে হারাইতে বসি, যেন বিবেককে জড়াইয়া ধরি। যদি বিবেকও ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে চক্ষুকর্ণহীন ব্যক্তি স্পর্শশক্তিতে যেমন তদ্গতপ্রাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ যেন বৈরাগ্যকে আপন হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখি। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মানুভূতির ধারা সাধকের হৃদয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, সাধকের

মস্তকের সহিত ইহার সম্বন্ধ গৌণ। শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবের হৃদয়পদ্মে ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন। তবে যদি বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য সমস্তই চলিয়া যায়, তখন কি ব্রহ্মসাধক নিরুপায়? আমার মনে হয়, তখন জীবনের অবস্থা-বিপাকের উপর মনুষ্যকে নির্ভর করিতে হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শোকের আগুন বা তাপের আগুন কিংবা প্রশ্নের আগুন আবার সাধকের বুকের ভিতরে প্রকাশ হইলে, ব্রহ্মসন্নিধানে পৌঁছান সহজ হইবে। আবার যদি কোন জাতি ব্রহ্ম-সাধনার দিকে আপন জীবন-স্রোত কোন মতেই ফিরাইতে না পারে, তাহা হইলে একজন যথার্থ ব্রহ্মসাধক স্বীয় রক্ত দিবেন বা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। তখন সেই পুণ্যরক্তে জীব পুণ্যময় হইবে, আবার বসুন্ধরায় বিলুপ্ত ব্রহ্ম-অনুভূতি ফিরিয়া আসিবে। এই ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ কিন্তু উপনিষদে নাই। আর্য্য-জাতি পৌরাণিক যুগে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল ও পরে ইহা সমস্ত জগতে নানাদিক হইতে ছড়াইয়া যায়। ব্রহ্ম-সাধক কি ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না?

যিনি ব্রহ্মবাণী শুনিয়াছেন, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। কেশব বলেন, "ব্রহ্মশ্রবণ ব্রহ্মসাধনার জন্য অনুকূল স্রোত, যাহা ব্রহ্মের নিকট হইতে মানবের দিকে চিরন্তন কাল বহিতেছে।" (আচার্য্যের উপদেশ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭) একজন ইংরাজ প্রচারকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এই wireless এর যুগে ঈশ্বর বহুদূরে থাকিলেও তাঁহার বাণী শোনা কঠিন নহে, যদি সাধকের অন্তর রেডিওর ন্যায় বার্ত্তা-গ্রহণে সমর্থ হয়; আর ঈশ্বর যদি নিকটে থাকেন, তাহা হইলে সংসারের সকল কলরবও যে তাঁহার বাণীকে ছাপাইয়া ফেলিতে পারিবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। এক্ষণে ব্রহ্মবাণী জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে কিভাবে কাজ করিতেছে, তাহা অল্পের মধ্যে আলোচনা করিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করি।

ব্রহ্মবাণীর উল্লেখ আমরা ইউরোপে প্রথম Socrates এর জীবনে পাই। তিনি বলিতেন যে, "Divine Sign" সব সময়ে জীবনপথে তাঁহাকে সাহায্য করে। কখন কি যে করিতে হইবে, তাহা Divine Sign তাঁহাকে জানায় না। কখন কি না করা উচিত, তাহাই তাঁহাকে জ্ঞাত করে। ইহুদী জাতির মহা-পুরুষদিগের জীবনেও এইরূপ স্বর্গীয় ইঙ্গিতের আভাস অনেকস্থানে পাই। Moses ঈশ্বরের নিকট হইতে যে অনুশাসন লাভ করিলেন, তাহা সমস্তই 'না' সূচক। (যথা—চুরি করিও না, পরস্ত্রীতে আসক্ত হইও না ইত্যাদি।) ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-ইতিহাসে খৃষ্টই প্রথম, কি যে মানবের কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে 'হাঁ' সূচক আজ্ঞা লাভ করিলেন। আমাদের দেশে উপনিষদের যুগে, ব্রহ্ম-সাধকগণ এইরূপ পথ-নির্দ্দেশের বার্ত্তা বহুবার পাইয়াছিলেন। বাঙ্গলায় কেশবচন্দ্রও বর্ত্তমানকালে বহুবার বলিয়াছেন, প্রার্থনার ফল 'আদেশ'। তবে আমরা যতদূর লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, প্রথম জীবনে তিনি প্রার্থনা করিয়া আদেশ পাইতেন। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত যোগ স্থাপিত হইলে আর প্রার্থনা করিতে হইত না; প্রথমে 'আদেশ' আসিত, পরে সেইমত প্রার্থনা ও জীবনের কার্য্য সাধিত হইত। আমার নিজের মনে হয়, প্রত্যেক ব্রহ্মসাধকের জীবনে এই সত্যই প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম-অনুভূতি সম্বন্ধে আমার বলা শেষ হইল। এক্ষণে কেশব যে ভাবে প্রার্থনা করিতে ভালবাসিতেন, সেইভাবে প্রার্থনা জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করি:—"জগতের বেদী নিস্তব্ধ হউক। ব্রহ্মময়ী মা আমার অন্তরে বসিয়া নিশিদিন কথা বলুন। আমি নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া থাকি।"

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

পূর্ব্ববারে আমরা ১৮৬৯সনে কেশবচন্দ্র বোম্বে প্রার্থনা সমাজ-মন্দিরে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। আজও আবার সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। কেন না আমার এ প্রবন্ধাবলী আজও একখানি পুস্তকরূপে ভাই ভগ্নীদের সমক্ষে ধরিতে পারি নাই। পাক্ষিক পত্রে মুদ্রিত হইয়াই এখন ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত হইতেছে। ১৫।২০দিন পরে পরে ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক ও পাঠিকাগণ পড়িতে সুযোগ পান; এ দিকে পূর্ব্ব বারে কতদূর বলা হইয়াছে, তাহা চক্ষের সমক্ষেই হউক বা মনের স্মৃতিতেও হউক, পরিদৃষ্ট হয় না। এজন্যেই পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের লিখিত বিষয়গুলি হইতে কিছু কিছু যথাস্থানে উদ্ধৃত করতঃ, ভাই ভগিনীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। আশা করি, আমার এ পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তি-দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

কেশবচন্দ্র প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বে বলিয়াছিলেন যে, "আমি আশার চক্ষে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে, একদিন ভারতের শিক্ষিতমণ্ডলী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া, তাঁহারা এ কাল পর্য্যন্ত যে জ্ঞান-রাশি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিবেন। অতি সামান্য লইয়া যাহা আরম্ভ হয়, পরিণামে তাহাই অসামান্য হইয়া পড়ে। বোম্বে, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে মাত্র ১২টি করিয়া লোক আমাদের সঙ্গে দাঁড়াইতে দাও, দেখিবে, আমরা সকলে মিলিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর জন্য এক জাতি হইয়া পড়িব। এবং ক্রমশঃ যাবতীয় সম্প্রদায়ের সকলকে গ্রহণ করতঃ, সম্মিলিত ভাবে এক মহা শক্তিশালী জাতি হইয়া পড়িব। আশা করি,

এমন দিন আসিতেছে যে, দিন আমরা নানা ভাগে বিভক্ত, নানা ভাবে অবস্থিত যাবতীয় সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক মহা জাতিতে পরিণত হইব। তখন যাবতীয় নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেই এক ঈশ্বরের মহিমাই মহিমান্বিত করিবে। প্রত্যেকে মিলিয়া তাঁহারই পূজা অর্চ্চনা করিবে। সকল প্রকারের বিভিন্নতা দূরীভূত হইয়া, সকলেই এক বিশাল পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িবে। ভারত আবার সঞ্জীবিত হইয়া, ঐ মুক্ত ও সঞ্জীবিত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও আমেরিকার সহিত কর মর্দ্দন করিবে। তোমরা কি বলিতে চাও যে, এ সকল কেবল কল্পনা ও স্বপ্নবৎ? আমি অনন্ত বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যেন 'ভারতের দুঃখ দুর্গতির অবসান হয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশে যেরূপ এক স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভারতেও যেন ঐ হাসি ফুটিয়া উঠে। বিধাতা প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত দেশহিতৈষণার দ্বার উন্মুক্ত করুন, যেন উহা সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। ঐ দেশ-হিতৈষণা হইতে মহৎ কার্য্যাবলী, পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া, ভারতের সমস্ত জাতির মনের ও আত্মার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করতঃ, ভারতের আত্মিক, কায়িক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করুক।" কেশবচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রাণেও জাগ্রত হইয়া, তাঁহাকে নানাবিভাগের নানাকাজে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণেও এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে নানাদিকে সংগ্রামে নিরত করিয়া তুলিয়াছিল এবং কেশবচন্দ্রের প্রাণেও ইহাই আজীবন কার্য্যকরী হইয়াছে। এখন সকলেই মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ কি উদ্দেশ্যে এদেশে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পিতৃত্ব স্বীকার করতঃ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মের ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের "পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব" এই একমাত্র সাধারণভূমির উপরে সম্মিলিত হইবার পথের যাবতীয় বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া দিবে এবং দ্বিতীয়তঃ সহস্র প্রকারের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী সমূহ তুলিয়া দিয়া যেন সকলেই এক বৃহত্তম জাতি হইয়া পড়ে, সকলেই যেন এক বৃহত্তম অখণ্ড পরিবারভুক্ত হইয়া, "আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান" এ সঙ্গীত যেন সমস্বরে গাহিতে পারে। ভারতভূমি পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র, আসিয়া মহাদেশ মানব মাত্রেরই এক সাধারণ তীর্থভূমি। জগতের শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত এবং আর্য্য অনার্য্য যাবতীয় জাতি সমূহেরই এক ঈশ্বরই স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা। আমাদিগের সকলের হৃদয়েই একই রক্ত। একই উপাদানে সকলে গঠিত। একই ঐশ্বরিক নিয়মে আমরা এ জগতে আসিয়াছি। একই ব্যবস্থা আমাদিগের সকলকে এ জগৎ হইতে অপসৃত করিবে। যাবতীয় মানবজাতি পৃথিবীর একই পরিধিতে অবস্থিত, এক ঈশ্বরই কেন্দ্রে থাকিয়া সকলকে তাঁহার দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। এই বিরাট ব্যাপার অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আসুন, আমরা যেন মিলিতকণ্ঠে গাহিতে পারি :—

ভিন্ন কেহ নহি মোরা, সবে একেরই সন্তান,
একেরই আশ্রয় লয়ে জুড়াব তাপিত প্রাণ॥
হিন্দু বা মুসলমান, ইহুদি কিম্বা খ্রীষ্টান,
শিখ বৌদ্ধ আদি সবে পূজে এক ভগবান।
যত ধর্ম্ম ধরাতলে, একেরই মহিমা বলে,
মুক্তিপথে ল'য়ে চলে বিশ্বাসী জনে ;
যুগে যুগে দেশে দেশে, যত সাধুগণ এসে,
সকলেই এক ভাবে জুড়ায় পাপীর-প্রাণ।
তবে কেন হিংসা দ্বেষে, অকূলে বেড়াও ভেসে,
ত্বরা করি লও এসে, একেরই শরণ ;
হয়ে এক পরিবার, চল ভাই ভবের পার
আশ্রয় করে' তরণী সুন্দর নববিধান॥"

অন্যত্র হইতেও আবার সকলে গাহিবে :—

"কর হে আনন্দে জয়গান, হয়ে এক প্রাণ,
আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান ;
এক জ্ঞান, এক শক্তি, এক ধর্ম্ম, এক ভক্তি,
এক পথ, এক গতি, এক গম্যস্থান ;
তবে কেন ভেদবুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান।
যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই, এই ভবে,
সেখানে যাইতে হবে বিধির বিধান ;
তিনি বিনা কারও কাছে নাহি আর পরিত্রাণ॥"

যে সংগীত দুইটি হইতে উপরোক্ত কথাগুলি দেখান হইল, ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প, প্রয়াস এবং সংগ্রামের উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

এখন আমরা দেখাইব যে, কি কি উপায়ে এই মহা সম্মিলন সাধিত হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই সম্মিলনের চিত্রখানি চিত্ত-পার্শ্বে রাখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, এমন এক ধর্ম্মমন্দির প্রকাশিত করা যাইতে পারে, যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় লোকেই পূজা প্রার্থনাদি করিবার নিমিত্ত একত্র হইতে পারেন। সুতরাং এমন ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, যেখানে এক জাতি অন্য জাতিকে পৃথক ভাবিবার, অথবা জাতিগত হিসাবে বসিবার কোন তারতম্য করিবার কোন চিহ্নই থাকিতে পারিবে না, যেখানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই তুল্যাধিকার চিরদিন ঘোষিত হইবে। এক কথায় যেখানে জাতিভেদের কোন লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হইবে না। কেন না, ইহা একটি সহজ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত যে, যেখানে প্রতিমা বা মূর্ত্তিপূজা অথবা কোন

নরপূজার ব্যবস্থা থাকিবে, সেখানে কখনও সকল জাতীয় লোক সম্মিলিত হইতে পারিবে না। প্রতিমা-পূজারই হউক বা নর-পূজারই হউক, যত কেন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কাল্পনিক অথবা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও রূপক-গত ব্যাখ্যাই হউক না কেন, কোন মুসলমান্ বা খৃষ্টান বা শিখ সেখানে প্রবেশই করিবে না। অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, প্রাচীন মিসরবাসীদের একজন কুমীরের পূজা করিত, অন্যজন কুমীরকে ভক্ষণ করিত, এই উভয় জনে নিয়ত সংগ্রাম চলিত। সুপ্রাচীন বৈদিক ইতিহাসে উল্লিখিত রহিয়াছে, যখন দেবতারা পুরোডাস (পরেটা) প্রস্তুত করতঃ অন্যান্য নানা লোভনীয় সামগ্রীর সহিত যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন, তখন তাঁহাদেরই জ্ঞাতি বা "মাসতুত" ভ্রাতা দৈত্যেরা ও দানবেরা (ইঁহারা এখনকার কালের ব্রাহ্মণদের মতই অনেকটা ছিলেন, বলা যায়; দৈত্য দানবেরা যজ্ঞ-বিরোধী ছিলেন) আসিয়া দেবতাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া তত্তাবৎ ভক্ষণ করিত; এতৎস্থলেও অনেক সময় উভয় দলের ভিতরে সংগ্রাম চলিত। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে নানা মূর্ত্তিপূজা বা নর-পূজার মন্দিরে যতই না কেন উদারতা বা সার্ব্বভৌমিকতা প্রদর্শিত হউক, সেখানে কখনও কোন মুসলমান প্রবেশ করিবে না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বাঙ্গালীদিগের ভিতরে প্রতিমা-পূজার বা নরপূজার মন্দিরে সার্ব্বভৌমিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, মহাত্মা গান্ধীর আখ্যাত "হরিজন" এবং আমাদের বাঙ্গালীদের তথাকথিত বর্ণহিন্দুর অপূর্ব্ব সমাবেশ সংসাধিত হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহা জাতীয়তার দিক হইতে দেখিলে, দেখা যাইবে যে, এ মিলন অন্তঃসারশূন্য বা শূন্যগর্ভ। কেন না একেশ্বরবাদী মানবসমাজ দূরে থাকিয়া উহা এক তামাসার বিষয় বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছে। আমরা ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত লোকেই একথা বিশ্বাস করি ও সাহসভরে বলিতে পারি যে, যতদিন পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এদেশে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি-গণের একত্র সম্মিলনের আশা করা যাইতে পারিতেছে না। এজন্য ব্রাহ্মসমাজ ঐ সেই রাজা রামমোহন রায়ের যৌবন-প্রাপ্তির প্রাক্কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত, পৌত্তলিকতার ও জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে এবং চিরদিনই করিতে থাকিবে। রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা নানা ভাবেই দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী চিরদিনই তাহা ঘোষণা করিবে। এজন্য তিনি একেশ্বরবাদ-প্রচারের নিমিত্ত নানা ভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন, যেন এই প্রতিমা-পূজা-বিবর্জ্জিত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জগতের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণের সম্মিলিত ভাবে এক ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথও এজন্য পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৩ সনে বাঁশবেড়ে গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার সময়ে, ৫০০ শত লোকের ভিতরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রগণ যখন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বভাবতই কৌতূহলী হইবে এবং কিছু পরিমাণে ঈশ্বরের স্বরূপও জ্ঞাত হইবে, তখন তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের নিজেদের পরিবারে পৌত্তলিক পূজা চলিতেছে এবং অসার আমোদ প্রমোদ, হাস্য কৌতুকই লোকে ঈশ্বরের পূজা বলিয়া মনে করিতেছে। তখন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব না জানিতে পারিয়া নিরাশ হইবে এবং অনেকেই বিজাতীয় খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি অবলম্বন করিবে। অতএব স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান-সম্পন্ন হয়, সে জন্যই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।" সেই দিনই উক্ত পাঠশালার স্বনাম-প্রসিদ্ধ শিক্ষক চির-যশস্বী অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় এক তেজস্বিনী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "আমরা আর কোন বিষয়েই আপনাদিগের উপরে নির্ভর করিতে পারি না। খৃষ্টান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে শঙ্কা হয় যে, না জানি পরের ধর্ম্মই বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এক্ষণে আমাদের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষার শিক্ষা প্রদান করা এবং দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।" ১৮৬৭ সনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে যখন 'মহর্ষি' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এখন এক কোণ হইতে উত্থিত হইতেছে, পরে ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, বস্তুতঃ এতকাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে। এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে। সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে, এই আমার কামনার বিষয়।"

১৮৪৫ সনের ৭ই পৌষ, দেবেন্দ্রনাথ তখনকার সমস্ত ব্রাহ্ম-দিগকে লইয়া পলতার পর পারে গোরিটীর বাগানে এক মেলা করেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ঐ মেলাতেই রাখাল-দাস হালদার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মদের যখন জাতিভেদ নাই, তখন উপবীত রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই, উপবীত পরিত্যাগ করাই উচিত। ১৮৫১ সনে সুপ্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ১৮৫৪ সনে দেবেন্দ্র-নাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন যে, "আমার মতে, ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। অতএব তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মদিগের উপবীতই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি জাতিভেদ কোথায় থাকে? আর কি বিবাহসময়ে জাতিভেদ করা যায়? বোধ হয়, এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও এ পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার সাধ্য নাই।" দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে, তাঁহার কন্যাকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহ দিতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত হইলে মাতা ক্ষিপ্তা হইবেন, ভ্রাতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, ইহা ভাবিও না। তোমার ভিতরে আমি যখন ব্রহ্মাগ্নি দেখি, তখন তুমি কেমন করিয়া কন্যার বিবাহের সম্প্রদানশালায় সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের স্থানে ক্ষুদ্র অযোগ্য সৃষ্ট বস্তু আনিয়া বসাইবে? ইহা আমার অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে, সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীট-আবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি হইতে পারে?"

পরিতাপের বিষয় এই যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের ভিতরে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজী শিক্ষার প্রাথমিক যুগে কতকটা সংঘটিত হইলেও, পরবর্ত্তী সময়ে সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। রামমোহন রায়ের বিলাত-গমনের পর বৎসরই ডিরোজিওর প্রধান শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রভাবে এদেশীয়দিগের প্রচলিত সংস্কার এখন আর বিদূরীত হইবে না, এ বিশ্বাস হইতেই ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না। ছই বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় স্যার ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় টাঙ্গাইলে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমিতিতে সভাপতিরূপে দুঃখ করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, "আমি দেখিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করি, যখন দেখি যে, আমি বিজ্ঞান কলেজে এম, এ, অধ্যয়নরত যে সকল যুবককে হাতে কলমে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণের ব্যাপারটা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, তবু তাহারাই এম, এ, পাশ করতঃ গ্রহণের সময়ে গঙ্গাস্নান করতঃ পবিত্র হইবার জন্য অতি ব্যগ্র হইয়াছে।" ইহাতেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের গভীর গবেষণাতেও প্রকৃতিগত বদ্ধমূল সংস্কার বিদূরীত হইবার নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ়সংকল্প।

মহর্ষি ১৮৬১ সনে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজনিয়ম দ্বারা যাহাতে সঙ্করবর্ণে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, এমত চেষ্টা করা এক্ষণে সঙ্গত বোধ হইতেছে।" ইহাতে মনে হয় যে, তিনি যেন আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপারে রাজবিধির সাহায্য না পাইলে, খুব একটা গোলযোগ ঘটিতে পারে। ইহার পরেই ১৮৬২ সনে পুনরায় রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন, "যে ব্রাহ্ম আপনার যাবতীয় সাংসারিক শুভ কার্য্যে অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের কাছে প্রণত হন এবং কোন প্রকারেই কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা না করে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করে। শর্ম্মণ, বসু, মিত্র প্রভৃতি যে সকল কুলের পদবী আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, পরিবর্ত্তন কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের তাহার অভিপ্রেত নহে, সে সকল পাদবী থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া যে ব্রাহ্মদের ভিতরে জাতিভেদ থাকিবে, ইহা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ শূদ্রের আদান প্রদান হইলে যে ব্রাহ্মবিবাহ হইল না, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। তোমার যদি অভিপ্রায় হয় যে, ভিন্ন জাতিতেও তোমার কন্যা সমর্পণ করিবে, তবেও এ প্রস্তাবে সমস্ত ব্রাহ্মই আহ্লাদিত হইবেন। এবং এমন পাত্রও আছে যে, সে তোমার কন্যাকে বিবাহ করিবে।" ১৮৬২ সনে সর্ব্বপ্রথম অসবর্ণ বিবাহ হয়। ১৮৬৩ সনে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী

(পুরী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় দিন, ২২শে মে, রবিবার, উৎসবমণ্ডপে প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ এবেলার উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তরুণ ভগিনীগণ মধুর সংগীত করিয়া উৎসবের গাম্ভীর্য্য ও মধুরতা বর্দ্ধন করেন। উদ্বোধন ও আরাধনায় জীবন্ত কেশব-জননীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া, নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপাসনা করেন। সর্ব্বসমন্বয়াচার্য্য বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞ সমাধান করিতে, স্বয়ং মা কেশবজননী তাঁহার এই নবশ্রীক্ষেত্রে সসন্তানে আবির্ভূত। জননী বিনা নবশিশু, নবভক্ত শ্রীকেশবের জন্মযজ্ঞ আর কে সমাধান করিতে পারে? এই মহান সাগরের উপকূলে, যেখানে বহুকাল হইতে কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিয়া, এক জগন্নাথের নাম লইয়া, তাঁহার পূজা ও দর্শন লাভ করিবার জন্য ভক্তিভাবে সমবেত হইয়াছেন এবং পরস্পরের জাত্যভিমান ভুলিয়া পরস্পরকে প্রেমান্ন বিতরণ ও আদান প্রদান করিয়াছেন, একমাত্র জগন্নাথ-দর্শনের জন্য কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখানে মিলিত হইয়াছেন, আজ সেই পুণ্যভূমিতে সর্ব্বসমন্বয় নববিধানের নবশ্রীক্ষেত্র মা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং নববিধান মূর্ত্তিমান নবশিশুর জন্মযজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য তিনিই আমাদিগকে এখানে আজ মিলিত করিলেন। যে নববিধান সমগ্র বিশ্বে সকল ধর্ম্ম এবং সকল মানবকে নবজীবন দিবার জন্য আবির্ভূত, তাহারই সাধনতীর্থ এই নবশ্রীক্ষেত্র রচনা করিয়া, মা আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। ঐ মহাসাগর যেমন সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া অনাহতভাবে নব জগন্নাথের জয়গান করিতেছেন, তেমনি একদিন নিশ্চয়ই এই মহাসমন্বয়বিধান সমগ্র জগৎকে অধিকার করিবে। শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার মহৎ জীবন দ্বারা তাহাই প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সকল মানবকে আপনার অঙ্গরূপে

গ্রহণ করিলেন। আমরা তাঁহারই জন্মযজ্ঞ-সাধনের জন্য আজ এই নবশ্রীক্ষেত্রে আহূত। এই যজ্ঞে মা স্বয়ং স্বর্গস্থ সমুদায় ভক্তপরিবারকে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সসাগরা পৃথিবীকেও তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছেন। যদিও আমরা অতি অল্পসংখ্যক ভাই ভগ্নী বাহিরে মিলিত, কিন্তু শ্রীকেশব যেমন বলিলেন, আমির পশ্চাতে আমরা, তেমনি এই দৃশ্যমান আমাদের পশ্চাতে অদৃশ্যমান সকল মানবাত্মা এই মহাযজ্ঞে আমন্ত্রিত।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, "মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃতিতে গঠিত।" তাই নিরাকার ঈশ্বর যে আছেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্যই এই মানবজীবন রচিত। শব্দ মূর্ত্তিমান না হইলে তাহা কেহ দেখিতে পায় না, তাই ঈশ্বরের বাণীপ্রসূত এই মানবজীবন। কিন্তু অজ্ঞানতা মোহ এই মানবের মানবত্ব বিনাশ করিল, তাই ব্রহ্মনন্দনের জন্মে মানবের দ্বিজত্ব প্রতিষ্ঠিত; তিনি বলিলেন, "যে আমাকে দেখেছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে।" পবিত্রাত্মজাত পিতার পুত্রত্ব প্রমাণ করিলেন ব্রহ্মনন্দন ঈশা; কিন্তু জগৎ তাঁহাকে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত মানবাদর্শ মহাজনদিগকে ঈশ্বরত্ব দান করিল। তাই বিধাতার বিধান মানবজীবনে পূর্ণ হইল না বলিয়াই নববিধানের আগমন, নববিধানের নবমানুষ শ্রীকেশবচন্দ্রের উদয়। শ্রীকেশবচন্দ্র মানবতার পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। মানবকুলে কাল বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন যিনি, তিনি দেখাইলেন, পাপপ্রবণ মানবজীবনও ঈশা গৌরাঙ্গের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তাই একদিকে যেমন স্বর্গস্থ সাধু ভক্তগণ, তেমনি অপরদিকে জঘন্য নারকী পাপিগণের সহিত সম অবস্থাপন্ন এবং সহানুভূতি যোগে এক হইলেন। শ্রীকেশব নিত্য নব নব জীবনে, নব নব দ্বিজত্বে, নব নব প্রগতি এবং অনন্ত উন্নতির সম্ভাবিত জীবনে মার হাতে গঠিত হইলেন। শ্রীকেশব নিজ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও আমিত্ব যেমন মহাযোগে ভগবানে বিলীন করিলেন, তেমনি ভ্রাতৃযোগেও বিশ্বমানবে তাহা নিমজ্জিত করিলেন, তাই তাঁহার জন্মে মানবের নিত্য নব নব জন্ম। যৌথ কারবারে যেমন উপার্জ্জিত ধন কাহারও একার নয়, কিন্তু সবারই সম অধিকার, তেমনি শ্রীকেশবচন্দ্র যে জন্মলাভ করিলেন, যে জীবনধন অর্জ্জন করিলেন, তাহা আমার তোমার সবারই যে প্রাপ্য এবং সম্ভোগের অধিকার, ইহা ঘোষণা করিলেন। "নারকী উদ্ধার হয়, ইহা যদি দেখিতে চাও, ভাই, আমার জীবন লাও, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে" ইহাই আশাচন্দ্র আশা দিলেন। আমরা যেন তাঁহার সঙ্গে এই মহাযজ্ঞে 'আমি আমার' আহুতি দিয়া, নববিধানে নূতন মানুষ হইয়া যাই। মা আমাদের ভিতর হইতে সেই নূতন মানুষকে বাহির করিয়া, এই জন্মযজ্ঞসাধনে আমাদিগকে ধন্য করুন।

ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এবং আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "নূতন মানুষ বাহির করা" পুনরাবৃত্তি করেন। ভাই নগেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র পাওা শেষ সঙ্গীত করেন।

মধ্যাহ্নে সমবেত ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হয়। রূপপুরের শ্রদ্ধেয়া যুবরাণী মাতা তাঁহার গৃহে রন্ধনাদির ব্যবস্থা করেন এবং এই প্রীতিভোজনে বিশেষ সাহায্য বিধান করেন। প্রেমাশ্রম হলে ভ্রাতা ভগিনীগণ আনন্দে প্রীতিভোজন করেন। পরে অন্ন ব্যঞ্জন উদ্বৃত্ত হওয়াতে, অনেক দীন দরিদ্রদিগকে তাহা বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে পাঠ আলোচনাদি হয় ও সন্ধ্যার সময় উন্মত্ত কীর্ত্তনান্তে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। আরাধনার স্বরূপসাধনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকেশবজীবনে যে সকল স্বরূপের সমাবেশ সাধন হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া, অধ্যাপক নিয়োগী মহাশয় সুমিষ্ট উপদেশ দিয়া বলেন, "শ্রীকেশবচন্দ্র যে উপাসনা, সাধনা ও নবভাবের ধর্ম্মসাধন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের এক অমূল্য সংস্থান; এ সাধন বিনা ব্রাহ্মসমাজের কিছুতেই পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবে না।" এ বেলার উপাসনায় প্রীতিভাজন ভ্রাতা ননীভূষণ দাস অধিকাংশ সঙ্গীত করেন এবং ভাই নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র পাওা সংকীর্ত্তন করিয়া শেষ করেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই জুন, শান্তিকুটীরে, শ্রীমান্ লাবণ্যচন্দ্র সিংহের দৌহিত্র, শ্রীমান্ গোকুলচন্দ্র পাইনের পুত্র শ্রীমান আশীষকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১১ই জুলাই, শান্তিকুটীরে, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের পঞ্চম কন্যা "বুড়ীর" জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মাতা ও ভাই বোনদের লইয়া প্রার্থনাদি করেন।

গত ১৩ই জুলাই, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমারের শুভ জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৫ই জুলাই, ৪০।১এ মনোহর পুকুর ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের শুভ জন্ম দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মিলনবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সন্তানগণ শ্রীমান্ রণজিৎ, বিশ্বজিৎ ও শ্রীমতী সুপ্রিয় প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ১৬ই জুলাই, বিধানজননীর কৃপায় তাঁর দীন সেবক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

ভগবান্ সকলের মস্তকে শুভাশীষ দান করুন।

নামকরণ—গত ১লা জুলাই, ১নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে, ৺অনুকূলচন্দ্র রায়ের পৌত্র, অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ সেনের দৌহিত্র,

শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায়ের শিশু পুত্রের শুভনামকরণ অনুষ্ঠানে, মধ্যাহ্নে ভাই অক্ষয়কুমার লধ এবং সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নের উপাসনায় শিশুকে "প্রণবকুমার" নাম প্রদান করা হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রত্যাবর্ত্তন—ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায় (M.B., D.T.M.) প্রায় তিন বৎসরকাল এডিনবরায় অধ্যয়ন করিয়া, Chemical research বিষয়ে Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গত ৪ঠা জুলাই, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা আমাদের প্রাণের গভীর সম্বর্দ্ধনা তাঁহাকে জানাইতেছি। দেশের কাজে, মণ্ডলীর কাজে উচ্চতর জ্ঞানের সহিত অধিকতররূপে আত্মনিয়োগ করিয়া, সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ধন্য হউন।

পারলৌকিক—গত ৬ই জুলাই, প্রাতে, হাওড়ায় ২১নং জয়দেব কুণ্ডু লেনের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ (৺যোগেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী) শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারীর মৃত্যু ও দীনবাবুর তৃতীয় সংোদর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকারের একমাত্র কন্যা কৃপাকণা সেন গুপ্তার মৃত্যু উপলক্ষে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন ও দীননাথবাবু উভয় আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে দীনবাবু ধুবড়ী অঞ্চলে জলপ্লাবনে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে ১০০৲, কলিকাতা নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲, গিরিডি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, ধুবড়ীর ব্রাহ্ম সমাজে ৫৲ এবং সেবক ভাই অখিলচন্দ্রের সেবার্থে ৫৲ টাকা, মোট ১২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে জুন, শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় শান্তিকুটীরে কীর্ত্তন, প্রার্থনা, পাঠাদি হয়। অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ পাঠ করেন ও নালুদার জীবনী বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। লেঃ কঃ জ্যোতিলাল সেনের নেতৃত্বে কীর্ত্তনাদি হয়। এই উপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও উপাসনাদি হয়।

গত ১৬ই আষাঢ়, প্রাতে অমরাগড়ীতে রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের মাতা ৺গোলাপসুন্দরী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায়ও সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও রাত্রে কীর্ত্তন হইয়াছিল। অদ্য সন্ধ্যাকালে কলিকাতায়, ৩৬ডি বলরাম দাস রোডে, ৺প্রসন্নকুমার রায়ের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২রা জুলাই, ১।১ রাসবিহারী এভেনিউ ভবনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৬ই জুলাই, হাওড়া বাঁটরায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, ৺বসন্তকুমার দাসের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৭ই জুলাই, প্রাতে হাওড়ায় ২১নং জয়দেব কুণ্ডু লেনে, শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের সহধর্ম্মিণী ৺বিভাবতী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন ও দীননাথবাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিকণা ঘোষ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই জুলাই, প্রাতে নবদেবালয়ে, গৃহস্থ বৈরাগী ৺রাজমোহন বসুর পুত্র ৺নির্ম্মলচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কটক মধুভবনেও উপাসনা হয়।

গত ১১ই জুলাই, ভাই প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র প্রমোদের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শান্তিকুটীরে শিশুসমাগম হয় এবং শিশুদের লইয়া প্রার্থনাদি হয় ও শিশুদিগকে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

গত ১৩ই জুলাই, ১৩।১এ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তদের গৃহে, তাঁদের পিতৃদেব ৺সতীশচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রবধূ শ্রীমতী সান্ত্বনা দত্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৩ই জুলাই, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে, ৺সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীমান্ কৃপাংশুনাথ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র"

(শতবার্ষিকী সংস্করণ)

ভগবানের বিশেষ কৃপায়, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক নিবদ্ধ "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক বৃহৎ গ্রন্থের শতবার্ষিকী সংস্করণে মূল অংশের (Text) মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। নির্ঘণ্টাদি মুদ্রিত হইতেছে। সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে, আশা করি। এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে যাহা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত ন্যূনাধিক আরও ৩০০৲ টাকা সাহায্যের প্রয়োজন। তদর্থে বন্ধুগণের নিকট আবার উপস্থিত হইতেছি। ভগবানের কৃপায় যখন অধিকাংশ সাহায্যই পাওয়া গিয়াছে, তখন এই সামান্য সাহায্যও যে সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, তাহাতে সম্পূর্ণ আশা রাখি। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির মূল্য ১০৲ টাকা ধার্য্য হইল। আগষ্ট মাসের মধ্যে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া অগ্রিম মূল্য প্রদান করিলে, ৮৲টাকায় পাওয়া যাইবে।

"জ্ঞানকুটীর", এলাহাবাদ ;
১০ই জুলাই, ১৯৩৮ সাল। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
1st. August, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, তুমি এই মানব-জন্মদায়িনী, তুমি আত্মাময়ী; তোমার আত্মা হইতেই আত্মজরূপে এই মানবজন্ম দিয়াছ। তুমি তোমার ইচ্ছায় স্বয়ং এই মানব-দেহ গঠন করিয়া, ইহার ভিতর কেমন করিয়া তোমার আত্মার শিশু-জন্ম দাও, তাহা আমরা জানি না। কি অলৌকিক কৌশলে মার গর্ভে স্বহস্তে ক্রমে ক্রমে এই দেহ-মন্দির গঠন কর ও তাহার ভিতর তোমার পবিত্র আত্মজাত শিশুকে রক্ষা কর, এবং তোমার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ কর, ইহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাই। আমাদের প্রত্যেককেই তুমি নবশিশুরূপে জন্ম দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছ। নিজ নিজ জন্মদিনে আমরা ইহাই স্মরণ করি, আমরা যে তোমাজাত, তোমা হইতে প্রত্যেকে প্রেরিত; তোমারই প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া তোমারই প্রিয় হইব, ইহারই জন্য আমাদিগকে তুমি এই মানবজন্ম দান করিয়াছ। পিতামাতার ঔরস গর্ভে যদিও আমাদের এই দেহ গঠিত, কিন্তু আমাদের আত্মা প্রত্যক্ষ তোমার পবিত্রআত্মজাত। এই মানবজাতি যে তব জাত, নবজাত, পবিত্রাত্মজাত, ইহা যেন আমরা স্মরণে রাখি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমরা সংসারে কুসঙ্গে পড়িয়া, কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া, দুর্ম্মনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, হায়, কেন তোমার অপ্রিয় হইলাম! আমরা কার সন্তান, কোথা হইতে আসিলাম, কে আমাদিগকে নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ হইবার জন্য এই মানব-দেহে আনিল, আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া কেন ইহা ভুলিয়া যাই? আমরা তোমাকে ভুলিলেও তুমি আমাদিগকে ভুল না; তাই তুমি আমাদের বাহ্যদৃষ্টির অগোচরে নিরাকার অন্তঃপুরে থাকিয়া, আমাদের মঙ্গল কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই কাছে কাছে রহিয়াছ এবং যাহাতে আমরা তোমার প্রভাব জীবন্তরূপে অনুভব করিতে শিক্ষা করি এবং আত্মবিস্মৃত না হই, তাহার জন্য তুমি আমাদিগকে এই ধর্ম্মবিধান দিয়াছ। আবার যুগে যুগে যেমন মানবের পরিত্রাণের জন্য ধর্ম্মবিধান সকল পাঠাইয়াছিলে, বর্ত্তমান যুগে তুমি সেই সর্ব্ববিধান সমন্বয় করিয়া, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান নববিধান আমাদিগের জন্য দান করিয়াছ এবং তুমিই আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে গুরু হইয়া এই বিধানে দীক্ষিত ও পরিত্রাণার্থী করিয়াছ। আমরা তোমারই কৃপাগুণে যেমন ভক্ত পিতামাতার ঔরসগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তেমনি নবজন্ম-লাভের জন্য, দ্বিজত্ব-লাভের জন্য, তোমার এই নববিধানে আশ্রয় পাইলাম। আবার শুধু তাই নয়, তোমার এই নববিধানে যাঁহাকে চির নবশিশু, আদর্শ বিশ্বমানব নবশিশু রূপে জন্মদান

করিয়াছ, তোমার আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদিগকে, তোমার সেই নবশিশুকে আমাদের চিরসঙ্গিরূপে, তাঁহার সহিত মিলাইয়া দিয়াছ। তুমি যে আমাদের মা, তুমি যে আমাদিগকে নবশিশু করিয়া জন্ম দিয়াছ, ইহা আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম; তাই যাহাতে আমরা চির নবশিশুদল হইয়া তোমা জাত সন্তানরূপে এ দেহ-পুর-বাসে বাস করি, সেই আদর্শ দেখাইবার জন্য, তুমি তোমার নবশিশু কেশবসঙ্গে আমাদিগকে নববিধানে আশ্রিত করিলে। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় কৃপা স্মরণ করিয়া, নিত্য নিত্য তোমার নবজাত নবশিশু হইয়া, কেশবের সঙ্গিরূপে পরিচিত হইতে পারি। মার নবশিশু সর্ব্বদাই মার কোলে কোলে লালিত পালিত হয়, মা স্বয়ং শিশুকে তাঁহার মনের মত মানুষ করিয়া গঠন করেন; আমরাও তেমনি তোমার দ্বারায় গঠিত হইব। আমাদিগকে তোমার সেই নবশিশুর ছাঁচে গঠিত কর। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ দাও।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীকেশবের জীবনবেদ

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "হে অনন্ত বেদব্যাস, তুমি যেমন করিয়া জীবনবেদ লিখিয়াছ, আমার জীবন-পুস্তক লিখিয়াছ, এমন শাস্ত্র কই? তুমি নিজ হস্তে কলম ধরিয়া লিখিতেছ, পুস্তকের শিষ্য চাই, পাঠক চাই; গুরু তুমি, লেখক তুমি। যদি এই গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পাড়, কত জ্ঞান পুণ্য লাভ হয়। এই জীবন-গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই বহুমূল্য পুস্তকখানি মানুষ যদি আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে যায়, অনর্থ ঘটে। তুমি লিখিয়াছ, তুমি বুঝাইতে পার। মা, তুমি বইখানি খুলিয়া পৃথিবীর কাছে দাও, গুপ্ত জীবনের রহস্যগুলি লোককে পড়াও। পৃথিবী পড়ুক, শিখুক। এ পুরাণ ছাড়া নূতন পুরাণ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের লেখা বাইবেল গ্রন্থ। ইহা ভবিষ্যতে হাজার হাজার লোক পাঠ করিবে, জ্ঞান পাইবে এবং সেই জ্ঞানে শান্তিরস পাইবে; ইহার অক্ষর-গুলি দেবাক্ষর, পদ্মাক্ষর। এ পাপীর জীবন লিখিলে মুক্তার অক্ষরে? সরস্বতী, কোটী কোটী প্রণাম করি তোমাকে; আমরা যেন এ জীবন-পুস্তকের সমাদর করি এবং ইহার সত্য সকল সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদর কর।"

শ্রীকেশবচন্দ্র নিজ জীবনকে জীবনবেদ বলিয়া, পুরাণ অপেক্ষা নূতন পুরাণ বলিয়া, বাইবেল গ্রন্থ বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, প্রচার করিলেন। ইহা ঈশ্বরের স্বহস্তে লিখিত, দেবাক্ষরে, মুক্তার অক্ষরে লিখিত। সত্যই যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনিই বুঝাইতে পারেন। আমরা নিজ বুদ্ধিতে যদি বুঝিতে যাই, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। তিনি তাই বলিলেন, ইহা যদি আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে যাই, অনর্থ ঘটে।

বাস্তবিক আমরা কেশবজীবন আপন আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি বলিয়াই, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা করিতেছি এবং তাহা লইয়া আমাদের কতই মতভেদ উপস্থিত হইতেছে। বেদ, বাইবেল, পুরাণ সম্বন্ধেও তেমনি আমরা নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে বুঝিতে চেষ্টা করি বলিয়াই, আমাদের মধ্যে এত মতভেদ ধর্ম্মভেদ সম্প্রদায়-ভেদ উপস্থিত হইতেছে।

তাই শ্রীকেশবচন্দ্র সাবধান করিয়া দিলেন, আমরা যেন নিজ নিজ বুদ্ধিতে তাঁহার জীবনতত্ত্ব অধ্যয়ন না করি; কিন্তু যিনি তাঁহার জীবন রচনা করিয়াছেন, সেই মহাগুরু পবিত্রাত্মার পদতলে বসিয়া যেন অধ্যয়ন করি। এবং তাঁহার জীবনের ঘটনাবলিরূপ গদ্য, পদ্যগুলি যেন পবিত্রাত্মার আলোকেই বুঝিতে চেষ্টা করি।

বাস্তবিক ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীকেশবচন্দ্রের ভাবের ভাবুক না হইলে এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানে শিষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন না হইলে, কেমন করিয়া অহংকৃত জ্ঞান-বিচার দ্বারায় এ জীবনবেদ আমরা বুঝিতে পারিব? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ব্রাহ্মণেরা বলিতেন, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই; ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, আমাদের অহংকৃত জ্ঞানই আমাদের এই শূদ্রত্ব। এই শূদ্রত্ব পরিহার করিয়া দীন শিষ্যত্ব অবলম্বন করিলে, তবে আমরা এই মহাবেদ নববিধান-বেদ বুঝিতে এবং অনুসরণ করিতে সক্ষম হইব।

এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার কোন নিকট বন্ধুকেও তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে নিবারণ করিয়াছিলেন এবং নিজেই আপন অধ্যাত্ম জীবনতত্ত্ব বিবৃত করিয়া জীবনবেদ নামে অভিহিত করিলেন। আমরাও প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ জীবনকে ঈশ্বরের হস্তরচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি এবং তদনুসারে নিজ নিজ জীবনে ঈশ্বরের

লীলা দর্শন করিয়া জীবনকে বেদরূপে সম্পাদিত করিতে পারি, ইহাও শিক্ষা দিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনকে কেবল জীবনবেদ বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তাহা নহে, ইহা যে পুরাণ অপেক্ষাও নূতন পুরাণ. ইহা বাইবেল গ্রন্থ, ইহাও নির্দ্দেশ করিলেন। অর্থাৎ বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ সকল শাস্ত্রেরই একাধারে সমাধান তাঁহার জীবনে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, আমরা মার হাতে গঠিত, মার স্বহস্তের চন্দনের গন্ধে ইহা সুগন্ধযুক্ত। তাই বর্ত্তমান যুগে অমূল্য কেশবজীবন-গ্রন্থ কেবল আমরা পাঠ করিব না, কিন্তু তদনুরূপ জীবনগঠনে আমরা আকাঙ্ক্ষিত এবং সচেষ্ট হইব ; এবং তিনি যেমন প্রার্থনা করিলেন, আমরা তেমনি ইহার প্রকৃত সমাদর করিব এবং ইহার সত্যগুলি সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন।

—•—

বায়ু-পরিবর্ত্তন

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন একটি বিশেষ বিধান। চিকিৎসা-বিধানে ঔষধ-সেবন অপেক্ষা বায়ুপরিবর্ত্তন অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। ঔষধে যে রোগ আরোগ্য না হয়, বায়ুপরিবর্ত্তনে তাহা অনায়াসলভ্য। তাই অস্বাস্থ্যকর স্থানে বা সহরে ও পল্লিতে যাহারা বাস করে, তাহারা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর আবাসে, পর্ব্বতে বা সাগরোপকূলে সময়ে সময়ে গমন করে এবং পরিবর্ত্তনের দ্বারায় সুস্থতা ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে। চিকিৎসা-বিধানে বায়ুপরিবর্ত্তন যেমন, নববিধানে উপাসনাও তেমন। উপাসনা আর কি? জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গ সহবাসে অধিবাস; তাঁহার সঙ্গে অধিবাস দ্বারায় জীবনের সুস্থতা ও স্বাস্থ্য লাভ করা। আমরা সংসারের বিষয় মধ্যে এবং অহং-পাপকলুষিত দেহ-প্রবাসে বাস করিয়া থাকি, এখানকার আবহাওয়ায় আমাদের পদে পদে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নানাপ্রকার পাপরোগের বীজাণু আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমাদের মানবীয় সুস্থতা ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে ও নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত করে; তাই নববিধান-বিধাতা বিধান করিয়াছেন, আমরা আমাদের ঘরে একটি স্বাস্থ্যনিবাসরূপ দেবালয় রচনা করি, কিম্বা সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রা করি এবং সেখানে জীবন্ত ঈশ্বরের স্বরূপের বলকর অক্সিজেন সেবন করি। যেমন জীবন্ত মা, তেমনি তাঁর সঙ্গে সাধু ভক্তগণ সেখানে নিত্য অধিবাস করিতেছেন। যাঁহারা সেই স্বর্গের বাতাস এবং সৌরভ ফুলের বাগানের ন্যায় বিকীর্ণ করিতেছেন, সেই সৎসঙ্গ-সহবাসে ধরায় স্বর্গবাস লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা আমাদের অস্বাস্থ্যকর মন প্রাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করে। ইহাই যথার্থ বায়ুপরিবর্ত্তন।

—

হর-গৌরী

অর্দ্ধাঙ্গ হর, অর্দ্ধাঙ্গ গৌরী, ইহাই হর গৌরীর রূপ, প্রাচীন বিধানে, অঙ্কিত বা কল্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধানে নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্র সস্ত্রীক যুগলসাধনে দু'জনে একজন হইলেন, ইহাই পরিবারসাধনের আদর্শ। তিনি আরও এক দিকে যেমন সাধু মহাপুরুষদিগকে আপন উচ্চ অঙ্গ বলিয়া তাঁহাদের মহৎ জীবন পরিধান করিলেন, তেমনি ঘোর পাপী নরনারীকেও একই দেহের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেন। মহাপুরুষদের সহিত অধ্যাত্ম ভক্তি-যোগ-সাধনায় যেমন তিনি সিদ্ধ, তেমনি প্রেমযোগেও পাপী মানবকে আপনার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাই তাঁহার একাঙ্গ যেমন সাধু মহাপুরুষগণ, অপরাঙ্গ তেমনি পাপী অধম নরনারী। এই যুগল-সাধনে সিদ্ধি-লাভেই নববিধানে নব বিশ্বমানবত্ব।

—•—

নববিধান

শ্রীকেশবচন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী

শত বর্ষ আগে
এসেছিলে হে মহান্ বিশ্বের আলোকে,
ধরণীর কোলে।
ভালে তব লেখা ছিল বিজয়-তিলক,
ধরিত্রীর প্রাণে, নাহি জানি, উঠেছিল
কি বিপুল বিস্ময়-পুলক মহা কলরোলে।
প্রথম সূর্য্যের রশ্মি আঁধার ধরণী পরে,
হানে যথা আলোকের তীর ;
অজ্ঞতার অন্ধকার নাশিবারে তুমি,
তেমনি করিলে মনে স্থির।
কঠোর বৈরাগ্য নিষ্ঠা কর্ম্মের প্রেরণা,
এনে দিল দেশে দেশে নবীন চেতনা ;
আহ্বান করিলে তুমি এই ধরণীরে,
ধরি তব বিধান-বিষাণ—
সঙ্গ তব লভি, সঞ্জীবিত হলো কত
কঠিন পাষাণ।
বেদান্তের সুদুর্জ্জের পরম ব্রহ্মেরে
মাতা বলে, সখা বলে, এনে দিলে ঘরে ;
আপনি হইলে নিজে শিশুর মতন,
মার সাথে নিশিদিন হ'তো আলাপন।

সাড়া দিল সব দেশ তোমার আহ্বানে,
হ'লো তব জয়!
পূত মন্ত্রে তব, দীক্ষা লভি নরনারী,
বিধানপতাকা-তলে লভিল আশ্রয়।
শতাব্দীর পরে আজও তব বাণী
মৃত প্রাণে দেয় শক্তি আনি।
হে আর্য্য, হে পূতচিত্ত, হে মহামানব,
আর একবার তোমার পতাকাতলে
ভীতি ভয় কর পরাভব।
হে কেশব, চিত্ত মাঝে স্মরি তব নাম,
নিবেদন করি আজি হৃদয়ের সহস্র প্রণাম।

লাবান, শিলং; ৮ই জুন, ১৯৩৮। প্রণত শ্রীশচীন নীর

—•—

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

ব্রহ্ম-জ্ঞান

(২য় প্রবন্ধ)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ব্রহ্মানুভূতি সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্মকৃপা থাকিলে এবং সাধকের বৈরাগ্য স্বাভাবিক হইলে, ব্রহ্মানুভূতি হইতে বিলম্ব ঘটে না। এক্ষণে বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিব যে, ভগবৎপ্রসাদ ও আত্মচেষ্টার সম্মিলনে সাধক ব্রহ্ম-জ্ঞানের পথ দিয়া ব্রহ্মানুভূতির অবস্থায় পৌঁছাইতে পারেন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে, সাধক ব্রহ্মকে চিনিলেন, কিন্তু জানিলেন না। এক্ষণে সর্ব্বপ্রথমে আমরা চেনা ও জানার প্রভেদ বিশ্লেষণ করিতে চাই। যাহাকে হৃদয় দিয়া আমরা অনুভব করি, তাহাকে আমরা চিনি। যাহাকে মস্তক দ্বারা অনুভব করি, তাহাকে জানি। আর একটি বিশ্লেষণের উপায় নির্দ্দেশ করিতে চাই। লোককে চিনিবার জন্য অপরের সহায়-তার উপর আমরা নির্ভর করি না, কিন্তু জানিবার জন্য কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির Introducton আবশ্যক। কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার করিয়া দিই। আমরা শৈশব-কালে মাতাকে চিনি, কিন্তু পিতাকে জানি। তবে মাতার অবর্ত্তমানে যদি পিতা আমাদিগকে পালন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পিতাকে চিনি ও আর সকলকে জানি। আবার যদি পিতামাতা উভয়কে নিকট জানিয়া ভালবাসিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহাদের ভালবাসা বিনা চেষ্টায় পাইয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দুই জনকেই চিনি এবং তাঁহাদের সাহায্যে আত্মীয়-বন্ধুদিগকে জানি। এমনও হইতে পারে, আজ যাহাকে জানি, পরে তাহাকে চিনি। যাহাদের সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়, সেইরূপ বরবধূ পরস্পরকে জানে, কিন্তু ক্রমশঃ চেনে। হৃদয়-বিনিময় হইলে তাহারা উভয়ে উভয়কে চিনিতে থাকে। আবার ভাই ভাই বাল্যকালে পরস্পরকে চিনে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের জীবনের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইলে এবং হৃদয়ের টান প্রশমিত হইলে, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে না, কিন্তু জানে। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস, এই শেষের দৃষ্টান্তটি কদাচ দেখা যায়। চেনার ভাগ কমিয়া গিয়া জানার ভাগ বাড়িতে পারে, কিন্তু একেবারে চেনা যায় না, এমন হয় না। হৃদয় দিয়া যাহার সহিত পরিচয় হয়, সে সম্বন্ধ অনন্তকালের সম্বন্ধ ও তাহা ব্রহ্মানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। অতএব চেনা ও জানার মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা বোঝা গেল।

আবার বলি, প্রথম প্রবন্ধে ব্রহ্মকে চিনিয়াছি, কিন্তু জানি নাই। জানিবার প্রয়োজন কবে আসে? এইমাত্র ত বলিলাম, চেনার ভাগ (Direct contact) কমিলেই জানার ভাগ (Indirect contact) আরম্ভ হয়। ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ মানুষের সহিত সম্বন্ধের অনুরূপ, একথা বলিতে বাধা পাই, অথচ বারবার উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে পরিষ্কার না করিলেও নয়। প্রিয়তম ব্যক্তি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন তাঁহাকে খুব চিনি; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গুণগুলি স্মরণ হয়। যতদিন জীবিত থাকেন, তাঁহার গুণের স্রোত হৃদয় মধ্যে বহিতে থাকে বলিয়া, সে বিষয়ে আমরা খবর তেমন লই না। তা'ছাড়া মানুষটা আজ যেমন আছে, কাল ত তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে? এই জন্য ইংরাজীতে প্রবাদবাক্য আছে, "Call no man great till he is dead"। এই কারণে প্রিয়জনের দেহান্তের পর তাহার গুণরাশি মনকে অধিকার করিয়া ফেলে, দোষের ভাগ আমরা ভাবিতেও চাহি না। অতএব লোকটি জ্ঞানতঃ আমাদের কাছে সগুণ লোক হইল। অথচ ইহা কিছু তাহার পরিপূর্ণ সত্য পরিচয় নহে। কারণ সে ব্যক্তির গুণসমূহ যাহা মনে আছে, সে ব্যক্তির গুণসমূহ যাহা মনে নাই, তাহার সমষ্টি সেই জীবিত ব্যক্তি ছিল। যখন বাঁচিয়া ছিল, তাহার অমর সত্তাকে আমরা নিগুর্ণ ব্যক্তি (নিগুর্ণ অর্থে indefinably real) বলিয়া জানিয়া, তাহার চিরন্তন "আমি"র পরিচয় পাই। মৃত্যুর পর সে আমাদের নিকট "সগুণ ব্যক্তি" হইয়া গেল। একথা ভুলিলে চলিবে না, যাহা কিছু জীবন্ত অর্থাৎ সত্তাময় হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা কোন বিশেষ সময়ে ব্যক্ত হউক, অথবা অব্যক্ত থাকুক, সমস্তই নিগুর্ণ। যখন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মকে বা মানুষকে বা কোন কিছুকে তাহার মহিমায় তাহাকে অনুভব করি, বা স্মরণ করি, তখন তাহা সগুণ। এক কথায়, সমস্তই সত্তায় নিগুর্ণ, মহিমায় সগুণ।

আবার উদাহরণ দিই। মাতা যতদিন জীবিতা আছেন, তত দিন সন্তান ভাবে না, তাঁর গুণ আছে কি না, অথবা তাঁর রূপ কেমন? গুণহীনা মাতা বা রূপহীনা মাতাকেও কি মানুষ ভালবাসে না? সেইরূপ গুণহীন ব্রহ্ম অথবা নিরাকার ব্রহ্মকে আমরা প্রথম প্রবন্ধে হৃদয় দ্বারা চির আপনভাবে বরণ করিয়াছি।

এক্ষণে আমাদের হৃদয়ের টান অবহেলা করিয়া, যদি মস্তকের দ্বারা তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে যাই, অর্থাৎ তাঁহাকে আর চিনিতে চাহি না, জানিতে চাই, তাহা হইলে 'নির্গুণ ব্রহ্ম' যিনি সর্ব্বমানবের প্রিয়তম দেবতা, তাঁহার প্রকাশের পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বর্ত্তমান থাকেন, তবে আর তাঁহাকে হৃদয়ের রাজা বলিয়া পাই না, তিনি আমার মস্তকের প্রজা হইয়া যান। আমি নির্গুণ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সগুণ ব্রহ্মকে কাছে টানিয়া লই।

ইহা কিরূপে সম্ভব? ব্রহ্ম এমন সুবিধা কেন দিলেন? সাধকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এইরূপ সুবিধা আসিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, শিশু যখন প্রথম সূর্য্যালোক দেখে, সে এক বিস্ময়কর আনন্দ! তারপর দেখা ফুরায়, কিন্তু পরের দিন বা অন্য সময়ে আবার দেখে। সেইরূপ সাধকের জীবনে ব্রহ্মানুভূতি সব সময়ে অবিচ্ছেদে উপভোগ করা সম্ভব নাও হইতে পারে; কিন্তু আবার ব্রহ্মানুভূতির শুভমুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে। একবার অনুভূতি লাভ হইলে, আর একবার অনুভূতির সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ সেই মধ্যবর্ত্তিকাল ব্রহ্মজ্ঞানের শুভ অবসর। এক কথায়, ব্রহ্মানুভূতিতে স্মরণ নাই, ব্রহ্মজ্ঞানে স্মরণ আছে।

আবার সাধকের ইচ্ছামতই ব্রহ্মজ্ঞানের সুযোগ আসিতে পারে। নিজের জীবনের কথা স্মরণ করিলে এই উক্তির তাৎপর্য্য সম্যকভাবে বুঝিতে পারা যায়। আমি কি ইহা চাহিয়াছিলাম? নিশ্চয়ই চাহিয়াছিলাম। তিনি যে আমার রাজা, আমার চাওয়ার অন্তরায় কোনদিন তিনি হবেন না। আমি যদি তাঁহাকে আমার নিকট হইতে দূর করিয়া দিই, তিনি কথাটি না কহিয়া সরিয়া যাইবেন। আবার আমার ভাঙ্গাঘরে যেদিন অশ্রুজলের প্রদীপ জেলে তাঁহাকে ডাকৃব—তিনি ত বিমুখ হবেন না, আবার ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আপাততঃ পাঠক পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেও, আমি জানাইতে চাই যে, আমি তাঁহাকে হৃদয় দিয়া চিনিতে চাহি না, মস্তক দিয়া জানিতে চাই। ইহাতে আমার অপরাধ কি? আজ আমার মস্তক আমাকে এই কথাই বুঝাইতেছে যে, সব সময়েই আমি অসত্যভাবে তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। তবে এক্ষণে ভাল করিয়া দেখি না, তিনি আমার রাজার মত রাজা কি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল মনুষ্যেরই এই অবস্থা আসিয়া থাকে এবং উপনিষদের সাধকগণেরও তাহাই হইয়াছিল।

Garden of Edenএ Adam ও Eveএর এই অবস্থা বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। Eveএর মনে কেমন কৌতূহল জন্মিল। তবে কি স্ত্রীলোকদের কৌতূহল পুরুষদের চেয়ে বেশী? তাহাদের বিশ্বাসও যেমন প্রবল, অবিশ্বাসও তেমনই প্রবল হইতে পারে, সাধারণতঃ তাহারা পুরুষদের মত উদাসীন থাকে না। তাই মানবের আদিমাতা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বর্গীয় উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমরা বলিব, তাঁহারাই ঈশ্বরকে তাড়াইলেন। যেখানে ঈশ্বর রহিলেন না, সেস্থান কি স্বর্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? ঈশ্বর মস্তকের চাবিকাঠি তাঁহাদের হস্তে দিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইজন্য হৃদয় দুয়ার দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এখন হইতে মস্তক দ্বারা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। Old Testament দেখাইয়াছে যে, তাহা সম্ভব হইল না। তাই খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইলেন ও মস্তকের চাবিকাঠি ঈশ্বরকে ফেরত দিয়া, আবার তাঁহাকে হৃদয়সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা করিয়া বসাইলেন। Paradise Lost হইয়াছিল, এক্ষণে Paradise Regained হইল।

বাইবেলের এই গল্প অনুযায়ী ব্রহ্মানুভূতি হইতে বিচ্যুত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন করিবার চেষ্টা শুধু যে নিষ্ফল, তাহা নহে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেতও নহে এবং এরূপ করিলে মানুষ ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। মানুষ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এইরূপ করিলে, তাদৃশ পরিণাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু মানুষ যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিশুপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পথে স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রসর হয়, তখন ব্রহ্ম কি তাহাকে দণ্ডের ভাগী করিবেন? অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দের ভিতর দিয়া আবার তাহাকে শিশুপ্রকৃতিতে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতিদানে কৃতার্থ করিবেন? ঈশ্বরের পথ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারিব না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, উপনিষদ অনুসারে সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দিয়া বহু আনন্দে আবার ব্রহ্মানুভূতিতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন এবং লোকশিক্ষার দিক দিয়া এইরূপ ব্রহ্মপরিক্রমার কত যে সুফল, তাহা আমরা যতই উপনিষদের পথ ধরিয়া চলিব, ততই বুঝিব।

ব্রহ্মানুভূতির পথ হইতে আমরা এখনও ব্রহ্মজ্ঞানের পথে একপাও অগ্রসর হই নাই। শুধু বুঝিয়াছি, সাধক আপন সত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। যদি নিজ স্বভাবগুণে ব্রহ্মসাধক শিশুর মত অন্তঃকরণ লইয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, (কেশবের উপদেশ—"শরীরে বার্দ্ধক্য, অন্তরে শিশু" দ্রষ্টব্য) তাহা হইলে ত তিনি ব্রহ্মকে আজীবন চিনিবেন, জানিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে মানুষ সব সময়েই শিশু থাকিতে পারে কি? বয়সের সঙ্গে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, তবে মাঝে মাঝে জীবনে শিশুর অবস্থা আসিবেই, কারণ তাহা না হইলে মানুষ আবার নূতন জীবন কেমন করিয়া লাভ করিবে? সেই শুভ অবসরে ব্রহ্মানুভূতি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাকি সময় কি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সাধক জীবনধারণ করিতে পারিবেন?

ব্রহ্মানুভূতির সময় অতীত হইলে পর আর যখন ব্রহ্মকে চিনিতে পারা যায় না, তখন সাধকের জীবন দুঃসহ বোধ হয়। সংসার বিষবৎ লাগে, জীবন ধারণ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। কে এই ব্রহ্ম, যিনি আমাকে এত সুখ দিয়া এত কষ্টে ফেলিয়া গেলেন? ব্রহ্মানুভূতি নিঃশেষ হওয়ায় সাধক আপন সত্তায়

ফিরিয়া আসিয়া, সংসারের মধ্যে যেন সব সত্তার ছাড়াছাড়ি লক্ষ্য করেন। তাঁর নিজ জ্ঞানমত ব্রহ্ম, বিষয় ও নিজ সত্তার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জীবন-স্রোত তাঁহার অনুভব ঘটে। অতএব জীবনের দিক দিয়া একণে বারবার তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিবে, ব্রহ্ম কি, আমি কে ও এই সংসার কেমন? উপনিষদের ঋষিগণ আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের জীবনেও এই তিনটি সমস্যা ক্রমশঃ উপস্থিত হইল। উপনিষদে এই সকল প্রশ্নের বিচার ও আলোচনা আছে; আমরা একণে কেবল মাত্র প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম কে ও তাঁহার সত্তার কি কি বিশেষত্ব, এই সম্বন্ধে জানিবার জন্ম ব্রহ্ম-সাধক উপনিষদে বর্ণিত কোন্ কোন্ পথ লইলেন, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম সাধকের মনে এই একটি প্রশ্ন হইতে অসংখ্য প্রশ্ন জাগিতে থাকে। তিনি সমস্ত প্রশ্ন আপন অন্তরে ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অথবা যাঁহাদের ব্রহ্মানুভূতি ঘটিয়াছে, সেই সব আচার্য্যদের সাহায্য লইতে পারেন। উপনিষদ্ এই দুই পথেরই সমর্থন করেন। 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নানা-বিধ আলোচনা সম্ভব। তবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই শব্দটির দুইটী অর্থ হইতে পারে:—(১) ব্রহ্মসান্নিধ্যে যুক্ত-করে শরণ লওয়া, (২) আচার্য্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক উপবেশন করা।

সনাতন হিন্দুসমাজে পরিবর্ত্তিকালে এই দ্বিতীয় পথটি আদৃত হইয়াছে। যাহার ব্রহ্মানুভূতি জীবনে হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ। আর যাঁহারা সত্যকামের মত প্রথম জীবনে অলন্ত বিশ্বাস দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি পাইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য এই দুইটি পথই সম্ভব। কেহ বা বলিবেন, ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহাও ব্রহ্মানুভূতিতে প্রত্যাগমন করা হইল। কথাটা কতক সত্য বটে, ব্রহ্মসাধকও তাহাই চান। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুঃখে বা শোকে কাতর হইলে যেমন মানুষ সহজেই ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইতে চায়, সেইরূপ প্রশ্নার্থী ও জ্ঞানার্থী সোজা ব্রহ্মের নিকট পৌঁছিতে পারেন। মাতা যেমন দূর দেশে গমন করিলে বালক তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া তাঁহার আজ্ঞা লয়, মাতার দর্শন বা স্পর্শ সম্ভব হয় না, ইহাও সেইরূপ ব্রহ্মসেবকের চেষ্টা যে, তাঁহার আবেদন ব্রহ্মসমীপে পৌঁছিলে, তিনি নিশ্চয়ই উত্তর পাইবেন। আর আচার্য্যদিগের গৃহের দ্বার ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর জন্য চিরদিন উন্মুক্ত রহিয়াছে।

ব্রহ্মকে গুরু করিলে কিরূপ ঘটে, সে সম্বন্ধে কেশব বলিতে-ছেন, "তিনি জানেন যে তাঁহার সন্তানেরা যদিও প্রকৃতির নিকট, পুস্তকের নিকট জ্ঞানলাভ করে, তথাপি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ না করিলে তাহাদের পরিত্রাণ নাই।......... মনুষ্য তোমাদিগকে ভ্রমান্ধকারে ফেলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের কর্ণে যে মন্ত্রদান করেন, তাহা উচ্চারণ মাত্র অন্ধ চক্ষু পাইবে এবং বধির শুনিতে পাইবে।" (আচার্য্যের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৫—৬) ঈশ্বরের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লইতে গেলে পর কিরূপ অবস্থা ঘটে, সে সম্বন্ধে কেশব বলিতেছেন, "আসিলাম ভ্রাতাবন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজের হৃদয়কুটিরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম, অহংকৃত মস্তককে বহু আয়াসে অবনত করিলাম, প্রবল রিপুরূপ ভয়ানক তুফানকে একটি বাক্য-বাণে শান্ত করিলাম। একটি নাম করিলাম, অসংযত মন স্তম্ভিত হইল। চতুর্দ্দিকে আর কেহ নাই। সেই নির্জ্জন স্থানে, সেই রূপ-রহিত, বাক্যাতীত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন। হৃদয় অবাক্ হইয়া তাঁহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করিল।.........পিতা, যাহা দেখাইলে, কৃপা করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, কখনও এমন শুনি নাই। মাতাপিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবান্ধবেরও নিকটে পাই নাই। কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম।" (আচার্য্যের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১১—২) ব্রহ্মকে গুরু করিলে যে মস্তক হইতে সাধককে হৃদয়ে ফিরিতে হইবে, তাহা ত কেশব নিজ মুখে বলিলেন। এবার আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যাইলে পর কেমন হইবে, কেশব সে বিষয় কি বলেন? কেশব বলিতেছেন, "সত্য, ধর্ম্মপথে আমা-দের সহায় চাই, নেতা চাই, উপদেষ্টা চাই! এ সকলই ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন। পৃথিবীতে সাধু ব্যক্তি কে? সকলেই বলিবে, যাঁহার অনেক সাধুতা আছে এবং যিনি অনেক সাধু কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহা সাধুর লক্ষণ নহে। ধর্ম্মজগতের সাধু ব্যক্তি স্বচ্ছ, যাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বর উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়, তিনি গুপ্তভাবে থাকিয়া ঈশ্বর-দর্শনে আমাদের সহায় হয়েন, তিনিই প্রকৃত সাধু। ধর্ম্মগ্রন্থ কি? ব্রাহ্মদিগের পক্ষে তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সমধিক উজ্জ্বলতা সহকারে দর্শন করা যায়।" (আচার্য্যের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬১—২)।

এইবার আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, ব্রহ্ম বা আচার্য্য-দিগের নিকট শিক্ষা লইবার প্রণালী কি? উপনিষদ্ বলেন, "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন" এবং এই তিনটি যথার্থভাবে হইলে পর "ব্রহ্মদর্শন" হয়। কেশব বলিয়াছেন, ব্রহ্মদর্শন না হইলে জানিবে, ঠিক মত সাধন হয় নাই। আবার বলি, যাঁহারা সোজা ব্রহ্মকে গুরু করিতে চান, তাঁহাদিগকে সোজা তাঁহার দিকে কাণ পাতিয়া থাকিতে হইবে, তাঁহার চিন্তায় তন্ময় থাকিতে হইবে (ব্রহ্মসঙ্গীত ইহার জন্ম খুবই সাহায্য করে) ও পরে "নিদিধ্যাসন" অর্থাৎ নির্জ্জনে ধ্যানের সময় নিজ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য নিজসত্তা লইয়া ব্রহ্মের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আর আচার্য্যের নিকট যাইলে পর তাঁহার আদেশ অনুসারে মনকে শাসনে রাখিয়া, একান্তে ধ্যানের সাহায্যে সত্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে ও ফলে সত্যলাভ হইল কি না, তাহা নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিতে

চেষ্টা করিবে; কারণ সত্য জানিলে পর জীবনের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটে। যদি না ঘটিল, জানিতে হইবে যে, সত্যলাভ হয় নাই। ব্রহ্মানুভূতির পথে চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ধর্ম্মব্রত লইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। সামান্য লেখা পড়ার জন্য মানুষ কি না করে, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আত্মসমর্পণের কষ্ট স্বীকার করিবে না? ব্রহ্মের নিকট আত্মসমর্পণে ত কষ্ট নাই, বরং সকল কষ্টের অবসান হয়। কেশবের বাণী, আমি যতদূর বুঝিয়াছি, ইহাই স্পষ্ট করিয়া জানাইতে চায় যে, ব্রহ্মানুভূতির জন্য স্বীয় অন্তরের কবাট যদি সর্ব্বদা খুলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অত্যন্ত সরল হয়। আর শুধু আচার্য্যগণের প্রদত্ত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে নিরস লাগিতে পারে, কারণ আচার্য্যগণের মধ্যে সহানুভূতির অভাব হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মময়ী মায়ের সন্তানের জন্য সকল অবস্থাতেই সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। মানুষ যখন শ্রুতি অনুসারে অমৃতের পুত্র, তখন ব্রহ্মানুভূতির দ্বার ত ব্রহ্ম খুলিয়া রাখিয়াছেন, শুধু সাধকের এক বার হামাগুড়ি দিয়া অর্থাৎ কাহারও সাহায্য না লইয়া প্রবেশ করিলেই ব্রহ্মের কোল লাভ করা সহজ হয়।

যাক, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হই। আচার্য্যগণ আমাদিগকে হাত ধরিয়া হাঁটিতে শেখান। তাঁহারা সকলেই কি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত? যে সকল আচার্য্য ব্রহ্মানুভূতিতে ডুবিয়া আছেন, তাঁহারা সচরাচর নীরব থাকেন। কি বলিবেন? বলিবার কিছু নাই। আর যে সকল আচার্য্য ব্রহ্মের নিকট হইতে স্বীয় অনুভূতি সকলের সহিত ভাগ করিয়া লইতে আদেশ পাইয়াছেন, (এই কারণে ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে "বামনী" বলা হইয়াছে অর্থাৎ একজনের পুণ্যফল তিনি অনেকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে ভালবাসেন) তাঁহারা অপর সাধনপ্রয়াসীদিগকে সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। ইঁহাদের সাহায্য ছাড়া আর উপায় কি? তবে পূর্ব্বকথিত "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন" ও পরে "দর্শন" হইল কি না, সে সম্বন্ধে ছাত্রকে নিজেই সতর্ক থাকিতে হইবে।

উপনিষদ্ গ্রন্থে ঋষিদিগের তপোবনে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের ক্লাশ (class) বসিত। ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য সময়ে সময়ে Conference, Congress (অর্থাৎ সভা সমিতি) প্রভৃতি আহ্বান করা হইত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, রাজা জনকের আনুকূল্যে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মনীষিগণ একত্র হইয়া সত্যজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত। সে স্থলে শুধু পুরুষেরা যে থাকিতেন, তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক বা ব্রহ্মানুভূতি যাঁহার লাভ হইয়াছে এইরূপ মহিলাগণও উপস্থিত থাকিতেন। আমার মনে হয়, সেখানে নিশ্চয়ই বেদোক্ত ব্রহ্মসঙ্গীত, ব্রহ্মআরাধনা প্রভৃতি সমস্তই হইত এবং পরিশেষে বিচার ও মীমাংসার জন্য স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোচনাও হইত। আমার নিজের মনে এই বিশ্বাস যে, সে সকল ঋষি তাঁহাদের পুণ্যময় দেশ ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। একবার ডাকিলেই তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে সকলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। সেইজন্য এদেশে ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনপথে কখনও আচার্য্যের অভাব হইবে না। বাংলার যুগে যুগে উপনিষদের সাধনপথগুলি কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু এক্ষণে শুধু এইটুকু মনে রাখিতে চাই যে, আধুনিক ব্রাহ্মসমাজও ব্রহ্মজ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য সেই ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ ও সহায়তার প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছে। তবেই বোঝা গেল যে, "ব্রহ্মানুভূতি"র পথ শেষ হইয়া গিয়া, "ব্রহ্মজ্ঞান"এর মার্গ খুলিয়া গিয়া ভালই হইল। যাঁহারা অনুভূতি পাইয়াছেন, তাঁহারা আসিবেন, এবং যাঁহারা অনুভূতি পান নাই, তাঁহারাও আসিবেন। সাধনাভিলাষী হইয়া মায়ের সকল পুত্রেরা একত্র হইলে, ব্রহ্মময়ী জননী কি দূরে থাকিতে পারিবেন? যাঁহারা ব্রহ্মকে চিনেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন, সাধন ঠিক হইল কি না। যাঁহারা ব্রহ্মকে চেনেন ও জানিবার অধিকার ব্রহ্মের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাঁহারা সহযাত্রী পথপ্রদর্শক হইবেন। আর যাঁহারা চেনেন না, জানেন না, তাঁহাদের জন্য মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত হইবে। আর যাঁহারা জানিতে বা চিনিতে চান না, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া নূতন আনন্দে যোগ দিবেন। পরিশেষে যাঁহারা এই সকল উপায়ে ব্রহ্মকে জানিতে বা চিনিতে পারেন না, তাঁহাদের কিরূপ পথ, তাহা পরের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। মোটের উপর এইভাবে উপনিষদের যুগে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ হইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়।

—•—

আত্মনিবেদন

(দীন সেবক ভাই প্রিয়নাথের ১৬ই জুলাই অশীতিতম জন্মদিনে)

মার কৃপায় আজ আশী বৎসরে পড়িলাম; মা জন্মদায়িনী, নববিধানবিধায়িনী, বিশ্বমানবজননীর শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতাভরে অবলুণ্ঠিত হই। ভক্ত পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীকে প্রণাম করি। সর্ব্বভক্ত এবং সর্ব্বমানবসমন্বয়-জীবন নববিধান-প্রবর্ত্তক সদল শ্রীকেশবচন্দ্রকেও অভিবাদন করি। পরিবার ও মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নীদিগকেও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন করিয়া সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিলেন, "আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন, কেন না এত কালের ভিতর আমরা এত ভাল হয়েছি। মানুষ হয়ে ভগবতীর পা স্পর্শ করি, দেখি আবার ভগবতীর চরণ স্পর্শ করেও সংসারের কীটের মত হই।...এত

বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, ইহার ভিতর যৌবনের আশা উদ্যম তেজ কেমন করে রয়েছে। আবার ইহাও আশ্চর্য্য, ইহার ভিতর জড়তা অবসন্নতা আসছে।...এই তো আমরা জড়ের মত লোক। ইহার ভিতর ঈশ্বর আছেন, বারবার বলিতেছি। এই যে আস্তিক শরীর, ইহার ভিতরেও আবার 'ঈশ্বর কৈ ঈশ্বর কৈ' আমার কুস্বভাব বলে।......কৃপাসিন্ধু দয়া করে, এমন আশীর্ব্বাদ কর যে, এমন অবস্থার ভিতর থেকে যে এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে, তা দেখে আমরা খুব চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হই এবং দিন দিন তোমার চরণে আরও শরণাগত হই।"

আজ জন্মদিনে, এই মহাবাণী প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সত্যই এই দীর্ঘজীবনে, জীবন্ত মার জীবন্তলীলা কতই প্রত্যক্ষ করিলাম! আবার তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও মনের ভিতর কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম কই থামিল? একদিকে কতই নিরাশার অন্ধকার, আর একদিকে কতই আশা, উৎসাহ, উদ্যম। জীবন-সংগ্রামে, বিপদ অন্ধকারে যেমন মার জীবন্ত আনন দেখিয়া আশান্বিত হইলাম, তেমনি আশা-চন্দ্র কেশবচন্দ্রেরও সঙ্গ সহায়তা পাইয়া কতই আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইলাম। কোথায় ছিলাম, কেমন করিয়া মার অলৌকিক কৃপায় নববিধানের সেবায় নিয়োগ পাইলাম। এক সময়ে শ্রীকেশব-চন্দ্রের কতই বিরোধী ছিলাম। আবার সেই শ্রীকেশবচন্দ্রের দৈহিক সঙ্গ ও আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হইলাম। তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলাম, শিক্ষা লইলাম, অভিষেক লাভ করিলাম। তাঁহার সঙ্গে নাচিলাম, গাহিলাম, তাঁহার পবিত্র দেহের আলিঙ্গন পাইলাম, নববৃন্দাবনের অভিনয় করিলাম, অভিনয় দেখিলাম, ধরায় স্বর্গের উৎসব প্রত্যক্ষ সম্ভোগ করিলাম। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? আবার এত সৌভাগ্য পাইয়াও আমার মত এমন দুর্ভাগ্যই বা কে, যে বর্ত্তমান মণ্ডলীর নিরাশার অন্ধকারে কতই প্রাণ হাপু হাপু করিতেছে। এক এক সময় মনে হয়, বুঝি ইহার পূর্ব্বে জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইলেই বা ভাল হইত; যাঁহারা অগ্রে চলিয়া গেলেন, তাঁহারা কতই ধরায় স্বর্গের অবতারণা দেখিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা ভাবিবার ত অধিকার আমার নাই।

রাত্রের পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিবেই আসিবে। জীবন-সাগরে তরঙ্গ উঠিবে, পড়িবে, তাহার ভিতর দিয়া এ জীবনতরী শান্তি-উপকূলে পোঁছাবেই পোঁছাবে। ইহাই বিধাতার বিধি, কেন না বিশ্বাস করি, এ জীবনতরীর হাল তিনিই স্বয়ং ধরিয়া আছেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, "প্রিয়, আমি তোমারই মত রোগা ছিলাম"। উত্তরে বলিয়াছিলাম, "তবে ত আমার আশা আছে।" বলিলেন, 'আশা আছে বৈ কি।' সেই আশায় বুক বাঁধিয়া এতদিন বাঁচিয়া আছি। তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "We must not be as other men are." আমরা অন্য লোকের মত হব না। আরও লেখেন, "Those whom He loves most, He tries most. Can we not magnify Him when we are solely troubled this is what He expects of us His loyal children." এই সকল আশ্বাসবাণীই এ দীর্ঘ জীবনে উৎসাহ ও বল।

তিরোধানের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বেদানা খাওয়াইতে ছিলাম, ভয়ে ভয়ে দিতেছিলাম, পাছে তাঁর গলায় লাগে; বল্লেন, "আরও দাও, আরও দাও।" এখনও সেই বাণী এই কাণে ধ্বনিত হইতেছে। চাহিতেছেন, আরও দাও, আরও দাও। তিরো-ধানের কালে তাঁহার পবিত্র চরণযুগলের স্পর্শ এই বক্ষে অনুভব করেছি। এখনও সেই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য প্রাণ নিয়ত আকুল এবং তাহাতেই আশ্বস্ত।

এত সৌভাগ্য পাইয়াও আমি কি দুর্ভাগ্য, আমার মনে হয়; আমারই অপরাধে বুঝি, শ্রীদরবারের ও মণ্ডলীর বর্ত্তমান দুরবস্থা। কই, যা করিতে এলাম, তাহার কি হল। এত যে পেলাম, তাহা কই কাহাকে দিতে পারিলাম, কই ভক্তের মনের মত হইলাম, কই মার ইচ্ছামত নববিধানের সেবা করিতে পারিলাম, ইহা ভাবিয়া অনুতপ্ত ও অবসন্নই হই। তাই আজ শ্রীদরবারস্থ অগ্রজ ও মণ্ডলীস্থ ভাই ভগিনী ও দেশবাসী জগদ্বাসী সকলকারই শুভ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

আমরা যে নববিধান পাইয়াছি, ইহাই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ধর্ম্ম। ইহার সহিত কোন ধর্ম্মের বৈষম্য বা বিরোধ নাই। সর্ব্বধর্ম্ম ইহাতে মিলিত, সর্ব্বধর্ম্ম একত্র ইহাতে সমাবিষ্ট। ইহা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই। ইহাই একমাত্র সর্ব্বমানবের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম। ইহা মানবকল্পিত কিম্বা বিচার বুদ্ধি-সঙ্গত নয়। ইহা প্রত্যক্ষ জীবন্ত বিধাতার নববিধান। আবার ইহা নিত্য নূতন, ইহা কোন মণ্ডলীতে নিবদ্ধ নহে, হইতে পারে না বা হইবে না। ইহা অনন্তকাল নব নব ভাবে অভিব্যক্ত হইবে।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মেরই যাহা যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা স্বীকার ও বিশ্বাস করি, এবং ইহারা সকলেই যে এই নববিধানের অন্তর্ভুক্ত, ইহা যেন আমরা বিশ্বাস করি। এক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশ স্থান ও কাল বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও যেমন সকলই একই মহাসাগর, তেমনি এই সকল ধর্ম্মই বিধাতার বিধান, এবং সকল ধর্ম্মই বিধাতার এক অখণ্ড বিধানের অন্তর্গত; এবং শুধু তাহাই নহে, এক মহাসাগরে যাত্রা করিয়া যাইতে হইলে যেমন বিভিন্ন সাগর, উপসাগর পার হইয়া যাইতে হয়, তেমনি বিবিধ ধর্ম্মসাগরেরও বিভিন্ন ভাব স্বীকার ও গ্রহণ না করিলে, পূর্ণ নববিধান উপকূলে আমরা উপনীত হতে পারি না। তেমনি হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া আমরা পূর্ণ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিব না। ইহাই নববিধানের শিক্ষা।

সকল ধর্ম্মকেই একই ধর্ম্ম-সাগরের স্পন্দন বলিয়া আমরা

সম্মান করিব। তবে সাম্প্রদায়িক কুনীতি, কুরীতি বা সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন, তাহা কখনই নববিধানকে খর্ব্ব করিতে পারিবে না এবং আমাদেরও পারিবারিক বা সামাজিক বা মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতাতে ইহার অনিষ্ট কিছুই হইবে না। নববিধানের জয় হইবেই হইবে, ইহা নিঃসংশয়চিত্তে সমগ্র বিশ্বে আমরা ঘোষণা করিব।

আমরা যেমন বিশ্বজনীন সর্ব্বমানবধর্ম্ম নববিধান পাইয়াছি, তেমনি আমরা তাহার জীবন্ত সাক্ষিস্বরূপ নববিধানমূর্ত্তিমান বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্রকে এই নববিধানসাধনের ধর্ম্মবন্ধু বা জীবনসঙ্গিরূপে লাভ করিয়াছি। নববিধান একাকী সাধনের বিধান নয়; সংকীর্ত্তন যেমন একা হয় না, হারমোনিয়ম যেমন একটি রীডে বাজে না, তেমনি সর্ব্বসমন্বয় নববিধান সপরিবারে, সদলে বা সদরবারে মিলিত জীবনে সাধন করিতে হয়। এইজন্য শ্রীকেশবচন্দ্রকে মা সকল অখণ্ড সাধনায় সিদ্ধ বিশ্বমানবরূপে গঠন করিয়া প্রেরণ করিলেন। তাই যদি আমরা নববিধান-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চাই, তাঁহাকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া, অন্ততঃ স্বামী স্ত্রী উভয়ে পরিবারস্থ সন্তান সন্ততিদিগকে লইয়া, মণ্ডলীগতভাবে মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীদের সহিত, শ্রীদরবারস্থ প্রেরিত প্রচারকদিগের সহিত সমযোগে একাত্মতা সাধন করিতে হইবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে ছাড়িয়া, স্ত্রী যদি স্বামীকে ছাড়িয়া উপাসনা সাধন করেন, গৃহস্বামী যদি সন্তান সন্ততিদিগকে না লইয়া কেবল একা উপাসনা করেন, মণ্ডলীর ভাই ভগিনীগণ পরস্পরকে ছাড়িয়া, পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া, বিচ্ছিন্ন ভাবে উপাসনা সাধন করেন, শ্রীদরবারের প্রচারকগণ যদি পরস্পরকে ছাড়িয়া একা একা প্রচার করেন বা সাধন করেন, তাহা কেমন করিয়া নববিধান-সঙ্গত সাধনা বা উপাসনা হইবে?

শ্রীকেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহাকে যে লইবে, তাঁহাকে তেত্রিশ কোটি সকলকেই লইতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, মানুষ যদি পৃথক পৃথক ধর্ম্মসাধন করে, সে নববিধানের পরিত্যক্ত মানুষ হয়। যদি আমরা একা একা শ্রীকেশবকে গ্রহণ করিতে চাই, তাহাও যথার্থ হইবে না। যদি আমরা মনে করি, অন্য সকলকে ছাড়িয়া আমি আচার্য্য-গ্রহণ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিব, তাহা কেমন করিয়া হইবে?

তাই কাতরপ্রাণে ভাই ভগিনীদিগের নিকট নিবেদন, যেন শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী সাধনায় পূর্ব্বে এই কথাগুলি আমরা পবিত্র আত্মার আলোকে বিশেষভাবে চিন্তা করি। শ্রীকেশবচন্দ্র কে এবং তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ এবং কি জন্য বা তিনি বর্ত্তমান যুগে আসিয়াছেন, ইহা পাঠ ও আলোচনা করিতে হইবে এবং উপাসনা-যোগে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। বিশ্বমানবজীবনে তাঁহার পুনরাগমনই তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞসাধনার যেন উদ্দেশ্য হয়।

কাম, ক্রোধ, অহংকার এই তিন রিপু আমাদের সর্ব্বদাই প্রকৃত সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। শ্রীকেশবচন্দ্র এই জন্য এই তিনি রোগের ঔষধ বিশ্বাস, প্রেম এবং শুদ্ধতা নিজ জীবননীতি বলিয়া সাধনে সিদ্ধ হইলেন।

(১) জীবন্ত মার প্রার্থনাশীলতা, (২) পাপবোধ, (৩) চিরশিষ্যত্ব, (৪) শিশুত্ব, (৫) আমিত্বহীনতা, শ্রীকেশবচন্দ্র প্রধানতঃ এই পঞ্চোপচারে জীবন্ত মার প্রত্যক্ষ দর্শন, তাঁহার বাণী শ্রবণপূর্ব্বক, নিত্য সপরিবারে, সবান্ধবে এবং বিশ্বমানবকে প্রাণযোগে গ্রহণ করিয়া নিত্য উপাসনা করিলেন এবং তাহার দ্বারাই নববিধানমূর্ত্তিমান হইলেন। আমরা যদি তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী, তাঁহার পরিবার বা নববিধানের মণ্ডলী ও শ্রীদরবারের লোক হইতে চাই, তাঁহার এই সাধনা আমাদের অবলম্বন করা কি কর্ত্তব্য নয়?

নববিধানে আমরা জীবন্ত মার উপাসনা করিবার অধিকার পাইয়াছি। আমাদের ঈশ্বর মনঃকল্পিত বা হস্তরচিত কিম্বা দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ মৃত পুত্তলিকা নয়। তাঁর উপাসনার জন্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ণ এক পবিত্রাত্ম-প্রেরিত প্রণালী পাইয়াছি, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। ইহাতে আপন আপন বুদ্ধির মত যেন না চালাই এবং পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রতিদিন পরিবার, দল এবং দরবারসহ উপাসনা সাধন করিতে কৃতসংকল্প হই ও তদ্দ্বারা যেন বিশ্বমানবধর্ম্ম শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত নববিধানের নবজন্মলাভে ধন্য হই।

অবশেষে পরিবার, দল এবং শ্রীদরবারস্থ সকল আত্মার অন্তরঙ্গদিগের শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, এই জন্মদিনে মার চরণে বার বার প্রণত হই, মা দয়া করিয়া এই শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্, ব্রহ্মানন্দো হি কেবলম্, নববিধির্হি কেবলম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়

শেষ উপসংহার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূল ভিত্তি কোথায়, ইহাই প্রদর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায়, ঐ সেই ১৮৩০ সনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠা সময়ে বিরচিত ট্রাষ্টডীডে যে ১১টি মূল্যবান বিষয় গৃহ-প্রতিষ্ঠার সংকল্প বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে, তত্তাবতের বিশ্লেষণ করতঃ প্রদর্শন করিয়াছি যে, রাজার ঐ ভিত্তিপ্রস্তরেই সমস্ত অনুষ্ঠানটি অদৃশ্য বীজাকারে (Potentially) লুক্কায়িত ছিল। যথাবিধানে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত বীজ হইতে যেমন যথাকালে অঙ্কুর বাহির হয় এবং একখানি অদৃশ্য হস্তের পরিচর্য্যার ফলে যথাকালে সুদৃশ্য চারাগাছটি অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তেমনি ১৮৩০

সন হইতে ১৩ বৎসর কাল পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষকরূপে ইহার জীবনীশক্তিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই ইহার প্রথমমালী। তাঁহার তিরোধানের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ সুরক্ষিত বীজটিকে যথাযোগ্যভাবে ফুটাইয়া তুলিবার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। রাজা রামমোহন বীজবপন করিয়াই দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় আর ফিরিয়া আসেন নাই; বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রথম মালীর কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার শূন্য স্থানে মাননীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেন এবং যথাসাধ্য ইহাকে প্রস্ফুটিত করিবার প্রয়াসে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পড়েন। ১৮৫৭ সনে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তৃতীয় মালী হইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহকারিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। কেশবচন্দ্র পরিচর্য্যা করিতে করিতে তাঁহার প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে, ইহা কি আকারে, কি প্রকারে প্রস্ফুটিত হইবে, ইহা উপলব্ধি করতঃই, তাহার চিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত হন। ১৮৬০ সন হইতেই ইহার অভ্যন্তরস্থ সমুদায় অবস্থাটিই যেন কেশবচন্দ্র, বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত "রঞ্জেন রেস" (X-Rays) আলোকে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুক্কায়িত দ্রব্যগুলি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির দিব্য আলোকে একটির পর আর একটি করিয়া সমুদয় উপাদানগুলি উপলব্ধি করিয়া লইতেছিলেন এবং ১৮৬৯ সনে তাঁহার প্রদত্ত Future Church বক্তৃতাতে, কি আকারে, কি প্রকারে, কি কি উপভোগ্য উপকরণ সহকারে ইহা ফুটিয়া উঠিবে, তাহা কলিকাতায় ঘোষণা করেন। পরে তিনি ১৮৭০ সনে জগতের শ্রেষ্ঠতম দেশের শ্রেষ্ঠতম নগরে ও শ্রেষ্ঠতম জাতির মধ্যে তাঁহার মহাভাব ব্যক্ত করিতে থাকেন, এবং এই মহৎ কার্য্যে ইংরেজ জাতির সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়া, ১৮৭০ সনের ২০শে জুলাই জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার আশা ও আকাজ্ক্ষা ঘোষণা করেন। ইহার ফলে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণী ও আমেরিকান ও অন্যান্য জাতির সম্মিলিত চেষ্টায়, ১৮৯৩ সনে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকাগো নগরে ইহাকে অঙ্কুরিত একটি চারা গাছ রূপে জগতের সমস্ত লোকেই দেখিতে পান।

প্রকৃতি আমাদিগকে দেখাইয়া আসিতেছে যে, বটবৃক্ষের নিম্নে বটের চারা উঠিতে দেখা যায় না। অথবা শিমুল গাছের তুলার অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলি ঝটিকাবর্ত্তে দূর দূরান্তরে উড়িয়া যায়, কোন সুদূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া মৃত্তিকায় পতিত হয় ও অঙ্কুরিত হইয়া বিশাল বৃক্ষরূপে দণ্ডায়মান হয়। কেশবচন্দ্রের হৃদয়-নিহিত এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বীজটীও এই ভাবে সুদূরবর্ত্তী আমেরিকার মৃত্তিকায় অঙ্কুরিত হইয়াছে। আমরা এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বা সম্মিলনের আদর্শটী যে কেশবচন্দ্রের হৃদয়েই সর্ব্বপ্রথমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এ বিষয়ে বঙ্গের ৩টী অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যদান প্রকাশিত করিতেছি।

(১)

শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষ্য

১৯১০ সালের ৮ই জানুয়ারী স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে কেশবচন্দ্রের স্মৃতিসভার অধিবেশনে, কবিসম্রাট বিশ্ববিখ্যাত মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে পণ্ডিত শাস্ত্রী যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কথা কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পণ্ডিত শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, "কেশবচন্দ্র সেন খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা করতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক উদার ও আধ্যাত্মিক সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মরূপে দেখিতে পান এবং তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা Jesus Christ—Europe and Asia ও Greatmen এবং শ্লোকসংগ্রহ পুস্তকখানি এই মহাভাব-পরিচায়ক। বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান ভাব ছিল। ইহা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার আকাজ্ক্ষাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ও তাঁহার চিন্তাকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইহাই পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার নববিধানের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাবকে অভিব্যক্ত করে। ইহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁহার একটী প্রধানকার্য্য। এ কার্য্যের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রতীতি করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও জগতের ধর্ম্ম সকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লইয়া বাস করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু সময় আসিতেছে, যখন তাহা দেখিতে পাইবে। তখন কেশবচন্দ্রের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইবে।"

(২)

মাননীয় লর্ড সিংহের সাক্ষ্য

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ মাননীয় লর্ডসিংহ মহোদয়, ১৯২১ সনের ১৯শে নবেম্বর, কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের উৎসবে বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান কথাই এই যে, জগতের সমস্ত ধর্ম্মই সত্য এবং এই সকল ধর্ম্মের মিলন (Harmony) অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার নিশানে হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ক্রুশ এবং মুসলমান ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই ৩টী ধর্ম্মই জগতের অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, সর্ব্বধর্ম্মই সত্য, একথা লর্ডসিংহ একটি প্রাচীন গল্প বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার ৩টি পুত্রকে মহামূল্য অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ৩টী পুত্রকেই পৃথক পৃথক ভাবে গোপনে লইয়া গিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তোমার এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তিন পুত্রই মনে করিয়াছিল যে, তাহার অঙ্গুরীয়টীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনটিই

একই প্রকারের বস্তু। কেশবচন্দ্রের বাণীও এই ভাবের। কেশবচন্দ্রের কথা এখনও সর্ব্বসাধারণের ভিতরে গৃহীত হয় নাই। একদিন সেন্ট ব্যাথিউলে বিশপ বায়রনেশের একটা কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয়, তখন তাহা সর্ব্বসাধারণের ভিতরে প্রচলিত মত, বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরোধী হইলেও গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তখন সেখানে এক উচ্চ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন যে, আত্মার অনেক চক্ষু আছে, জানালাও অনেক। জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া বাহিরের জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আসুন, আজ আমরা, তিনি জীবনে যে সত্য সাধনা করিয়াছেন এবং সেজন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হই। তিনি ভারতবাসীদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীর্ণ মত, ভাব ও সংস্কার পরিত্যাগ করিতে বলিয়া উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যাবলী গৌরবময় হউক। আমরা আজ যে এখানে একত্র হইয়াছি, এজন্য যেন গৌরব অনুভব করি।

(৩)

ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের সাক্ষ্য

মাননীয় ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার মহোদয় ১৯১৫ সনে বোম্বে থিয়িষ্টিক সমিতিতে সভাপতি হইয়া বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে শুধু ব্রহ্ম না বলিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শব্দের অর্থ—The Lord of Dispensation। এ ভাব নববিধানের প্রবক্তা মহাত্মা কেশবচন্দ্রের রক্তে মাংসে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা ছবি-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত, কেশবচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন। ধর্ম্ম-জীবন-অঙ্কনে তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম-জীবনের আকার ও রূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নূতন বিধি ও ব্যবস্থা এবং ধর্ম্মের চিহ্ন ইত্যাদি অঙ্কনে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মের আদর্শ নবভাবে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের মিলন, সমুদয় মহাপুরুষদিগের একত্রীকরণ, যোগ ও ভক্তির মিলন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রামত্ততার সংমিশ্রণ, নানা কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, ভারত ব্যাপিয়া ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা, সংকীর্ত্তনের পুনঃ প্রবর্ত্তন, সাধুসমাগম, খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের গূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন, Doctrine of special Inspiration, New Samhita, নূতন নিশান ও তাহাতে ধর্ম্মসকলের সমন্বয়চিহ্ন, সমাজ-সংস্কার, বিবাহ আইন ইত্যাদি বহু বিষয়েরই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সকল সৃষ্টিই ফলপ্রদ হইয়াছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে আবার সমস্ত ধর্ম্মের ও সমস্ত ধর্ম্মবিধানের এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মিলনই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের ন্যায় জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের আদর্শরূপে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই জুলাই, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের অশীতিতম জন্মদিনে, প্রাতে নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় শান্তিকুটীরে সেবিকা হেমন্তকুমারী বিশেষ উপাসনা করেন ও ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। ১৭ই জুলাই, ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনাকালে, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদী হইতে মণ্ডলীর হইয়া ভাই প্রিয়নাথের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। জন্মদিনে পুরী নবশ্রীক্ষেত্রেও সন্ধ্যায় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ময়মনসিংহ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন ও বারিপদা হইতে ভাই অখিলচন্দ্র, ভাই নগেন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং শিলং হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী তার যোগে ভক্ত পরিবারের পক্ষে শুভকামনা জানাইয়াছেন।

গত ১৮ই জুলাই, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে, তাঁহার প্রবাসভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসন করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ২০শে জুলাই, ১২৮নং হ্যারিসন রোডে, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমারের নবজাত শিশুর জাতকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাই প্রিয়নাথ সম্পাদন করেন।

গত ২৪শে জুলাই, ৯নং টার লেনে, শ্রীমান্ অজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান শিশুর মাতামহ-ভবনে ভাই প্রিয়নাথ সম্পাদন করেন। এই উপলক্ষে পিতা প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, গত ১২ই জুলাই, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে, স্বর্গীয় মেজর এস্, এন্, মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমারের একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বিধানজননী নবজাত শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২৪শে আষাঢ়, (৯ই জুলাই) গিরিধি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ দেবকুমারের সহিত, শ্রীযুক্ত কুলদাচন্দ্র নিয়োগীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী চিন্ময়ীর শুভ পরিণয় কলিকাতার ৯৫নং মাণিকতলা স্পারস্থ (বিবেকানন্দ রোড) ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

পারলৌকিক—গত ২৫শে জুলাই, শ্রীমান্ গোকুলচন্দ্র পাইনের গৃহে, ৺রমেশচন্দ্র বসুর পরলোকগতা প্রথমা কন্যা মীরার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ৩১শে জুলাই, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহাদের খুল্লপিতামহী লেডী মুখার্জ্জির (স্যার আর, এন, মুখার্জ্জির সহধর্ম্মিণী) পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন,

নরেনবাবু শ্লোকাদির বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন এবং এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করেন:—

প্রচারাশ্রম ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, অনাথাশ্রম ১০৲, অন্ধবিদ্যালয় ১০৲, মূক ও বধির বিদ্যালয় ১০৲, রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ১০৲, অবলা বিধবাদের বস্ত্র ১০৲, হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম ৫৲, ভগিনীসমিতি ৫৲, মোট ১০০৲ টাকা।

আমরা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম, গত ২৩শে জুলাই, ময়মনসিংহের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীশ্রীনাথ চন্দ অষ্টাশীতিতম বর্ষ বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

পরমজননী পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই জুলাই, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে গগণবাবু প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০শে জুলাই, গৃহস্থ বৈরাগী স্বর্গগত রাজমোহন বসুর সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, শান্তিকুটীরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৫শে জুলাই, ১২।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী ৺কান্তমণি দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৬শে জুলাই, ভাই প্রিয়নাথের কন্যা প্রীনীতির সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে জুলাই, ৪০।১এ মনোহর পুকুর ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺মনোজিতের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী শ্রীমতী স্নেহলতা রায় মনোঙ্কিত ফাণ্ডে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে জুলাই, ভাই ফকিরদাস রায় ও আচার্য্যপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, নববেদালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন।

উৎসব—গত ১০ই জুলাই, রবিবার হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত বালেশ্বর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১০ই জুলাই, রাত্রিতে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের আরম্ভসূচক প্রার্থনা হয়। ১১ই সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে, সুগায়ক গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডার নেতৃত্বে সংকীর্ত্তনোপাসনা হয়। ১২ই সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব,—প্রাতে উষাকীর্ত্তন, সকাল ও সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। দুইবেলাই উপাসনান্তে একত্রে সাধু-সেবা হয়। ১৩ই প্রাতে মহিলা-উৎসবে প্রায় ২০টি মহিলা সমবেত হন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। উপদেশের বিষয় "সতীত্বের পরীক্ষা", ঐ ভাবেই আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভোজনান্তেও মহিলাগণ ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সংগীত করেন। বালেশ্বর সহরের পরপারে সিদ্ধিয়া পল্লি হইতে অনেকগুলি মহিলা আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর যথাবিধি প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া মতিগঞ্জ বাজারে উপস্থিত হইলে, ভাই অখিলচন্দ্র বক্তৃতা করেন। রাত্রি প্রায় ১১॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া সংকীর্ত্তন শেষ হয়। সংকীর্ত্তনে ভাই নগেন্দ্রনাথ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডার সহযোগে নেতৃত্ব করেন। ১৪ই জুলাই সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্রের সভাপতিত্বে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা হয়। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বিশাল ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কর সহযোগী ও সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশাল সম্পাদক হইয়াছেন। সভার কার্য্যান্তে সংগীত ও সংক্ষেপে উপাসনার কার্য্য ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়া শান্তিবাচন করেন।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র"

(শতবার্ষিকী সংস্করণ)

ভগবানের বিশেষ কৃপায়, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক নিবদ্ধ "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক বৃহৎ গ্রন্থের শতবার্ষিকী সংস্করণে মূল অংশের (Text) মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। নির্ঘণ্টাদি মুদ্রিত হইতেছে। সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে, আশা করি। এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে যাহা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত ন্যূনাধিক আরও ৩০০৲ টাকা সাহায্যের প্রয়োজন। তদর্থে বন্ধুগণের নিকট আবার উপস্থিত হইতেছি। ভগবানের কৃপায় যখন অধিকাংশ সাহায্যই পাওয়া গিয়াছে, তখন এই সামান্য সাহায্যও যে সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, তাহাতে সম্পূর্ণ আশা রাখি। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির মূল্য ১০৲ টাকা ধার্য্য হইল। আগষ্ট মাসের মধ্যে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া অগ্রিম মূল্য প্রদান করিলে, ৮৲টাকায় পাওয়া যাইবে। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

"জ্ঞানকুটীর", এলাহাবাদ;
১০ই জুলাই, ১৯৩৮ সাল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲
18th. August, 1938

প্রার্থনা

মা, ভাদ্র মাস এলো, ভাদ্রোৎসবের আহ্বান শুনিতে দাও। বিশ্বপ্রকৃতিতে ভাদ্র মাস বর্ষার মাস, ভাদ্র মাসে আকাশ হইতে অজস্র বৃষ্টি বর্ষণ হয়, এই সময় ক্ষেত্র-কর্ষণের সময়, বীজবপনের সময়। এ সময় ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, বীজ বপন করিতে না পারিলে, শস্য-সংগ্রহের সময় কাঁদিতে হয়, অনাহারে মরিতে হয়, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভাদ্র মাসে আরো নদীতে বান ডাকে, মরুভূমি প্লাবিত হয়, তাহাতে নদীর পলি পড়িয়া শস্য-ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করে। মা, জড় প্রকৃতিতে যেমন, মানব-জীবনেও তেমন এই ভাদ্র মাসে নূতন বিধানে এই ভাদ্রোৎসবের বিশেষ বিধান করিয়াছ। তাহা এই জন্য যে, তুমি এ সময়ে স্বর্গের কৃপা বর্ষণ করিবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের জীবনক্ষেত্র-কর্ষণে সহায়তা করিবে। এখন আমাদের জীবনক্ষেত্রে সুফলের বীজ বপন করিব; তাহাতে আমরা জীবনের অন্ন সংস্থান করিব এবং ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পাইব। সত্যই তোমার ভাদ্রোৎসব যে তোমার নববিধানের নব উপাসনাপ্রতিষ্ঠার উৎসব। জীবনক্ষেত্র-কর্ষণের জন্যই এই উপাসনা। বিশ্বমানব কেমন করিয়া সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার সাধন এই উপাসনা। শ্রীকেশবচন্দ্র নিজে সাধনা ও আচরণ দ্বারায় এই উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমাদের বর্ত্তমান যুগে, মানবজীবনের কর্ষণের ও তাহাতে নব জীবনের বীজ-বপনের প্রণালী এমন আর কোথাও নাই। মা, এবারকার ভাদ্রোৎসবে তোমার স্বর্গের কৃপাবারি অজস্রধারে বর্ষণ কর এবং আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রের সাধিত এবং প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মজীবনকর্ষণ ও বীজবপনরূপ পূর্ণ উপাসনা-সাধন-প্রণালী গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। জীবনে জীবনে, পরিবারে, দলে এবং সমগ্র বিশ্বে ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে যেন সক্ষম হই। ভাদ্রমাসে নদীতে যেমন বান ডাকে, তেমনি তোমার প্রেমের বানে আমাদের শুষ্ক মরুভূমিসম পরিবারগত, মণ্ডলীগত জীবনকে প্লাবিত করিয়া সরস করুক। আমাদের শুষ্ক জীবন যেন নববিধানে নব নব ভাবে উর্ব্বর হয়। বিশেষতঃ এ বর্ষে শ্রীকেশবচন্দ্রের নব শতবার্ষিকী জন্মযজ্ঞ তুমি আনিতেছ; আমরা যেন এই ভাদ্রোৎসব হইতে নববিধানের নব উপাসনা সপরিবারে সদলে এমন করিয়া সাধনে নিরত হই, যাহার দ্বারা আমরা সে মহা জীবন-যজ্ঞে যোগ দান করিবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

ভাদ্রোৎসবের সাধনা

আবার ভাদ্রোৎসব আসিল। মা নববিধানবিধায়িনী তাঁহার নবভক্ত সনে বিশ্বমানবকে এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমরাও তাঁহার সহিত সকলকে আহ্বান ও অভিনন্দন করি। রাজা, প্রজা, স্বদেশবাসী, বিদেশবাসী সকল সম্প্রদায়স্থ ভাই ভগ্নীদিগকে সাদরে অভিবাদন করি—আহ্বান করি। হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, জৈন, পারসী সকলকারই সমযোগ আমরা ভিক্ষা করি। সার্ব্বজনীন বিশ্বমানবধর্ম্ম নববিধান। নববিধানের এই উৎসবে সবারই নিমন্ত্রণ।

উৎসব ধরায় স্বর্গের অবতারণা। ভাদ্র মাসে আকাশ হইতে যেমন অবিরলধারে বারি বর্ষণ হয় এবং এই সুযোগে কৃষকগণ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্য বপন ও রোপণ করে, তেমনই স্বর্গের কৃপাবারিবর্ষণে আমাদের জীবন-ক্ষেত্র কর্ষণ করিব এবং তাহাতে নববিধানের নব জীবন বীজ বপন করিব, তাহারই জন্য এই ভাদ্রোৎসব সমাগত। তাই এই ভাদ্রোৎসবের মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাতে আত্মযোগ দান করি এবং সপরিবারে ও সদলে সমস্ত দেশবাসী জগজ্জন সনে এই মহান্ মহোৎসবে যোগ দিয়া ধন্য হই।

এই ভাদ্র মাসেই শ্রীরাজর্ষি রামমোহন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম উপাসনা প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপাদ্য এক ঈশ্বরের সমবেত উপাসনা করিবার জন্য তিনি একটী "ব্রাহ্মসভা" স্থাপন করেন। এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষা জন্য কেহ কেহ ভাদ্রোৎসব সাধন করেন। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নূতন সার্ব্বজনীন উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন হইতে প্রথম ভাদ্রোৎসব নামে উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়।

যখন রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ব্রহ্মোপাসনার কোন নূতন প্রণালী অনুষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ব ব্যক্তিগত উপাসনার যে গায়ত্রী মন্ত্র আছে, তাহাই সাধনের ব্যবস্থা হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেদপাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা সেই উপাসনার অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। বাস্তবিক ব্যক্তিগত সাধনা যাহা, ঠিক মণ্ডলীগত সাধনা তাহা নয়। নির্জ্জন সাধনা ও সজন সাধনার ভিন্নতা যে আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেইজন্য ব্যক্তিগত সাধনা যাহা, মণ্ডলীগত সাধনা তাহা হইতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ-সাধন এক, মণ্ডলীগত বা পরিবারগত উৎকর্ষ সাধন আর এক। তাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যে ব্যক্তিগত সাধনের উপাসনাপ্রণালী চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সমীচীন নয় বলিয়াই, নববিধানের প্রারম্ভে সমাজগত ও পরিবারগত সব উপাসনা-সাধন-প্রণালী বিধাতার প্রেরণায় আচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তন করিলেন। এই প্রণালীর প্রচেষ্টা হইতেই ভাদ্রোৎসবের যথার্থ প্রবর্ত্তন হয়।

নববিধান বিশ্বপরিবারকে এক পরিবার, সকল ধর্ম্মকে একধর্ম্ম, সকল সমাজকে এক অখণ্ড সমাজে পরিণত করিবার জন্য অবতীর্ণ। তাই ইহাতে ব্যক্তিগত সাধনা এবং সমাজগত সাধনা একীভূত। সমষ্টিগত জীবনলাভের জন্যই নববিধান প্রেরিত। এইজন্য নববিধানের উপাসনা-প্রণালী এক অদ্ভুত অলৌকিক সার্ব্বজনীন উপাসনা-প্রণালী।

আমরা যখন একা একা থাকি, তখন 'আমি—আমি' বলিয়া কথা কই। যখন পাঁচজন একত্র হই, তখন 'আমি' স্থানে 'আমরা' বলিয়া পরিচয় দিই; সেইরূপ পূর্ব্বের ব্রহ্মসাধনা ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য করিলেই যথেষ্ট হইল, মনে করিতাম, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব সমাজগত জীবনে নিমজ্জিত করিতে হইবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের বিশেষ শিক্ষা।

পরিবার যেমন একা একা হয় না, পাঁচটী মিলিয়া একটি পরিবার; তেমনি বহু পরিবার যেখানে মিলিত, সেখানে দল গঠিত হয়। যৌথ কারবারে যেমন সবার সমভাগ, তেমনি নবধর্ম্মবিধানেও ধর্ম্মসাধনার সমযোগ সম্পাদনের জন্য এই বিশেষ উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত।

যথার্থই এই উপাসনাপ্রণালী সমস্ত মানবকে এক অখণ্ড ধর্ম্মপরিবার এবং অখণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলীরূপে গঠনের জন্য স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র সকল ধর্ম্মের সকল উপাসনাপ্রণালী একসূত্রে গাঁথিয়া, এই উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মসাধকগণ যথার্থ ভ্রাতৃযোগে মিলিত হইয়া, এক উপাসনাপ্রণালী অবলম্বনে কেমন করিয়া ধর্ম্মসাধনে অভেদ-আত্মা হইতে পারেন, তাহাই ইহাতে অনুষ্ঠিত; এবং তিনি নিজ জীবনে ইহা সাধন ও অনুষ্ঠান করিয়া, বিশ্বমানবের সহিত সমযোগ-সাধনার আদর্শ দেখাইয়াছেন। এমন অলৌকিক বিশ্বমানবতার জীবনপ্রদ উপাসনাপ্রণালী

আর কোথাও নাই। আক্ষেপের বিষয়, এমন অদ্ভুত উপাসনাপ্রণালী পাইয়াও ইহার সম্যক আদর কৈ করিতেছি এবং বিধাতার অভিলষিত সাধন অবলম্বনে আমরা তেমন কৈ জীবনে সমুন্নত হইতেছি ? শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের অহংজ্ঞানবশতঃ আমরা তেমন করিয়া বিধান শিক্ষা করিতে পারিতেছি না।" তেমনি এই উপাসনা-সাধনশিক্ষা বিষয়েও আমাদের তেমন আগ্রহ দেখিতেছি না। আচার্য্য আর এক জায়গায় বলিলেন, "আমার কোন ভাই যেন কিছু বাড়াইয়া দিতে, কিম্বা কমাইয়া দিতে চেষ্টা না করেন। বিধান যাহা, তাহা ষোল আনা ঠিক রাখিতে হইবে।" এ সম্বন্ধেও আমাদের ক্রটী দেখিতে পাই।

যদিও আমরা একই উপাসনাপ্রণালী অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহাতে নিজ নিজ স্বাধীন মত চালাইতে আমাদের মধ্যে অনেককে দেখা যাইতেছে। আচার্য্যপ্রবর্ত্তিত প্রণালী কৈ আমরা সকলে অনুসরণ করি ? সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন করিতে যেমন সমসুরে সমতানে গান না গাহিলে ঠিক সঙ্গীতের বিধি পালন করা হয় না, তেমনি আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট উপাসনার তান লয় সম্বন্ধে যদি আমরা নিজ নিজ স্বেচ্ছামত চালাই, তাহাতে কি আমাদের অপরাধ হয় না ? বাস্তবিক হারমোনিয়ামের বাঁধা সুরের সহিত সুর মিলাইয়া গান করাই বিধি। সে বিধি ছাড়াইয়া যদি নিজ সুর চড়াই, তাহা কখনও সুসঙ্গীত হয় হয়। তেমনই শ্রীকেশবচন্দ্র উপাসনা-সাধনে যে সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার অতিক্রম করিলে আমরা কখনওই নববিধানসঙ্গত উপাসনা-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না।

আমরা যখন উপাসনা করি, তখন যেমন আরাধনার মন্ত্র ও প্রার্থনার মন্ত্র সমস্বরে উচ্চারণ করি, তেমনি সমগ্র উপাসনাই যাহাতে আমরা সমপ্রাণে সমমনে সমচিন্তায় সমভাবে, আচার্য্যের সহিত সমযোগে করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতে আমাদের কৃতসংকল্প হওয়া উচিত নয় কি ? যদি আমরা আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নিজ নিজ মত চালাই, তাহাতে যদি কোন সাধকের যোগভঙ্গ হয়, তাহার জন্য কি আমরা দায়ী নই ? এই সকল বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া, পবিত্রাত্মার প্রেরণায় যাহাতে আমরা এক উপাসনা-সাধনার দ্বারায় অধ্যাত্ম মিলন সম্পাদন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের সামাজিক উপাসনার লক্ষ্য হয়। এবারকার ভাদ্রোৎসবে যেন এই সাধনার মিলন সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকেশব-সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ?

১। শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমার মা, তোদেরও মা'; সুতরাং আমরা কেশবের সহোদর, তিনি আমাদের অগ্রজ ভাই।

২। শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "এদের একজন সঙ্গী চাই, যে যেখানে যায়, আমি তার সঙ্গে।" জীবনপথে কেশব আমাদের সঙ্গী।

৩। তিনি বলিলেন, "এঁদের একজন বন্ধুর দরকার, ইঁহারা ঘরে ফিরিবার আগে, একজনকে বন্ধু করে নিয়ে যান।" তিনি আমাদের ধর্ম্মবন্ধু। শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকেও মিতা করিয়াছিলেন, আমরা অধম চণ্ডাল হইলেও, শ্রীকেশব আমাদের বন্ধু হইতে চাহিয়াছেন।

৪। শ্রীকেশব বলিলেন, "আবার গুরু হইতে চলিলাম, এ আগেকার গুরু নয়, নববিধানের গুরু, সকলে এক দেহের অঙ্গ, এই বিশ্বাস।" শ্রীকেশব এই বিশ্বাসসাধনের শিক্ষাগুরু এবং আচরণে আচার্য্য।

৫। তিনি বলিলেন, 'এখানে আমি ও আমরা হইতে পারে না, একই শরীরের অঙ্গ ইহারা। আমিও যা, ইহারাও তা।" সুতরাং আমরা কেশবের সহিত একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সদল অখণ্ড বিশ্বমানব শ্রীকেশবের সহিত কায়, মন, আত্মা, হৃদয়, ইচ্ছায় একজন হইব। এই সাধনে আমরা শ্রীকেশব-পরিবার, শ্রীকেশবদল। বিশেষভাবে এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধে বিধাতা আমাদিগকে শ্রীকেশবের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন। ইহা যেন আমরা বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ সাধন অবলম্বনে নিরত হই।

—০—

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

(২য় প্রবন্ধ)

ব্রহ্ম-জ্ঞান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান হইতে কি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অবরোহণ করিলাম, তাহা দেখিলাম। এক্ষণে আচার্য্যগণের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে কি করিয়া ব্রহ্মধ্যানে আরোহণ করিতে হইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আমাদিগের অন্তরের প্রশ্নই আমাদিগকে আচার্য্যগণের নিকট লইয়া যাইবে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারাই (৩ এস্থলে আচার্য্যগণের সাহচর্য্য

লইয়া) আমরা ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছাইতে পারিব। দুঃখ কষ্টে, পাপে তাপে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, বুকের মধ্যে যে বিপদ্‌ভঞ্জন কাণ্ডারী সদা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই শরণাগত হইবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। 'দয়াময়' 'মঙ্গলময়' প্রভৃতি মন্ত্রের এই রূপে সাধকের অন্তরে আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এ সকল মন্ত্রের মালা গাঁথিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয়স্বরূপ তাহাদিগকে ঘোষণা করা ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণের অধিকারভুক্ত। এমন ভাবে এই মন্ত্রগুলিকে গ্রথিত করিয়া সর্ব্বমানবের কল্যাণের জন্য তাহাদিগের প্রচার আবশ্যক, যাহাতে মানুষ সকল অবস্থাতেই তাহাদের আশ্রয় লইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। মানুষের অবস্থার অন্ত নাই। তাই এই মন্ত্রগুলির সমাবেশ ও সমন্বয় নানাভাবে উপনিষদে পাইয়া থাকি। সে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয়স্বরূপ। কোন একটি তার স্পর্শ করিলে যেমন বাদ্যযন্ত্রের সকল তার হইতে মিলিয়া মিশিয়া ঝঙ্কার উঠে, তেমনি কেবল একটি মন্ত্র যদি সাধক আপন অন্তর দ্বারা স্পর্শ করিতে পারেন, তাহা হইলে উপনিষদের সমস্ত ব্রহ্ম-মহিমা তাঁহার অন্তরে ধ্বনিত হইবে ও ব্রহ্মানুভূতি ঘটিবে এবং সেই অনুভূতির প্রতিধ্বনি সমস্ত জীবন ও জগৎ ব্যাপিয়া সাধকের নিকট ঘোষিত হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বাদ্যযন্ত্র বাজান, সেইরূপ ব্রহ্ম সাধকের অন্তর স্পর্শ করিয়া ঝঙ্কার দেন এবং সেই সঙ্গীতে ব্রহ্ম, সাধক ও সংসার মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যান। ব্রহ্মানুভূতি ফুরাইলে এই সুখ শান্তির স্মৃতি অন্তরে ব্রহ্মমহিমা বাড়াইয়া দেয় ও ব্রহ্মজ্ঞান উত্তরোত্তর সার্থক হইতে থাকে।

তবেই বোঝা গেল, উপনিষদের ঋষিগণ আপন আপন সাধনানুসারে ব্রহ্মের গুণাবলী চয়ন করিয়াছিলেন ও সেইভাবে সগুণ ব্রহ্মের পরিচয় তাঁহাদের শিষ্যগণ আপন জীবনে "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন" দ্বারা ধারণ করিলে পর, নির্গুণ ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিতেন। কেহ বা বলিবেন, ব্রহ্মের কি কোন মন্দগুণ নাই? থাকিলেও ব্রহ্মসাধক তাহা ধ্যান করিয়া তাঁহার অনুভূতির জন্য ব্যস্ত হইবেন না। কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মন্দগুণ যে সকল সত্তায় দেখা যায়, সে সমস্তই অস্থায়ী ও তাহাদিগের রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে। সাধনার দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম চিরন্তন ও অবিনশ্বর, সেইজন্য তাঁহার মধ্যে মন্দগুণ থাকিতে পারে না। এইবার পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত মত বলিব, যেমন এক ব্যক্তির গুণসমূহ যাহা মনে আছে, সেই ব্যক্তির গুণসমূহ (ইহার মধ্যে অগুণও ধর্ত্তব্য) যাহা মনে নাই, ইহার সমষ্টিতে সেই নির্গুণ ব্যক্তি হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রহ্মের যে সকল গুণ আমরা স্মরণ করি, ব্রহ্মের যে সকল গুণ আমাদের স্মরণাতীত অথবা আমরা স্মরণ করি না, তাহার সমষ্টি নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের অংশ মাত্র। যদি উপমা হইতে সত্যগ্রহণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলিব, সগুণ ব্রহ্ম চন্দ্রের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মরূপ সূর্য্যেরই কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে। তবে মনে রাখিতে হইবে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথক বস্তু, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম মিলিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্। নির্গুণ ব্রহ্ম নিত্য সত্য বস্তু, সগুণ ব্রহ্ম সাধকের নিমিত্ত তাঁহার চিদাকাশে ব্রহ্মের প্রকাশ। যে নির্গুণ ব্রহ্ম নিজে আসেন, দেখা দেন, কথা কন, তিনি যে সাধকের সগুণ ব্রহ্মের চেয়ে অনেক বেশী। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিয়াও জানা গেল না। সমস্ত চেষ্টাই কি তাহা হইলে ব্যর্থ হইল? উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। উপনিষদ্ হইতে জানিয়াছিলাম যে, ব্রহ্মকে মন দ্বারা দর্শন করিতে হইবে (পূর্ব্ব প্রকাশিত ব্রহ্মানুভূতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে উপনিষদ্ হইতে জানিতেছি যে, ব্রহ্মকে মন দ্বারা পাওয়া গেল না। তাহা হইলে ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের যথার্থ অবস্থা কিরূপ? উপনিষদের হেঁয়ালীর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে, ব্রহ্মানুভূতির স্তরে সাধক ব্রহ্মকে চিনিয়াও চিনেন না অথবা না চিনিয়াও চেনেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পর্য্যায় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াও জানেন না অথবা না জানিয়াও জানেন। যিনি এই ভাষার ইঙ্গিত বুঝিবেন, তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে না। আর যিনি বোঝেন না, তাঁহাকে বুঝাইয়া কাজ নাই।

এক কথায়, ব্রহ্মকে চিনি বা না চিনি, তাঁহাকে যতটা পারি জানিব ও জানিয়া চিনিব, ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধে সর্ব্বমানবের শাশ্বত ধর্ম্ম। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, ইহাই বাংলার ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম। ধ্যান হইতে জ্ঞানে অবরোহণ করিব ও জ্ঞান হইতে ধ্যানে আরোহণ করিব। এইরূপে ব্রহ্মপরিক্রমা চলিবে। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সাধক অন্তরে যে লীলাভূমি, তাহাই ব্রহ্মমন্দির। সেখানে যে সব মানুষ একত্র হইয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এক যোগে সমান অধিকারে ব্রহ্মসাধন করিতে পারেন, তাহাই আধুনিক বাংলার কেশব উপনিষদের পথ ধরিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন ও সেই ভিত্তির উপর বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদের ঋষিগণ Congregational worship অর্থাৎ ব্রহ্মসাধনার সঙ্গত অনুমোদন করেন। তবে যাঁহারা যীশুর ন্যায় কেবল মাত্র ব্রহ্মানুভূতির উপর নির্ভর করিতে চান, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়াসী হন না ও প্রার্থনার সময় ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা না করিলেও তাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। একবার "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ" বলিলেই তাঁহাদের পূজা সার্থক হয় এবং ব্রহ্মের গুণাবলীর কীর্ত্তন আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যীশুর পরবর্ত্তী কালে সেমিটিক (semitic) জাতিদিগের আচার্য্য মহম্মদ ইহার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন ও মুসলমানদের পূজায় সর্ব্বপ্রথমে কোরাণে বর্ণিত ঈশ্বরের গুণাবলী মনন করা হয়। কেশবও ইহাই করিতে বলেন! এইরূপ করিলে উপনিষদের ঋষিগণের আনন্দের সীমা থাকে না। এইবার যদি এই কথা বলি যে, উপনিষদে বর্ণিত সগুণ ব্রহ্মের গুণাবলীর চুম্বক করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আরাধনা-মন্ত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসেবক কেশবচন্দ্র গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে কি? সাধনার সকল

স্তরে ব্রহ্মমহিমায় বিভোর হইয়া সাধক উপলব্ধি করেন, "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম"। প্রাণ যখন লীলারসে মত্ত থাকে, তখন এই কথাই বার বার মনে পড়ে যে, তিনি "আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি।" আবার যখন সাধকের অন্তর বাহির স্থির হইয়া যোগারূঢ় হয়, সে সময় ব্রহ্মের "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" মূরতি সমস্ত সত্তা গ্রাস করিয়া ফেলে। শেষে বিচ্ছেদকালে সাধক ভুলিতে পারেন না যে, ব্রহ্ম ব্রহ্মই রহিয়া গিয়াছেন ও সাধক নিজ পঞ্চভূতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন ব্রহ্মকে শ্রদ্ধার সহিত মনে করিয়া জানাইতে ইচ্ছা করে যে, তিনি "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।"

সাধকের নিজ অবস্থানুযায়ী ব্রহ্মারাধনার মন্ত্রগুলি নিত্য নূতন অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইতে থাকে। আমরা এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে চাই যে, বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথকে যুবক কেশবচন্দ্র এই আরাধনার মন্ত্রের চয়ন-কার্য্যে কি করিয়া সাহায্য করিলেন? মদীয় "কেশব-পরিচয়" পুস্তকে আমি তারিখ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই কেশবের ব্রহ্মানুভূতি ঘটিয়াছিল। যাহার জীবনে ব্রহ্মানুভূতি হইয়াছে, সে যুবক হইলে কি হয়, নূতন জগৎ গড়িবার জন্য বৃদ্ধ ও যুবক উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। আধুনিক ব্রাহ্মসমাজ সেইজন্য তাঁহাদের উভয়ের কাছেই এই বিষয়ে ঋণী। তবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মারাধনার মন্ত্র সঙ্কলন করিয়া নিজের জীবন এমনই সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, দেশবিদেশের ব্রহ্মসাধকদের সংস্পর্শ তাঁহার কাছে ভাল না লাগায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধকগণ তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহার নিকট ঋণ অপরিশোধনীয় রহিয়া গেল বলিয়া সকলে বিবেচনা করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংকলিত ব্রহ্মারাধনার মন্ত্রগুলি আমাদের নিত্য সকাল সন্ধ্যার সহচর। দুঃখ শোকে আমরা সেই মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুভব করিবার জন্য অপেক্ষায় থাকি। বহু যুগ পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষিগণ যখন এই ভাবে সগুণ ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্মের অংশ বা উপাধি বলিয়া জানিলেন, তখন বাকী অংশ বা অন্যান্য উপাধিগুলি জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ব্রহ্ম কি শুধু গুণময় হইয়া সাধকের অন্তরকে মথিত করেন? নির্গুণ ব্রহ্মে যাহাতে মানব অন্য উপায়েও পৌঁছাইতে পারে, সেই সুযোগ দিবার জন্য অন্য কোথাও কি তিনি ওতপ্রোত ভাবে অপেক্ষায় নাই?

এইবার অন্তরলোক ছাড়িয়া সাধক বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। প্রকৃতির রূপের অন্ত নাই ও সাধকের সহিত ইহার চাতুর্য্যেরও শেষ নাই। মোটামুটি বলিতে গেলে, ধর্ম্মজীবনে প্রকৃতির তিনপ্রকার পরিচয় মানব লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া ব্রহ্মদর্শন প্রকৃতির উত্তম পরিচয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকৃতির এই দিকটার বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিতে চাই। আবার সাধক যদি ব্রহ্মসাধনার পথ ছাড়িয়া আত্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও সে ক্ষেত্রে প্রকৃতি অনেক দূর পর্য্যন্ত সাধকের সাহচর্য্য করিয়া থাকে ও ইহাই প্রকৃতির মধ্যম রূপ। আমরা ইহা আত্মজ্ঞান প্রবন্ধে দেখিতে পাইব। ইহা ছাড়া যদি সাধকের প্রথম জীবনে প্রকৃতি ধর্ম্মপথের বিঘ্নস্বরূপ বা অন্তরায় হইয়া পড়ে ও নানা কৌশলে তাহাকে বশে আনিয়া তাহারই সাহায্য লইয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিকৃষ্টরূপ সে অবস্থায় সাধকের নিকট ধরা পড়ে। এ সম্বন্ধে আমরা "যোগ ও কেশব" প্রবন্ধে আলোচনা করিব। মোট কথা উপনিষদের ভিতর প্রকৃতির এই তিনটি স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমরা লক্ষ্য করিলেও, ইহা বলিতে পারি যে, উত্তম ও মধ্যম স্বরূপটি উপনিষদে সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে এবং নিকৃষ্ট স্বরূপটি উপনিষদ্ হইতে গ্রহণ করিয়া হিন্দু দর্শনগুলিতে পরবর্ত্তীকালের সাধকগণ প্রকৃতিগ্রস্ত মনুষ্যের জন্য যথাযথভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, মনে করি। উপনিষদ্গুলি পাঠ করিবার সময় আমাদের অনেকবার মনে হইয়াছে যে, প্রকৃতিও ব্রহ্মের ন্যায় অরূপ ও নির্গুণ (যে হিসাবে আমরা পূর্ব্বে মানুষের অমৃতময় সত্তাকে নির্গুণ মানুষ আখ্যা দিয়াছি)। কিন্তু সাধকের প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক হিসাবে ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দিয়া ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছাইতেছেন। তাঁহার নিকট প্রকৃতি আপন উদাসীনতার ভিতর দিয়া আনন্দস্বরূপের আরতি ও পূজার বার্ত্তা বহন করিবে। ব্রহ্ম ত ব্রহ্মসাধকের অন্তর জুড়িয়া স্থান করিয়া লইয়াছেন, এইবার তিনি প্রকৃতিকে সাধকের অন্তরের মর্ম্মস্থল হইতে আকর্ষণ করিবেন। এই অবস্থায় ব্রহ্মসাধককে অন্তর্য্যামী যিনি, তিনি বলিতে থাকেন, "আমাকে অন্ন দাও, জল দাও, ফুল দাও, ফল দাও, আমার অভাব কি তুমি মিটাইবে না?' এই যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ব্রহ্ম এক্ষণে সাধকের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহার ফলে সাধকের পক্ষে কেবল নিজের মুখে অন্ন দিলে হইবে না, যেখানে যত জীব জন্তু আছে, সকলকে অন্ন দান করিবার জন্য সাধক ব্যস্ত হইলেন। এবং এই ভাবে অন্ন নিবেদন করিয়া (অন্ন অর্থে ভোগের পদার্থও লওয়া যাইতে পারে) যে আনন্দময়ের ভিতর দিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের নূতন পরিচয় লাভ করিলেন, তাহা নিজ অন্তরে কোন্ ভাষায় লিখিয়া রাখিবেন, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তিনি লিখিলেন, "অন্ন ব্রহ্ম"। ফলতঃ সাধক শুধু যে ব্রহ্মসাধনার নূতন পথ পাইলেন, তাহা নহে, তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা সকল জীবের সহিত সমানুভূতিও জন্মিয়া গেল ও পরসেবা-ব্রতের পথ খুলিয়া গেল।

পূর্ব্বের মত আবার ব্রহ্ম যখন সাধকের অন্তর জুড়িয়া বলিলেন, "আমার বিত্ত চাই, আমার পুত্র চাই" তখন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সাধকের জীবনে যে সামাজিক কল্যাণ আরম্ভ হইল, তাহা হইতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র জগৎসম্পর্ক প্রভৃতির সূত্রপাত

হইল এবং এইরূপে ব্রহ্মমহিমা নবীনতর লোক-রচনার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সাধকের জীবনকে সজীবতর করিয়া তুলিল। সংসারকে যে বৈরাগ্য দ্বারা 'আচ্ছাদিত' করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, উপনিষদের এই আদর্শ মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমাদের মনে হয়, উপনিষদের সাধকগণ এ সময়ে পশু পক্ষী ও আর আর সকল জীবের সহিত মনুষ্যের নিগূঢ় যোগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। জীব জন্তুদিগের ভিতর শরীরের ভিন্নতা আছে বটে, মনও ভিন্ন প্রকারের হওয়াই সম্ভব (আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্য দার্শনিক Bergson ইহাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানিয়াছেন); কিন্তু প্রাণ ত একই প্রকারের বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বিশ্বজোড়া প্রাণের বার্ত্তা সাধককে বুঝাইল, "প্রাণ ব্রহ্ম"। এইরূপে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বাড়িল। অহিংসা ধর্ম্মের অঙ্গ হইল।

কত বলিব। উপনিষদের ঋষিগণ নিজেরাই তাঁহাদের সাধন-পথের সংবাদ দিতে পারেন। যাঁহারা শিল্পী, সে সকল ঋষিগণ ব্রহ্মকে প্রকৃতিময় দেখিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের সহবাসে ফিরিলেন। যাঁহারা দার্শনিক, তাঁহারা ব্রহ্মকে "বিজ্ঞানময়" জানিয়া সগুণ ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইলেন। যাঁহার মধ্যে যে ভাবটি ব্রহ্ম সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাব অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধামে উপস্থিত হইলেন।

উপনিষদের বাগান ফুল, ফল, লতা ও বৃক্ষে সুশোভিত হইল। ইহারা কেহই মরিবে না। এগুলি মানুষের গড়া ঘরবাড়ী নয় যে ভাঙ্গিবে। বাদানুবাদের উপর ইহাদের সৃষ্টি নহে; ঋষিদিগের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বীজ হইতে ইহারা জীবন লাভ করিয়াছে। মানুষের আত্মসত্তার ভূমিতে শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে ও অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মকরুণায় অবস্থিত হইয়া ইহাদের ভিতর বাহির পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে।

কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে যাঁহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন, এ সকল অভিজ্ঞতা মানুষকে সকল অবস্থায় ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্য সহায়তা নাও করিতে পারে। যদি সাধক নির্গুণ ব্রহ্ম না পৌঁছাইয়া, অন্নকে বা প্রাণকে বা মনকে ব্রহ্ম বলিয়া পূজা আরাধনা করিতে থাকেন, তাহাতে বিজ্ঞান বা দর্শনের উন্নতি হইতে পারে; কারণ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক প্রকৃতির লীলার মধ্য দিয়া সগুণ ব্রহ্মের ইঙ্গিত মত নির্গুণ ব্রহ্মে যেমন পৌঁছান, আবার সেই মত স্তরে স্তরে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝেন ও বুঝাইতে সক্ষম হন। কিন্তু ব্রহ্মসাধক যদি এইরূপ অন্নেতে (?) সন্তুষ্ট হইয়া যান, তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে যে, নির্গুণ ব্রহ্ম অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিতে থাকিয়াও এই সমস্তের অতীত হইয়া রহিয়াছেন। কারণ তিনি চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মকে পাইয়াও পাওয়া গেল না। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন, "তিনি অন্নেতে নাই, তিনি যে ভূমা।"

অথচ আবার বলি, সেই আনন্দস্বরূপ সাধকের নিকট গোপন থাকিতেও পারেন না। কারণ তাহা হইলে সাধকের জীবন বাঁচিবে না। কেশব বলিতেছেন, "নিরাকার অপ্রকাশ ঈশ্বর আমার অভাব মোচন করিতে পারেন না। আমি চাই পিতা, আমি চাই স্নেহময়ী জননী, আমি চাই হৃদয়ের বন্ধু আমি চাই সখার, আমি চাই চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু। অপরিচিত ব্রহ্ম আমার উপকারে আসিবেন না। তাঁহাকে নানাবিধ পরিচিত রূপ ধরিয়া, স্বর্গের সিংহাসন ছাড়িয়া, আমার ঘরে আসিতে হইবে।.........তিনি যদি একরূপ ধরেন, আমার চলিবে না। ক্ষুধার সময় তাঁহাকে অন্ন-ব্রহ্ম, অন্নদাতা হইয়া আসিতে হইবে। অজ্ঞানের সময় তাঁহাকে রাশি রাশি গ্রন্থ লইয়া গুরু এবং শাস্ত্রী হইয়া আসিতে হইবে। অনাবৃষ্টিতে জল হইয়া, ইন্দ্র হইয়া আসিতে হইবে।............আমাদের ঈশ্বরের অবতারের সংখ্যা নাই। তিনি যে কখন, কাহার নিকট কি ভাবে অবতীর্ণ হইবেন, কেহই জানে না।...ভক্তের নিকট তিনি নিত্য নূতনরূপে অবতীর্ণ হন।...নিত্য নূতন অবতার! তবে বুঝি তুমি লক্ষ অবতার হইবে!" (আচার্য্যের উপদেশ, অষ্টম খণ্ড, "ব্রহ্মের অসংখ্য অবতার" শীর্ষক উপদেশ)।

বলা বাহুল্য, এইরূপ চিন্তার ধারা উপনিষদেও আমরা পাই; এবং সেই কারণে মনে হয়, উপনিষদ্ গ্রন্থে হিন্দুর অবতারবাদ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত বর্ত্তমান। কিন্তু এ ভাব পৌরাণিক কালে আদর্শ সমেত হিন্দুর অন্তরে স্থান পাইয়াছিল। এক্ষণে ইহাই মনে রাখিতে চাই যে, ব্রহ্ম সাধকের অন্তর হইতে, অন্ন প্রভৃতি প্রকৃতিময় যাহা কিছু তাহা যেমন চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রকৃতির অন্তরালে যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তিনিও সেই সব যোগাইতে ছিলেন। ফলে সাধক কেহ নয়, প্রকৃতিও কেহ নয়। ব্রহ্মই চান, ব্রহ্মই পান; ব্রহ্মকেই চান, ব্রহ্মকেই পান। Subject, predicate সব যেন একাকার হইয়া গেল; সাধক শুধু অনুভব করিলেন যে, তাঁহার ভিতর বাহির সমস্ত জুড়িয়া রহিয়াছেন এক অসীম সত্তা, যিনি "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"। উপনিষদের এই বার্ত্তা ভুলিবার নয়। "অদ্বৈত" অর্থে উপনিষদ্ বলিতেছেন, "দুই নাই।" কিন্তু এ বাণীর ত ইহাও অর্থ নহে যে, শুধু "একই" আছে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদের এই 'নেতি' বাদ সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম কে, তাহাও ঠিক করিয়া বলেন না। ব্রহ্মানুভূতির দ্বারা সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন যে, ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্;" কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তিনি কেবলমাত্র বোঝেন যে, ব্রহ্ম দুই নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছাইলেন, তাঁহারা এই দুইটি উপলব্ধিকে একই সত্যের দুইটি দিক (Positive and Negative) জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। গুণময় ব্রহ্মকে জানা গেল। প্রকৃতিতে যে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পরিচয় লাভ হইল। নিজ সত্তার মধ্যেও ব্রহ্মকে অনুভব করিলেন। তবে এক শ্রেণীর সাধক রহিয়া গেলেন, যাঁহারা

এসব পথে লাভবান্ হইলেন না। এ সমস্ত প্রকারেই ব্রহ্মকে জানিতে বা চিনিতে হইলে, ব্রহ্মকৃপা ছাড়া পথ নাই। এক্ষণে তাঁহারা আর ভগবৎ-প্রসাদকে মূলধন করিতে মোটেই প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা, সম্পূর্ণভাবে আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের অন্বেষণে বাহির হওয়া। উপনিষদের এই পথকে আমরা আত্মজ্ঞানের পথ বলিয়া অভিহিত করিব। পরের প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা হইবে।

এক্ষণে ইহা বোঝা গেল যে, ব্রহ্ম মানুষের অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন বলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছান যায়। কেবল পাপ তাপের মধ্যে তিনি মনুষ্যের সহিত জড়িত নহেন। তখন তিনি প্রত্যাশা করেন যে, মানুষ তাঁহাকে চিনিবে ও তাহা হইলেই সকল কষ্টের পরিসমাপ্তি হইবে। পাপ তাপ যদি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে এই যন্ত্রণাময় পার্থিব জীবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন না এবং ঋষিরা তাঁহাকে "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্" বলিয়া আখ্যা দিতেন না। ঋষি সত্যকামের একটি মহাবাক্য যেরূপ মনে পড়িতেছে, সেইরূপ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি :—

"দেখ, এই চক্ষে ঘৃত বা জল পড়িলে তাহা আপনিই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া পড়িয়া যায়, চক্ষুকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ এই চক্ষুর যিনি চক্ষু, সেই পরম পুরুষকেও কোন কর্ম্ম বা ফলাফল স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অমৃত, তিনি অভয়, তিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।"

শেষ কথাটি বড় জটিল লাগিতেছে, "তিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।" তবে এইবার আত্মার মধ্যে ব্রহ্মের অন্বেষণ করা যাউক। ব্রহ্মকে জানিয়াও জানা গেল না, আত্মার পরিচয় লাভ হইবে কি?

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় প্রেমেন্দ্র

(৩০শে জুলাই, সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পঠিত)

"মানবের জীবন ও সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী। উভয়কে চিরস্থায়ী করিবার আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহারা কালের আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হইয়া বিস্মৃতির শূন্যতায় মিলাইয়া যায়।

"কিন্তু আমাদের মানবাত্মার আর একটি গুণ আছে, যাহা গোলাপের ন্যায় জীবন ও সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে আয়ুঃশেষে বিস্মৃতির গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হয় না। উহাই আমাদের 'মহত্ত্ব'—যাহা মানবকর্ত্তব্যের দ্বারা লভ্য।

এবং ইহাই কেবলমাত্র মানবের মৃত্যুর পর বিস্মৃতির অন্ধকারের বুকে আলো। ইহা নিমীলিত গোলাপের সুগন্ধ-সৌরভের ন্যায় চিরস্থায়ী।"

(অতি অল্পবয়স্ক কিশোর প্রেমেন্দ্রের লিখিত মূল ইংরাজীর অনুবাদ)

প্রেমেন্দ্রের এই লেখার রন্ধ্রপথে তাহার বিরাট জীবনের অন্তঃপুরের যে কটা 'দ্রব্য' আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা মহত্ত্বের সত্যে সুরভিত বলিয়াই, আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রেমেন্দ্রের ভাই ভগিনীগণ!

ফুল ফোটে, আবার ঝরে যায়। মানুষ জন্মায়, আবার মরে। কত চেষ্টা মানুষকে বাঁচাবার। মাতার স্নেহ, পিতার বৃদ্ধ বয়সের শান্তি, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা, অনাত্মীয়ের প্রীতি সবই তাকে ধরে রাখতে চায়—হাত বাড়িয়ে বলে, 'যেতে নাহি দিব'—কিন্তু কৈ তা তো হয় না,—মানুষ মরে—তাকে যেতে দিতে হয়। যদিও আমাদের "............সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে গভীর ক্রন্দন—'যেতে নাহি দিব'। হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।" প্রেমেন্দ্রকেও মাতৃহৃদয়, পিতার বক্ষ, আত্মীয় অনাত্মীয়ের দল বাধা দিয়ে চলে যেতে দিতে চায় নি। তবু সে তো চলে গেছে। সবই যে 'চলে যায়'।

এই 'চলে যায়', এই কি শেষ জীবনের?—এই কি মানবাত্মার শেষ কথা? ফুলের ঝরে যাওয়ার কথাই কি তার সম্বন্ধে একমাত্র জানার বা বলার কথা? তার এর চেয়ে সত্য কি কিছু নেই? তবে জীবন তো একটা 'mournful dream'—বিষাদময় অলীক স্বপ্ন। তবে জন্ম বৃথা, মিথ্যা—জীবন ক্ষণিকের মিথ্যা স্বপ্ন—আর মৃত্যু অনাবিষ্কারিত। কিন্তু তা তো নয় :—

"Death closes all. but something ere the end,
Some work of noble note may yet be done."

জন্ম সত্য—জীবন সত্য—মৃত্যু সত্য। এ তিন সত্য ভুললে চলবে না। ফুল ফোটা সত্য, তার স্থিতিকাল সত্য এবং তার ঝরে যাওয়া সেও সত্য। প্রেমেন্দ্রের জন্ম সত্য—জীবন সত্য—তার মৃত্যুও সত্য,—প্রেম-ফুল যে ঝরে গেছে, সেও সত্য। কারণ সে ফুল আর ফুটবে না।

এরও ওপর আরও সত্য ফুলের গন্ধ—মানুষের জীবনের মহত্ত্ব। তাই প্রেমেন্দ্রের সব থেকে বড় সত্য—তার 'মহত্ত্ব'। যে মহত্ত্ব অনেক বৃদ্ধকে হার মানায়। 'আমরা বাঁচি মরবার জন্য' এ এক অতি বাজে কথা; আসল কথা 'আমরা মরি বাঁচবার জন্য'। মৃত্যু আমাদের মৃত্যুপারের উষার আলো দেখিয়ে দেয়। আমাদের এ জীবটা তো একটা প্রস্তুতি—ওপারের এক মহা উৎসবের জন্য। এ জীবনে যদি প্রস্তুতই না হলাম, তবে সেই জীবনে মহোৎসবের দ্বারের বাহিরেই যে থেকে যাবো। ভিতরে যাবার প্রবেশপত্র সংগ্রহই যদি না করলাম, তবে—হলো কি?

এ জীবনের কর্ম্মফলের মহত্ত্বই সেই প্রবেশিকা। ফুলের স্থিতিকালের গন্ধবিতরণই তার মৃত্যুর পরে মনে রাখবার সব

চেয়ে দামী কথা। ফুল আমাদের চোখের সামনে ঝরে যায়—আবার ফুটে ওঠে আমাদের হৃদয়ে। তাই গন্ধটা তার সব থেকে দামী। প্রেমেন্দ্রের সম্বন্ধে এ কথাগুলো ঠিক ভাবে খাটে। সে আমাদের চোখের সামনে নেই, কিন্তু মনের অনুভূতিতে রয়েছে। যাঁরা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও, যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে তার সান্নিধ্যে আসেন নি—কিন্তু তার দেদীপ্যমান মহত্বের দীপশিখার একটু আলো পেয়েছেন, তাঁদের মন প্রাণই তো প্রেমেন্দ্রময়। তার জাজ্বল্যমান মহত্বের দীপশিখায় তাঁদের হৃদয়-বর্ত্তিকা নতুন আলোয়, নতুন করে জ্বলে উঠেছে। আমাদের এ জীবনের ঈশ্বর-ভক্তিই—মহত্বই সে মৃত্যুপারের উৎসবের প্রবেশিকা। আর তার থেকে ঠিক্‌রে পড়া আলোই অন্ধকারে দীপশলাকা। আমরা যখন প্রস্তুত, আমরা যখন মহৎ, তখনই মৃত্যু এসে আমাদের দুয়ারে ডাক দেয়—'ওরে আয়, তুই প্রস্তুত।' আমরা তখনই হলাম সেই উৎসবে আমন্ত্রিত। প্রেমেন্দ্রের আমন্ত্রণ এসেছিল, যখন সে চতুর্দ্দশ বৎসরের বালকমাত্র। এ জীবনের সর্ব্ব গুণাবলীই এ জীবনের আসল কথা। প্রেমেন্দ্রের জীবনের আসল কথা—তার মহত্ব—তার প্রেম। মৃত্যু সত্য—আর তারপর যা আছে, তা আবার আরও সত্য। সে আগে প্রস্তুত হয়েছিল, সে আগে গেছে—তার অন্তরাত্মাকে অশীতিবর্ষ বৃদ্ধেরও আগে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন—কারণ তার হৃদয়-পাত্র ভগবৎপ্রেমে টলমল করছিল; পাছে ধরার ধূলায় পড়ে তা অবমানিত হয়, নষ্ট হয়—তাই তাকে ডেকে নেওয়া। আর তাই সে এখান থেকে চলে গেছে। সে ছিল মহৎ—সে ছিল প্রস্তুত। যে তার জীবন পর্য্যালোচনা করেছে, সে অবাক হয়ে গেছে দেখে যে—একটা কৈশোর হৃদয় কেমন করে সেই বিরাটের, মহানের সুর ভেঁজে চলেছে, ছোট হৃদয়-তন্ত্রে অবিরাম। প্রেমেন্দ্রের হৃদয়-তন্ত্রে অসীমের মহান্ মন্ত্র এমনি করেই চৌদ্দ বৎসর বেজেছিল। আজ তাই সে আগুয়ান। এখানে, আজ আমরা সমবেত—আমরা প্রেমেন্দ্রের আপনার লোক। আমরা কেউ তার ভাই, কেউ তার বোন—কিন্তু—প্রশ্ন আছে। আমরা কি তার আত্মার আত্মীয়?

আজ ঈশ্বরের কাছে, আমাদের অগ্রজ প্রেমেন্দ্রের স্মৃতি স্মরণ করে এই প্রার্থনা জানাই, যেন আমাদের আদর্শ প্রেমেন্দ্রের আলোকে আলোকিত হতে পারে।

"পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ"

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(খৃষ্টধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম)

পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ এদেশে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুরে তাঁহাদের প্রধান দুর্গ সংস্থাপিত হয়। তাঁহারা সে সময়ে বেশ বদ্ধমূল হইয়া বসিবার পরেই হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণ করিতে সুচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ মার্শম্যান ও কেরী প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি সেনাপতিরূপে বিবিধভাবে এদেশীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলকেই একদিকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সাম্য, মৈত্রী, উদারতা, বিশুদ্ধতা প্রদর্শন, অন্যদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বহুদেবদেবীবাদ, জাতিভেদ, ছুতিস্পর্শতা ও অন্যপ্রকারের নানারূপ কুসংস্কার প্রদর্শনে রত হন। এ সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় অন্য নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও, এই সকল প্রচারকগণের অভিযোগের বিরুদ্ধে ও হিন্দুধর্ম্মের সাপক্ষে লিখিত তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করেন। কথিত আছে, তিনি নিজে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করতঃ, মূল বাইবেল হইতেই শব্দার্থ, ভাবার্থ এবং নানা বিকৃতার্থ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচলিত কুসংস্কারগুলি তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি এই সকল মিশনারী-দিগকে দেখাইছিলেন যে, হিন্দুদিগের রাম ও কৃষ্ণের পূজাও যেমন পৌত্তলিকতা ও নরপূজা, খৃষ্টের পূজাও ঠিক তেমনি ভাবেরই পৌত্তলিক পূজা ও নরপূজা। রামমোহনের এই ভাব-প্রদর্শনের ফল বহুকাল পরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে "অমৃতবাজার" পত্রিকার সম্পাদকও লিখিয়াছিলেন যে, "মেরীর তনয় যদি পরিত্রাতা হয়, ঘোষের তনয় তবে দোষে রত নয়।" রামমোহন ত্রিত্ববাদ লইয়াও বিদ্রূপের সহিত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই ত্রিত্ববাদ লইয়া শ্রীরামপুরের পাদরী রেঃ এডামের সহিত তাঁহার তর্ক বিতর্কের ফলেই, এডাম সাহেব আর ত্রিত্ববাদী না থাকিয়া, একেশ্বরবাদী খৃষ্টান হইয়াছিলেন। এজন্য খ্রীষ্টীয় সমাজে তিনি "স্বর্গচ্যুত দ্বিতীয় এডাম" (The fallen Second Adam) আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এসময়ে রামমোহন একাকীই এ সময়ে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তাঁহার সময়ে এদেশীয় বিশেষ উল্লেখ্য কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার পর বৎসর, সর্ব্বপ্রথম স্বনামপ্রসিদ্ধ শিক্ষক মিঃ ডিরোজীওর একজন প্রধান শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ডিরোজিওর প্রধান প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে নৈতিক আদর্শে অনেকেই স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিলেও, সামাজিক কুসংস্কার দূর করিবার জন্য প্রায় সকলেই সাহসী সেনানীর ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী বক্তা (First Bengalee Orator) রামগোপাল ঘোষই জাতি ভেদ অস্বীকার করেন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে "আমি গঙ্গা মানিনা" বলিয়াছিলেন, ইহাতে সে সময়ে কলিকাতায় একটা হুলস্থূল পড়িয়াছিল। তখন গঙ্গাজল স্পর্শ করতঃ বিচারালয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে হইত। যাহা হউক, রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে গমনের পর হইতে, খ্রীষ্টান মিশনারিগণ মহা উৎসাহে তাঁহাদের আন্দোলন, আলোচনা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাবিতরণ-কার্য্যে মাতিয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সময়েও

ইহা প্রবল ভাবেই চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টান ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি খৃষ্টের নামও শুনিতে পারিতেন না। কোন মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা অর্চনা করা বা কাহাকেও ঈশ্বরের অবতাররূপে ঘোষণা করা, তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বদ্ধমূল বিশ্বাসই ছিল। এজন্য তিনি স্বদেশীয় চৈতন্যদেবের নামও করিতেন না। কেন না, তিনিও একজন অবতাররূপে পূজিত, স্বীকৃত ও ঘোষিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সদলে আদি সমাজ হইতে পৃথক হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিবার পরে, দেবেন্দ্রনাথ একদিন সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছিলেন; তিনি মন্দিরের সম্মুখভাগেই খৃষ্টধর্ম্মের গির্জ্জার চূড়ার ন্যায় চূড়া দর্শন করতঃ, উপাসনার উপদেশে "খৃষ্ট-বিভীষিকা" বলিয়া অশোভন ও অপ্রত্যাশিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কেশবচন্দ্রপ্রমুখ দলের রণক্ষেত্রে অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই খৃষ্টান প্রচারকগণের পূর্ণ উদ্যম চলিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়া এদেশীয় শিক্ষিত যুবকগণ খৃষ্টান হইবার সম্ভাবনা, ইহা দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন। কেন না, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় ও আলোকে প্রতিমাপূজা, নরপূজা প্রভৃতির প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবে। এতকাল পর্য্যন্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতে ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যে, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুতে দেবতার আরোপ এবং জলে তীর্থবোধ ইত্যাদি নির্ব্বোধদিগের কার্য্য বলিয়া প্রবচন থাকিলেও, তাহার প্রভাব কাহারও প্রতি পরিদৃষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ডিরোজিওর প্রধান শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং সুশিক্ষিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেখিবে যে, তাহাদের শাস্ত্রে কেবল প্রতিমা-পূজা, নরপূজা এবং নানা কুসংস্কারের কথাই বর্ণিত আছে, তখন তাহারা আর তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম্মে, জাতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না, দলে দলে খৃষ্টান হইয়া যাইবে। এজন্যই আমি বেদ বেদান্ত হইতে তাহাদিগকে দেখাইয়াছি যে, এক অদ্বিতীয়, নিরাকার সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পূজাই হিন্দুদিগের মহা গৌরব। এবং ইহাই বেদ ও বেদান্তে লিখিত আছে।" ইহা জানিলে তখন আর তাহারা বিদেশীয় ধর্ম্মের দিকে ধাবিত না হইয়া স্বদেশীয় স্বজাতীয় প্রকৃত ধর্ম্মের দিকেই আকৃষ্ট হইবে।" এজন্যই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পুস্তকে এ সকল বিষয় বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দেবেন্দ্রনাথের এ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজ পর্য্যন্তও ফলবতী হইতে দেখা যাইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তিগণও গতানুগতিক পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন বাক্যব্যয় করিতেছেন না; বরং তাঁহারা এই সকল পৌরাণিক, তান্ত্রিক দেবদেবীরত কথাই নাই, মনসা, মাকাল, শীতলা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, জরাসুর, এমন কি ওলাদেবীর পর্য্যন্ত কত আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ, মনের গতি ইহাদিগের দিকে স্থিরতর রাখিবার প্রয়াসী হইতেছেন। নরপূজার প্রাবল্য দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশে এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহাদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কেহ অবতার, কেহ বা স্বয়ং ভগবান্‌রূপে নানা ভাবের রচিত নানা মন্ত্রে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশ এখন God-making Bengal বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে টাঙ্গাইল সহরে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনে, শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতিরূপে দুঃখ করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান কলেজে আমি এম, এ, পরীক্ষার্থী যে সকল ছাত্রবন্ধুকে হাতে কলমে নানা প্রকারের চিত্র দেখাইয়া চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ শিক্ষা দিয়াছি, তাহারাই, দেখিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে, চন্দ্র-গ্রহণ সময়ে কি সূর্য্য-গ্রহণ সময়ে, উৎসাহের সহিত গঙ্গায় স্নান করিয়া নিজদিগকে শুদ্ধ হইলাম বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, কেশবচন্দ্র সদলে ব্রাহ্মসমাজে এ সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই সকল খৃষ্টান মিশনারীদিগের সহিত নানাভাবে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ ত্রিত্ববাদ, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব-প্রচার, শয়তানবাদ, অনন্তনরকবাদ, অভ্রান্তশাস্ত্রবাদ, অভ্রান্ত মহাপুরুষবাদ, মানবের পাপ লইয়াই জন্মগ্রহণ, খৃষ্টের রক্তমাংস পান ভোজন ও নানা প্রকারের অলৌকিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা, হস্তপদবিদ্ধ ও রক্তাক্ত শরীরে কবর হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যাওয়া (পুনরুত্থান) ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েই মহাতর্ক চলিয়াছিল; এবং পরিশেষে কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ মিশনারী রেঃ ডাইসন সাহেবের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের পরে, ডাইসন সাহেব ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। তাঁহার পরাক্রমে সে সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ এতদূর আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের গলে জয়মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র কখনও রামমোহন রায়ের ন্যায় বিদ্রূপ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতায়, আলোচনায় গাম্ভীর্য্য সম্বন্ধে প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনের বাড়ীতে, শ্রদ্ধেয় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্রের তর্কযুদ্ধের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজা কখনও কখনও বিদ্রূপ বা পরিহাসচ্ছলেও তর্ক করিতেন, যেমন ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে বলিবার সময়ে চীন দেশীয় তিন জন খৃষ্টান ও ইংরেজ পাদ্রীর বিষয় উল্লেখ করতঃ তর্ক করিয়াছিলেন; রামমোহন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানাস্ত্র-প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র খৃষ্টকে অতি উচ্চাসনে বসাইয়া, তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রত্ব দৃঢ়তর রাখিয়া, তাঁহার বিশেষত্বের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি অন্যান্য যাবতীয় মহাপুরুষদিগের তুলনায় খৃষ্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে (Prince of Prophets) ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রদত্ত Jesus christ: Europe and Asia, Great Men, Inspiration, India askes: who is christ? এবং That marevllous Trinity বক্তৃতাগুলিতে তিনি খৃষ্টকে কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তত্ত্বাবতে তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে ও চিরদিনই আসিবে। তিনি খৃষ্টকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া, শুধু স্বীকার নহে, গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে জুডাস বলিতেন। তিনি যিশুদাস পদবী গ্রহণ করতঃ নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন, তাঁহার এই গ্রহণের ফলেই খ্রীষ্টানধর্ম্মের সহিত আর সংগ্রামের প্রয়োজন হয় নাই। গ্রহণেই প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রদর্শিত হয়, বিবাদের অবসান হইয়া পড়ে। কেন আজ খৃষ্টান ধর্ম্ম এদেশের শিক্ষিতবর্গকে পূর্ব্বের ন্যায় আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে? খৃষ্টান ধর্ম্মের জীবনীশক্তি (vitality) এখনও সতেজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ আর সেই রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির ন্যায় মনীষী ব্যক্তিগণ এখন আর খৃষ্টান হন না। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের কোন বিশেষ মহতী সভাতে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরই একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, "আপনারা সকলেই মনে করিয়া আসিতেছেন যে, আমরা ভারতীয় খৃষ্টানমণ্ডলী শুধু ভারতবাসী-দিগকে খ্রীষ্টান করিবার জন্যই সমস্ত ভারতে প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০।৬০ কোটি টাকা খরচ করিয়া আসিতেছি। এ মনোভাবের আমি প্রতিবাদ করিতেছি, যেহেতু কই এখন ত আর পূর্ব্বের ন্যায় উল্লেখ-যোগ্য ভারতীয় শিক্ষিতবর্গের কেহই প্রায় আমাদের এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন না। তবে কেন আমরা এত অর্থ ব্যয় করিতেছি?" উত্তরে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের এ দেশীয়দিগকে শিক্ষা প্রদান করাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য, শিক্ষা দ্বারাই মানুষ তৈয়ার হইয়া থাকে। মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলাই এখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।" মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্টকে আমাদেরই একজন বলিয়া ঘোষণা করিবার পরে, ১৮৭৩ সনে তদানীন্তন সোমপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় (ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল এবং যাঁহার রচিত "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" পুস্তক পড়িয়া আজও বাঙ্গালী জাতি হাস্যজনক বিশুদ্ধ আমোদে তৃপ্তি লাভ করতঃ মনে মনে গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া থাকে) তাঁহার সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলেন যে, "কেশবচন্দ্র যেভাবে খৃষ্টকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা হিন্দুগণই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছি। খ্রীষ্টের নীতি, প্রেম, বৈরাগ্য এবং অভিন্ন যোগ ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়। ঐ সেই ভারতীয় ঋষিগণ ইহা জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব ইহা তাঁহার জীবনে অতি সুন্দরভাবে উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারাও যেমন ভারতীয় ঋষি, দিব্যপুরুষ, খ্রীষ্টও সেইরূপই একজন ঋষি ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।" কেশবচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা "Jesus Christ: Europe and Asia" পড়িয়া সে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতেই আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কেশবচন্দ্র শীঘ্রই খৃষ্টিয়ান হইয়া পড়িবেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও সর্ব্ব প্রথমে "Precepts of Christ is to guide peace and happiness." বলিয়া খৃষ্টের উক্তি সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠিক তখনও খৃষ্টীয় মণ্ডলী প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, মহাত্মা রামমোহন রায় এবার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। যাহা হউক, পরে কেশবচন্দ্রের Great Men বক্তৃতা পড়িয়া সকলের চমক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তথাপি তাঁহার ঐ সকল বক্তৃতায় ইউরোপ ও আমেরিকার এক নূতন আলোক প্রকাশিত হইয়া আজও দীপ্তি পাইতেছে। ঐ আলো নূতন নূতন ভাব প্রদর্শন করিতেছে। কেশবচন্দ্র হইতে খৃষ্টসম্বন্ধে এই নবালোক, নবভাব ও আধ্যাত্মিকতার নব আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াই, তাঁহার সহযোগী প্রতাপচন্দ্র "Oriental Christ" লিখিয়া জগতে যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় পবিত্র কোরাণ শরিফ হইতে Inspiration পাইয়া সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। আমরা আজ এখানে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন, কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন, সে সকল অবান্তর কোন কথার উল্লেখ করিতেছি না। কেবল বলিতে চাই যে, রামমোহন যে শুধু আমাদিগকে নহে, সমস্ত জগদ্বাসীদিগকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবনে ধর্ম্মলাভের প্রধান কথাই "সমীহা" সাধন। যাহা করিতেছি তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতেই করিতেছি, যাহা বলিতেছি তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতেই বলিতেছি, যাহা দেখিতেছি তাহা ও ঈশ্বরের সাক্ষাতেই দেখিতেছি, যাহা ভাবিতেছি তাহাও ঈশ্বরের সাক্ষাতেই ভাবিতেছি। এইরূপ যে চিন্তন, তাহারই নাম সমীহা। ইহা স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মসাধনের অতি সহজ উপায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ঐ সেই উপনিষদের ছিন্ন পত্র পড়িয়াই, তাঁহার মনের মতন কথাটি পাইলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেন, "সংসারের যাবতীয় বস্তুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত সন্দর্শন কর, তিনি যাহা তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।" আমাদের ন্যায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা এক অমূল্য উপদেশ, এই সাধনায়ই গৃহী ব্যক্তির নিত্য কর্ম্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ। এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গাহিয়া যাইতেছেন যে, "গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন, পবিত্র তীর্থ এ সংসার তপোবন।" কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের আদেশ সংসারে প্রতিপালন কর। তিনি নিজ জীবনের আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এই জীবিতকালে ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ধর্ম্মসাধনের স্বাভাবিক উপায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে, "আদেশানুগতো ভক্তঃ কেশবো ব্রহ্মসেবকঃ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১লা আগষ্ট, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে ৺কৃষ্ণবিহারী সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জন্ম দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

উৎসব—গত ১লা আগষ্ট, বাগনানে, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের প্রতিষ্ঠা-দিন স্মরণে বিশেষ উৎসব হয়। ভাই প্রিয়নাথ প্রাতে উপাসনা করেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু প্রার্থনা করেন এবং আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হয়; ও নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে নীতি উপদেশ দিয়া অবসর দেওয়া হয়। অপরাহ্নে প্রার্থনা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ শান্তিকুটীরে আসিয়া, সপরিবারে সন্ধ্যার উপাসনা করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে সায়ং উপাসনা ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ সম্পাদন করেন।

পারলৌকিক—গত ২রা আগষ্ট, মঙ্গলবার, প্রাতে ভাগলপুরে শ্রীমতী নির্ম্মলা বসুর গৃহে, পরলোকগত মাতুল শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়. শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ সময়োপযোগী উপাসনা করেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু প্রার্থনাদি করিয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ও নিম্নলিখিত দান স্বীকার করেন:— মুঙ্গের ব্রহ্মসমাজ ১৲, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ ১৲, দুস্থ বিধবা ১৲, রোগীর সেবার্থে ২৲, কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে (কলিকাতা) ৫৲ টাকা, মোট ১০৲ টাকা।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কুচবিহারে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী, প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে, গত ৬ই আগষ্ট, পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিধামে স্নেহময়ী জননীর কোলে স্থান লাভ করিয়াছেন।

গত ১২ই আগষ্ট, ১৩।১এ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃব্য (৺সতীশচন্দ্র দত্তের অনুজ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তের পরলোকগমন উপলক্ষে উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

পরমজননী পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৪শে জুলাই, (বারিপদায়, ময়ূরভঞ্জে) ৺ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, প্রাতে ভাই নগেন্দ্রনাথের ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র উপাসনা করেন, ভাই নগেন্দ্রনাথ সময়োপযোগী প্রার্থনা ও সঙ্গীত করেন। ভাই অখিলচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ দেবের "অমর জীবন" প্রার্থনাটী আবৃত্তি করিয়া, ভক্ত নন্দলালের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধে লিখিত আত্মনিবেদন পাঠ করেন।

পশ্চিম বঙ্গের চিহ্নিত কাঙ্গালদাস ফকিরদাস রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ১৫ই শ্রাবণ প্রাতে, অমরাগড়ীতে তাঁর সমাধিমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। ২রা আগষ্ট, (১৭ই শ্রাবণ) জয়পুর হাইস্কুলে কাঙ্গালদাস ফকিরদাসের স্মৃতিসভা হয়। রাউতড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ৩০০শত ছাত্র ও শিক্ষকগণ উক্ত স্মৃতিসভায় যোগদান করেন। ছাত্রদের মধ্যে ৫।৬টী ছাত্র ইংরাজী ও বাঙ্গলা প্রবন্ধে ভক্ত দাসের উচ্চ জীবনের ও স্বদেশ-সেবার বিষয় বর্ণনা করেন। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং সভাপতি ভক্তের পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ইংরাজীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখার জন্য একটি ছাত্রকে ৩৲, বাঙ্গালায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখার জন্য একটী ছাত্রকে ২৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার দেওয়া স্থির হইয়াছে।

গত ৩১শে জুলাই, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধা দেবীর একমাত্র পুত্র ৺প্রেমেন্দ্রনাথের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ৭৬নং নিউ থিয়েটার রোডে "প্রেম-সঙ্ঘের" শিশু-সমাগম হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং কুমার বিকাশেন্দ্র-নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। এই উপলক্ষে পুরী প্রেমাশ্রমেও শ্রীকেশব-প্রেমসঙ্ঘের যুবাদিগকে লইয়া ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বিশেষ উপাসনা করেন। যুবকগণ সমবেত সঙ্গীত করেন।

একখানি পত্র

আমার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী, প্রায় ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমে, গত কল্য (৬ই আগষ্ট, ২১শে শ্রাবণ) শনিবার, দেহমুক্ত হইয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ৩টি পুত্র ও ২টি কন্যা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আগামী ১৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া এখানে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে ও আমাকে চিনেন, এমন শ্রদ্ধেয় ভাই বন্ধুদিগের সমীপে প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন তাঁহার আত্মার জন্য তাঁহাদের উপাসনা প্রার্থনার সময়ে বিধাতা সমীপে প্রার্থনা করেন।

কোচবিহার,	বিনীত
৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮ খৃঃ।	শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উনসপ্ততিতম ভাদ্রোৎসব

নিমন্ত্রণ

"হেন শুভদিনে কে কোথা আছ ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।
ইহপরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই;
নরামর আত্মপর মিশে যাই এক ঠাঁই।
মা মা মা বলে, ভক্তিরসে গলে,
তাঁহার চরণে লুটাই॥"

কার্য্যপ্রণালী

(আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৫; ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮; সোমবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে (৭৮বি অপার সার্কুলার রোড) উপাসনা; সন্ধ্যা ৭টায়, ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গাদি।

৩১শে „ ১৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গাদি।

৩২শে „ ১৭ই আগষ্ট, বুধবার—স্বর্গগত শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ দেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা; সন্ধ্যা ৭টায়, ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৪॥০টায় শান্তি-কুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী "জন্মাষ্টমী" উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয়ে বলিবেন।

২রা „ ১৯শে আগষ্ট, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা।

৩রা „ ২০শে আগষ্ট, শনিবার—স্বর্গগত জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা; সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদল কর্ত্তৃক সঙ্গীত, প্রার্থনা, বক্তৃতা প্রভৃতি।

৪ঠা „ ২১শে আগষ্ট, রবিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ও বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা; ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গ এবং ৭টায় কান্তিচন্দ্র স্মৃতি-উৎসবে উপাসনা—ভিখারীর উৎসব—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, সোমবার—সন্ধ্যা ৭টায় শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে কীর্ত্তনাদি।

৬ই „ ২৩শে আগষ্ট, মঙ্গলবার—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

৭ই „ ২৪শে আগষ্ট, বুধবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

৮ই „ ২৫শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—যুব-উৎসব।

৯ই „ ২৬শে আগষ্ট, শুক্রবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায়, চন্দননগর প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় "আধুনিক ভারতে শ্রীকেশবচন্দ্রের অবদান" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

১০ই „ ২৭শে আগষ্ট, শনিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

১১ই „ ২৮শে আগষ্ট, রবিবার—**সমস্তদিনব্যাপী উৎসব**—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় কীর্ত্তন, ৮॥০টায় উপাসনা; মধ্যাহ্নে ৩টায় উপাসনা ও তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; সন্ধ্যা ৬টায় কীর্ত্তন ও ৭টায় উপাসনা।

দ্রষ্টব্য :—উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অঞ্জলিরূপে যিনি যাহা দিবেন, তাহা ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উৎসব ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ ডাক্তার শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

১১ই ভাদ্র দুইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
2nd. September, 1938

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা

ধন্য, মা, উৎসব সত্যই তোমার স্বর্গের প্রেমবারি-বর্ষণ। ধরায় স্বর্গের অবতারণা ভিন্ন উৎসব আর কি? ভাদ্র মাসে যখন বারি-বর্ষণ হয়, চতুর কৃষক যে, সে প্রাণপণে ক্ষেত্র কর্ষণ করে ও নব নব জীবন্ত বীজ বপন করিয়া লয়। কেন না সে জানে, এ সময় ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ বপন না করিলে, পরে হাহাকার করিয়া মরিতে হইবে। যে তাহাতে অবহেলা না করে, সে প্রচুর ফসল সঞ্চয় করিয়া নিজেও ধন্য হয়ই, আবার প্রতিবেশী ও দেশবাসীদিগকে তাহা বিক্রয় করিয়া বা বিতরণ করিয়া তাহাদিগেরও কতই জীবনের উপায় বিধান করে। নববিধানের নবসাধন নববিধানের উপাসনা। এই ভাদ্রোৎসব বিশেষভাবে সেই উপাসনা-প্রতিষ্ঠারই উৎসব। এই উপাসনা আমাদের জীবনক্ষেত্র কর্ষণ ও তাহাতে বীজ বপন এবং তদ্দ্বারায় ফল উৎপাদন ভিন্ন আর কি? এই উপাসনা-সাধনাতেই শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধানমূর্ত্তিমান হইলেন, এবং অখণ্ড মানবত্ব লাভ করিলেন। এই উপাসনা-সাধনার দ্বারাই কেশবচন্দ্র কেশবচন্দ্র হইলেন। নিজ জীবনের সাধনার দ্বারাই তিনি এই নববিধানের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিলেন। অতএব এই উপাসনা-সাধনে যদি আমরা অবহেলা করি, কেমন করিয়া আমরা শ্রীকেশবের জন্মশতবার্ষিকী-সাধনে সক্ষম হইব। মা, যদি তুমি দয়া করিয়া, উপাসনাপ্রতিষ্ঠার উৎসব এই ভাদ্রোৎসব আমাদিগের দ্বারা সম্পাদন করাইলে, তবে আমরা যেন এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিশ্বমানব-জীবনপ্রদ উপাসনায় প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাবতী হইতে পারি, এবং প্রতি পরিবারে পরিবারে ইহা সাধন করিয়া, সপরিবারে ও সদলে শ্রীদরবারস্থ সকল ভাই শ্রীকেশবের সহিত সমযোগে ইহা নিত্য সাধন করিয়া ধন্য হই। তোমার কৃপাবারিবর্ষণে আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, দলগত এবং দরবারগত জীবনে প্রচুর ফললাভে ধন্য কর। আমরা যেন সকল দেশবাসী ও জগদ্‌বাসীকে নবজীবনলাভের উপায়-বিধানে সক্ষম হইতে পারি। তাহা হইলেই যথার্থ পৃথিবীতে শ্রীকেশবচন্দ্রের পুনরাগমন হইবে এবং তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী-যজ্ঞও সফল হইবে। মা, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী-সাধনে ঐক্যবন্ধন

নববিধান পবিত্র আত্মার বিধান। এই বিধানের সাধন উপাসনা, পরমাত্মার উপাসনা। জীবন্ত পরমাত্মা আমাদের উপাস্য। তাই আমাদের উপাসনা জড়পূজা নয়, মানুষ-পূজাও নয়; আমরা যেমন জড় দেবদেবীর পূজা ছাড়িয়াছি, তেমনই মনের কল্পিত দেবদেবীর পূজা যেন আমাদের উপাসনা না হয়। আমরা যেন আরাধনা করিতে বুদ্ধির তুলি দিয়া মানসপটে কোন কল্পনার মূর্ত্তি আঁকিতে চেষ্টা না করি।

আমাদের উপাসনা—আত্মার উপাসনা, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উপাসনা। সুতরাং আমরা যদি কেবল জ্ঞান বিচার বুদ্ধি যোগে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হই, সে উপাসনা ঠিক উপাসনা হইবে না। তাহা মনের ভাব বা কল্পনা মাত্র হইতে পারে। তাই আমাদের পরমাত্মা-রূপিণী নববিধানবিধায়িনী জীবন্ত জননীর পূজা করিতে হইলে, আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন আমাদের উপাসনা-সাধন যথার্থ হইবে না। এজন্য, তিনি হৃদয়বেদীর উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া উপাসনা করাইতে-ছেন, ইহাই যেন উপলব্ধি করিতে পারি। ইহারই প্রক্রিয়া নববিধানাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত উপাসনা-সাধন-প্রণালীতে নিবদ্ধ। তাই সেই প্রণালী অনুসরণ না করিলে, আমরা কেমন করিয়া উপাসনায় সিদ্ধ হইতে পারিব। ইহা প্রত্যক্ষ জীবন্ত বিধাতাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং নববিধান-মূর্ত্তিমান্ আচার্য্যের সাধনসিদ্ধ মন্ত্র বিশ্বাস করিয়া, যেন আমরা অক্ষুণ্ণভাবে এই প্রণালীগত উপাসনা-সাধনে কৃতসংকল্প হই।

এই উপাসনাপ্রণালী নিম্নলিখিত কয়েকটী ভাগে বিভক্ত :—

১। উদ্বোধন-সঙ্গীত। ২। উদ্বোধন। ৩। আরাধনার সঙ্গীত। ৪। স্বাধ্যায়-মন্ত্র। ৫। আরাধনা। ৬। ধ্যান। ৭। সমবেত প্রার্থনা। ৮। জগতের মঙ্গল-প্রার্থনা বা ব্যক্তিগত প্রার্থনা। ৯। সঙ্গীত। ১০। ব্রহ্ম-স্তোত্র। ১১। শাস্ত্রপাঠ। ১২। আদর্শ-চরিত স্মরণ। ১৩। উপদেশ (সামাজিক উপাসনায়)। ১৪। আচার্য্যদেবের প্রার্থনা। ১৫। সঙ্গীত। ১৬। শান্তিবাচন। ১৭। শেষ সঙ্গীত বা সংকীর্ত্তন। ১৮। নমস্কার। এই অঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উদ্বোধনের ভিতর ইহুদী ও ঋষিদিগের সাধনা নিহিত। আরাধনায় পৌরাণিক সাধনা, বৈদিক সাধনা, ইস্লামিক সাধনা সমন্বিত। ধ্যানে ঋষি এবং যোগীদিগের সাধনা, প্রার্থনায় খৃষ্ট-সাধনা, দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা ইসলাম সাধনা, স্তোত্র ও সংকীর্ত্তন বৈষ্ণব সাধনা, শাস্ত্রপাঠে শিখ ও হিন্দু সাধনা, উপদেশে খ্রীস্ট এবং ইসলাম সাধনা, এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন সাধনা একই প্রণালীতে এই উপাসনায় সমন্বিত ও নিবদ্ধ সুতরাং সকল ধর্ম্মা-বলম্বীর সহিতই সমযোগসাধনার এমন প্রকৃষ্ট প্রণালী আর কোথায়?

এই প্রণালীসাধন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে কিছু কিছু বৈষম্য দেখা যাইতেছে, সে বিষয়ে এবার-কার উৎসবে আমরা যেন বিশেষ আলোক ভিক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি।

উদ্বোধনে আমরা মনকে সাংসারিক চিন্তা হইতে বিমুক্ত করিয়া ঈশ্বরের দিকে উন্মুখীন করিব। ইহাই আমাদের উদ্বোধনের সাধনা। এ সময়ে আমরা সাংসারিক চিন্তা হইতে ঈশ্বরের দিকে আত্মচেষ্টায় আকাঙ্ক্ষিত হইতেছি। ইহাই আমাদের প্রধান ভাব হইবে। এ সময়ে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে নাই, দূরে আছেন, তাই তাঁহাকে তিনি বলিয়া ভাবিতেছি। যিনি দূরে, তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা হয়? তাই উদ্বোধন সাধনে প্রার্থনা করা স্বাভাবিক নয়, তাহা আমরা যেন না করি। উদ্বোধনের সঙ্গীতও আমাদের সেইভাবে হওয়া উচিত।

উদ্বোধনে পর আরাধনার সঙ্গীত, তাহাও আরাধনার উপযোগী ঈশ্বরের স্বরূপ-ব্যঞ্জক হইবে, তাহাতে যেন প্রার্থনার ভাব না থাকে। তাহার পর স্বাধ্যায়মন্ত্র, স্বাধ্যায়-মন্ত্র উচ্চারণের প্রথমে কেহ কেহ ওঁ শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আচার্য্যদেব তাহা করেন নাই। ওঁ শব্দ সমষ্টিগত ভাবব্যঞ্জক। ইহা সাধারণতঃ প্রাচীন বিধানে দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতে ব্যবহৃত হইত। আমরা যখন ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে দর্শন করিয়া, তাঁহার স্বরূপ-বিশ্লেষণে আরাধনাপূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন কেন এ শব্দ উচ্চারণ করিব। আরাধনায় আমরা ঈশ্বরের এক এক স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া উপলব্ধি করিতে চাই। যদিও ঈশ্বরের

সকল স্বরূপই পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আরাধনা-সাধনের জন্য যখন বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেছি, তখন ঈশ্বরের এক এক স্বরূপ পৃথক করিয়া দর্শন করিতে হইবে। এ সময়েও প্রার্থনার অবস্থা নয়। কেন না, আরাধনায় আমরা পূর্ণ ব্যক্তিরূপে ব্রহ্মকে ত উপলব্ধি করিতেছি না। যেমন কোন মানুষের এক এক অঙ্গ যখন দেখি, তখন ত সমস্ত মানুষটীকে দেখিতেছি না। মানুষটির চোখটি কেমন যখন দেখিতেছি, তখন চোখটিই দেখিব। তখন তাহার কাণের কথা ভাবিব কেন? এমনি আরাধনার সময় যখন সত্যস্বরূপ দেখিব, তখন তাঁহার সত্তা মাত্র দেখিব, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব দেখিব না। তখন তাঁহার ব্যক্তিরূপও দেখিতে চাহিব না; তিনি পিতা কি মাতা, গুরু কি বন্ধু, এ সব কথাও সে সময় আনিব না। এমনি জ্ঞানস্বরূপের সময় তাঁহার জ্ঞানের ভাব ভাবিব। অনন্তস্বরূপ-সাধনের সময় আমাদিগকে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানাতীত ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার পর তাঁহার সেই অনন্ত সত্তা তাঁহার প্রেমেতে ব্যক্তিরূপ যখন ধারণ করেন, তখনই তাঁকে বিশেষ ব্যক্তিরূপে অর্থাৎ পিতামাতা বন্ধু ইত্যাদিরূপে উপলব্ধি করিব। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমানবের এবং সকল ধর্ম্মের অখণ্ডত্ব হৃদয়ঙ্গম করিব। অদ্বৈত ব্রহ্মের এক দিকে প্রেম, আর এক দিকে পুণ্য; সেই পুণ্যরূপপ্রদর্শনে তিনি যখন আমাদের পাপ মনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন, তখনই আমাদের নবজন্ম বা পবিত্রাত্ম জাত জন্মলাভ হয় এবং তখনই আমাদের তাঁহার আনন্দঘনরূপদর্শনের অবস্থা আসে। এইরূপে যখন প্রত্যেক স্বরূপটি পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি হয়, তখনই তাঁহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ধ্যানযোগে দর্শনের অবস্থা আসে। সেইজন্যে 'তুমি তুমি' বলিয়া যাঁহাকে দেখিতেছিলাম, তিনি আবার এক তিনি হইয়া সর্ব্বস্বরূপের মিলিতরূপে দেখা দিতে আসেন। ইহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যানে তাঁহার প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধ হইলে, স্বভাবতঃই মন তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে ব্যাকুল হয়। এখনই যথার্থ প্রার্থনার অবস্থা।

নববিধান সমগ্র মানবের সহিত সমযোগসাধনার বিধান; তাই প্রার্থনায় আমরা কেবল ব্যক্তিগত প্রার্থনা না করিয়া, সকলেই সমস্বরে প্রার্থনা করি—"আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও" ইত্যাদি। এইরূপে যখন আমরা প্রকাশ্য মন্দিরে উপাসনা করি, তখন জগতের জন্য প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মস্তোত্র আমাদের নাম-স্মপ-সাধন। বিভিন্ন শাস্ত্র-পাঠের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সহিত আত্মযোগ-সমাধান। তাহা কেবল পাঠ নয়, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অনুসরণ সাধন। ইহা দ্বারা আমরা প্রত্যেক ধর্ম্মকে হৃদয়ঙ্গম ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিব এবং তদ্দ্বারা সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ঐক্যবন্ধন সাধন করিব।

অনেকে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রার্থনাকেও শাস্ত্রের ন্যায় পাঠ করিয়া উপদেশ দেন, ইহা নববিধানসঙ্গত নয়; কেন না প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত কি আমাদের সে সম্বন্ধ? তিনি যে আমাদেরই, আমরা যখন নববিধানবিশ্বাসী হইয়াছি, তখন আমরা তাঁহার সহিত একাঙ্গ, এক পরিবারভুক্ত; তাই তিনি বলিলেন, "ইহারাও যা, আমিও তা।" "ইহারা ও আমি একটা"। তাই তাঁহার প্রার্থনাই আমাদের প্রার্থনা, তাহা আমাদের শাস্ত্র নয়। সেইভাবে তাঁহার প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া, আমাদের তাঁহার সহিত সমযোগসাধনে নববিধানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে সংযুক্ত হওয়া বিধেয়। শাস্ত্রকারদের কথা লইয়া আমরা উপদেশ দিতে পারি।

দৈনিক উপাসনা-কালে আদর্শচরিত স্মরণ এবং শান্তিবাচনের পর যত শাস্ত্রকে, যত সাধুকে, যত নারীকে, যত শিশুকে, যত শত্রুকে এবং নববিধানকে ও শেষে পবিত্রাত্মারূপিণী জননীকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিতে আচার্য্যদেব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এগুলিকেও উপাসনার অঙ্গরূপে আমাদের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। শেষে আমরা "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" বলিয়া 'শান্তি শান্তি' উচ্চারণে উপাসনা শেষ করি। কেহ কেহ 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলমের' সঙ্গে সঙ্গে 'হরিকৃপা হি কেবলম্,' 'মাতৃকৃপা হি কেবলম্,' উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, আমাদের ব্রহ্মই হরি ও মা। তাই আচার্য্যদেব এক 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্,' উচ্চারণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারই ভিতরে ঐ তিন ভাবই নিহিত। তবে যদি আমাদের ত্রিনীতি সাধন প্রবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে বরং 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলমের' সঙ্গে "ব্রহ্মানন্দো হি কেবলম্,' নববিধির্হি কেবলম্" ইহা সংযোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা মণ্ডলী ও শ্রীদরবার সমযোগে এই সংযোজন গ্রহণ করিতে পবিত্র আত্মার আলোকে নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে ইহা সংযুক্ত হইতে পারে।

নববিধানাচার্য্য বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী সম্পাদনের জন্য যখন আমরা প্রস্তুত হইতেছি, তখন তাঁহার প্রবর্ত্তিত

ও জীবন্ত ঈশ্বর-প্রেরণায় উপলব্ধ যে উপাসনাপ্রণালী আমরা লাভ করিয়াছি, তাহারই অনুসরণে পূর্ণভাবে সাধন করিয়া, যেন আমরা তাঁহাকে জীবনে গ্রহণ করিবার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারি।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

উপাসনার অবস্থা

শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন "উপাসনা যেন আমাদের জীবনের অবস্থা হয়।" সত্যই উপাসনা আমাদের শ্রেষ্ঠ সাধন। আমরা যখন উপাসনা করি, তখন আমরা কতই উচ্চ স্বর্গ অনুভব করি। কিন্তু আবার উপাসনার মন্দির হইতে বাহির হইলেই, আমরা যে মন লইয়া আসিয়াছিলাম, সেই মনে ফিরিয়া যাই। যদি উপাসনা আমাদের জীবনের প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহা হইলে যখন যেখানে, যে কার্য্যে থাকি না কেন, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের সন্নিধানে আছি বা ঈশ্বর জীবন্তরূপে আমার কাছে কাছে আছেন, ইহা উপলব্ধ হইবে। জীবনের এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই উপাসনা-সাধন। যতদিন না সে অবস্থা হয়, ততদিন আমাদের নিরাপদ অবস্থা নয়।

শ্রীকেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা

নববিধানে শ্রীকেশবচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা শিক্ষা দিলেন। সেই জন্য উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা-সাধনে সাধকের পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। মন্ত্র তন্ত্র পুস্তক আচরণ বিধি ইত্যাদিতে নিবদ্ধ হইয়াই সকল ধর্ম্মস্রোত সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের অধীন হইয়া, আমরা জীবনে অনন্ত উন্নতি লাভ করিব। ইহারই পথ নববিধানে মুক্ত হইল। এতদূর স্বাধীনতা দিলেন যে, তাহাতে স্বেচ্ছাচার আসিবারও আশঙ্কা। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জীবন্ত, তিনি স্বয়ং আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করেন। তাঁহার অধীন হইতে আকাঙ্ক্ষিত যে, তাহার ধর্ম্মরক্ষক যে তিনি; তাই কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমরা ঈশ্বরের অধীন, তাই চির স্বাধীন।" তাঁর মতে ঈশ্বরের প্রকৃত অধীনতাই পূর্ণ স্বাধীনতা।

—•—

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

আত্ম-জ্ঞান

তৃতীয় প্রবন্ধ

(১)

পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষ চিন্তাটি ধরিয়া আবার বিচার আরম্ভ করি। ব্রহ্মকে যে পাপ স্পর্শ করে না, তাহা ত দেখা গেল। তাহা হইলে সংসারে পাপের স্থান কোথায়? ব্রহ্মে যখন পাপ নাই, তখন পাপ সাধকের আত্মায় অথবা প্রকৃতিতে আছে কি? নিজে কষ্ট পাইতেছি বলিয়া অপরকে দোষী করিতে অনেক সাধকের প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্রহ্মসাধকের অন্তরে সন্দেহ উঠে না। তা'ছাড়া প্রকৃতির মধ্যে যখন ব্রহ্মদর্শন ঘটিয়াছে, তখন তাহার মধ্যে পাপ না থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণে ব্রহ্মসাধক নিজেকেই পাপী সাব্যস্ত করিয়া লন। তাই বলিয়া ইচ্ছা করিয়া পাপ করিলেও ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করিয়া কিছু ব্রহ্মানুভূতি পাওয়া যায় না। তিনি যখন জানেন, সাধকের কোন হাত নাই, অথচ সে পাপ-দুঃখ পাইতেছে, তখন তিনি তাহা হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য সাধকের সহায় হন। এইরূপ বিশ্বাসী সাধকগণ অবিরাম মনে করেন যে, পাপতাপ আপন সত্তা হইতে উৎপন্ন হইতেছে ও যাহা কিছু পুণ্য, তাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। কেশবও এই পথের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেশবের এইরূপ অনুভূতির সহিত বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনার যে পাপ-স্বীকারের মন্ত্রাদি আছে, তাহার সহিত অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাই; এবং উপনিষদের যুগে ব্রহ্মসাধকদিগের জীবনে "যদ্ রাত্র্যা (অথবা অহ্না) পাপম্ অকার্ষম্ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং" ইত্যাদি অথবা পাপের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি যে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ভগবৎসমীপে নিবেদিত হইত, তাহা বলা বাহুল্য। উপনিষদে পাপ সম্বন্ধে কয়েক স্থলে উল্লেখ আছে। ঋষিদিগের বাণী অনুসারে ঈশ্বর-সন্নিধানে অগ্রসর হইবার জন্য যাহা কিছু বিঘ্নস্বরূপ, তাহা সমস্তই পাপ এবং পরিত্যাজ্য। তবে মানবসত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন হইলে পর পাপের উৎপত্তি বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "এই পুরুষ জন্মলাভ করিলে পাপের সহিত সংসৃষ্ট হন। যখন ইনি উৎক্রমণ করেন এবং মৃত হন, তখন পাপসমূহকে পরিত্যাগ করেন।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৮)। যাজ্ঞবল্ক্যের এই মহাবাক্যের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের আচার্য্যগণের পাপসম্বন্ধে উক্তি অনেকটা মিলিয়া যায়। তবে ত জগতের সকল ব্রহ্মসাধক ইহার সমর্থন করিতেছেন। পাপসম্বন্ধে তাঁহাদের মতের কিছু অনৈক্যও থাকিতে পারে, কিন্তু কেশব সম্বন্ধে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তাঁহার সাধনজীবনের "পাপ-বোধ" সম্পূর্ণভাবে আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত। ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জানা এইখানেই শেষ হইল।

(২)

যাঁহারা কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা এইরূপ আত্মজ্ঞান লইয়াও সন্তুষ্ট হইবেন না। উপনিষদের যুগেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহারা অনেকে ভাবিলেন, "ঈশ্বরেতে পাপ নাই, আমাতেই কি তাহা আছে?" এই প্রশ্ন তাঁহাদের অন্তরকে দগ্ধ করিল। "আত্মার" সাধনার দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে জানিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। অথচ ব্রহ্মানুভূতি

ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথের সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা এতই তৃপ্ত যে, ব্রহ্মের বিরুদ্ধে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিযোগের জ্বালা যন্ত্রণা তাঁহারা সহ্য করিতে চাহিলেন না।

কিন্তু সকল সাধক শান্তিপ্রিয় নহেন। সাধকের মধ্যে ব্রাহ্মণভাব থাকিতে পারে; আবার কাহারও মধ্যে ক্ষত্রিয়ভাবও যে বিদ্যমান থাকিবে না, এমন নহে। এই দুই প্রকার সাধক মিলিয়া উপনিষদের অনুভূতিধারা জগৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে ব্রাহ্মণপ্রকৃতির সাধকদের বিষয়ে চর্চ্চা করিতেছিলাম। এইবার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির সাধকগণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রহ্মের সহিত শান্তিস্থাপনে বিমুখ হইয়া সাধন-সংগ্রামে নামিলেন। কেশব তাঁহাদিগের সহিত রণে নামিতে চান না। যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। আমার ত নিজের কথা ভাবিলে চলিবে না। কেশব যখন আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ দেখিতে যাইব ও সংগ্রামস্থল পরিদর্শন করিয়া যেটুকু নিজ বুদ্ধিতে উপনিষদের ও পরবর্ত্তিকালের আচার্য্যগণের সাহায্যে জানিতে ও বুঝিতে পারিব, তাহাই নিবেদন করিব ও পরিশেষে কেশবের সহিত মিলিত হইব।

উপনিষদের সাধকদিগের অবস্থার কতই পরিবর্ত্তন হইল। ব্রহ্মানুভূতির কালে ঋষি সত্যকাম প্রভৃতি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া আর কিছু জানিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের সময় নিজ সত্তা ও প্রকৃতির সত্তার ভিতর দিয়া বিচ্ছেদের মধ্যেও তাঁহারা ব্রহ্মমহিমা উপলব্ধি করিলেন। এক্ষণে ব্রহ্মকে বর্জ্জন করিয়া সে কালের অতৃপ্ত সাধকগণ আবার কোন পথে চলিলেন?

ব্রহ্মানুভূতিতে সাধকের হৃদয় ছিল, সাধনার পীঠস্থান। ব্রহ্মজ্ঞানের সময় হৃদয় ছাড়া মস্তকের সাহায্যও সাধক লইলেন, কিন্তু অহরহ হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এক্ষণে 'আত্মা'র সাধনার পথে আর নিজ চেষ্টায় হৃদয়ের দিকে তাঁহারা ফিরিতে চাহিলেন না। হৃদয়ের কার্য্য বন্ধ হইলে অবশ্য মানুষ আর বাঁচে না। কিন্তু হৃদয়কে অনুগত রাখিয়া, তাহাকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত রাখিয়া, মস্তকের দ্বারা চালিত হইতে জীবজগতে শুধু মানুষই পারে। তাই বোধ হয়, আত্মার সাধন কেবলমাত্র মানুষের ধর্ম্ম হইতে পারে।

তবে ত বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। হৃদয়কে নির্জীব করিয়া মস্তককে উত্তরোত্তর সজীব করিতে গেলে, "প্রকৃতি" আকর্ষণ করিতে পারে। তাহা হইলে সাধক নীচ স্বভাব অথবা ইন্দ্রিয়ের সেবক হইয়া যাইবেন। কিংবা যদি বিচারের সাহায্যে সাধক ইন্দ্রিয়ের দিকে আকৃষ্ট না হন, তাঁহার মস্তক তাঁহাকে ঘোর স্বার্থপর অথবা অহংকারে পূর্ণ করিতে পারে। উপনিষদের সাধকগণ এই দুই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক রহিলেন এবং একবার যখন 'ভূমা'র আনন্দস্পর্শ তাঁহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন এই সব নিকৃষ্ট আনন্দে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইবে না।

এক্ষণে বল কোথায় পাইবেন? সেনা না থাকিলে যুদ্ধ চলে না। ক্ষত্রিয় বীর আত্মার সাধক স্থির করিলেন যে, তিনি একাই যথেষ্ট। এতদিন ত ব্রহ্মকৃপার জন্য তাঁহাকে ভিখারী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এইবার সে কাঙালবৃত্তি ত ঘুচিবে। ব্রহ্মকে যখন জানি না বা তাঁহাকে জানিয়াও জানা যায় না, তখন তাঁহাকে লইয়া কি হইবে? সাধক স্থির করিলেন যে, এইবার তাঁহার নিজের সকল দুর্ব্বলতা অপসারিত হউক! "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

কিন্তু ব্রহ্মকে বর্জ্জন করিতে হইলে, অনেক কিছু বর্জ্জন করিতে হয়। নিজের বাহিরে যে প্রকৃতি ও সাধকের নিজ সত্তায় যে প্রকৃতি বাস করিতেছে, তাহাকেও বর্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম ও মন ব্রহ্ম; তবে আত্মার সাধক কি করিবেন? তিনি স্থির করিলেন যে, শুধু ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলে চলিবে না, জগতে যে প্রকৃতি রহিয়াছে ও তাঁর নিজ সত্তায় যে প্রকৃতি বাস করিতেছে, তাহারা যে ভাবে চলিতেছে চলুক, তাহাদের যেমন করিয়া হউক, বর্জ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য জীবনের ধারা এমনতর রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মের বন্ধু প্রকৃতি যেন পাইয়া না বসে, তাহা হইলে আত্মার সাধক ব্রহ্মের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। অতএব বাহিরের প্রকৃতি হইতে যৎটুকু অন্ন, যত অন্ন প্রাণ না হইলে নয়, সেইরূপ রসদ লইবেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে যতটুকু নিজের সত্তা খরচ হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আত্মার সাধক বুঝিলেন, উৎকট তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য চাই। উপনিষদে কথিত "পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা" অর্থাৎ পুত্রের ইচ্ছা, বিত্তের ইচ্ছা ও উচ্চ লোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা, মোট কথা সমস্ত অভিলাষ বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, আত্মার সাধনার জন্য ব্রহ্মের প্রতি বৈরাগ্য পর্য্যন্ত চাই। (২১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আবার শ্রুতির ভাষায়, "নয়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। অর্থাৎ আত্মাকে বেদ অধ্যাপন বা শাস্ত্রের অর্থগ্রহণের শক্তি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। উপনিষদ্ এই সঙ্গে আরও বলেন, যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ আত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে ইনি স্ব স্বরূপ প্রকাশ করেন। (মুণ্ডক ৩।২।৩) তাহা হইলে ত জগতের সকল ধর্ম্মপুস্তক ও বাদানুবাদকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল মাত্র নিজ ধারণা ও অনুভূতির মধ্যে আত্মস্থ হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এতটুকু অভিলাষের ছায়া পর্য্যন্ত অন্তরে থাকিলে চলিবে না। সমস্ত নিজ সত্তাকে "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত" অবস্থার ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, নির্ম্মল আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

উপনিষদের ঋষিগণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

কিরূপ প্রয়াস, কত শক্ত সাধনা, তাহাও নিজেদের জন্ত নয়, সর্ব্বমানবের জন্ত একটা সাধনপথ, তাঁহারা খুঁজিয়া পান বা না পান, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। ইউরোপীয় নাবিকগণ পুরাতন জগৎ হইতে অগ্রসর হইয়া নূতন জগৎ (New World অর্থাৎ আমেরিকা ; আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া ইউরোপ কত গর্ব্ব অনুভব করিল। অপর দিকে উপনিষদের আচার্যাগণ 'ব্রহ্মে'র জগৎ হইতে গিয়া 'আত্মা'র জগৎ আবিষ্কার করিয়া প্রথমে বা শেষে কোন কালেই গর্ব্ব অনুভব করিলেন না। এবং এক্ষণে সাধনার সূচনায়, সর্ব্বগ্রাসী ব্রহ্মকে ছাড়িয়া, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত পাথের যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, ব্রহ্ম হইতে দূরে সেই অজানা প্রদেশে, যেখানে আত্মার অনুভূতি সম্ভব, তাহাই খুঁজিতে চলিলেন। ঐতিহাসিক যুগে শঙ্করাচার্য্য ও বিবেকানন্দ ইহা করিতে পারিলেন। এবং যাঁহারা পুরাতন গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া নূতন অভিজ্ঞতায় ডুব দিবার জন্ত enterprise অর্থাৎ অসাধারণ উদ্যম রাখেন, তাঁহারাই এই পথের পথিক হইবেন। আমেরিকা পুরাতন জগতের কোন আদর্শই লইতে চাহে না, তাই আমার মনে হয়, বাঙ্গালী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত 'আত্মা'র সাধনা সে দেশে এত সমাদর লাভ করিল।

কিন্তু এ সব ঐতিহাসিক আলোচনায় কালক্ষেপ করিলে চলিবে না। 'আত্মা'র সাধনার সংগ্রামস্থলে যাইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতটুকু অন্ন না হইলে শরীরধারণ হয় না, যতটুকু নিঃশ্বাস না লইলে প্রাণরক্ষা হয় না, তাহাই এই সকল সাধকগণ করিবেন। প্রয়োজন হইলে অন্নত্যাগ করিবেন, নিঃশ্বাস লইতেছেন কি না, তাহার অনুভূতি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিবেন। ইহাই হইল। সমস্ত consciousness অর্থাৎ অনুভবশক্তি আত্মস্থ করিয়া, উপনিষদের সাধকগণ আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশে চলিলেন। উপনিষদ্ জানাইতেছেন, তিনটি ধাম উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা চতুর্থ ধামের অভিজ্ঞতা নিজ নিজ জীবনে অর্জ্জন করিলেন। 'জাগ্রৎ অবস্থা', 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি' অতিক্রম করিয়া তাঁহারা 'সমাধি' পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের যাহাতে বুঝিবার সুবিধা হয়, সেইজন্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে এই চারিটি অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের মধ্যে আত্মা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, এই প্রাণ সমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃপুরুষ। তিনি এক থাকিয়া উভয় লোকেই বিচরণ করেন—তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন। স্বপ্নাবস্থায় তিনি ইহলোক এবং মৃত্যুময় রূপসমূহকে অতিক্রম করেন।......সেই এই পুরুষের দুই স্থান—ইহলোক এবং পরলোক। ইহাদের সন্ধি স্বপ্নস্থানই তৃতীয় স্থান। সেই সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া (এই পুরুষ) এই ইহলোক এবং পরলোক এই উভয় লোকই দর্শন করেন। যে প্রকার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তিনি পরলোকস্থানে গমন করেন, সেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই পাপ ও আনন্দ এই উভয়কেই দর্শন করেন। তিনি যখন প্রসুপ্ত হয়েন, তখন সর্ব্বভূতযুক্ত এই লোকের উপাদান সমূহ গ্রহণ করিয়া, এই সমুদায়কে স্বয়ং বিনাশ করিয়া, নূতন জগৎ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় জ্যোতির দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করেন। আবার ইহাও কথিত আছে যে, শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজে সুপ্ত না হইয়া সেই পুরুষ সুপ্ত হৃদয়গণকে দর্শন করেন। এই হিরণ্ময় পুরুষ—এই এক পক্ষী শুদ্ধ জ্যোতিঃ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার জাগরিতস্থানে আগমন করেন।...... স্বপ্নাবস্থায় মানবাত্মারূপী সেই দেবতা ঊর্দ্ধে ও অধোতে গমন করিয়া বহুরূপ সৃষ্টি করেন, কখনও বা স্ত্রীলোকের সহিত আমোদ করেন, কখনও বা যেন ভয়ের কারণ দর্শন করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না।........."

সুষুপ্তি সম্বন্ধে :—"যেমন শ্যেন বা সুপর্ণ পক্ষী এই আকাশে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইলে পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া নিজ নীড়ের দিকেই ধাবিত হ'ন ; এই স্থলে সুপ্ত হইয়া কোন প্রকার কামনাও করেন না, কোনও প্রকার স্বপ্নও দর্শন করেন না।"

সমাধি সম্বন্ধে :—"যখন মনে করে, 'আমি যেন দেবতা, আমি যেন রাজা, আমিই সমুদায়' ইহাই তাহার পরম লোক। ইহাই ইহার কামনা-রহিত, পাপরহিত অভয়রূপ। যেমন লোকে প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানে না, তেমনই এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না। ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকাতীত রূপ।......ইহাই ইহার ব্রহ্মলোক। ইনিই পরম গতি, ইনিই পরম সম্পদ, ইনিই পরমলোক এবং ইনিই পরমানন্দ। অন্য সমুদায় ভূত এই আনন্দের অংশ মাত্র ভোগ করে।" (চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় ব্রাহ্মণ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

নববিধানে দীক্ষা ও উদ্বাহব্রতপালনে

শুভ আশীর্ব্বাদ

(শ্রীমতী শোভার দীক্ষা ও শুভবিবাহ উপলক্ষে বরকন্যার প্রতি কন্যার পিতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের প্রদত্ত উপদেশ)

আজ নববিধানের মূলতত্ত্ব সকল জেনে এবং তাহা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলীতে ইঁহারা প্রবেশেচ্ছুক হয়েছেন, আর পরস্পর উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সংসারধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হতেছেন। তাই আজ নববিধানের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা ও উদ্বাহ-

ব্রতপালনে সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ। নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য কাঙাল প্রেমদাস চিরঞ্জীব শর্ম্মা গাইলেন :—

"সেই নববৃন্দাবনে, নিত্য লীলা-দরশনে, করিব সম্ভোগ স্বর্গবাস।"

নববিধানে জীবনের এই আদর্শ—নববৃন্দাবনে নিত্যলীলা দর্শন ও স্বর্গবাস সম্ভোগ।

"শ্রীনববৃন্দাবন" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লিখেছিলাম :—"দীক্ষা-গুরু, আপনার চরণতলে আজ কি মস্তক অবনত করব না? যেদিন শান্তিকুটীরে সেই সুগম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তির সম্মুখে, গার্হস্থ্য-জীবন অবলম্বনের প্রারম্ভে, আত্মীয়গণের সম্মুখে, যাঁর সহিত চিরদিনের তরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হবে, তাঁরই সহিত সমস্বরে, নববিধানের মূলমন্ত্রে বিশ্বাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলাম, সেই দিন কি নববিধানের শ্রীমন্দিরের 'শ্রীনববৃন্দাবনের দ্বার' সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় নাই?"

আজও সেই কথাই বলতে ইচ্ছা করে; সেই কথাই তাই বার বার বলি।

তারপর যেদিন বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রসাদ-ফুল ফুটেছিল, সেই দিন মানবজীবনের অন্তর্নিহিত আনন্দময় দেবতার আনন্দ সুধা-ধারা বহির্জগতে, পরিবার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সুধাধারা প্রকাশ ও বিকাশ দেখে, সেই প্রস্ফুটিত পুষ্পের নাম 'সুধা' রাখা হল। সেই সুধা আজ কত জীবনে, কোথায় কার সঙ্গে আবার মিলিত হয়ে কত বিভূতি লাভ করেছে ও কত ভাবে উৎসারিত হয়ে কত প্রাণে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতেছে।

তারপর যখন আমাদের বাগানে আর একটী ফুল ফুটল, তার সৌন্দর্য্যে সকলে বিমোহিত হয়ে, পরিবারের অপূর্ব্ব শোভা-বর্দ্ধন সন্দর্শনে তাহাকে 'শোভা' নামে নামাঙ্কিত করা হল। রূপে গুণে, শিক্ষার সৌরভে, চরিত্রের কোমলতা ও মাধুর্য্যে [illegible] কাল ধরে আমাদের চারিদিকেই অপরূপ শোভা বিকীর্ণ করেছে; আজ আবার অপর জায়গায়, অন্য পরিবারে, অপর প্রাণের সহিত মিলিত হয়ে সেখানকারও শোভা বর্দ্ধন করবে। তাই আজ এই দীক্ষা ও শুভ আশীর্ব্বাদের আয়োজন। আজকের দিনে দু'একটী প্রাণের কথা সকলের সম্মুখে বলবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল।

স্নেহের নির্ম্মলচন্দ্র, তুমিও আমাদের অতি নিকট আত্মীয়। তোমার পিতা আমার পঠদ্দশায় অন্তরঙ্গ বন্ধু ও যৌবনকালে ধর্ম্মপথের সহযাত্রী। সেই কাঙাল প্রেমদাসের Haluluja Bandএ তোমার পিতা প্রধান নায়ক; আমিও তাঁর সহচর ছিলাম। যখন নববৃন্দাবনের মধুর মুরলী বাজত, তখন আমরা দু'জনে একত্রে মিলিত হয়ে, সেই বংশীধ্বনি শুনে, সঙ্গীতাচার্য্যের সঙ্গে কতই না গেয়েছি, কতই না নেচেছি।

তোমার মাতা আমার অতি নিকট আত্মীয়া ছিলেন—কনিষ্ঠা ভগ্নীর সমান। তাঁদের বিবাহোৎসবে আমার কত আনন্দ হয়েছিল; বিবাহরাত্রে দুইজনকে পাশাপাশি বসায়ে পরিবেশন করে খাইয়ে কত না তৃপ্তি পেয়েছিলাম। আবার তোমার মাতার সাংঘাতিক রোগের সময় মরণের সঙ্গে কতই না সংগ্রাম করেছিলাম—কিন্তু পরাজিত হয়েছিলাম, আর সেই মৃত্যুশয্যার পাশে বসেছিলাম, আমরা দুজনে—তোমার পিতা ও আমি—তোমার পিতার কাতর প্রাণের আকুল প্রার্থনায় সজলনয়নে যোগ দিয়েছিলাম।

যদিও তুমি এত নিকট আত্মীয় ছিলে, তবুও তোমাকে এত দিন ধরে খুব কাছে কাছে পাই নাই। কিন্তু চিরদিনই তোমার উপর আমার দৃষ্টি ছিল। তোমার শিক্ষার উন্নতি-সন্দর্শনে, তোমার সদ্‌গুণরাশির বিকাশে আমি চিরদিনই আনন্দিত হয়েছি। আর আজ আমাদের বুকের আদরের ধনকে তোমার সঙ্গে মিলায়ে দিয়ে, তোমাকেও আমরা আমাদের বুকের ভিতর পেলাম। এই শুভ সম্মিলনে, নির্ম্মলচন্দ্রের চৌদিকে মনোহর শোভার বিকাশ দেখে কতই না সুখ, কতই না আরাম।

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গার্হস্থ্যধর্ম্ম—সংসারধর্ম্ম। এই ধর্ম্মসাধনে বিবাহিত জীবনই একমাত্র উপায়, তাই উদ্বাহ-ব্রতের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হয়। তোমাদের কাছে আজ এই সম্বন্ধে দুইটী জীবনের কথা বলিতেছি, আমাদের যৌবনকালের দুইটী জীবনের কথা।

আমাদের যৌবনকালে যুবকদিগের প্রার্থনাসমাজ (Young Man's Prayer Meeting) নামে একটি সভা ছিল। সেই সময়কার নববিধান সমাজের অধিকাংশ যুবকই এই সভার সভ্য ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ (স্বর্গগত বিনয়েন্দ্রনাথ) ইহার প্রধান নেতা ছিলেন। এই সমিতিতে সভ্যগণ প্রত্যেকেই নিজের নিজের জীবনের আদর্শের চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। তখনকার নববিধান-মণ্ডলীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়েছিল মতদ্বৈধে; গৃহবিবাদ অনলে সমাজের অবস্থা ছিন্ন ভিন্ন—ছারখার। কিন্তু এই Prayer Meetingএর উন্নতি হইলে সকলেই আশান্বিত হয়েছিলেন যে, পরে ক্রমশঃ নববিধান সমাজ পুনঃ সংস্কৃত হবে এবং মণ্ডলী আবার জেগে উঠবে।

আমরা সকলেই—এই Prayer Meetingএর দল—চির-কুমারব্রত অবলম্বন করেছিলাম। বিবাহকে জীবনের উন্নতির পথে, এমন কি সমাজসংস্কারের পথে অন্তরায় বলে মনে করতাম। হঠাৎ একদিন আমরা শুনলাম যে, আমাদের নেতা—আমার জ্যেষ্ঠ যিনি, তখন আমাদের বাড়ী ত্যাগ করে Fraternal Home প্রতিষ্ঠা করে কয়েকটী যুবকের অভিভাবক হয়ে অধিষ্ঠান কর-ছিলেন, আর এইখানেই আমাদের প্রার্থনা-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানই অতি সমারোহে সম্পাদিত হচ্ছিল—তিনি বিবাহ করতে সংকল্প করেছেন। আমরা স্তম্ভিত ও সকলেই ভগ্নমনোরথ হলাম।

সকলেই তাঁর কাছে, তাঁর এই জীবনের পরিবর্ত্তনের কারণের

জিজ্ঞাসু হলাম। তিনি বল্লেন—"এই জগৎ প্রকৃতি পুরুষের মিলনে সৃষ্ট; নববিধানের দেবতা নববৃন্দাবনের ঠাকুর—যুগলমূর্ত্তি; তাঁর প্রকৃষ্ট সাধনা, বন্দনা যুগলভাবেই সম্ভব; একক সাধনে অসম্পূর্ণ সাধন। গৃহধর্ম্মসাধনে বিবাহের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হয়; তাই তিনি সেই মন্ত্রেই দীক্ষা নিতে চলেছেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং কিরূপ ভাবে দাম্পত্য প্রেম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নববিধানের আদর্শে সংসাধিত করেছিলেন—সে সব কথা আমার বলবার প্রয়োজন নাই।

আর একটী জীবনের কথা—সে আমারই জীবনের কথা। আমিও দাদার ভাই ছিলাম। আমিও নাগা-সন্ন্যাসী ছিলাম। সেবাধর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য করেছিলাম। সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সেবা-ব্রতে ব্রতী হয়েছিলাম। অনেক বিষয়ে সফলকামও হয়েছিলাম; কিন্তু ক্রমশঃ উন্নতির পথে যেন বাধা, বিঘ্ন এসে উপস্থিত হ'ন।

আমি মনে করেছিলাম যে, আমি ত সমাজসংস্কারক নহি; জীবনপথে একলা চলা, উন্নত হতে উন্নততর হওয়া আমার পক্ষে অতি সহজ হবে। কিন্তু তাত হল না, হার মানতে হল; কত স্থানে, কত রকম বাধা পেলাম। তখন মনের ভিতর, প্রাণের ভিতর কে যেন বলে দিলেন—সেবাধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; আর প্রেমধর্ম্মসাধনে যুগলভাব একান্ত প্রয়োজন। এখানেও সেই যুগলমূর্ত্তির—প্রকৃতি পুরুষের আরাধনা, পূজা ও বন্দনা প্রয়োজন। একক অবস্থায়, নাগাসন্ন্যাসীর দ্বারা এ পূজা, বন্দনা সম্যকরূপে সংসাধিত হয় না। তাই সেই নববিধানের দেবতার, নববৃন্দাবনের ঠাকুরের লীলাখেলায় এ জীবনের পরিবর্ত্তন। সেই নাগাসন্ন্যাসী আজ ঘোর সংসারী। দীর্ঘকাল ধরে এই যুগলসাধনে, এই সংসারধর্ম্মপালনে নিযুক্ত।

তোমরা দু'জনে সেই নববিধানের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লয়ে, নববৃন্দাবনের শ্রীমন্দিরে, নবজীবনে প্রবেশ করতে চলেছ। এই যুগলসাধনে আত্মবিসর্জ্জন সর্ব্বসময়ে ইষ্টমন্ত্র করতে হয়—একজন আর একজনের কাছে নিজেকে বিলায়ে দিতে হয়, পরস্পর পরস্পরের নিকট দাসখৎ লিখে দিতে হয়। শ্রীনববৃন্দাবনে দাসদাসী হতে হয়। একটি উদার প্রেমিকের জীবন-চরিতে পড়েছিলাম :—

"Refuse not, Pilgrim what men ask of thee,
Love, Labour, Life—give all and give it free.
When in thy wallet naught remains but death,
Know this thine own and take it for thy fee."

যাত্রী, অনন্ত জীবনপথের যাত্রী, নববৃন্দাবনের তীর্থযাত্রী, তোমার সহযাত্রীরা, তোমার আত্মীয় স্বজনেরা, তোমার ভাই বোনেরা, তোমার নিকট যাহা চাইবেন, দিতে অস্বীকার করো না। প্রেম, উদার প্রেম, শ্রম—অকাতর সেবা, জীবন—এই নশ্বর জীবনও সকলই দান করবে। যা কিছু তোমার আছে, সব অকাতরে বিতরণ করবে; বিনা মূল্যে, প্রতিদানের প্রত্যাশী কখনও হয়ো না। তারপর যখন তোমার সব পুঁজি পাটা ফুরায়ে যাবে, যখন তোমার তহবিলে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবে না, তখন এই মৃত্যুকে তোমার নিজস্ব বলে গ্রহণ করবে। ইহজীবনের শেষ দিবসে এই মরণকে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, দেবতার পরম আশীর্ব্বাদ বলে বরণ করে নেবে। আর এই মহান্ উপদেশ সদা সর্ব্বদা স্মরণে রাখবে :—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে কোন কার্য্য করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমাদিগের যাহা আছে, সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তিনি তোমাদিগকে সকল প্রকার অকল্যাণ হতে রক্ষা করিবেন। তোমাদের গৃহকে ঈশ্বরের গৃহ এবং নববিধানের পবিত্র ও আনন্দপূর্ণ আলয় কর। আর সেই যুগলসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক যে বলেছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" এই মন্ত্র তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হ'ক। আমার প্রাণের আশীর্ব্বাদ তোমাদের জানাচ্ছি। এখানকার উপস্থিত সকল গুরুজন, সকল আত্মীয়জন তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন; আর স্বর্গস্থ পূর্ব্বপুরুষগণের ও সেই আনন্দময় দেবতার, বিশ্ববিধাতার আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হোক। নববিধানের দেবতা, নববৃন্দাবনের ঠাকুর তোমাদের হৃদয়নাথ হয়ে চিরদিন অধিষ্ঠিত থাকুন।

—০—

কান্তি-স্মৃতি

(সাম্বৎসরিক দিনোপলক্ষে পুরাতন ভৃত্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি)

এই পাপতাপবিদগ্ধ সংসারে ভগবানের অশেষ করুণায় সময় সময় এক একজন ঈশ্বরচিহ্নিত মানবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহাদের নিজের বলিয়া জগতে কিছুই নাই। পরার্থেই তাঁহাদের জীবনধারণ, পরকে লইয়াই তাঁহাদের সংসার—নিজের অশন-বসন, ভোগবিলাস, এমনকি নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের প্রতিও সম্পূর্ণ বীতরাগ। সম্পূর্ণ পরের এবং জগতের সেবার জন্যই যেন তাঁহারা এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকেন। আমাদের পরমারাধ্য গৃহস্থ-সন্ন্যাসী শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার বিষয়ে কিছু লেখা বা আলোচনা করা আমার ন্যায় একজন নিরক্ষর বর্ণজ্ঞানহীন বর্ণযোজকের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি অষ্টবিংশতি বৎসর তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া, আমি তাঁহার নিকট হইতে যে সকল অমূল্য উপদেশাদি শ্রবণ ও তাঁহার কার্য্যকলাপাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে দু'একটি ঘটনা আজ "ধর্ম্মতত্ত্ব"-পাঠক ও জনসাধারণের

নিকট বিবৃত করিব। একদিনকার ঘটনার কথা বলিব, যাহার একবর্ণও কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং তিনি কিরূপ অনন্তবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রচারাশ্রমের পূর্ব্বাবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস দিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রচারাশ্রমের নির্দ্ধারিত আয় প্রায় কিছুই নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে এই আশ্রমের অভিভাবকত্বের এত বড় গুরুভার বহন করিতে হইত। আমরা, এই সুদীর্ঘ ২৮ বৎসরের মধ্যে, কখনও এক মাসের মাহিয়ানা একত্র পাই নাই। বাহিরের কাজ আনিবার কথা বলিলে, তিনি বলিতেন, "বাবা আমাদের এই ছাপাখানা মঙ্গলগঞ্জের সম্পত্তি, তাঁহারা মিশনের সাহায্যের জন্য দিয়াছেন, ব্যবসায়ের জন্য নয়—আমার ছেলেপিলে কিছুই নাই, তোমরাই সব, আমার এক মুঠা হইলে তোমাদেরও হইবে।" ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। এই ভাবেই এতদিন চলিয়াছিল।

ঘটনাটি এই—সেদিন শনিবার। বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে, সপ্তাহ যাবৎ একটি পয়সাও কোথা হইতে আসিতেছে না। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা লেবেল লাগান অবস্থায় ও৲ টাকা কয় আনা ডাক টিকিটের অভাবে চারিদিন পড়িয়া রহিয়াছে, পাঠান হইতেছে না। প্রেসের কর্ম্মচারিগণ, অন্যদিন না হইলেও, শনিবার কিছু না কিছু পাইত। কিন্তু এই দিন সকলকেই একে একে শূন্যহস্তে ফিরিতে হইল। সর্ব্বশেষ আমি নিচের ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া, ৫॥টার পর চাবির গোছা লইয়া উপরে গেলাম। বারাণ্ডায় টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি মিত্র মহাশয়কে চাবির গোছাটি দিয়া বলিলাম, কি হবে? আজতো আর কিছু না হইলে চলে না? তিনি বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমিও ভাবিতেছি, কি হবে? উহাদের তো সোমবারে কিছু কিছু দিব বলিয়া বিদায় করিলাম, কিন্তু সোমবারেও যে কোথা হইতে আসিবে, তাহা ত ভাবিয়া পাইতেছি না।" এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি যাহাকে যে দিন কিছু দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইতেন, সেদিন যেমন করিয়াই হউক, তাহা পালন করিতেন। আর যাহাকে বলিতেন, আচ্ছা, ঐ দিন দিতে চেষ্টা করিব, সেইটিই অনিশ্চিত থাকিত। ইহাতে আমাদেরও বুঝিতে বেশ সুবিধা হইত যে, কবে নিশ্চিত পাইব। পরে তিনি বলিলেন, আমি দু'টি টাকার জন্য ভাবিতেছি। চাল, তেল, ময়দা, ঘি, নুন, চিনি ইত্যাদি ধারে পাইব, কিন্তু কাঁচা বাজার তো আর ধারে পাইব না। এতগুলি ছেলেমেয়ে আমার উপর নির্ভর করিয়া আছে; আমি তাহাই ভাবিতেছি যে, দুটি টাকার কি করিব। দেখি, সোমবার একান্ত কিছু না পাইলে, শান্তির একখানা গহনা বন্ধক দিয়া কিছু টাকা আনিয়া দিও। এরূপ একাধিকবার হইয়াছিল। (শান্তি উপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ, ডাঃ যোগানন্দ রায়ের সহধর্ম্মিণী) আমি বলিলাম, সোমবার তো এখন অনেক দেরী, এ দুই দিন কি করিয়া চলে?

তখন তিনি সম্মুখের দেওয়ালে টাঙ্গান ফ্রেমে আঁটা কার্পেটে বোনা মেয়েদের একটি শিল্পলিপি "The Lord will provide" এইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মাগো! এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বোধ হয়, এক কি দুই মিনিট, হঠাৎ যেন স্বপ্নোত্থিত বা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, বাবা, তোমার ও দরকার, আমারও দরকার, তিনি কি চুপ করিয়া থাকিবেন? দেখ দেখ, এখনও একঘণ্টা সময় আছে!" অর্থাৎ সন্ধ্যা হইতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। এই কথা বলিয়া তিনি আবার মস্তক অবনত করিলেন। উভয়েই নিস্তব্ধ—মিনিট পাঁচ কি ছয় পরে যে অবস্থার উদ্ভব হইল, সে আজ বহু বৎসর গত হইলেও, সেই কথা স্মরণ করিতে এখনও যেন সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। নীচের তলা হইতে এক ভদ্রলোক বল্লেন, "মণিবাবু আছেন?" আমি বলিলাম, "কে, বিপিনবাবু?" "উঃ—আঃ বাঁচলাম, আমি সেই কড়েয়া হতে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছি; আজ শনিবার, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, ভাবিলাম, আপনারা সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, আজ না হইলে আমায় আবার সোমবার আসিতে হইত। কতকগুলি বিদেশের অর্ডার আছে, যাহা সোমবারেই পাঠাইতে হইবে।" (ইনি কড়েয়ার রিয়াজুদ্দিন খাঁ লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী বিপিন বিহারী দে)। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে আসিলেন এবং তাঁহার প্রার্থিত পুস্তকের ফর্দ্দ দিলেন।

কমিশন বাদে আমাদের ত্রিশ টাকার অধিক পাওনা হইল। সমস্তই টাকা, পয়সা, নোটটোট কিছু ছিল না। টেবিলের উপর স্তরে স্তরে সাজান। বিপিনবাবু চলিয়া গেলেন। আমার তখন কথা বলিবার শক্তি নাই, বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! "প্রাণে থেকে কাণে শোনা" বলিয়া যে প্রবাদ আছে, আজ তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া হতবাক্! তখনও কর্ণে বজ্রগম্ভীরস্বরে সেই কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে—'দেখ দেখ, এখনও একঘণ্টা সময় আছে, তোমারও দরকার, আমারও দরকার, তিনি কি চুপ করিয়া থাকিবেন?" কথায় বলে, ভক্তের ভগবান্। তিনি এইরূপেই ভক্তের মানরক্ষা ও মুখরক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা সীমাবদ্ধ জলাশয়ের কূপমণ্ডূকবিশেষ, তাঁহার ন্যায় মহাসমুদ্রের মকরের মর্য্যাদা কি করিয়া বুঝিব? পরে তিনি বলিলেন, "বাবা, তুমি নাও, তোমার যা দরকার—আমি দুটি টাকার জন্য ভাবিতেছিলাম।" আমি তখন অতি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, আমার গোটা পাঁচেক হইলেই চলিবে। কিন্তু আপনি যা বলিলেন, তাহা যে এরূপ ভাবে পাঁচ মিনিটের ভিতর সত্যে পরিণত হইল, ইহা একান্ত অলৌকিক কাণ্ড! তখন তিনি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে ধরা গলায় বলিলেন,—"বাবা, আমি আজ

বৎসর এইরূপ দেখিয়া আসিতেছি। যখন যখন আমি এইরূপ বিপদে পড়িয়াছি, তিনি তখনই তাহা আশ্চর্য্য উপায়ে উদ্ধার করিয়াছেন।" কি জ্বলন্ত বিশ্বাস! পরে তিনি বলিলেন, "তোমাকেও বলি, যখন কোন বিপদে পড়িবে, নকল ছাড়িয়া আসলের শরণাপন্ন হইও।" তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশ পালন করিয়া দুই এক ক্ষেত্রে আমিও আশ্চর্য্য ভাবে উদ্ধার পাইয়াছি। এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়াই তিনি পারিবারিক উপাসনায় প্রায়ই গাহিতেন—

"ধন্য ধন্য আনন্দময়ী মা তোমায়।
তব বাঞ্ছা পায়, যারা স্থান পায়,
তাদের তুমি গো জননী জীবনোপায়।"

তিনি একাধারে পুরুষ এবং নারী, দুই প্রকৃতিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় গৃহস্থালীর কার্য্যাদি সুষ্ঠুরূপ সম্পন্ন করিতে বড় বড় সংসারের পাকা গৃহিণীরাও হার মানিয়া যাইতেন। সকল সংসারে, বিশেষতঃ বিবাহাদি অনুষ্ঠানাদিতে কত বিশৃঙ্খলা পরিদৃশ্যমান হয়; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, প্রচারাশ্রমে কত কত বিবাহাদিতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক পরিবারবর্গ লইয়া তিনি কেমন সুশৃঙ্খলভাবে তাহা সম্পন্ন করিতেন। আশ্রমবাসী, নিমন্ত্রিত সকলে এবং দাসদাসী কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে কাহাকেও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে বা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে দেখি নাই; প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ এবং খাওয়া দাওয়ার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া এমন গৃহিণীপণার পরিচয় দিতেন যে, ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

একদিন বেলা ৯টার সময় ভাগলপুরপ্রবাসী এক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ঠিক সেই সময় উপাসনার ঘণ্টা পড়িল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, চল উপরে যাই; উপাসনার পর সকল সংবাদ শুনিব। পরে উপাসনার পর নীচে আসিয়া প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, তোমার কাল থেকে বোধ হয় খাওয়া হয় নাই? মুখটি একেবারে শুখাইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক বলিলেন, আজ চার দিন হইল, আমার স্ত্রী মারা গিয়াছেন। তিন দিন হইল, কলিকাতায় আসিয়াছি এবং ৩।৪টি আত্মীয়ের বাড়ীতেও গিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমার খাবার কথা বলেন নাই, আজ আপনিই বলিলেন। তখন মিত্র মহাশয় কৃপাসিন্ধু ঠাকুরকে ডাকিয়া, স্কুলের ছেলেদের যাহা রান্না হইয়াছে, তাহা হইতে একজনের ভাত দিতে বলিলেন। পরে তিনি কাছে বসিয়া, মাতা যেমন অভুক্ত সন্তানকে ভোজন করান, তেমনি তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

নারায়ণচন্দ্র মোড়ল নামক একজন বাঙ্গালী প্রেসম্যান ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ প্রচারাশ্রমে কার্য্য করিতেছিল। বর্ষার সময় একদিন সমস্ত কাপড় ভিজাইয়া কাজ করিতে আসে। তাহা দেখিয়া মিত্র মহাশয় তাহাকে নিজের পরিধেয় বস্ত্র পরিতে দিয়া কাপড় ছাড়িতে বলেন। বৈকালে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরাইয়া দিতে গেলে, তিনি বলিলেন, "যাহা দিয়াছি, তাহা কি আর লইতে আছে? ওখানি লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি তাহার পৃষ্ঠ মৃদু করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বারান্তরে আর এরূপ করিয়া আসিও না, এরূপ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত হইলে বেতন কাটা যাইবে না।"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—•—

ব্রাহ্মসমাজের বিশ্রামলাভ

(খৃষ্টধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আমরা পুনরায় মূল বিষয়েরই অবতরণা করিতেছি—যুদ্ধের সন্ধি কোথায়? যুদ্ধের বিরতি পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ। এই গ্রহণই জগতের শান্তিদূত। কেশবচন্দ্র খৃষ্টকে গ্রহণ করতঃ খৃষ্টিয়ান মণ্ডলীর সহিত সন্ধি করিয়া এদেশবাসীদিগকে খৃষ্টান হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তেমনি ভাবেই মহাপুরুষ মহম্মদকেও গ্রহণ করতঃ, এদেশবাসীদিগকে মুসলমান হইবার পথও অবরুদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন। আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, গ্রহণেই যুদ্ধবিরতি। মুসলমান ধর্ম্মবিষয়ে ইহার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা করি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন কোচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর নববিধান ধর্ম্মকে নিজ পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন এই রাজ্যের অন্তর্গত হলদী বাড়ীতে কয়েকজন "প্রধান উপাধিধারী" সম্ভ্রান্ত মুসলমান ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ এ নগরে আসিলে মন্দিরে উপাসনা করিতে যাইতেন এবং বেশ মেলা মেশাই করিতেন। আমি ৩।৪ মাস তাঁহাদের বাড়ীতে প্রচারার্থে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ, উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাও করিয়া আসিয়াছিলাম। হলদীবাড়ীতে এক সময় একজন অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত মৌলভী আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ, আলোচনা ও তর্ক করিবার নিমিত্ত, ঐ প্রধানগণের কেহ কেহ কলিকাতার স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়কে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি কোন কারণে আসিতে না পারায়, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কে আনা হইয়াছিল। সভাতে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। যখন মৌলভী সাহেব উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি খোদাকে কেমন জানেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "খোদাকে এক বলিয়া জানি।" আবার ২য় প্রশ্ন হইল, "আপনি হজরত মহম্মদকে কি মনে করেন?" উত্তরে উপাধ্যায় বলিলেন, "মহাপুরুষ মহম্মদকে একজন 'পয়গম্বর' বলিয়াই বিশ্বাস করি।" এই দুই উত্তরেই মৌলভী সাহেব আনন্দের সহিত বলিয়া ফেলিলেন যে, "আরে, ইঁহার সহিত আর কি তর্ক করিব, ইনি ত মুসলমানই।" বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজ যেমন

খৃষ্টকে মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি হজরত মহম্মদকেও মহাপুরুষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবেই বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব গুরুনানক, মহাত্মা কবীর প্রভৃতি মহাজনদিগকে গ্রহণ করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকেই নববিধানে আসিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

উপসংহারে বলিতে চাই যে, কেশবচন্দ্রের জন্মেই প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহু ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াও খৃষ্টান হন নাই। এখানে বলিতে চাই যে, ইহা এক সত্য ঘটনা যে, বরিশালের সুবিখ্যাত কালীমোহন দাস ও দুর্গামোহন দাস ভ্রাতৃদ্বয় খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের পূর্ণ সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র প্রেরিত পার্কারের গ্রন্থ পড়িয়া, তাঁহারা দুই ভাইয়েই আর খৃষ্টান না হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ পূর্ব্বে খৃষ্টান হইবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু পরে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এমন কি, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ঘুরিয়া যান। কেশবচন্দ্র কিরূপ বীরত্ব ও সাহসের সহিত খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, আমরা উপসংহারে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, ১৮৮২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি যে "Marvellous Mystery of the Trinity" নামে টাউন হলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিতেছি। কেশবচন্দ্র এদেশস্থ মিশনারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, "হে স্বর্গ হইতে সনদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টের দূতগণ, আপনাদিগকে সাবধান হইবার নিমিত্ত কিছু বলিতে চাই। ভারত পৌত্তলিকতার ভারে প্রপীড়িত! আপনারা ভারতের অসংখ্য দেবদেবীর উপরে খ্রীষ্টের নামে আর কোন নূতন অবতার ভারতের বক্ষে বসাইবেন না। খৃষ্টই জগতের স্রষ্টা, জগতের অধিপতি, মানবজাতির পিতা, ইহা আর ঘোষণা করিবেন না। যদি আপনারা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে পিতা বলিয়া ঘোষণা করেন, তবে তাহা পৌত্তলিকতা; অতএব বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, খৃষ্টকে মিছামিছি আর পিতা না বলিয়া, ঈশ্বরপুত্র বলুন। আমাদিগের দেশীয়দিগকে পরিষ্কাররূপে বলিয়া দেন যে, ভারতে পূজিত অসংখ্য দেবদেবীর ন্যায় ও বহুবিধ অবতারের ন্যায় খ্রীষ্ট অবতার নহেন। যদি ইহা হইতে ক্ষান্ত না হন, তবে আপনারা ভারতীয় জাতিকে নূতন প্রকারের পৌত্তলিকতার বিষে বিষাক্ত করিবেন। সাবধান! স্মরণ করুন, আপনারা হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচার করিবার এক মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবাসিগণ কোন্ অতীত কাল হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বর মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, অবতারের পূজাই ঈশ্বরের পূজা। ইহা কোন ঈশ্বরপুত্রের পূজা নহে। যদি আপনারা এ জাতিকে খ্রীষ্টকে নূতন অবতার বলিয়া প্রদান করেন, এ জাতি যে অন্ধকারে ছিল, তাহা হইতে আরও ঘনীভূত গাঢ় অন্ধকারে পড়িবে। এখানে আমি খ্রীষ্টের পতাকার পক্ষ সমর্থকরূপে দাঁড়াইয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় আমি দেখিতে চাই, খৃষ্টের নির্দ্দোষ নিশান আর যেন কোন অবতারদোষে দূষিত না হয়। এই এখানে আমি ভারতের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়াছি। আমার হাতে এ দ্বারের চাবি রহিয়াছে। আমি আমার যাবতীয় শত্রুগণকে বলিব, দূরে প্রত্যাবর্ত্তন কর। ভারতের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছি, তোমরা আর বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে পারিবেনা। যতদিন আমি জীবিত আছি, স্বদেশগতপ্রাণ সৈনিক পুরুষের ন্যায় আমি পৌত্তলিকতার প্রতিনিধিদিগকে প্রবেশ করিতে দিব না। ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত সকলেই অবগত হউন যে, যাঁহারা খৃষ্টকে মানবাকারে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা খ্রীষ্টকে প্রচার করেন না। খৃষ্টের বিরুদ্ধতাই করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে শত্রুবৎ ব্যবহারই প্রাপ্ত হইবেন। হে অতি সুমিষ্ট খৃষ্ট, হে ঈশ্বরপুত্র খৃষ্ট! একবার এস, পৌত্তলিকতা বিদূরিত হউক! হে প্রতিমাপূজক প্রচারকগণ, বিদায়, বিদায়, চির বিদায়!"

মহাত্মা ভূদেবই, ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিদিগকে খ্রীষ্টান প্রচারকগণের সহিত তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে দেখিয়া, তাঁহার রচিত সামাজিক প্রবন্ধে ব্রাহ্মদিগকে বাঙ্গালী সৈনিক পুরুষ বলিয়াই আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। এ কথা প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরিশেষে ভারতের স্বনামধন্য পুরুষ মহাজ্ঞানী মহাতার্কিক আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় কলিকাতায় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রেই বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়াছেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—০—

সংবাদ।

চিকিৎসারম্ভানুষ্ঠান—গত ৩১শে শ্রাবণ, ২৯।১এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া ডাঃ শ্রীমতী প্রীতির চিকিৎসা-ব্যবসায়ের আরম্ভ উপলক্ষে, সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। শ্রীমতী প্রীতি ভগ্নীদের নিয়া সুমিষ্ট সঙ্গীত করেন। মাতৃদেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর প্রথম ডাকের দর্শনী ৫৲ টাকা ভাদ্রোৎসবে দান করা হইয়াছে। বিধানজননী তাঁর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিদেশ-যাত্রা—গত ২৯শে আগষ্ট, বি, এন, রেলঃ, বোম্বে মেলে, শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার সস্ত্রীক, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধ-

চন্দ্র রায়, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার দাস সস্ত্রীক কন্যাসহ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি শ্রীমান্ হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় ইঁহারা সকলে একযোগে ইউরোপ-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। মা সর্ব্বমঙ্গলার আশীর্ব্বাদে ইঁহাদের যাত্রা শুভ ও আনন্দপ্রদ হউক।

কৃতজ্ঞতা-দান—ভাই প্রিয়নাথের চোখে ছানি পড়িয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছেন। মেডিকেল কলেজের সুবিখ্যাত চক্ষুরোগ-চিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে বিনা ব্যয়ে ১২দিন তাঁকে সযত্নে রাখিয়া, চক্ষের ছানি অস্ত্র করিবার প্রাথমিক অস্ত্র চিকিৎসা করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে নিকট ছানি কাটান হইবে। এজন্য তাঁহাকে ও তাঁহার সহকারী-দিগের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৬ই আগষ্ট, কোচবিহারে, শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী ৮বরদাসুন্দরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মহেশবাবু উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় প্রচারভাণ্ডারে ৪৲, ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৲, B. R. Fundএ ২৲ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

পারলৌকিক—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই আগষ্ট (২৭শে শ্রাবণ), মিহিজামে, ডাঃ রণেন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২২।২৩ বৎসর বয়সে, টাইফয়েডে ভুগিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। গত ২৪শে আগষ্ট, মিহিজামে পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় বরদাকান্ত বসু উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

পরমজননী পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই ভাদ্র, ১।৫ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গৃহে, পিতৃদেব স্বর্গগত ব্রজগোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিক দিনে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রবধূ শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী নিয়োগী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীমতী বনলতা দে স্বর্গীয়া ভগ্নী প্রেমলতা দেবীর স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, কলিকাতায় ভাদ্রোৎসবে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ২৩শে জুলাই, স্বর্গীয়া মহারাজ-কুমারী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিপার্শ্বে শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

গত ২৯শে জুলাই, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার প্রথম পুত্র স্বর্গীয় করুণাকুমারের সাম্বৎসরিক দিনে, তিনি উপাসনা করেন।

কোচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে, ১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধনসূচক উপাসনা, ১৫ই আগষ্ট সোমবার ভিত্তিস্থাপনের দিনে দুই বেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

পাটনার সংবাদ—এখানে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে মিলিত উৎসব হয়। ১৯শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার দাসের গৃহে বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রার্থনা করেন এবং বালকবালিকাগণ সঙ্গীতাদি করে। মিসেস দাস সকলের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করেন। প্রায় দেড়শত লোক উপস্থিত ছিলেন। ২০শে আগষ্ট, গর্দ্দানিবাগে উপাসনা হয়। ২১শে আগষ্ট, প্রাতঃকালে রামমোহন রায় সেমিনারি হলে শ্রদ্ধেয় পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় ব্রহ্ম-মন্দিরে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী উপাসনা করেন। ২৩শে আগষ্ট, সন্ধ্যায় সেমিনারি হলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার প্রথম প্রবর্ত্তন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ২৪শে আগষ্ট (৭ই ভাদ্র), ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রাতঃকালে ৮টায় বাঁকিপুরে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ-দেবালয়ে বিধানভক্ত রমণীকান্ত চন্দের স্বর্গগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। পরিবারস্থ সকলে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে সেবিকা হেমলতা দেবী স্বামী আত্মার উদ্দেশে কলিকাতায় ভাদ্রোৎসবে ২৲, ভগ্নী-সমিতি ১৲, সাধু সমগুলাল শিক্ষাতীর্থে ১৲ এবং শ্রীমতী বনলতা দে কলিকাতায় ভাদ্রোৎসবে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। (অদ্য কলিকাতায় ২৯।১এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসের গৃহেও উপাসনা হইয়াছিল।)

শ্রদ্ধাস্পদ গৌরীপ্রসাদ মজুমদার ও তাঁহার পত্নী অসুস্থ হইয়া শয্যাগত থাকাতে এখানকার সকলেই দুঃখিত। স্থানীয় যুবকগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সেবা করিতেছেন। কলিকাতা হইতে আত্মীয় বন্ধুগণও তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারা দুজনেই অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন কয়েকমাস ইংলণ্ডে থাকিয়া সম্প্রতি পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছেন। পাটনার শতবার্ষিকীর আয়োজন চলিতেছে।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভগ। ১৭শ সংখ্যা।
১লা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
18th September, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী, জগৎপালিনী! এক তোমা হইতেই বিশ্বজগৎ প্রসূত হইয়াছে, এক তোমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, একা তুমি জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, একা তুমি জগৎকে পালন করিতেছ; তাই তুমি জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী এবং জগৎপালিনী। তোমার কত বিচিত্র রূপ, তোমার কত বিচিত্র গুণ; কে দর্শন করিয়া, কে জানিয়া শেষ করিয়াছে? পৃথিবীর মধ্যে বঙ্গ ভারতেই তুমি মাতৃভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছ। বঙ্গ ভারত এই শরৎকালে তিন দিন তোমার পূজা করিয়া, তিন দিন পরে তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, গৃহ সংসার হইতে তোমাকে বিদায় করিয়া দেয়। তাহারা সংসারের সকল ভার আপনারা লয়, তাই বঙ্গ ভারতের দুর্গতি ঘুচিল না। বঙ্গে ভারতে বাহ্য পূজায় না তোমার সত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল, চিন্ময়ী সত্য-স্বরূপা, না তোমার সত্যরূপের দর্শন লাভ হইল, না তোমার পালনীশক্তিতে সকলের পুষ্টি হইল, তুষ্টি হইল। ক্রমাগত দুঃখ, দৈন্য হাহাকার বাড়িয়া চলিল। তাই তুমি এই নবযুগধর্ম্ম নববিধানে বিশেষ ভাবে চিন্ময়ী মাতৃরূপে গৃহ পরিবারে অবতীর্ণ হইলে। তুমি সাধারণ ভাবে সর্ব্বত্র জগজ্জননী, বিশ্বধারিণী, বিশ্বপালিনী; কিন্তু বিশেষ ভাবে তুমি গৃহ পরিবারে তোমার পুত্র কন্যা-দিগের সকল ভার লইয়া, গৃহ পরিবারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য, গৃহদেবীরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বাগ্‌দেবী সরস্বতীরূপে এবার গৃহে গৃহে অবতীর্ণ। তুমি চিন্ময়ী সত্যস্বরূপা, আপনি গৃহ পরিবারে তোমার সত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবে, আপনি তোমার পুত্রকন্যাদিগের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, নব নব দর্শনে, কল্পনাবিহীন সত্য দর্শনে ও আপনার সত্যবাণীতে তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষাদান করিবে, দীক্ষা দান করিবে, নিজে সংসারের সকল ভার লইয়া, সকল ভার বহন করিয়া, পুত্রকন্যা-দিগের পার্থিব, অপার্থিব সকল অভাব পূর্ণ করিবে, সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধান করিবে, তুমি গৃহ পরিবারে আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীতে ক্রমে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবে, এই তোমার প্রতিজ্ঞা। তুমি আমা-দিগের নিকট চাহিতেছ পূর্ণ আত্মসমর্পণ, সম্পূর্ণ আত্মদান। আমরা এখনও তোমাতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিতেছি না, আত্মদান করিয়া তোমার দিব্য পরিচালনার অধীন হইতে পারিতেছি না, তাই তোমার স্বর্গের অভিপ্রায় আমাদের বিধানবিশ্বাসী মণ্ডলী মধ্যে এখনও পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। তোমার চিহ্নিত

ভক্ত ব্রহ্মানন্দ তোমাতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আত্মদান করিয়া আমাদের এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইলেন। বঙ্গভারতের অনেকেই এখনও তাঁহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না; আমরা তাঁহাকে দৃষ্টান্তরূপে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াও তাঁহার ন্যায় তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার পূর্ণ অধীন হইতে পারিতেছি না। অন্তরে বাহিরে আমাদের কত দুঃখ দুর্গতি। তাই এই বঙ্গভারতের বন্যা ও দুর্ভিক্ষজনিত দুঃখ দুর্গতির সময়, মাতৃভূমির জাতীয় দুর্গোৎসবকে আদরে বক্ষে ধারণ করিয়া, করযোড়ে তব চরণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদের এবং আমাদের দেশের সকল ভাই ভগ্নীর হৃদয়ে চিন্ময়ী শ্রীদুর্গারূপে এ সময় অবতীর্ণ হও, তোমার সত্য দর্শনদানে, তোমার অভয়বাণী-শ্রবণে সকলকে ধন্য কর। তোমাতে ভাল করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষাদান কর। আমরা তোমার সত্য দর্শনলাভে ও তোমার অভয়বাণী-শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া, তোমার গুণকীর্ত্তনে, নামকীর্ত্তনে মত্ত হই, এবং আমাদের হৃদয়, আত্মা, গৃহ পরিবার, সমস্তদেশ এ সময় উৎসবানন্দে পূর্ণ হউক, আমাদের এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ভারতে দুর্গোৎসব

বঙ্গ ভারতের জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। পৌরাণিক ভারতে যত দেবদেবীর কল্পনা করা হইয়াছে, যত দেব দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদ্যাশক্তি, সকল ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যের আধার শ্রীদুর্গার পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা। কথিত আছে, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাগণ অসুরদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়াও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিতেছিলেন না, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেবতাগণের শক্তির সংযোগে এক মহাশক্তিরূপা দেবীর উদ্ভাবন করেন, তিনিই আদ্যাশক্তি ভগবতীরূপিণী দুর্গতিহারিণী শ্রীদুর্গা। ইনি সকল অসুরকুল বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে নিরাপদ করেন, দেবতাদিগকে নির্ব্বিঘ্ন করেন। যখনই কোন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তখনই ইনি মহাশক্তিরূপে, অভয়দায়িনী অভয়া রূপে, জগন্মাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া, সকল শঙ্কা দূর করিয়াছেন, সকলকে অভয়দান করিয়াছেন, সকলের মধ্যে শান্তি, সৌভাগ্য বিধান করিয়াছেন। বৎসরের অন্য সময়েও বঙ্গ ভারতে এই দেবী-পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু শরৎকালের আশ্বিনে এই দেবী-পূজাই বঙ্গ ভারতের মহা জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই সময়ে বিবিধ ফলে, ফুলে, ধন ধান্যে বঙ্গভারত বিশেষরূপে নব সাজে সজ্জিত হইয়া থাকে; তাই এই সময়কে জাতীয় মহা উৎসবের সুসময়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এ সম্পর্কে অনেক আছে, আমরা এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, এসময় এই দেবী মৃন্ময়মূর্ত্তিতে বিশিষ্ট ঘরে ঘরে পূজিত হইলেও, সত্যতঃ ইনি চিন্ময়মূর্ত্তিতে এ সময় জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের ঘরেই অবতীর্ণ হন। লোকে ইঁহার চিন্ময় দিব্য অবতরণকে অবতরণ বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও, ইনি সকলের ঘরে সত্যই উৎসবানন্দদায়িনী জননীরূপে অবতীর্ণ হইয়া, ছোট বড়, ধনী নির্ধন, সকলের গৃহকে, সকলের হৃদয় মনকে উৎসবানন্দে পূর্ণ করেন। তাই দেখিয়াছি, এ সময় যাঁহার গৃহে বাহ্য পূজা, তাঁহার গৃহেও উৎসবানন্দ, যাঁহার গৃহে বাহ্যপূজার আড়ম্বর নাই, তাঁহার গৃহেও উৎসবানন্দ। সত্যই এ সময় পরমজননী পুত্রকন্যাসহ ঘরে ঘরে অবতীর্ণ হন। এ সময় বিদেশ হইতে বিষয়কর্ম্মরত পুত্রগণ গৃহে আগমন করেন, স্বামীর আলয় হইতে কন্যাগণ পিতৃগৃহে সাদরে আনীত হন। এইরূপ পুত্রকন্যাদের আগমন ও মিলনে অনেক গৃহই উৎসবানন্দে পূর্ণ হয়। পিতা মাতার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। বিদেশাগত স্বামীর সম্মিলনে সতী স্ত্রীর হৃদয়ে কতই আনন্দোচ্ছ্বাস, সকলের শুভ সম্মিলনে পল্লীর গৃহগুলি সত্যই উৎসবময়। এইরূপে যাঁহাদের গৃহে বাহ্য পূজাজনিত উৎসব, তাঁহাদের গৃহে উৎসব, যাঁহাদের গৃহে বাহ্য পূজার আড়ম্বর নাই, তাঁহাদের গৃহেও উৎসব।

এ সময় ঘরে ঘরে দূর নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের সাদর নিমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা, আহারাদির প্রচুর ব্যবস্থা হইত। বঙ্গদেশ এ সময় বিশেষভাবে ধন-ধান্য, ফল ফুলে যেমন পরিশোভিত হইত, বঙ্গের গৃহগুলিও ধন-ধান্য, ফল-পুষ্পে ভরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর সংসাররূপে পরিণত হইত। এ উৎসবের সুন্দর দৃশ্য আমরা বাল্যে, যৌবনেও প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

কিন্তু সে প্রাচীন সমাজের সুন্দর দৃশ্য আর এখন নাই। প্রাচীনকাল যেমন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের সুন্দর সামাজিক দৃশ্যও বিলুপ্তপ্রায়। পূজার ঘরে আর সে সরল বিশ্বাস ভক্তিতে আত্মভোলা পূজা-বন্দনা-রত জীবন নাই, সাধারণ ঘরে ঘরে আর সে মধুর পারিবারিক বন্ধন নাই। ক্রমে পূজা-গৃহে কতই পূজার অপরাধ আসিয়াছে, সাত্ত্বিকতার স্থান কত অসাত্ত্বিক আচরণ অধিকার করিয়াছে, এখন বঙ্গের অন্তরে বাহিরে কেবল শুষ্কতা। বঙ্গের পল্লীর অবস্থা কোনদিকেই আশাজনক নয়, নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁহারা কৃতি, তাঁহাদের অনেকেই সহরবাসী। পল্লিগুলি তাই আরও নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বঙ্গভারতে পূজাপরাধ অনেক হইয়াছে, এখনও হইতেছে। মঙ্গলময় বিধাতার গূঢ় নিয়মে বঙ্গভারতে প্রতিবৎসরে কত প্রকার প্রাকৃতিক শাসন উপস্থিত হইতেছে, কত প্রকার ভয় বিভীষিকা আসিয়া বঙ্গ ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কবি যথার্থ গাহিলেন, "শক্তিপূজা কথার কথা না, যদি কথার কথা হত, তবে এ ভারত, শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না।"

যেমন বঙ্গভারতে, তেমনই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পূজা বন্দনা বিষয়ে লোকমণ্ডলীতে অনেক অপরাধ। পূজার ভিতর দিয়াই স্বর্গ এবং পৃথিবীর মিলন, পূজার ভিতর দিয়াই ক্ষুদ্র মানবে অনন্ত ব্রহ্মের বিচিত্র লীলা। পূজার দুর্গতি দর্শন করিয়া, বিশ্বের পরিত্রাতা, গতিদাতা যিনি, তিনি এই নব যুগে পূজা বন্দনার বিশুদ্ধ নববিধি লইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ। তিনি পরব্রহ্ম, স্রষ্টা, পিতা, হৃদয়বিহারী শ্রীহরি প্রভৃতি কতই বিচিত্র রূপে অবতীর্ণ। "এক পবিত্রাত্মা হরি বহুরূপধারী।" জীবের প্রয়োজনে তিনি কত রূপেই প্রকাশিত হইয়া জীবের প্রয়োজন সাধন করিতেছেন।

বিশুদ্ধ পূজা বন্দনা শিক্ষা দিবার জন্য, পূজাকে বিশুদ্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, এবার তিনি স্বয়ং গুরুরূপে অবতীর্ণ; এখানে মানুষ গুরুর আর পূর্ব্বের মত স্থান নাই। কিন্তু এ নবযুগের বিষয়াসক্ত জীব আমরা কিছুতেই তাঁহাকে ধরা দিতেছি না, তাঁহার শিক্ষাধীন হইতে প্রস্তুত হইতেছি না। তাই তিনি এই নবধর্ম্মে বিশেষ ভাবে মাতৃরূপে অবতীর্ণ। এবার তিনি তাঁহার অনন্ত স্নেহের মূর্ত্তি, প্রেমের মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া, সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে, আমাদের গৃহ পরিবারকে আপনার করিয়া লইবেন; তাই তাঁহার জীবন্ত মাতৃরূপের অবতরণ। স্বয়ং বিশ্বজননী যখন আমাদের প্রতি জীবনের নবজীবনদায়িনী, পরিত্রাণদায়িনী মা হইয়া, আমাদের প্রয়োজন বুঝিয়া আপনার ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয়মনকে আলোকিত করিয়া প্রকাশিত হন, তাঁহার ভুবন-মোহন রূপ গুণের সৌন্দর্য্যে আমরা তখন মোহিত হইয়া অবাক্ হইয়া যাই; এবং মন নীরবে প্রাণের ভিতর ধ্বনি করে, 'আমরা কে যে, তুমি আমাদের অন্তরে এমন ভক্তজন-দুর্লভ দর্শন দিলে?' যদিও আমরা তাঁহার এই অযাচিত কৃপাজনিত দর্শন দীর্ঘ সময় প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারি না, কিন্তু যখনই অভাবে পড়িয়া ডাকি, তখনই যে তিনি আমার প্রয়োজন বুঝিয়া অন্তরে সাড়া দেন, দর্শন দেন, নব নব আলো ঢালিয়া শিক্ষা দেন। তাঁহার যে বিশেষ বিশেষ দর্শন, সে দর্শন-আমাদিগকে মা বলিয়া ভাল করিয়া ডাকা শিক্ষা দিবার জন্য, ব্যস্ত হইয়া, ব্যাকুল হইয়া আরও উচ্চ দর্শন-লাভের অধিকারী হইবার জন্য। তিনি যে ডাকিলেই সাড়া দেন, সে সাড়া, তিনি যে আমাদের প্রাণমন্দিরে চির বর্ত্তমান দেবতা, তাহারই সাক্ষ্য দিবার জন্য। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাকে সময় সময় হৃদয়মন্দির হইতে বিসর্জ্জন দিতে চাহিলেও, তিনি যে আমাদের হৃদয় আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, তিনি বিসর্জ্জনের দেবতা নন, তাহাই প্রদর্শন জন্য। আমাদের দৈন্য দুঃখ দেখিয়া, তিনি বিশেষভাবে গৃহজননীরূপে আমাদের গৃহ পরিবারের সকল ভার বহন করিতে প্রস্তুত। জননী কি পুত্র কন্যাগণের গৃহ ছাড়িয়া, পুত্র কন্যাগণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? তিনি ঘরে ঘরে ধনধান্যবিধায়িনী গৃহলক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গলদায়িনী, পরিত্রাণদায়িনী-নবজীবনদায়িনী, সকল দুর্গতিহারিণী শ্রীদুর্গা। বঙ্গ ভারত এখনও সত্য দুর্গাকে ভুলিয়া, কল্পনার দুর্গার পূজা করিয়া, তিন দিনের পর দেবী-বিসর্জ্জনের বিরহ-বেদনা সহ্য করিতেছে। আমরা এই জাতীয় মহা পূজার সময়, বঙ্গ ভারতের সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত, বন্যা-পীড়িত ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, সত্য দুর্গতিহারিণী শ্রীদুর্গার পূজা বন্দনা করি। এই পূজা ঘরে ঘরে প্রচার করিতে, প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নপর হই। পরমজননী সহায় হউন।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

জীবনবেদ

বাইবেলে আছে, আদিতে ছিল বেদ Word, বেদ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সহিত যুক্ত ছিল বেদ ; কিন্তু তাহা দেহে মূর্ত্তিমান না হইলে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। এই ভাবে শ্রীকেশবজীবন মূর্ত্তিমান বেদ। তিনি বলিলেন, সত্যই বেদ। তাই তিনি আপন জীবনকে জীবনবেদ বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। সত্যই ইহা নববিধান-বেদ, নবজীবনবেদ।

একমানবত্বসাধন

শ্রীকেশব বলিলেন, 'সমস্ত মানব আমাতে, তাই আমি এক। এখানে দশটী মানুষ নাই, একটী মানুষ, এইটী দেখিতে দাও।' এই একমানবত্ব-সাধনই নববিধানের বিশেষ সাধন। বিশেষভাবে যখন আমরা উপাসনা করি, পারিবারিক অনুষ্ঠান করি, তখন যেন পরস্পরের ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা, ব্যক্তিত্ব এক অখণ্ড মানবত্বে নিমজ্জন করিতে সাধন করি। তাহা হইলেই গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য আমাদের মধ্যে আর আসিতে পারিবে না। কিন্তু অনুষ্ঠান-কর্ত্তা এবং পুরোহিত, আচার্য্য ও উপাসক ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, এই ভাব মনে থাকিলে আমাদের ভিতর গুরুগিরি ও পৌরোহিত্যের আশঙ্কা যাইবে না। যখনই যাঁহার সহিত উপাসনা করিব, কিম্বা অনুষ্ঠান করিব, তখন 'তিনি আমি', এই ভাবে সম-যোগসাধনে উপাসনা ও অনুষ্ঠান যেন করি ; তাহা হইলে নব-বিধানের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। শ্রীকেশবচন্দ্র এই ভাবে যোগীর সহিত যোগী, শোককারীর সহিত শোককারী, শিশুর সহিত শিশু, আর্য্যনারীর সহিত আর্য্যনারী, হিন্দুর সহিত হিন্দু, মুসলমানের সহিত মুসলমান, খ্রীষ্টানের সহিত খৃষ্টান হইয়া অখণ্ড বিশ্বমানবত্ব লাভ করিলেন।

উপাসনা

(৭ই ভাদ্র, পাটনা ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে, ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপাসনার সারাংশ)

উদ্বোধন :—

আজিকার দিন আনন্দের দিন, শুভ মুহূর্ত্ত, মাহেন্দ্রক্ষণ। আজিকার দিন ব্রহ্মানন্দ সকল আকিঞ্চন, ভক্তি, অনুপ্রাণনা নিয়ে আমাদের ডাকছেন। এই পবিত্র দিনে নিরাকার সাকার হয়েছেন ; ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির এই পবিত্র দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কত যে সাহস, কত নীরব ভক্তি, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা, কত অনুরাগ, কত অনুপ্রাণনা এই পবিত্র দিনে ব্রহ্মানন্দের ও তাঁহার সঙ্গিগণের সকলের অন্তরকে উদ্ভাসিত করেছিল, আজ একবার স্মরণ করি। আজ আকাশ পরিষ্কার, মেঘ শূন্য, কোন অবরোধ নাই। কেন না আজিকার এই দিনে স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ এবং পৃথিবী স্বর্গের সঙ্গে মিলিত। অদ্য-কার এই শুভ দিনের মাহাত্ম্য আমরা অন্তরে অনুভব করি। এই যে ভারতে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠান, ইহা জগতের ইতিহাসে বিশেষ পবিত্র ঘটনা। এমন ধারা ঘটনা তো পৃথিবীতে কখনও ঘটে নাই। একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ—কত শত শত ভাই ভগিনী মিলিত এবং সকলে একাত্মা। ব্রহ্মানন্দের উদ্বোধন শ্রবণ কর। তিনি তো এখন আর দেশ কালে আবদ্ধ নন, তিনি বিশ্বগত। সেই জ্যোতির্ম্ময়, মহান্ আত্মার নৈকট্য আমাদের অন্তরে অনুভব করি। আজ এই পবিত্র দিনে, ব্রহ্মানন্দের পুনরাগমন হোক্। এই সব ভক্তেরা যে আবার আসেন, জগতের দুঃখ, অভাব মোচন করবার জন্য। আজ ব্রহ্মানন্দ আসুন, আমাদের মধ্যে জগতে আসুন। তিনি যে সকল ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী, ঋষিদের সঙ্গে একাত্মা। সেই যে স্বর্গ, যে স্বর্গে ব্রহ্মানন্দ রয়েছেন, সেই স্বর্গ আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হোক্। আজ স্বর্গ পৃথিবীর মিলনের মধ্যে আমরা দীনহীন পাপী মিলিত হয়ে যাই। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্"—এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মমন্দিরে মিলিত হই। আজ সেই অনুপ্রেরণা অন্তরে আসুক। তাঁর সেই ভক্তি, প্রেম, পুণ্য আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোক্। সেই প্রকাশে আমরা রূপান্তরিত হয়ে যাই।

হে দেবতা, তুমিই তো রূপান্তর কর। এই পবিত্র দিনে কেমন সব রূপান্তর করে, নতুন একটা আদর্শ, নতুন জগৎ এই দীন দুঃখীর সামনে তুমি ধরলে। তোমার পুণ্যজ্যোতি, তোমার জ্ঞানালোক, তোমার প্রেমের পবিত্র সমীরণ আমাদের রূপান্তরিত করে দিলে। দেবতা, একটু সাদৃশ্য দাও। যেখানেই থাকি, যতই দীন দুঃখী হই, সেই ভক্তের সঙ্গে সাদৃশ্য দাও ; [illegible] কর, অবতীর্ণ হও ; তোমার পূজাতে প্রবৃত্ত হই।

আরাধনা :—

সত্যলোক ; এই যে চারিদিকে ঘিরে রয়েছ। হে সত্য-স্বরূপ, তোমার সে সত্যলোক স্বর্গে, পৃথিবীতে। স্বর্গ হতে পৃথিবীতে আসে, আবার পৃথিবী হতে স্বর্গে যায়। আদান প্রদান। এই লীলা করছ চিরদিন। হে সত্যস্বরূপ, যখন তুমি প্রকাশিত হও, তোমার প্রকাশে তোমার স্বর্গ প্রকাশিত হয়। হে ব্রহ্ম, তোমার ব্রহ্মলোক প্রকাশিত হয়।

তোমার যে আলোক, তোমার যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান ব্রহ্মানন্দের অন্তরে দিয়েছিলে। সেই আলোকে তিনি সত্যলোক, ব্রহ্মলোক দর্শন করে, তারই একটা আলোক আমাদের দিলেন। সত্য যদি অন্তরে প্রকাশ হয়, তা বাহিরে প্রকাশ হবেই হবে।

অনন্ত এ প্রবাহ, কখনও তো বিরাম নেই—এ প্রবাহ ছুটেছে। তোমার ডাক বারবার অন্তরে আসে। হে অনন্ত,

তুমি ব্রহ্মানন্দকে ডেকেছিলে, তিনি আপনার ভেতরে আর রহিলেন না। শরীর থেকে পাখীটা ছুটে বাহিরে পালিয়ে গেল। মেঘ এসে অনন্ত নীলাকাশকে ঢাকে, যেই মেঘ সরে যায়, তুমি অনন্ত আকাশে প্রকাশিত হও। অনন্তের মধ্যেই তো রয়েছি। অন্তরে অনন্ত চিদাকাশ তুমি পূর্ণ করে রয়েছ। দেবতা, এত যে দীনহীন, পাপী আমরা, তথাপি, হে অনন্ত, আমরা জীবনের সব অন্তসীমা অতিক্রম করে অনন্তের পথে যাচ্ছি। অনন্ত অন্তরে, অনন্ত বাহিরে। অন্তসীমার সাধনের মধ্যে তোমার সাধনা, অনন্তের সাধনা। অন্তকে যখন দেখি, অনন্তকে তখনই দেখতে পাই। খণ্ডে অখণ্ড, সীমার মাঝে অসীম। হে অনন্ত, সে সাধনা কেমন করে করব? অসাধ্যের সাধনা; কেউ কি পারে? অবাঙ্মানসগোচর, তোমায় কি কেউ জানে? জানায় কেবল তোমার দয়া। তুমি দয়া। যেমন ভাগীরথী উচ্চতম গঙ্গোত্রী থেকে নীচে বহিয়া আসে, তোমার দয়া তেমনি নিম্নগামী। আমি যে অধম, তবু তুমি আমার কাছে এসেছ। রোজ প্রাতঃকালে উঠে দেখি, একি, তুমি এসেছ? অভ্রান্ত দয়া। যখনি দেখি, দেখতে পাই, আমার সকল দুঃখের মাঝখানে, দয়াময়! তুমি রয়েছ। তাই ব্রহ্মানন্দ বললেন, 'দয়াময়'। এমন কেউ বলতে পারে না, এমন কারো মুখে শুনিনি। ব্রহ্মানন্দের মুখে যে তোমার দয়াময় নাম শুনেছে, সে আর ভুলতে পারবে না। দয়াময় হরি, দয়াময় হরি! তুমি দয়াময়, তুমি মঙ্গলময়। তোমার দয়াতে সমস্ত জগৎ চলচে, আশ্চর্য্য! হে দয়াময়, মঙ্গলময়, তুমি প্রেমময়। যে দয়া আমাদের অন্ন জল, নিঃশ্বাস বায়ু, শিরাতে রক্তপ্রবাহ, সেই দয়াই ভালবাসা। প্রেমময় তুমি। এক তোমার প্রেম নানাভাবে জগতের সকল পদার্থকে রসাল করে। 'রসো বৈ সঃ।' হে প্রেমময়, তুমি কোথায় আছ? ব্রহ্মানন্দ যে খুব বুঝিয়ে দিলেন, তুমি অতি নিকটে। তিনি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। তুমি ভালবাসছ, শুধু তো তা নয়, তুমি যে ভালবাসা শেখাচ্ছ। এই সংসার প্রেমের বিদ্যালয়। অনুকূলের মধ্যে, প্রতিকূলের মধ্যে, সম্পদে বিপদে প্রেম শিক্ষা দাও।

তুমি প্রেমানন্দ। তাইতে ব্রহ্মানন্দ পাগল হলেন। কি ভালবাসতেন আমাদের। কি হাসিমুখ, কি ভালবাসা ভরা প্রাণ। এখনও যে ঐ হাসছেন। কত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে গেলেন। আজকার প্রতিষ্ঠান সেই প্রেমানন্দের প্রতিষ্ঠান। ভালবাসা, ভক্তি এই দুটী নিয়ে এই যে প্রেমের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কেমন করে তিনি পালন করতেন, আমি দেখেছি তো। পুণ্যই তাঁহার মন্ত্র। অশেষ পুণ্যবলে তিনি অশেষ প্রেমের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করলেন। শরীরটা ভেঙ্গে গেল, পিঞ্জরের পাখী চলে গেল।

আজিকার দিনের আনন্দ, জগতের আনন্দ। ঘর ভরা লোক, সমস্ত ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ। ব্রহ্মানন্দ একটি কথা বলছেন, সকলের অন্তরে বিদ্যুতের মত স্পর্শ করে, সকলকে জাগিয়ে দিচ্ছে। সব প্রাণ এক করে দিচ্ছে।

তুমি এক, এখানে দ্বৈত থাকে না। আমি তোমার, তুমি আমার। এই যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্র, ব্রহ্মানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন। একাকারের ধর্ম্ম। সব দেশকাল এক হয়ে গেল, এই নববিধান। একাকারে একাকার হয়ে যাওয়া। শরীর থাকবে না, একাকারে একাকার হয়ে যাবে। তুমি এক, তুমি এক, তুমি জয়যুক্ত হও, তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

নিবেদন ও প্রার্থনা :—

অদ্যকার দিন ৭ই ভাদ্র, ১৮৬৯খৃঃ। আজ ভারতে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনার মাহাত্ম্য আজ অনুভব করি। এমন ঘটনা ভারতের ইতিহাসে কখনও ঘটে নাই। যাঁরা দেখেছেন, সাক্ষ্য দান করবেন। ঘর ভরা লোক, সকলের মুখে দিব্য কান্তি; ব্রহ্মানন্দ বেদী থেকে ব্রহ্মে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই অনুপ্রাণনা উচ্চারণ করচেন, আর বিদ্যুতের মত সে কথা সকলের মনে লাগছে, সব প্রাণগুলিকে আনন্দে অনুরাগে পূর্ণ করচে—এ দৃশ্য আর কখনও কেহ দেখে নাই। ভারতের ঋষিগণ যোগ করেছেন একা; কিন্তু সকলে মিলে এক হয়ে ব্রহ্মের উপাসনা, এ ঘটনা ভারতে নব জাগরণ এনে দিয়েছে। আর এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে হয়েছিল প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলন। সকলকে তিনি এক করেছিলেন। আর আমার মনে লাগে, এটা কেবল ভারতের বিশেষ ঘটনা নয়, সমস্ত জগতের বিশেষ ঘটনা। ভারতের ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মিলন হল। ভারত যদি সমস্ত জগৎকে পরিপুষ্ট না করে, ভারতের শাস্ত্র পূর্ণ হতে পারে না। যাঁরা এই শাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁরাই জানেন, এই শাস্ত্রের মধ্যে কি ব্রহ্মজ্ঞান, কি ক্ষমা, দয়া, প্রেম, পুণ্য, এমন কোথাও নাই। এই আর্য্যজাতির ধর্ম্ম নিশ্চয় জগতের ধর্ম্মকে পরিপুষ্ট করবে। ভারতের ধর্ম্ম সমস্ত জগৎ গ্রহণ করবে।

হে দেবতা! ব্রহ্মানন্দের অন্তরকে কেমন তুমি বিকসিত করেছিলে, কেমন আলোকিত, উদ্বুদ্ধ করেছিলে; হে দেবতা, তাঁর অনুপ্রাণনা, জাগরণ কি ফুরিয়ে গেল? রয়েছে। ব্রহ্মানন্দ মৃত কখনও নন। অমর আত্মা, শরীরমুক্ত হয়ে জগতে বিস্তৃত, বিশ্বগত, জীবিত। যদি আমাদের অন্তরে তাহা বুঝিতে না পারি, সকল উপাসনা বৃথা। তুমি যেমন রয়েছ, তিনি তেমনি রয়েছেন। সেই নববিধানমণ্ডলী জীবিত রয়েছেন। যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা অনুভব করেন। স্বর্গে সেই মণ্ডলী কত বিস্তৃত, সেই বিশ্বপরিবারের মধ্যে আমরাও রয়েছি।

প্রভুগো, আমাদের সকলের অন্তরকে জাগিয়ে দাও। পুণ্যের ভেতর অনুপ্রাণনা দাও; আমাদের প্রত্যেকের জীবনে জাগরণ দাও, নবীনতা দাও। ব্রহ্মানন্দের আত্মার সান্নিধ্য, নৈকট্য দাও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সর্ব্বত্র পূর্ণ হোক্, যেমন স্বর্গে,

তেমনি পৃথিবীতে। সমস্ত জগতে তোমার নববিধান জয়যুক্ত হোক্।

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্! শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!

—০—

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

আত্ম-জ্ঞান

তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপনিষদের বর্ণনা শেষ হইল। আমাদের জানিবার তৃষ্ণা মিটিল না। এই চারিটি অবস্থা সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতে মন চাহিতেছে। জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থা ত আমরা সকলেই স্বীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারি। সুষুপ্তি ও সমাধি সম্বন্ধে উপনিষদ ছাড়া আর কোথাও কি আভাস পর্য্যন্ত নাই? আমার মনে পড়িতেছে, বৈষ্ণবগুরু চণ্ডিদাস লিখিয়াছেন:—

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরুলে আলো;
আলোর মাঝেতে কালাটি রয়েছে
চৌকি রয়েছে পাতা,
ওদেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা।"

এই অভিজ্ঞতা কি সুষুপ্তি ও সমাধির অনুভূতি নহে? "ওদেশ" বলিতে জাগ্রত ও স্বপ্ন বুঝায়; "এদেশ" বলিতে সমাধি। মধ্যে অন্ধকারময় পথ, যেখান দিয়া "নিসাড়" হইয়া যাইতে হয় ও উপনিষদ্ অনুসারে ইহাকে "সুষুপ্তি"র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডিদাসও কি তাহা হইলে এই পথ দিয়া শেষ অবধি গিয়াছিলেন? তিনিই ত লিখিয়াছেন:—

"শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, মানুষ উপরে নাই।"

চণ্ডিদাস! তবে কি তুমিও সাধন-জীবনে আত্মার পথ খুঁজিয়া সুষুপ্তি ও সমাধি পর্য্যন্ত যাও নাই? বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়িয়া শক্তিধর্ম্মের অনুশীলন করিতে গিয়া আগ্রহ সহকারে চণ্ডী পাঠ করিলে বুঝিতে পারি যে, শাক্তধর্ম্মেও আত্মানুভূতির প্রবাহ বহিতেছে। আমার নিজের বিশ্বাস, জগতের যে ধর্ম্মসম্প্রদায় হউক না কেন, ব্রহ্মানুভূতি ও আত্মানুভূতির দুইটি বিভিন্ন পথ প্রশস্ত হইয়া গড়িয়া উঠিবেই ও পরিশেষে মিলিত হইবে। আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম, শাক্তধর্ম্ম ও উপনিষদের ধর্ম্ম প্রেম, শক্তি ও অনুভূতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, এই সকল ধর্ম্মে "ব্রহ্মজ্ঞান" ও "আত্মজ্ঞান" (ব্রহ্মানুভূতি ও আত্মানুভূতির ফলস্বরূপ) এই দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি। বুদ্ধধর্ম্মের হীনযান ও মহাযান দুইটি শাখার ভেদাভেদও এইরূপ সাক্ষ্য দেয় না কি? বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মসাধনার সূচনাবার্ত্তা যিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই বাংলার অমর সন্তান রাজা রামমোহন কি মাণ্ডুক্য উপনিষদ ও অন্যান্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আত্মার সাধনাও প্রচার করিয়া যান নাই? রাজা রামমোহনের জীবনের এই দিকটা স্বামী বিবেকানন্দ ত কোন দিন প্রচার করিতে ভুলেন নাই। তবে রাজা রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মানুভূতির পথ ব্রাহ্মসমাজের সাধকগণ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কে বলিতে পারে, rationalism অর্থাৎ কেবলমাত্র স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবার ধর্ম্মপথ যে ভাবে উত্তরোত্তর ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্প্রদায়কে ধাক্কা দিতেছে, তাহাতে হয়ত অনাগত কালে উপনিষদের আত্মার সাধনাও ব্রাহ্মসমাজে চলন হইতে পারে এবং তখন ব্রাহ্মসমাজেও ব্রহ্মসাধনা ও আত্মার সাধনা মিলিত হইয়া একযোগে উপনিষদের সাধনপথগুলির প্রচার করিতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, ব্রাহ্মণভাব ও ক্ষত্রিয়ভাব দুইটি বিভিন্ন প্রকারের মানবস্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের পথের ভিন্নতা চিরদিন সাধক অন্তরে জাগরূক থাকিবে। ব্রহ্মজ্ঞানের পথ হ'ল, মানুষের কেন, সকল জীবের স্বাভাবিক পথ। আত্মজ্ঞানের পথ কেবলমাত্র মানুষের জন্য, মানুষের নিজ চেষ্টায় আবিষ্কৃত পথ। এই ত পার্থক্য। পথের আরম্ভে ভিন্ন রুচি, ভিন্ন অভিলাষ, ভিন্ন সহায়। পথের শেষে দুই দলের যাত্রীর মিলন ও আত্ম অভিজ্ঞতার বিনিময়। উপনিষদ জগতের আদি পুস্তক, যাহাতে এই দুইটি সাধন-পথের পরিপূর্ণ পরিচয় ও সমন্বয় পাই। তবে বিষয়টি অতি জটিল এবং হয়ত আমিও ভুল করিতেছি; কিন্তু যাহা জানিতেছি, তাহা কি জানাইব না?

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকগণ যদি আত্মানুভূতির পথে চলিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলেই কি, ঘুমের আড়ালে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিবার জন্য উপনিষদের ইঙ্গিতমত চলিয়াছেন? এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য কোথায়?

আমি নিজের মনে এই উত্তর পাইয়াছি যে, ঘুমের আড়ালে না যাইয়াও, এই জাগ্রত অবস্থায় সমাধি পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। আমি মনোবিজ্ঞানের ও মানুষের সহজ অভিজ্ঞতার আবার সাহায্য লইতেছি। আমার মনে হয়, জাগ্রত অবস্থায় মানুষের আকর্ষণ এত দিকে হইতেছে যে, মানুষ নিজ সত্তা ও লক্ষ লক্ষ জীবের অন্য সত্তার ভেদ লইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেছে। স্বপ্নের অবস্থায় এই অপর সত্তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন মানুষ কেবল মাত্র নিজের সত্তা উপলব্ধি করে। তাই সে অবস্থাকে বলা হয়, স্বপ্ন অর্থাৎ নিজেকে পাওয়া। আমার নিজের ধারণা, স্বপ্নের অবস্থা মানুষ জাগরণেও অনুভব করিতে পারে। যখন কোন

বক্তা বা কবি এবং দার্শনিক নিজ সত্তায় ডুবিয়া বক্তৃতা দেন, কবিতা রচনা করেন বা ভাবজগতের অথবা বস্তুজগতের সত্য অন্বেষণ করিতে নিযুক্ত থাকেন, তখন এই বিশ্বময় সত্তাগুলির সংস্পর্শ হইতে তাঁহারা একদম পৃথক হইয়া যান। তারপর কিছুই বলিতে পারিতেছি না, কিছুই লিখিতে পারিতেছি না, বা কোন সত্তাই আমার লাভ হইল না, এইরূপ অভাব দ্বারা যখন অন্তর পরিপূর্ণ হয়, তখন বক্তার, বা কবির, বা দার্শনিকের সুষুপ্তির অবস্থা হইয়াছে। উপনিষদের মতানুসারে সুষুপ্তি অভাবব্যঞ্জক অবস্থা। তারপর বক্তা, কবি বা দার্শনিক যদি এক মুহূর্তের শুভ অবসরে, নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার অবস্থায় সুষুপ্তি পার হইয়া সমাধি পর্য্যন্ত পৌঁছান, তখন যে ভূমার স্পর্শ ঘটে, তাহারই ফলে কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তরে উপজিয়া উঠে ও তাহার দ্বারা তাঁহারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। আমরা বলি, তাঁহারা জগৎকে এই সমস্ত দিলেন, অথচ জগৎকে পরিচালিত করিবার ভার যে নিয়ন্তার উপর চিরদিন রহিয়াছে, তিনিই তাঁহাদের ভিতর দিয়া পথ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হন। ব্রহ্ম যে সকল মানবের আত্মায় বসবাস করিয়া ওতপ্রোতভাবে আপন ইচ্ছা পালন করিতেছেন, তাহা উপনিষদের ঋষিগণ জানিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে কেশব বলিতেছেন, "ব্রাহ্মগণ, তোমরা কতবার দেখিয়াছ যে, দয়াময় ঈশ্বর অত্যন্ত অন্ধকার মধ্যেও বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই সকল দিন সকলে মনে কর।" (আচার্য্যের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩)

জাগ্রত অবস্থায় যে সমাধি পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা যায়, এ সম্বন্ধে সম্প্রতি New Yorkএ বেদান্তপ্রচারে নিযুক্ত স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার আচার্য্য গৌড়পাদ কর্ত্তৃক কারিকা সমেত মাণ্ডূক্য উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ-পুস্তকের ভূমিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন, "The Vedantic Samadhi does not mean the realization of truth with closed eyes, it means the vision of truth with eyes open on every subject." (Page xxiv, Preface)। সুষুপ্তি সম্বন্ধে মহর্ষিপুত্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "গীতাপাঠের ভূমিকা" পুস্তকে এক স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—"কেহ যদি মনে করেন সুষুপ্তি কেবল সুষুপ্ত অবস্থার নিজস্বধন, তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁর জানা উচিত যে, জাগরিত অবস্থাতে সবই আছে—বুদ্ধির জাগরণও আছে, মনের স্বপ্নও আছে। প্রাণের সুষুপ্তিও আছে।... আর তিনের সামঞ্জস্য লোক মধ্যে দুর্লভ হইলেও, মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতীব প্রার্থনীয়।" (পৃঃ ১৪৮) সেই পুস্তকেই আর এক স্থলে তিনি লিখিতেছেন, "সুষুপ্ত অবস্থায় যখন আমাদের আত্মশক্তি অপ্রকাশে নিলীন থাকে, তখন আমরা নির্গুণ হই। জাগতিক অবস্থায় যখন আমাদের আত্মশক্তি প্রকাশে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন আমরা সগুণ হই। স্বপ্ন অবস্থায় আমরা প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে, সগুণ ও নির্গুণের মধ্যে দোলায়মান হই। বেদান্তশাস্ত্রে বলে যে, সমাধি অবস্থা তুরীয় অবস্থা, অর্থাৎ তাহা না জাগরিত অবস্থা, না স্বপ্নাবস্থা, না সুষুপ্ত অবস্থা, পরন্তু তিনের অতীত চতুর্থ অবস্থা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে চতুর্থ অবস্থা, তাহা কিরূপ অবস্থা? বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের কথার ভাবে শ্রোতার এইরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, তাহা স্বপ্ন, জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি এই তিনের সমাহিত অবস্থা বা একীভূত অবস্থা। আর তাহা তিনের সমাহিত অবস্থা বলিয়া তাহার নাম 'সমাধি'। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাহা নির্গুণ এবং সগুণ এই দুই ভাবের ঐক্যাধান বা সমাধিস্থান।" (পৃঃ ১৭৯—৮০)

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনিই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন। উপনিষদের সহিত বেদান্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্টবক্তা দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে লিখিতেছেন :—"বৃক্ষ যেমন কালক্রমে মুকুলিত অবস্থা হইতে পুষ্পিত অবস্থা এবং পুষ্পিত অবস্থা হইতে ফলিত অবস্থায় পরিণত হয়, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞান তেমনই কালক্রমে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনে এবং পাতঞ্জল-দর্শন হইতে বেদান্তদর্শনে পরিণত হইয়াছে।.........এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি বক্তব্য এই যে, বেদান্তসংজ্ঞক দর্শন যেমন আমাদের দেশের সকল দর্শনের শেষের দর্শন, বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষদ তেমনই আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত্র। শেষের শস্য যেমন গোড়ার বীজেরই নূতন সংস্করণ, বেদান্তদর্শন তেমনই বেদান্তশাস্ত্রেরই নূতন সংস্করণ।.........বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষদ অদ্বৈতবাদী নহে, দ্বৈতবাদীও নহে, প্রকৃতিবাদীও নহে, মায়াবাদীও নহে, কোন বাদীই নহে। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি বাদী বলিতে হয়, তবে তাহা সত্যবাদী। সত্যবাদী বলিতে এক হিসাবে সর্ব্ববাদী বুঝায়, আর এক হিসাবে নির্ব্বিবাদী বুঝায়। এ রহস্যটির অর্থ যাঁহারা বোঝেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন; যাঁহারা না বোঝেন, তাঁহাদের বুঝিয়া কাজ নাই।" (পৃঃ ১৭০—১)

সুষুপ্তি ও সমাধি সম্বন্ধে আমাদের যাহা ধারণা, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা হইতে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম এবং ইহাও জানিলাম যে, উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তদর্শন পর্য্যন্ত হিন্দুর সকল ধর্ম্মচিন্তা একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। তা ছাড়া যদি সাধকের বিচারশক্তি উদ্বুদ্ধ থাকে, মনের উপর কোন সত্তার ছায়া পর্য্যন্ত না আসিয়া পড়ে ও নিজের প্রাণ বা ইচ্ছাশক্তি নিলীন অবস্থায় স্থির থাকে, তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশমত সাধক সমাধির অবস্থা (যাহাকে উপনিষদ "অনির্ব্বচনীয়" অবস্থা বলিয়াছেন) উপলব্ধি করিবার যে উপক্রম করিতেছেন, তাহা বলা যাইতে পারে।

(৩)

প্রথম দুইটি প্রবন্ধে যেমন ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে

আমরা জানিয়াছিলাম, সেইরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আত্মানুভূতি ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জানিবার প্রয়াসী হইয়াছি। ব্রহ্মানুভূতির জন্য যেমন আচার্য্যের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ আত্মানুভূতিও উপনিষদ অনুসারে মানুষের সহজ স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দিয়া ব্রহ্মানুভূতি পর্য্যন্ত সাধন করিতে হইলে, যেমন প্রথম অবস্থায় পথপ্রদর্শকের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের পথ ধরিয়া আত্মানুভূতিতে নিমগ্ন হইতে হইলে প্রারম্ভে, যিনি আত্মানুভূতি পাইয়া আত্মায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইয়াছেন, এইরূপ শিক্ষকের সাহচর্য্য বাঞ্ছনীয়। এতক্ষণ আমরা আত্মানুভূতির পথ অনুধাবন করিতেছিলাম। এইবার আত্মজ্ঞানের পথ অন্বেষণ করিব।

আত্মজ্ঞানের পথে যে প্রকার সাধনা কার্য্যকারী হইবে, সে সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে :—"আত্মশক্তি যাহার নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঔদাস্য দ্বারা এবং সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে অর্থাৎ আত্মবল, অপ্রমাদ এবং সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপায়ে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।" (মুণ্ডক, ৩।২।৪)

আত্মজ্ঞানের সাধকের জীবনের লক্ষণগুলি ত আমরা জানিলাম। কিন্তু যদি কেহ আত্মজ্ঞানের পথ ধরিয়া কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাধি পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে জানিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্য যেমন "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন" অবলম্বনীয় হইয়াছিল, সেইরূপ সেই পথগুলি আত্মজ্ঞানের জন্যও ফলপ্রদ হইবে। সচরাচর আমাদের দেশে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি গুরুর নির্দ্দেশমত সাধন করাই আত্মজ্ঞানের জন্য বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া উপনিষদের সাহায্যও লওয়া হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু আচার্য্য গৌড়পাদরচিত মাণ্ডূক্যোপনিষৎ গ্রন্থের "কারিকা" অনুধাবন করিতে বলা হয়। এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার অবসর এ প্রবন্ধে আমাদের নাই। তবে গৌড়পাদের কারিকা দর্শনশাস্ত্রে এক অমূল্য রত্ন ও যুগ যুগ ধরিয়া ইহা ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিতেছে বলিয়া, আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিব। ইহাও উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য এই প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গৌড়পাদ দেখাইয়াছেন যে, স্বপ্নের অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দৃষ্টি সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া একই সত্তা এবং সে অবস্থায় যাহা কিছু অনুভব করা যায় বা কল্পনা করা যায়, জাগ্রত অবস্থায় ফিরিবা মাত্র জানা যায় যে, সমস্তই মিথ্যা। সেইরূপ জাগ্রত অবস্থা সম্বন্ধেও জানা যাইতে পারে যে, ভোক্তা, ভোজ্যবস্তু ও ভোগ সমস্তই প্রকৃত হিসাবে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত একই সত্তা এবং স্বপ্নের অবস্থায় পৌঁছাইবা মাত্র বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, জাগ্রত অবস্থা সম্পূর্ণ অলীক। এই ভাবে যদি জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থাকে পরস্পরের সাক্ষ্য অনুসারে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়, তখন এই দুই অবস্থার মূলে যে সত্যবস্তু অর্থাৎ আত্মা রহিয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক মানবসত্তার আধ্যাত্মিক অনু-ভূতি ও জ্ঞান ক্রমান্বয়ে রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব জানা যায়। আত্মার এইরূপ অস্তিত্ব যখন অনুভবের বস্তু হয়, তখন জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থার অন্তরালে যে সুষুপ্তির অবস্থা রহিয়াছে, সাধক সেইখানে উপনীত হন। তারপর গৌড়পাদ যেভাবে আত্মা ও ব্রহ্মের অদ্বৈত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং অবশেষে আত্মা যখন ব্রহ্মভাবে তদ্‌গত হইয়া জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় বসবাস করে, তাহাই 'সমাধি'। মোট কথা আত্মজ্ঞানের পথে যাইতে হইলে, জাগ্রত ও স্বপ্নকে বাতিল অর্থাৎ একেবারে মিথ্যা জানিয়া, গৌড়পাদের নির্দ্দেশ অনুসারে কোন আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প বা আশা না লইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। তিনিই বলেন, সাধক সমাধির অবস্থায় জীবন যাপন করিলে পর, 'জড়' এর ন্যায় লোকের সহিত আচরণ করিবেন—অর্থাৎ আপনার জ্ঞানভাব প্রকাশ করিবেন না ও নিজের শারীরিক অভাবগুলির পূরণের সম্বন্ধেও ঘটনাক্রমে লব্ধ বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। (৬৫ ও ৬৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইহাই অদ্বৈত সাধনার পরাকাষ্ঠা। এবং যাঁহারা এই পথে যান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক সহজ ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

স্মৃতি-অর্ঘ্য

(ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৩৮, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে পঠিত)

নববিধানের যুবকমণ্ডলী আমাকে আহ্বান করে অনুগৃহীত করেছেন। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের হৃদয় পবিত্র করে, মন ও প্রাণ শুদ্ধ করে। আপনারা আমাকে সে আলো-চনার সুযোগ দিয়ে, আমাকে যথার্থই কৃতার্থ করেছেন। সেজন্য নববিধানের যুবকমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ [illegible] করছি।

আমাদের দেশে যোগশাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতির জন্য নানাবিধ ধ্যান-বিধির ভিতর যোগিচিত্তের ধ্যানের কথা আছে। বৌদ্ধেরা বোধিসত্ত্বের ধ্যান করে থাকেন। কোন মহাপুরুষের জীবন আলোচনা এক প্রকার ধ্যান-বিশেষ। দেশের আবহাওয়া দেখে মনে হয়,—আমাদের প্রাচীন পন্থা ভুলে', আমাদের স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা, তাঁদের কথা ভুলে' আমরা চলেছি ভুল পথে। আজ আমরা জীবনের পথে প্রাচীনকে ত্যাগ করে

নবীনকে বরণ করে নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, নবীন বলেই নবীনের কোন বিশেষ মূল্য নেই। নবীনের ভিতর সত্যসুন্দরের কোন আবির্ভাব দেখতে পেলে, তাকে কে অস্বীকার করতে পারে? অভিব্যক্তিধারায় বিশ্ব যে প্রতিদিনই অভ্যুদয়ের পথে যাচ্ছে, এর কোন প্রমাণ নেই। হতে পারে, হয়তো জীবনে চলার পথে কিছু সুবিধা এসেছে; কিন্তু তাই বলে নবীন সর্ব্বাংশেই প্রাচীনের সব প্রেরণাকে অতিক্রম করে বরণীয়রূপে আমাদের কাছে উপস্থিত, একথা স্বীকার করে মেনে নিলে, আমরা কিন্তু সত্য হতে ভ্রষ্ট হব। আজ এ উৎসবে এসে আমার এ কথাটাই মনে হচ্ছে কেশবচন্দ্র বাংলা দেশের যে কত বড় শক্তি, কই তাতো আমরা বুঝ ছি নে। তাঁর কথা, তাঁর জীবনের আদর্শের শক্তি আমাদের চালিত করছে না। আমরা আদর্শ প্রেরণা নিচ্ছি, অনেক কিছুর কাছ থেকে; কিন্তু এ পুরুষসিংহকে, তাঁর সাধনাকে, তাঁর শক্তিকে, তাঁর উদ্দীপনাকে বাংলাদেশ প্রায় ভুলতেই বসেছে। আমরা সাহিত্য পড়ি, দর্শনালোচনা করি—এমন কি অধুনাতন পাশ্চাত্য লেখকের যে কোন লেখাকে আগ্রহ সহকারে পড়ি; কিন্তু যাঁরা বাংলার মনস্বী মহাপুরুষ, যাঁরা আমাদের মাতৃভূমিকে ও তাঁর সৃজন-শক্তিকে বিশ্বের দরবারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, যাঁদের অতুলনীয় সাধনা ও সিদ্ধি কত লোককে কল্যাণের পথে অলক্ষ্যে এগিয়ে দিয়েছে, তাঁদের পবিত্র স্মৃতিকে আমরা সম্যক্ পূজা করতে পারছিনে। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যুগে যুগে ব্রহ্মসাধনার উদ্দীপনা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, মুনি ঋষিদের দ্বারা। "উপনিষদ্‌যুগ হতে এ যুগ পর্য্যন্ত, ব্রহ্মোপাসনা ভারতের সাধনা। এ সাধনায় ভারত বিভূতির বীর্য্যে, জ্ঞানের দীপ্তিতে ও প্রেমের মাধুর্য্যে পূর্ণ হয়েছে।" ভারতে মহাপুরুষদের ও অতিমানবদের ভেতর এমন কেউ নেই, যাঁরা ব্রহ্মোপাসনায় মগ্ন হন নি। সুধু চিন্তার দ্বারা নয়, সাধনার দ্বারাও ব্রহ্মবাদ ভারতের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যে পথে ঋষি মুনিরা ভ্রমণ করে, অলৌকিক সত্যে উপনীত হয়ে, ব্রহ্মজ্যোতিতে, ব্রহ্মরসে, ব্রহ্মতেজে আপ্লুত হয়েছেন, আজকার দিনে সে পথ হতে ভ্রষ্ট হলে, জাতির বিশেষ অকল্যাণ হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাঁরা ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মরত, ব্রহ্মমগ্ন, তাঁদের জীবন আমাদের কাছে আলোক-বর্ত্তিকার ন্যায়। জীবনের প্রারম্ভেই গভীর চিন্তা ও সাধনা সম্ভব হয় না, কিন্তু সাধনাপ্রতিষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের ভেতরই এমনি তীব্র শক্তি আছে যে, তাঁদের সঙ্গসুখ লাভ করতে পারলে, অথবা তাঁদের প্রতিষ্ঠার কথা জানতে পারলে, অতি আশ্চর্য্যরূপে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী জেগে ওঠে। আমরা নবদীক্ষা পাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অলৌকিক প্রেম, অমানুষিক ওজস্বিতার কথা শুনেছি মাত্র। তা'হলেও কৈশোরে এক অসহায় অবস্থার ভেতর যখন কোন আলোকই আমার সামনে দেখছিলেম না, তখন কেশবচন্দ্রের 'Prayer' শীর্ষক বক্তৃতাটী পড়ে, আমি আমার পথ দেখতে পেলেম। তাঁর শক্তিবাণী—প্রার্থনা সব দিতে পারে, জীবনকে রমণীয় করতে পারে, জ্ঞানে, মহিমায়, শ্রীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, আমারই হয়েছিল সত্যি করে আলোক-বর্ত্তিকা। সেই কৈশোর হতে এ প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত সেই বাণী আমার হয়েছে পথপ্রদর্শক। বুদ্ধির অগোচরে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের আদর্শ ও বাণী মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। এ বাণী ত সামান্য বাণী নয়, এ বাণী অশরীরী। এরূপ মুনি ঋষিদের বাণী ভারতের অন্তরাত্মাকে এখনও জাগ্রত ও পুষ্ট রেখেছে। জগতে আজ ধর্ম্ম ম্লান, সর্ব্বত্রই জড়শক্তির বিকাশ মানুষের অন্তরকে মুগ্ধ করে, তাকে প্রকৃত মহনীয় স্বরূপ হতে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, অন্তর জীবনের শাশ্বত শান্ত জ্ঞান-দীপ্তির ওপর একটা আবরণ পড়েছে। ভারতবর্ষ পাছে এ দৃষ্টির মাদকতায় আকৃষ্ট হয়ে তার স্বরূপকে, তার অন্তরাত্মাকে ভুলে যায়, তাই ব্রহ্মানন্দের ন্যায় ভাগবত পুরুষদের স্মৃতিপূজার বিশেষ আবশ্যক।

কেশবচন্দ্রের জীবন-কোরকের ভেতর ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করবার জন্য ছিল, একটা স্বাভাবিক সংবেগ। এটা এত স্বাভাবিক ছিল, যে অগ্নিপরীক্ষার ভেতর কোন দিনই তিনি লক্ষ্যচ্যুত হন নি। একটা অমানুষিক শক্তিতে তিনি ছিলেন পূর্ণ। জীবনের প্রাথমিক দীক্ষা হতে শেষ পর্য্যন্ত এ শক্তি তাঁকে কখনও ত্যাগ করে নি। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্তি যে অকিঞ্চিৎকর, এর পূর্ণ উপলব্ধি তিনি করেছিলেন বলেই, তিনি একটা দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তির জন্য, জীবনের প্রারম্ভ হতেই ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। ঈশ্বরকে শুধু বিচারের দ্বারা বোঝাই নয়, তাঁকে জানা, জীবনের মূলে হৃদয়গুহায় তাঁর স্পর্শ পাওয়া, সুধু স্পর্শ নয়, তাকে জীবন্তরূপে ধরা, ও তাঁর আদেশ তাঁরই বিধান মেনে নিয়ে জীবনের পথে তাঁরই কার্য্য সম্পাদন করা ছিল তাঁর পরম কাম্য। তিনি ছিলেন ঈশ্বরানুপ্রাণিত। জীবনের সবটাই তিনি এমন ভাবে সমর্পণ করেছিলেন যে, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁর কিছু ছিল না। কখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যের চ্যুতি হলে তিনি দিশেহারা হতেন। তাঁর অন্তর জীবনের স্বাভাবিক গতি ছিল ঈশ্বরাভিমুখে ও প্রতিষ্ঠা ছিল ঈশ্বরে। এ প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা, সুধু বিচার ও বুদ্ধির নয়। বিচার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে মহনীয় সত্তারূপে গ্রহণ করি, সেখানে বাক্ মৌন, মন স্তব্ধ, বিজ্ঞান সমাহিত—কিন্তু কেশবচন্দ্রের জীবনে মৌন সাধনা থাকলেও, তাঁর সাধনা উল্লসিত হয়ে উঠত, আনন্দের ও জীবনের হিল্লোলে। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ ব্রহ্মের অন্তর্য্যামী রূপের সাধক। সে সাধনা জীবনের পরম প্রকাশের পথে ব্রহ্মশক্তিতে তাঁকে পূর্ণ করে, প্রকৃতির ভেতর ঈশ্বরের বরণীয় সত্তা তাঁকে মুগ্ধ করত, অন্তরাত্মার অনুসন্ধানে আকৃষ্ট করত।

কিন্তু তিনি তাতেও ততটা আকৃষ্ট হতেন না, যতটা হতেন বিরাটকে প্রিয়রূপে পেতে। ব্রহ্মের প্রিয়রূপ ছিল তাঁর নিকট পরমরূপ। ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বরযোগ ছিল তাঁর সাধনার ভঙ্গী। "যোগেশ্বরের শান্ত, প্রশান্ত, সুগম্ভীর" আদর্শে যেমন ছিল তাঁর অনুরক্তি, তেমনি বিগলিত ভক্তির প্রসন্নতায় ও উন্মত্ততায় তাঁর ছিল প্রীতি। ভাগবত জীবনের ব্যাকুলতা, যোগযুক্তি ও আনন্দের উদ্বেলতায় তিনি ছিলেন পূর্ণ। সুখময় ভাগবত স্পর্শের অস্পৃহায় হয় ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতায় দেয় যোগ, অতিমানস স্তরে আমাদের অন্তর সত্তায় যোগ প্রতিষ্ঠা করে ভাগবত স্মৃতি, স্মৃতি দেয় আনন্দ। কিন্তু কেশবচন্দ্রের আনন্দ-সাধনায় যোগ-স্মৃতিই একমাত্র কাম্য নয়। ভগবানের আনন্দ-রূপের সাধনা যে আস্বাদ ও আবেগ নিয়ে আসে, তাতে জীবন-বেগ নবীন উল্লাসে পূর্ণ হয়ে উঠে। আনন্দসাধনায় আনন্দই সাধ্য ও সাধনা—কোন কঠোরতা নেই—অথচ জীবনের সবটাই ছন্দায়িত হয়ে ওঠে। আনন্দ-ছন্দের ভিতর দিয়ে পাই পরম আনন্দকে। আনন্দের সাধনা নানা ছন্দে, নানারূপে, নানা ধ্যানে সমৃদ্ধ। ছন্দের বিকাশে আনন্দলোকের স্তরের ওপর স্তরের বিকাশ, যা আমাদের মন ধারণা করতে পারে না। দিব্য গন্ধ, দিব্য দর্শন, দিব্য শক্তি, দিব্যরূপ, দিব্য সম্পদের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে হয় সাধক পূর্ণ। ভাগবত আনন্দের মূর্চ্ছনায় এসব অনুভূতির স্তর বিশেষ পূর্ণ। মূর্চ্ছনা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য দেয় এদের বিশিষ্ট রূপ। জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিও ভরপুর হয় এ আনন্দরসে। কোথা হতে আনন্দের নির্ঝর অবতরণ করে, সকল পাপ, সকল কলুষ দূরীভূত করে' কতরূপে আমাদের পূর্ণ করে। আনন্দসাধনার আস্বাদ পেলে, সাধকের ও ভগবানের ভেতর সকল দূরত্ব চলে যায়। সাধক তাঁকে পায় আপনার রূপে। তাই বোধ হয়, শ্রীচৈতন্য ভগবান্‌কে দয়িতরূপে বরণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের ভেতর যখন আনন্দ-সাধনা সঞ্চারিত হয়ে উঠল, তখন তিনি ব্রহ্মসাধনার নূতন রূপ দেখতে পেলেন.—এ আনন্দসাধনা শান্ত ব্রহ্মের সাধনা নয়—এটা একটা চিত্তের Wordsworth-এর ভাষায় Wise passiveness, জ্ঞান-বিশ্রান্তি নয়, এটা divine passion, দিব্য গতি, দিব্য আকর্ষণ। আনন্দসাধনায় কেশবচন্দ্র বলেছেন, "এত শুষ্কতার পর এত ভক্তি আসিল? এখন মাকে আমি দেখিলাম......শুষ্ক কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া যে কাঁদিতেছিল, সে হাসিতেছে......। ঈশ্বর-জ্ঞান অল্প ছিল, বাড়িল; হাত যোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে ছিলাম, পরে দেখি, তিনিই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কতরূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখনও শক্তির সহ আনন্দসংযুক্ত দেখিলাম; কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম। মার রূপ নানাভাবে মা দেখাইয়াছেন। আরও কত ভাবের রূপই সম্মুখে আসিতেছে।.........এখন মনে হইতেছে, মাকে দেখিয়া বুঝি একেবারে পাগল হইয়া যাই। যে আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে নাই, তাহার ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় নাই।" একথাগুলি বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে। সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গালী মত্ততার সাধক, রসের উদ্বেলতার সাধক। কেশবচন্দ্রে এ ভাব পূর্ণ। তিনি মত্ত হতে চাইতেন, মত্ত হতেন।

কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই, এ মত্ততা কি? বাহ্য দৃষ্টিতে একটা ভাবাবস্থা, কিন্তু অন্তরে এটা আনন্দের সংবেগ; আনন্দের এ সংবেগ এত বেশী যে, সমস্ত সত্তা উল্লসিত হয়ে উঠে। এটা একটা অসাধারণ অবস্থা, এ অবস্থা তখনি আসে, যখন জীবনের সকল স্তরে হয় আনন্দের প্লাবন। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে যেমন সাম্যভাব আছে, তেমনি আছে উদ্বেলতা। অধ্যাত্ম জীবনে ভাব-বৈচিত্র্যের মধ্যে কখনও আসে শান্ত সমাহিত ভাব, কখনও আসে প্রেমের তুফান ঝড়—বৈচিত্র্যময় জীবনে অধ্যাত্ম জীবন রসের ও আনন্দের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। ভাগবত পুরুষের এই উপজীব্য। তাঁর চোখে জীবনের সব লহরীতে আনন্দ, বিশ্ব আনন্দ সত্তার আনন্দময় প্রকাশ। জ্ঞানী সাধক ও ভক্তি-সাধকের মধ্যে তফাৎ এই—জ্ঞানী শান্ত সমাহিত বিশ্বের ভিতর তিনি শান্তরস দেখতে পান। বিশ্ব শান্তিতে সমাহিত। ভক্তি-সাধক আনন্দে সমাহিত হয়েও আনন্দের উদ্বেলতার সাধক। অপহতপাপ্‌মা ব্রহ্মলোকে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেও, সৃষ্টির স্তরে স্তরে, আমাদের অন্তর সত্তার স্তরে স্তরে আনন্দের সঞ্চার অনুভব হয়। অস্তিত্বের সব বন্ধুরতা বিগলিত হয়ে যায়, সকলকেই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "হরেঃ শরীরম্" বলে মনে হয়। কেশবচন্দ্রও তাঁর অপূর্ব্ব ভাষায় এ অবস্থার কথা বর্ণনা করে গিয়েছেন, "প্রেম ঘন, প্রেম ঘনতর হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইলেন এবং সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভক্তের মন মোহিত হইল। ক্রমে যত সৌন্দর্য্য দেখিবে, তত প্রগাঢ় মোহ হইবে। ভিতরে স্থির রহিল, বাহিরে চঞ্চলতা। যদি ভিতরের চক্ষু অন্য দিকে তাকাইতে চায়, তবে জানিবে, সেই সৌন্দর্য্য দেখা হয় নাই। যখন প্রাণ সেই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আর অন্যদিকে যাইতে ইচ্ছা করিবে না, তখন জানিবে, প্রাণ স্থির হইয়াছে। যে পরিমাণ অন্য দিকে যাইবে, সেই পরিমাণ মোহের অল্পতা।"

কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিতে ব্রহ্মসাধনার স্তর আছে। একই তত্ত্বের সাধনা করলেও, আমাদের গ্রহণযোগ্যতানুযায়ী তত্ত্বের আস্বাদ হয় বিভিন্নরূপে। যোগীর ব্রহ্মে যুক্ত অবস্থা, জ্ঞানীর লীন অবস্থা, প্রেমিকের রসাস্বাদনের অবস্থা—এ সব ভূমিকায় একই তত্ত্বকে আমরা জানি ও বুঝি; শুকদেবের ন্যায় কেশবচন্দ্রের ভেতর অধ্যাত্ম জীবন এমনি ছিল যে, তিনি এর প্রত্যেকটাতে ছিলেন আকৃষ্ট। দার্শনিক দৃষ্টিতে অনুভূতি বিশেষকে গ্রহণ করে, একটা মতবাদ সৃষ্টি করে। মতবাদ সৃষ্টি করাই তার প্রয়োজন।

কিন্তু অনুভূতির স্তরগুলি যেখানে খুলে যায়, সেখানে অধ্যাত্ম জীবনের আনন্দের আস্বাদের দিকেই আকৃষ্ট হয়। মতবাদের দিকে নয়। ব্রহ্মনির্ব্বাণ সত্য, কি লীলা সত্য, এর একটা দার্শনিকতা থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্যদ্রষ্টার কাছে এ দুটীরই অধ্যাত্ম জীবনে একটা গভীরতা আছে—দুটী জীবনের ভেতর তিনি নিষ্ঠ। কেশবচন্দ্র ছিলেন এরূপ জাগ্রত অনুভূতির দিকে আকৃষ্ট। এ জন্য তিনি যেখানে অধ্যাত্ম জীবনের স্বচ্ছ প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, তাতেই হয়েছেন তিনি আকৃষ্ট। মৌমাছি মধুই সঞ্চয় করে, একটা ফুল হতে নয়, সকল ফুল হতেই। ব্রহ্মভাবে যে চিত্ত সমৃদ্ধ, সেত তাকে আস্বাদ করবে নানারূপে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনে হৃদয়ের সকল তন্ত্রীই আঘাত করে। তাদের ভেতর সত্যিকারের ভেদ নেই—ভেদ হয় সুর বিশেষের প্রাধান্য হতে। ব্রহ্মসুরের সকল রাগিণীর সঙ্গেই ছিল কেশবচন্দ্রের পরিচয়, তাই তিনি সকল সম্প্রদায়ের সাধক-জীবনী হতে সঞ্চয় করতেন আনন্দ। সকলের সাথেই তিনি যুক্ত হতেন একটা ভাবের দৃষ্টি নিয়ে। তাঁর অধ্যাত্ম সত্তার এই বিরাট ভাব তাঁকে দিয়েছিল একটা অপার্থিব বিশেষত্ব, তাই তাঁর মানসক্ষেত্রে অনুভব হয়েছিল—'নববিধানের রূপ'—নবীন ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের নব অভিব্যক্তি, যার ভিতর কোন ধর্ম্ম তার বিশেষ রূপকে হারিয়ে ফেলে না। সকল সুরের ভেতর দিয়ে চিরন্তন আনন্দকে পাওয়াই নববিধানের স্বরূপ। নববিধান সকল ধর্ম্মে দেখছে ঈশ্বরের প্রকাশ। একে অবলম্বন করেই উঠেছে তাঁর বিশ্বদৃষ্টি, সকল ধর্ম্মের ভিতরই সমন্বয় সংস্থিতি। কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত। নবীন জগতে নববিধানই হবে আবশ্যক। সমষ্টি মানবের ভেতর আছে যে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সকলেরই সুষমায় ছিলেন তিনি আকৃষ্ট। নববিধান সকল সাধকমণ্ডলীরই বিধান। নববিধানের রূপ যে দিন হবে সুস্পষ্ট, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ সেদিন হবে অন্তর্ধান।

কিন্তু নববিধান কি মানুষের সৃষ্টি? কেশবচন্দ্র, বোধ হয়, তা মানতেন না। এর রূপ আছে দিব্যলোকে, ঈশ্বরই ইহার রচয়িতা—এজন্য ইহা শাশ্বত। আমাদের মানস প্রত্যক্ষের কাছে হয়ত তা অপ্রত্যক্ষীভূত, কিন্তু অতিমানসের কাছে তা সুস্পষ্ট। কেশবচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, "The New Dispensation is transcendentally spiritual. Its eyes are naturally turned inward and they see vividly the spirit world within......It sees with the spirit-eye and hears with the spirit-ear. It drinks inspiration. It builds the eternal city the Kingdom of heaven within." নববিধানের সার্থকতা উপলব্ধির সময় এসেছে।

যখন মানুষ হয়েছিল অত্যন্ত যুক্তিপ্রধান, তখনই কেশবচন্দ্র নববিধানের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরবাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করলেন। অন্তরে সমাহিত হয়ে সকল সমস্যার মীমাংসা ঈশ্বরের আদেশে কর্ত্তেন। অপার্থিব শ্রবণের দ্বারা তিনি ঈশ্বরবাক্য শুনতেন। মানুষের ভেতর অলৌকিক দিব্য শ্রুতি ও দিব্য দর্শন ত আজ বিজ্ঞানের উপলব্ধি। Revelationএর স্থান বিচার হতে অনেক ঊর্দ্ধে। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ পেতেন। তিনি তাঁর সকল কাজেই খুঁজতেন ঈশ্বরের ইঙ্গিত। প্রকৃত ঈশ্বর-বোদ্ধার রূপ ত এই। গৌরাঙ্গ, খ্রীষ্টের ভেতর আমরা এরূপের পরিচয় খুবই পাই। এ যুগের লোকের হয়তো কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ বুঝতে কষ্ট হবে না। Psychic Lifeএর অনুসন্ধান যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন, মানুষের প্রত্যক্ষের নানা রূপ আছে, নানা স্তর আছে। মানুষের spirit-eye, spirit-ear আছে। প্রকৃত ভাগবতের একটা অপ্রাকৃত তনুর অনুভব হয়। বৈষ্ণবেরা এই অপ্রাকৃত শরীরেই লীলার আস্বাদ করেন। St. Paulও এই অপ্রাকৃত শরীরের কথা (Psychic Self) বলেছেন। কেশবচন্দ্রও একথার প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন। মরমীদের কথার কি ঐক্য! এ অপ্রাকৃত দেহ লাভ হলেই, ঈশ্বরের সাথে হবে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, যা সহসা ছিন্ন হবার নয়। যত দৃঢ় এর প্রতিষ্ঠা, ততই সাধক সিদ্ধ দেহে নানারূপে ভগবানের সঙ্গ-সুখ অনুভব করেন। দিব্য নয়নে তাঁর দর্শন, দিব্য শ্রবণে হয় তাঁর শ্রবণ—সাধক অন্তরে বাহিরে করে ভগবানকে অনুভব—আত্মারাম হয়ে তিনি হন ইন্দ্রিয়ারাম। এ Psychic self—অপ্রাকৃত শরীর আজও আমাদের কাছে বেশ প্রতিষ্ঠিত নয়। বিজ্ঞান এর কিছু সন্ধান পেলেও, সত্য তত্ত্ব এখনও উপলব্ধি করতে পারে নাই। যত এ অপ্রাকৃত ভূমিকা আমাদের কাছে হবে স্পষ্ট, ততই কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ হবে পরিষ্কার। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের নবীন পথ খুলে যাবে। প্রকৃত ঈশ্বর-বোধ হবে তখনি প্রতিষ্ঠিত। মানসিক জ্ঞানে মানুষের যে ঈশ্বর-বোধ, তাহতে ইহা হবে ভিন্ন—এ জ্ঞান মরমীদের সম্ভব, অন্যের নয়। এই অপ্রাকৃত শরীর অমৃত লোকের ও মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে সংযোগ-সূত্র প্রতিষ্ঠিত করে। অপ্রাকৃতই প্রাকৃতকে কখনও কখনও উদ্দীপ্ত করে। ব্রহ্মতনু হয়েই ব্রহ্মসন্নিধি প্রাপ্ত হয়। এ ব্রহ্মতনু যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি, ঈশ্বরীয় শক্তি বিশ্বে কিরূপ কাজ করছে, তা পরিষ্কার দেখতে পায়। দিব্য জগতের সকল বিভূতি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের শক্তি তখন শুধু একটা অনুমানের বিষয় হয়ে থাকে না। তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ হয়।

এই অপ্রাকৃত শক্তিতে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা ঈশ্বরের ভেতর জীবজগৎ উদ্ধার করবার জন্য আছে যে ঐকান্তিকী স্পৃহা, তা বেশ অনুভব করেন। ঈশ্বরের জন্য আস্পৃহা জীবের ভেতর বিদ্যমান ও ঈশ্বরের ভেতরও জীবকে উদ্ধার করবার জন্য আস্পৃহা সততই বর্ত্তমান। এ আস্পৃহা আছে বলেই ঈশ্বর পরিত্রাতারূপে অবতরণ করেন। কেশবচন্দ্র ইহা বিশ্বাস করতেন। কৃপাবাদের মূলে আছে গভীরানুভূতি। কৃপাবাদ শুধু একটা বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ নয়, এ প্রজ্ঞার অনুভূতি নয়। এখানে আছে একদিকে যেমন ক্লেশ-বোধ ও পাপ-বোধ আর

একদিকে আছে তেমনি কৃপার ও ঈশ্বর-শক্তির অবতরণের বোধ। মুক্তি বা ঈশ্বর-সান্নিধ্য যাঁদের কাছে শুধু বুদ্ধির বিলাসেই পর্যবসিত হয় নি, তাঁরা অনুভব করেন, ঈশ্বর যাঁকে বরণ করেন, তিনি তাঁকে পান। এ কথার অর্থ কি?—মানুষের অবিদ্যা এত গভীর যে, বুদ্ধির বিকাশই মুক্তির চরম সার্থকতা তাকে দিতে পারে না। প্রাণস্তরের আকর্ষণগুলি ছিন্ন হয় না—যতক্ষণ না পর্য্যন্ত মানুষ একটা তেজোময় শক্তির আশ্রয় না পায়। তাই ঈশ্বরকে তিনি মুক্তিদাতা বলেছেন। মুক্তিদাতৃত্বরূপে ঈশ্বরের একটা কল্যাণরূপের সঙ্গে পরিচিত হই,—এ কল্যাণরূপ শুধু আমাদের দীপ্ত করে না, মুগ্ধ করে। মানুষ কখনও তাঁকে মানুষীভাবাশ্রিত, কখনও বা মানুষাতীত-আশ্রিতরূপে পায়। ঈশ্বর-বোধ যতই সুস্পষ্ট হয়, বিশেষতঃ জীবনের আবর্ত্তের ভেতর দিয়ে, ততই ঈশ্বর এরূপ আমাদের কাছে হয়েন সুস্পষ্ট। যেখানে মুক্তির জন্য সত্যিকার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, সেখানেই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের এ রূপ যে আজও অনেকের কাছে অস্পষ্ট, তার কারণ, তাদের ভেতর নেই সত্যিকার অজ্ঞানতার ও পাপের বোধ ও মুক্তির স্পৃহা। ঈশ্বরের কৃপা জীবনে সবচেয়ে আবশ্যকীয়, এ ধারণা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয় বলেই, ঈশ্বর গুরু ও মুক্তিদাতা, এ বোধ উজ্জ্বল নয়। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের মুক্তিদাতৃত্বে অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের এ রূপের ভিতর পরম রমণীয়তা দেখতে পেয়েছিলেন। বিশ্বাতীত জগতে ঈশ্বর আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর বিরাটত্ব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে, তাঁরই কারুণ্যশক্তিতে তিনি পরিত্রাতারূপে দিব্য আধার নিয়ে প্রকাশিত হন। এক দিকে তাঁর বিশ্বাতীত সত্তা, আর এক দিকে তাঁর বিশ্বমূর্ত্তি—এর মাঝে তাঁর পরিত্রাতারূপে করুণার মূর্ত্তি। ঈশ্বরের শক্তিতে সবই সম্ভব হয়। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু অমিতাভকে কল্যাণ-বিগ্রহ মনে করে উপাসনা করেন। যোগীদের নির্ম্মাণ কায় অবলম্বন করে, বিশ্বহিতে রত থাকবার কথাও শোনা যায়। এতেই বোঝা যায়, বিশ্বসত্তার অন্তরে আছে কল্যাণের নির্ঝর—পরমতত্ত্বের অনুভূতি হয় যত পরিষ্কার, ততই সাধকের তাঁর এই কল্যাণরূপের সাথ হয় পরিচয়। যাঁরাই সত্যকে বরণ করে নিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরাই এ কল্যাণরূপে আকৃষ্ট হয়েছেন। ঈশ্বরে এ কল্যাণরূপ না থাকলে, তাঁরাও এরূপ কল্যাণ-স্পৃহাতে আকৃষ্ট হতেন না।

কিন্তু ঈশ্বরের এ কৃপা-কল্যাণ আমাদের শুদ্ধ পবিত্র করে কোথায় নিয়ে যায়? কেশবচন্দ্রের উত্তর—নববৃন্দাবনে—যেখানে নব নব অনুরাগে, নবীন নবীন ভাবে ঈশ্বর আমাদের পূর্ণ করেন। প্রেমের উল্লাসে, জ্ঞানের দীপ্তিতে, ভাগবত ছন্দে আমরা পূর্ণ হই। রসময় বিশ্বের হয় অনুভূতি। অমৃতরসে হই আমরা মগ্ন। এ রস দিশে, বিশ্বাতীত বিশ্বে, জীবনের রাসোৎসবে। ছন্দের ওপর ছন্দ, সুষমার ওপর সুষমা, রসের ওপর রস, এ আনন্দ রাসোৎসবে সজ্জিত আছে। এখানে শুধু Cheerubs এবং Syruphsএর দিব্য ও মহনীয় সত্তায় আমরা আকৃষ্ট হইনে, এখানে শুধু অনাহত সঙ্গীতের সুর-মূর্চ্ছনা আমাদের তৃপ্ত করে না। সত্তার স্তরের ও উপর স্তরের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মছন্দ, ব্রহ্মরস প্লাবিত হয়ে জীবনের সকল নৃত্যকে করে সঞ্চারিত। অনন্ত রস-সঞ্চারে জীবনের সবটাই হয় মুখরিত। Danteএর দৃষ্টি ছিল দিব্য লোকের ছন্দের মহিমায় আবদ্ধ, Pythagorasএর দৃষ্টি ছিল অনাহত সুর সঙ্গীতে আবদ্ধ, কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল বিশ্বাতীত ও বিশ্বছন্দে আবদ্ধ। এ অপ্রাকৃত জীবনের ছন্দই আমাদের কাছে নিয়ে আসে নববৃন্দাবনের সংবাদ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার।

—•—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ৩০শে মে, ৭নং নবীন কুণ্ডুর লেনে, শ্রীমান্ মদনমোহন চক্রবর্ত্তীর শিশুপুত্রের নামকরণে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "ব্রহ্মর্ষি" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে। (এই সংবাদ অনেক দিন পরে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা দুঃখিত।)

বিলাত-যাত্রা—গত ১১ই সেপ্টেম্বর, কেশব একাডেমীর হেড মাষ্টার শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ (এম্ এ) ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শোভা দেবী (এম্,এ) উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। মা সর্ব্বমঙ্গলা ইঁহাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা বর্ষণ ও আশীর্ব্বাদ দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে আগষ্ট, ৩নং রায় ষ্ট্রীটে, জামাতা শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত পঙ্কজচন্দ্র দাস গুপ্তের গৃহে, ৺ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা সেন প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করেন।

গত ২৮শে আগষ্ট, ১৩।১এ বৃন্দাবন মল্লিক ফাষ্ট লেনে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহাদের মাতুল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র উপাসনা করেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, কাঁকুড়ায় কদমতলার বাড়ীতে, ৺ডাঃ শরৎকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং তাঁহার জীবনের গুণাবলী বিবৃত করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ১১৭নং লোয়ার রেঞ্জে, ৺অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে পুত্রগণ ২৲ এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিনতা শাস্ত্রী ১৲ টাকা এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নিবেদিতা রায় অনাথাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাহায্য-ভাণ্ডার—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহক-সভায় বন্যাপীড়িতদের জন্য সাহায্যভাণ্ডার খোলা হইয়াছে এবং লেপ্টেনান্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনকে (I.M.S. Retired) তাহার কোষাধ্যক্ষ করা হইয়াছে। মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণ এ বিষয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনুভব করিয়া, যিনি যা পারেন, কলিকাতায় ২৫০নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, (পোঃ সার্কাস) কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ | 3rd. October, 1938 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, আমরা আর্য্যজাতি, আর্য্যের প্রধান লক্ষণ, ক্ষেত্র-কর্ষণ ও শস্যোৎপাদন। ভূমি কর্ষণ করিয়া ফলোৎপাদন যেমন আর্য্যজাতির কর্ম্ম, তেমনি হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া আত্মোৎকর্ষ-সাধন ও ব্রহ্মদর্শনলাভ আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম। ইহার দ্বারাই তাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে সক্ষম হইলেন, এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" নিষ্পন্ন করিলেন। বৈদিক যুগে জ্ঞানযোগে চিন্ময়ব্রহ্মদর্শন যেমন তাঁহারা সাধন করিলেন, পৌরাণিক যুগে এই যে মৃন্ময় দেবদেবীর পূজা, তাহাও তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন-প্রচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বত্র সকল পদার্থে আছেন, তখন মৃন্ময়ে তিনি নাই, মৃন্ময়ের ভিতর তাঁহার চিন্ময়রূপ দেখা যায় না, ইহা কে বলিবে? তাই তাঁহারা, মা, তোমার উপমা কল্পনা করিতে করিতে, ভক্তির আতিশয্যবশতঃ তোমার প্রতিমা গড়িলেন এবং অজ্ঞান সাধকদিগের শিক্ষার জন্য প্রতিমাপূজা প্রবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু পাছে আবার তাহাতে ধর্ম্ম আবদ্ধ হয়, তাহার জন্য প্রতিমা গড়িয়া, তাহাতে ভক্তি সাধন করিয়া লইয়া, তিনদিন পরে তাহার বিসর্জ্জনেরও ব্যবস্থা করিলেন। মৃন্ময়ীমূর্ত্তিপূজা যে ব্রহ্মের রূপকল্পনা, ইহা হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত। কল্পনা যাহা, তাহা ত সত্য নহে। তাই তিনদিন পর তাহার বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা। কিন্তু হায়! কালক্রমে তাহাতে জড়পূজা, কুসংস্কার আসিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নষ্ট করিল। যিনি জ্ঞানময় নিরাকার, তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে হয়, বাহ্য চক্ষু কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে? এই যে জ্ঞানময়কে বাহ্য চক্ষুর গোচর করিবার জন্য প্রতিমা-রচনা, তাহা কখনই নিত্য পূজার উপাদান হইতে পারেনা। তাই তুমি, মা, বর্ত্তমান যুগে পবিত্রাত্মারূপে অবতীর্ণ হইলে এবং পবিত্রাত্মার বিধান নববিধান আনয়ন করিলে; এবং এই নববিধানের আলোকে মৃন্ময়ের পূজা পরিবর্ত্তন করিয়া, চিন্ময়ের পূজার পুনরুদ্ধার করিলে। তোমার নববিধান ত কিছু ভাঙ্গিতে আসে নাই। যাহা পূর্ব্বে অপূর্ণ ছিল, তাহার পূর্ণতা বিধান করিল। এই জন্য, মা, তুমি নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে, তোমারই প্রেরণায়, মৃন্ময়ী পূজা হইতে চিন্ময়ীর উদ্ভাবন কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা শিখাইলে। তাই তিনি পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম-সাধিত দুর্গোৎসব হইতে তিনি নব দুর্গোৎসব সাধন ও প্রবর্ত্তন করিলেন। তুমি নববিধানে যে সপ্তস্বরূপের আরাধনা করিতে আমাদিগকে শিখাইয়াছ, এই দুর্গোৎ-সবের মৃন্ময়ী প্রতিমা সেই সপ্তস্বরূপের প্রতিমা ভিন্ন আর কিছুই ত নয়। সত্যস্বরূপ শক্তিস্বরূপের প্রতিমা

আদ্যাশক্তি ভগবতী, জ্ঞানস্বরূপের প্রতিমা সরস্বতী, অনন্তস্বরূপের প্রতিমা অজগর, প্রেমস্বরূপের প্রতিমা লক্ষ্মী, অদ্বৈতস্বরূপের প্রতিমা মহাদেব, শুদ্ধস্বরূপের প্রতিমা কার্ত্তিক, আনন্দস্বরূপ বা সিদ্ধিস্বরূপের প্রতিমা গজানন গণেশ। এই সপ্তস্বরূপা ভগবতী হৃৎসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, পাপাসুর ও আমিত্ব অসুর নিধন করিয়া, সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিতে অবতীর্ণ। ইহাই এই মৃন্ময় দুর্গোৎসবের আধ্যাত্মিক সাধনা। শ্রীকেশবচন্দ্র তাই তোমারই প্রেরণায়, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের দুর্গোৎসব পরিবর্ত্তন করিয়া, অধ্যাত্ম দুর্গোৎসব, নিত্য দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করিলেন। মা, সত্যই এই দুর্গোৎসবে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে, ভক্তিভাবে কার না হৃদয় আর্দ্র হয়? হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে মহা আধ্যাত্মিক রত্ন নিহিত রহিয়াছে, ইহা আমরা যেন গ্রহণ করিতে বিমুখ না হই। শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত সমযোগে আমরা কেবল বৎসরান্তে একদিন নয়, কিন্তু দৈনন্দিন যেন এই দুর্গোৎসব সাধন করিতে পারি এবং আমাদের দেশবাসী, জগদ্বাসীর সহিত আমরা সকলে যেন বাহ্য জড়পূজা পরিহার করিয়া, অসার পৌত্তলিকতার মোহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া, প্রকৃত দুর্গোৎসবসাধনে নিরত হই এবং তদ্দ্বারা পাপ আমিত্ব অসুর নিধন করিয়া সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

শ্রীকেশবচন্দ্রের হিন্দুত্ব ও স্বজাতীয়তা

শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "প্যাসিফিক মহাসাগরেরও পরিমাণ করিতে পারা যায়, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রসারতা ও গভীরতার পরিমাণ হয় না।" বর্ত্তমান নববিধানকে তিনি জাতীয় বিধান বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিলেন। তথাপি কেন জানি না, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মের বণিক যাঁহারা, হিন্দুধর্ম্মকে তাঁহাদের কেবল নিজস্ব মনে করেন। তাঁহারা শ্রীকেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছেন, কেশবচন্দ্র অহিন্দু ছিলেন, কেশবচন্দ্রের ভাব সকলই বিজাতীয়।

আমরা নিঃসঙ্কোচিতচিত্তে বলিতে পারি, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং বিদ্বেষাত্মক ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীকেশবচন্দ্র অবশ্যই একদেশদর্শী নন, তাঁহার নিকট সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বভাব সমন্বিত এবং সমাদৃত; শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নিকট সত্যে সত্যে ভেদাভেদ নাই, প্রকৃত হিন্দুত্ব এবং প্রকৃত খ্রীষ্টত্ব একই। স্বজাতীয়তা এবং সার্ব্বভৌমিকতা শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনে এক। তাই, তাঁহাকে যাঁহারা বুঝিতে না পারেন, যাঁহাদের মন সংকীর্ণ এবং অনুদার, তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহার উদারভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন?

কথিত আছে, একস্থানে একটী প্রকাণ্ড ঢাল ছিল, তাহার একদিক স্বর্ণমণ্ডিত, আর একদিক রৌপ্যমণ্ডিত। যাহারা স্বর্ণমণ্ডিত দিক দেখিল, তাহারা তাহাকে সুবর্ণ ঢাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিল; যাহারা রৌপ্যমণ্ডিত দিক দেখিল, তাহারা রৌপ্যমণ্ডিত বলিল। এই রূপে উভয়ে এক এক দিক দেখিয়া, পরস্পরের সহিত কতই বিবাদ করিল। পরে যখন তাহারা উভয়ে দুই দিক দেখিল, তখন তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। এইরূপ শ্রীকেশবচন্দ্রের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব, এবং সর্ব্বজাতীয় ভাব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবেন, নিশ্চয় তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অবিচার করিবেন।

বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের ভিতর ভেজাল, মেশাল কিছু ছিল না; তিনি আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Every inch of this man is real, tremendously real."—এই ব্যক্তির প্রত্যেক ইঞ্চি ভয়ঙ্কর খাঁটি। তাই তাঁহার হিন্দুত্ব খাঁটী হিন্দুত্ব, তাঁহার স্বজাতীয়তা খাঁটি স্বজাতীয়তা। যাঁহারা তাঁহার পুস্তকাদি নিগূঢ়রূপে তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার জীবনের আচরণ মিথ্যা-সংস্কার-বিবর্জ্জিত হইয়া অনুধাবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিবেন, প্রকৃত আর্য্যত্ব ও হিন্দুত্বের উপরে তাঁহার সমগ্র জীবন ও সাধনা প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকেশবচন্দ্রের মাতৃদেবী নিষ্ঠাবতী, খাঁটি হিন্দুধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী ছিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের শৈশব জীবন মা সারদা দেবীর প্রভাবেই গঠিত। ছেলে বেলা হইতে তিনি বৈষ্ণব আচরণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি চিরদিন নিরামিষ-ভোজী; এমন কি, তিনি যখন বিলাত গিয়াছিলেন, তখনও তিনি আমিষ ভক্ষণ করেন নাই। মহারাজ্ঞী মা ভিক্টোরিয়ার রাজপ্রাসাদেও মহারাজকুমারী বিয়াট্রিস স্বহস্তে তাঁহাকে নিরামিষ পুডিং তৈয়ারী করিয়া আহার করাইয়াছিলেন; এমন কি, তাহাতে পেঁয়াজ,

রশুন বা ডিমও দেন নাই। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি নিরামিষ-ভোজী। এমন কি, যখন তাঁহার কঠিন পীড়ায় তাঁহাকে ব্রথ খাইতে দেওয়া হয়, তাহাও তিনি বিষ্ঠা বলিয়া উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়া দেন।

পরিচ্ছদে তিনি চিরদিন হিন্দু, বিলাতে গিয়াও তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন নাই। রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট কিম্বা রাজদরবারে, কিম্বা কোন প্রকাশ্য সভায়, যেখানে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ, সেখানে চোগা চাপকান পরিয়া যাইতেন বটে; অপর সকল সময়েই সামান্য থানের ধুতি ও মোটা চাদর তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। এক বার আমরা জানি, অক্স্‌ফোর্ড মিশনের সাহেবদিগের নিকট, চা পানের নিমন্ত্রণে চোগা চাপকান পরিয়া যেমন যাইবার গিয়াছিলেন; বাটিতে ফিরিয়া আসিয়াই আমাদিগকে লইয়া, নগ্নপদে, দেশীয় বেশে, গৈরিক চাদর গায়ে দিয়া, তাঁহাদেরই দ্বারে গিয়া হরিনাম করিয়া আসিলেন।

তাঁহার ভিতর বিজাতীয়ভাব বা অহিন্দুভাব কিছুই ছিল না। তাঁহার মাতৃভূমির সম্বন্ধে প্রার্থনা, তাঁহার গঙ্গাস্তব, তাঁহার হিমালয়ের প্রতি উচ্ছ্বাস, তাঁহার প্রার্থনাদি, তাঁহার দুর্গোৎসব-সাধন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশের অধ্যাত্ম পূজা এবং প্রার্থনাদি যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার মত হিন্দু এমন কে? হিন্দুজাতির যাহা কিছু ভাল, হিন্দু পরমহংস, হিন্দু পাহাড়ীবাবা, হিন্দু বৈষ্ণবগণ, হিন্দু বৈদিক ব্রাহ্মণ, কেহই তাঁহার পর ছিলেন না; সকলকেই তিনি সমান ভাবে আপন সহোদররূপে, আপন আত্মার অন্তরঙ্গ-রূপে গ্রহণ করিতেন ও ভালবাসিতেন। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ হিন্দু ও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিনন্দন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু আধ্যাত্মিক, তাহা গ্রহণ করিতে তিনি কখনই উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দু শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সমন্বয়ভাষ্য রচনা করিবার জন্য, উপধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কে বিশেষভাবে তিনি "উপাধ্যায়" পদে বরন করেন। হিন্দু যোগ ভক্তি নিজজীবনে সাধন করিয়া, সাধু অঘোরনাথকে এবং বিজয়কৃষ্ণকে উপদিষ্ট করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া, "মা আমাদের, আমরা মায়ের' বলিয়া যে নৃত্য করেন, তাহা তাঁহার পরম হিন্দুত্বের পরিচয় ভিন্ন আর কিছু নহে।

স্বজাতির কল্যাণ মঙ্গলের জন্যই তাঁহার যত কিছু প্রতিষ্ঠান। ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপরে যদিও মন্দির মস্‌জিদ গীর্জ্জার চূড়া একীভূত, কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরের 'মন্দির' নামকরণ তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচয় ভিন্ন আর কি? এ জাতিতে সুরাপান যাহাতে প্রবেশ না করে, তাহার জন্য তিনি বিলাত পর্য্যন্ত আন্দোলন করিয়াছেন। মহিলাদিগের শিক্ষা যাহাতে হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া হইতে পারে, তাহার জন্য হিন্দু নর্ম্যাল স্কুল নামে প্রথমে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য, আর্য্যনারীসমাজ নাম দিয়া নারীপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মহিলা এবং শিশুদিগকে হিন্দুভাবে বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিতেন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে, জলদান, ডাব ইত্যাদি ফলদান এবং পাখাদান, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি ব্রত দিতে অবহেলা করেন নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র নিজে সময়ে সময়ে ব্রত লইতেন, বহুদিন তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছেন। একবার বৈরাগ্যব্রত-সাধনের জন্য তিনি মস্তক মুণ্ডন করেন। কিন্তু আত্মগোপনের জন্য তিনি মুণ্ডিত মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া থাকিতেন। উপাসনা বা ধর্ম্মসাধনের জন্য গৈরিক গায়ে দিতেন, কিন্তু কখনও গৈরিক পরিধান করিতেন না। মন্দিরের সামাজিক উপাসনায় সাদা চাদরই ব্যবহার করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ-সেবকগণ জাতীয় উন্নতি-বিধানের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা করিতেছেন ও করিতে চাহিতেছেন, তাহার সকলই শ্রীকেশবচন্দ্রপ্রবর্ত্তিত। তবে তিনি বিদেশী বর্জ্জন বা ইংরাজ জাতির প্রতি ঘৃণা উদ্দীপক ভাবকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনের জন্য, সমগ্র মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করিবার জন্য এবং পরিণামে ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, বিধাতার বিধানে ইংরাজ জাতির হস্তে ভারতের রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছে। তাই ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগবশতঃই এবং ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশাতেই রাজভক্তি এবং ইংরাজ জাতির প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন।

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

হিন্দুধর্ম্মের এই মহাবাণী শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের সাধনা ছিল। তবে তাঁহার ন্যায় হিন্দু, তাঁহার ন্যায় স্বজাতীয় আর কে ?

ধর্ম্মতত্ত্ব

উপাসনায় স্বরূপের ক্রমসাধনা

শ্রীনববিধানাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত উপাসনার মধ্যে আরাধনা-সাধন এক অদ্ভুত নূতন সাধন। এই আরাধনায় যে স্বরূপের ক্রম-সাধনার বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এক এক স্বরূপে এক এক প্রাচীন বিধান ক্রমবিকাশ অনুসারে নিবদ্ধ। ১। সত্যস্বরূপে শিবের শক্তি সাধন বা প্রাচীন ইহুদি ধর্ম্মে বা বেদে যে 'কিছুই-নাই' হইতে শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি, এই সাধন নিহিত। ২। জ্ঞান-স্বরূপে সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান সাধনা। ৩। অনন্তস্বরূপে শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ। প্রেমস্বরূপে শ্রীঈশার প্রেম। ৫। অদ্বৈত-স্বরূপে মহম্মদের একেশ্বর বিশ্বাস। ৬। শুদ্ধস্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীঈশার শুদ্ধনীতি সাধিত। ৭। আনন্দস্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মত্ততা ও নববিধানের নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের আনন্দময়ীর দর্শন সমাহিত। পূর্ব্বকার সচ্চিদানন্দও নববিধানে সৎচিৎ অনন্ত শিবমদ্বৈত শুদ্ধানন্দরূপে অভিব্যক্ত ও পূজিত।

বেদীর কথা

বেদীর মৌলিক অর্থ—যেখান হইতে বেদোচ্চারণ হয়। তাই প্রাচীন বিধানে যেখানে বসিয়া গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দান করেন, তারই নাম বেদী। ব্রাহ্মসমাজে যেখান হইতে আচার্য্য উপদেশ দান করেন, তাহাই বেদী বলিয়া উক্ত হইত। কিন্তু নববিধানে বেদী অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র যখন নববিধান ঘোষণা করিলেন, তখন 'আচার্য্য' নাম পরিহার করিয়া 'সেবক' নাম গ্রহন করিলেন এবং 'উপদেশের' পরিবর্ত্তে 'নিবেদন' শব্দ প্রবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং নববিধানের বেদী তাহা, যেখান হইতে সেবক প্রভুদিগের নিকট আত্মনিবেদন করেন। এই জন্যই শুধু ভাবে নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ শ্রীকেশবচন্দ্র পূর্ব্বকার উচ্চ বেদীকে ভাঙ্গিয়া, সেবকের আসন সম্মুখস্থ উচ্চ প্রাচীর-মণ্ডিত গহ্বর মধ্যে স্থাপন করিলেন। সুতরাং নব-বিধানের বেদী প্রভুদিগের পদতলে বসিয়া সেবকের নিবেদনের গহ্বর মাত্র—ইহা উচ্চ আসন নয়।

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

আত্ম-জ্ঞান

তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আত্মজ্ঞানের সাধকদলের জীবনের লক্ষণ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ আমরা দুইই লক্ষ্য করিলাম। যত্ন করিয়া যে সমাধি পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়, উপনিষদের এই চিন্তার ধারা কালে বেদান্ত-দর্শনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের সাধকদিগের জীবনে এই সাধনধারা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহার ঘটনাবহুল উদাহরণ আমাদের কাছে লুপ্ত হইয়াছে; তবে বর্ত্তমান কালে পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবনে বেদান্তসাধনার চিত্র আমরা যথাযথভাবে পাই ও তাহা হইতে আত্মজ্ঞানের সাধকের অভিজ্ঞতা কতক জানিতে পারি। তোতাপুরী, যাঁহাকে রামকৃষ্ণ "ন্যাংটা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, রামকৃষ্ণকে বেদান্ত-সাধনায় দীক্ষা দিলে পর, অতি অল্প সময়ের ভিতর তিনি সমাধি পর্য্যন্ত আরম্ভ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় রামকৃষ্ণ যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমাধির অবস্থায় পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা তিনি নিজে এইভাবে দিয়াছেন :—

"দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্ত বাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও নির্ব্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু এইরূপে গুটাইবা মাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার নামরূপত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শ্রবণপূর্ব্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্য্যুপরি এইরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না,. মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও হোগা নেহি' অর্থাৎ 'কি হইবে না, এত বড় কথা!' বলিয়া কুটিরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া, ভগ্ন কাঁচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় মনে উদিত হইবা মাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া, উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প

রহিল না। একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধি-নিমগ্ন হইলাম।" (রামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, "সাধনভাব" খণ্ড, "বেদান্তসাধন" অধ্যায় হইতে গৃহীত)।

আত্মজ্ঞানের পথ যে কিরূপ কঠিন, তাহা রামকৃষ্ণ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা যেমন বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ কে যে ইহার প্রকৃত অধিকারী, সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া তবে এই পথের শিক্ষা তিনি নিজ জীবনে দিতেন। আমরা এই সূত্রে রামকৃষ্ণ কেমন করিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য বালক নরেনকে (যিনি বিবেকানন্দ নামে পরে বিখ্যাত হইয়াছিলেন) "সমাধি" বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহ মনে করিতে চাই। ভগিনী নিবেদিতা "The Master as I saw him" পুস্তকে তাঁহার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া জানাইতেছেন:—

"We cannot question that Sri Ramkrishna recognized such a soul, a brahmagyani from his birth, in the lad Noren, when he first saw him... 'Tell me, do you see a light when you are going to sleep?' asked the old man eagerly. 'Doesn't everyone?' answered the boy in wonder...... On another occasion while Sri Ramkrishna lay ill in the house at cassipur, Noren had seemed to one who was about him, to have been sleeping for hours, when suddenly towards midnight, he cried out, 'where is my body?' His companion, now known as the old monk Gopal Dada, ran no his aid, and did all he could, by heavy massage, to restore the consciousness that had been lost, below the head. When all was in vain and the boy continued in great trouble and alarm, Gopal Dada ran to the Master himself and told him of his disciple's condition......The Swami (বিবেকানন্দ) himself described the early stages of this experience, later to his Gurubhai, Saradananda, as an awareness of light, within the brain, which was so intense that he took it for granted that someone had placed a bright lamp close to him, behind his head." (p. 385-86

বলা বাহুল্য রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দুইজনেই যথাক্রমে উপনিষদে উক্ত সমাধি অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থায় সমাধি (যাহাকে যোগিগণ "যৌগিক সমাধি" বলিয়া পরে আখ্যাত করিয়াছিলেন) লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং ইহাকে আমরা পূর্ব্বে আত্মানুভূতির পথ বলিয়া জানিয়াছি ও ইহাকে স্বাভাবিক (natural) সমাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পথেও তাঁহাদের দুইজনেরই গুরুর প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে বোঝা যায় যে, তাঁহারা আত্মজ্ঞানের পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া স্বীয় সত্তার প্রভাবে আত্মানুভূতির পথ ধরিতে পারিয়াছিলেন, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আত্মজ্ঞান ও আত্মানুভূতির সমন্বয় করিয়াছিলেন। নিছক আত্মজ্ঞানের পথ অনুসরণ করিলে গৌড়পাদ উল্লিখিত জাগ্রত অবস্থায় সমাধি শিক্ষা করিতে হইত এবং তাহাকে আমরা অর্জ্জিত (acquired) সমাধি আখ্যা দিতে পারি। বেদান্তদর্শনে সুপ্ত অবস্থায় সমাধিকে "নির্ব্বিকল্প সমাধি" আখ্যা দেওয়া হয় ও জাগ্রত অবস্থায় সমাধিকে "সবিকল্প সমাধি" বলা হইয়া থাকে। সমাধি যেমন দুইপ্রকার, সুষুপ্তিও, আমাদের মনে হয়, সেইভাবে দুইপ্রকার। জাগ্রত অবস্থায় সুষুপ্তি অভাবসূচক, কারণ তখন সাধক "বহিঃপ্রজ্ঞ" নহেন (যাহা জাগ্রত অবস্থার লক্ষণ), আবার "অন্তঃপ্রজ্ঞ"ও নহেন (যাহা স্বপ্ন অবস্থার বৈশিষ্ট্য); বরং জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থা অতিক্রম করিয়া অজানা আকর্ষণে আধ্যাত্মিক রাজ্যে চলিতে থাকেন, অথচ ইহার জন্য তাঁহার অন্তরে কামনা থাকে না। সুপ্ত অবস্থায় সুষুপ্তি "যেন আনন্দময় অবস্থা"র মত (মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষায় "এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্")। কারণ ইহা সমাধির সমীপবর্ত্তী অবস্থা, অথচ এ অবস্থাতেও সাধক স্বপ্ন দেখেন না, কিংবা কোন কিছু কামনা করেন না। বেদান্ত-দর্শন অনুসারে যেমন সবিকল্প সমাধি নির্ব্বিকল্প সমাধির অন্তস্বরূপ, সেইরূপ আমাদের বিশ্বাস, সুপ্ত অবস্থার সুষুপ্তির আনন্দ না পাইলে জাগরণে সুষুপ্তি সার্থক হয় না; অথবা ইহা বলা যাইতে পারে যে, এক প্রকার সমাধি বা সুষুপ্তি সাধকজীবনে সূচিত হইলে, অপর প্রকার সমাধি বা সুষুপ্তি না হইয়া থাকে না। তবে কি সুপ্ত অবস্থায় আমরা যাহা কিছু আধ্যাত্মিক জীবন পাইয়া থাকি, জাগরণের অবস্থায় তাহা research অথবা পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিয়া থাকি? অথবা জাগরণে যে আধ্যাত্মিক অভাব অন্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহা ঘুমের আড়ালে কি পূরণ হইয়া থাকে? আমাদের উপনিষদ পাঠ করিয়া এই ধারণা অন্তরে জন্মায় যে, সুপ্ত অবস্থায় আত্মসত্তায় যে ধর্ম্মজীবনের বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহারই ফুল ও ফল জাগ্রত অবস্থায় জীবনে আত্মপ্রকাশ করে; অপর দিকে বেদান্তদর্শন অনুসারে জাগ্রত অবস্থায় যে ধর্ম্মজীবন মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহা সুপ্ত অবস্থায় স্নিগ্ধ শান্তিতে সাধককে আপ্লুত করে। তবে ধর্ম্ম-ইতিহাসে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ subconscious self অর্থাৎ সুপ্ত আত্মসত্তা; এবং conscious self অর্থাৎ জাগ্রত আত্মসত্তা ধর্ম্মজীবনের বিকাশের অভিব্যক্তি। তাই উপনিষদের আত্মার সাধনা বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত সাধনায় পরিণত হইল। এবং সাধুজীবনে subconscious (সুপ্ত) ও conscious (জাগ্রত) অবস্থার চরম অথবা সমাহিত পরিণতি superconscious (সমাধি) অবস্থায় হইয়া থাকে।

তবে এ কথা সত্য, যিনি বিবেকানন্দের মত "bright lamp behind his head" অনুভব করিবেন, আত্মার সাধনা তাঁহার পক্ষেই সহজসাধ্য হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই আমেরিকায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

"It is too abstruse, too elevated, to be the religion of the masses. Even in India, its birth-place, where it has been ruling supreme for the last three thousand years, it has not been able to permeate the masses. As we go on we shall find that it is difficult for even the most thoughtful man and woman in any country to understand Advaitism." (Swamiji's Works, Vol. II, Lecture on "The Atman")

অতএব ব্রহ্মকৃপা দ্বারা চিহ্নিত কয়েকটি সন্ন্যাসীর পক্ষে আত্মার সাধনা স্বাভাবিক হইতে পারে; কিন্তু ইহজগতের সর্ব্ব-মানবের জন্য, বিশেষ করিয়া গৃহস্থ সাধকদিগের জন্য যে ব্রহ্মানু-ভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথ, যাহা প্রথম দুইটি প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই চিরন্তন ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সামাজিক কল্যাণও ব্রহ্মসাধনার পথে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের মন এমনই উদ্‌ভ্রান্ত যে, যাহা দুঃসাধ্য, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে ভালবাসে। সংসারের মধ্যে যে সত্য-শিব সুন্দর ধরা দিতেছেন, তাঁহাকে মানুষ চাহে না; সংসারের বাহিরে জীবনের মরুভূমিতে যে ভগবৎ-উৎস গোপনে নিভৃতে মানুষের চিরকালের দাহজ্বালাকে প্রশমিত করিয়া জীবন মরণের পরপারে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহারই জন্য তাহার প্রাণ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। সেইজন্য 'আত্মা'র সাধনা, যাহা জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে কেবলমাত্র উপনিষদে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ ও বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-সাধন অবলম্বন করিয়া এ পথে যাইলে ইহা আরও সুগম হয়। তবে তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা যে কিরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহা ত পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কেশব চিরদিন সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আত্মার সাধনা ও ব্রহ্মের সাধনার মধ্যে যে বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে, তাহা তিনি গোপন করিতেন না। ক্ষত্রিয়ভাব ও ব্রাহ্মণভাবের সমন্বয় সাধক অন্তরে কি করিয়া সম্ভব? তবে যখন যে ভাবে সাধক থাকিবেন, তখন সেই ভাবের সাধনা সাধক গ্রহণ করিতে পারেন বটে; কিন্তু তাহাতে স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় ও সাধকের নিজ সত্তাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অথবা ব্রহ্মকৃপায় উপর চিরটা কাল নির্ভর করিয়া চলা সম্ভবপর হয় না।

ব্রহ্মসাধনা যে কত সহজ, সে সম্বন্ধে কেশব বলিতেছেন, "কেহ কেহ মনে করেন, অনেক প্রকার কঠোর সাধনা দ্বারা প্রাণায়াম, সমাধি অথবা অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস অবরোধ করিতে অভ্যাস না করিলে, যোগ ধ্যানের প্রথম অক্ষর ক খ ও শিক্ষা করা যায় না।......যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, জল খাওয়া স্বাভাবিক, ধ্যান করাও তেমনই স্বাভাবিক।...চক্ষু ঘর্ষণ করা, শরীরকে নিগ্রহ করা, অথবা বিবিধ চিন্তা কল্পনা দ্বারা মনকে নিপীড়ন করা ধ্যান নহে; মনকে স্থির করিতে না পারিলে ধ্যান হয় না।...... যে ধ্যানে কষ্ট আছে, তাহা সত্যের ধ্যান নহে, তাহা সত্যের ধ্যান নহে, তাহা সত্যের ধ্যান নহে, তাহা ব্রহ্মরাজ্যের ধ্যান নহে।... ঈশ্বর এই সহজ ধ্যান শিখাইয়া ব্রাহ্মসমাজকে কৃতার্থ করুন।" (আচার্য্যের উপদেশ, ৭ম খণ্ড, "ব্রহ্মধ্যান" শীর্ষক উপদেশ)

কেশবের এই উক্তি সন্নিবেশিত করিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, "সমাধি" অপেক্ষা "ব্রহ্মধ্যান"কে আমি উচ্চতর স্থান দিতেছি। কেশব যখন আমাকে "স্বাধীনতা" দিয়াছেন, তখন আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমি সরল ভাষায় একটুখানিও তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বলি। ছোট ছেলেরা কেহ বা মায়ের হাতে খাইতে ভালবাসে, কেহ বা নিজের পরিষ্কার হাতে খাইতে চায়, আবার কেহ বা অপরিষ্কার হাতে খাইলে পর মা বাপ পা'ন অথবা নিজের তৃপ্তি হয় না বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে ধূলা কাদা ধুইয়া, পরিষ্কার হইয়া, নিজ হাতে খাইতে ভালবাসে অথবা অবার আব্দার ধরে যে, মায়ের হাতে খাইবে। "ব্রহ্ম-ধ্যান" অবস্থায় সাধক ব্রহ্মময়ী জননীর হস্তে নিজ আধ্যাত্মিক ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটান। "সমাধি"র অবস্থায় স্বাধীনভাবে নিজ সত্তার সকল ক্ষুধার পরিতৃপ্তি তিনি সাধন করেন। "যোগ"এর কথা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, যখন বিষয়টি সহজভাবে আসিয়া পড়িল, তখন বলি, যোগের পথে সাধক প্রকৃতিগত সব কলুষ, সকল দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা পাইয়া (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায় "যেমন মৃত্তিকাদ্বারা মলিনীকৃত ধাতুখণ্ড উত্তমরূপে ধৌত হইলে পুনরায় উজ্জ্বল দেখায়" ২।১৪) পরে নিজ চেষ্টায় "সমাধি" পর্য্যন্ত পৌঁছান অথবা কেহ ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিয়া "ব্রহ্মধ্যান"এর পথ অনুসরণ করেন। এক্ষণে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্রহ্মধ্যান ও সমাধির চরম অবস্থা একই অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে ছেলের অথবা ছেলের সঙ্গে মায়ের দুই উপায়েই যথার্থ পরিচয় হয় এবং মায়ের ও ছেলের উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা হয় ও সন্তুষ্টি ঘটে। ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ এই প্রসঙ্গে জানাইতে পারি যে, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" (মাণ্ডূক্যোপনিষদের সপ্তম শ্লোক দ্রষ্টব্য) যাহা সমাধি অবস্থার সাধনার বিষয়, তাহাই ব্রাহ্ম-সমাজের আরাধনামন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের চরম বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মধ্যানের উপযুক্ত সহায় বলিয়া আচার্য্যগণের দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে। সমাধি ও ব্রহ্মধ্যান এই দুই প্রকার সাধনার সূচনায় অথবা অন্তে, যোগের পথ যে কলিকালে সাধকের কতখানি প্রয়োজন, তাহা গীতাপাঠে বুঝা যায়। তবে শিশুপ্রকৃতির সাধকের পক্ষে ব্রহ্ম-ধ্যান প্রথমে ও যোগ পরে আসিবে; পরিণত প্রকৃতির সাধকের জন্য যোগ প্রথমে ও ব্রহ্মধ্যান পরে সাধন করাই বিধেয়। উপ-

নিষদ অনুসারে কিন্তু ব্রহ্মধ্যান যোগের পূর্ব্বে সাধন-জীবনে স্থান পাওয়া চাই এবং এতদুদ্দেশ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মসাধনার পর্য্যায়গুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথম অধ্যায়ের দশের শ্লোকে "তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্" দ্রষ্টব্য। আমাদের ধারণা প্রথম অধ্যায় "ব্রহ্মধ্যান" সম্বন্ধে বিবৃত, দ্বিতীয় অধ্যায় "যোগ" সম্বন্ধে ও পরের অধ্যায়গুলিতে কি করিয়া "তত্ত্বভাবাদ্" অর্থাৎ তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা আলোচিত হইয়াছে, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, শেষের অধ্যায়গুলিতে দ্বৈত সাধনা ও অদ্বৈত সাধনার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, যাহার জন্য "শ্বেতাশ্বতর" নামটি সার্থক হইয়াছে।) (ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরল ভক্ত নন্দলাল

আজ আবার সেই ২৪শে জুলাই পুণ্যদিনে বিধানমণ্ডলীর শ্রীচরণে দাসের নিবেদন। ৩৩ বৎসর পূর্ণ হইল, নববিধানের শ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রচারক ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা অহৈতুক প্রেমের ব্রত উদ্যাপন করিয়া অদেহী হইয়াছেন। নব ভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবের অনুগামী ভক্তদলের মধ্যে নন্দলাল অন্যতম। ইনি যৌবনকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত একটা স্বর্গীয় প্রেরণার মধ্যে আপনাকে চালিয়া দিয়াছিলেন। পল্লিগ্রামের ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্যের সন্তান, পিতার ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াও মাতার কোমলহৃদয়ের কোমলতার অধিকারী হইয়াছিলেন। কলিকাতার আহিরীটোলার সজীদের পাল্লায় পড়িয়া ভীষণ যৌবনকালে যদিও সাময়িক ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা মাতার তীব্র ভর্ৎসনায় সেই যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আর কুসঙ্গ করিব না, ভাল পথেই চলিব," সেই হইতেই তিনি বীরের ন্যায় রাশি রাশি প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন। কোন প্রলোভন, কোন অপমান নির্যাতন তাঁর গন্তব্যপথে বাধা দিতে পারিল না। এই যে ভক্তের জীবনে পবিত্রাত্মার প্রভাব আরম্ভ হইল, এই হইতেই তিনি দৈনিক জীবনে পবিত্রাত্মা শ্রীহরির নব নব প্রেরণায় জীবন গড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাই তিনি গাহিলেন, "বড় আশার কথা শুনেছি, নাথ, তোমার মুখেতে; তুমি বলিয়াছ ভয় নাই রে, থাকতে তোর দয়াল পিতে।" এই একটা স্বর্গীয় প্রেরণার মধ্যে পড়িয়া নন্দলাল সারা জীবনটা হাবুডুবু খাইয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের মত অঙ্ক কষে ধর্ম্ম করা তাঁর ধাতে সহিত না। সমুদ্রের তরঙ্গে পড়িলে যেমন মানুষের কোন বুদ্ধি বিচার খাটে না, তাকে তরঙ্গেই হাবুডুবু খেতে হয়, তাঁর জীবন ঐরূপ হাবুডুবুর মধ্যেই কেটেছিল। পবিত্রাত্মারূপ ভূত তাঁকে অধিকার করায় তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন, তাই গান করলেন, "আমি কি আর আমাতে আছি, পাগল যাকে মা বলে পাগল হয়েচি।" পরকে আপন করিতে তাঁর মত কয়জন পারিয়াছেন, জানি না। আমরা তাঁকে একাধারে পিতা, মাতা ও বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম; তাই তাঁর সঙ্গে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে দিন কাটিয়াছে।

এক সময় ভক্তদলের মধ্যে সহজে কত উচ্চ উচ্চ সম্বন্ধের আলোচনা হইত। একদিনের কথা এখনও মনে উজ্জ্বল রকমে অঙ্কিত আছে। অমরাগড়ীতে সাধকদলের সম্মুখে প্রেরিত ভাই অমৃতলাল তাঁর প্রাণাধিক ফকিরদাসকে বলিলেন, "ওহে ফকির, আমার কি বংশধর হবে না?" অমনি নন্দলাল হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, 'কেন। আমি তো আপনার বংশধর আছি?' অমৃতলালও বলিলেন, "তুমি তো বংশধর আছো, এখানেও বংশধর চাই।" সেই হইতেই আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল যে, সত্যই আমরা ভক্তকুলের মান রাখিয়া ঐ পথে চলিব। সেই হইতে প্রেরিতদলের সহিত একটা স্বর্গীয় সম্বন্ধ আমরা রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া, ঐ সম্বন্ধ-সাধনায় জীবনের এই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিতেছি এবং নবভক্তিবিধানে যে চণ্ডাল, মূর্খ এবং ঘোর পাতকীরাও যে শ্রীহরির পদাশ্রয় লাভ করিতে পারে, তাহারই সাক্ষ্যদানের জন্য এখনও এই জীর্ণ দেহ ধারণ করিয়া আছি। ভক্ত নন্দলালের ধর্ম্মজীবনারম্ভ হইতে শেষ নিঃশ্বাসত্যাগের মধ্যে, আমরা কেবল তাঁর জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁকে জীবনের সখা, স্নেহময়ী মাতা, বিপদের বন্ধু, অসহায়ের সহায়রূপে পাইয়া, কিরূপে অহৈতুকী সেবা ও প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাইয়াছি। এই অহৈতুকী সেবাসাধনায় ভক্ত নন্দলাল চির অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁর অহৈতুকী সেবার জীবন্ত প্রমাণ—অমরাগড়ীর মণ্ডলীর সেবকগণ, ঐ মণ্ডলীর সুন্দর ব্রহ্মমন্দির ও জয়পুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুদৃশ্য অট্টালিকা, বালেশ্বরের সুপ্রশস্ত নববিধান ব্রহ্মমন্দির, যে বালেশ্বরের ব্রহ্মমন্দিরের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর বলিষ্ঠ সোণার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অতএব মণ্ডলীর সমীপে কাতর নিবেদন, যাহাতে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রেরিত প্রচারকদলের অক্ষয় কীর্ত্তিগুলি রক্ষিত হয়, সেই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া, ভক্তকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলেন, "যারা এত আশা করিয়া আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে, তাদের কি দিয়া যাইব? নরকের অভিসম্পাত, না, স্বর্গের আশীর্ব্বাদ? দীনবন্ধু, আর কিছু থাকিবে না, যা দিয়া যাইব, তাই থাকিবে। আমরা পৃথিবীতেও বাঁচিয়া থাকিব। এখানকার অমঙ্গলের জন্য দায়ী আমরা।" এই যে গুরুতর দায়িত্ব লইয়া ভক্তদল আসিয়াছিলেন, তাঁরা তাঁদের এখানকার কাজ শেষ করে অদেহী হইলেও, আমাদের মধ্যেই তাঁরা পবিত্রাত্মাযোগে তাঁদের স্বর্গীয় জীবন-প্রভাব দেখাইতেছেন। এখন আমরা যতই নিত্য নিত্য জীবনে পবিত্রাত্মার প্রভাব লাভ করিতে ব্যাকুল হইব, ততই জীবনে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। মা বিধানজননী আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা তাঁর কৃপায় আমিত্ব স্বামিত্ব শূন্য হইয়া, ভক্তপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

শ্রীকেশবচন্দ্র

(জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত)

জয় ব্রহ্মানন্দ বিশ্ব-প্রেমিক,
নবীন যুগের মহামানব,
জ্যোতির্ম্ময়ের সন্ধানদাতা,
নববিধানের প্রাণ-গরব।
কোরাণ পুরাণ বাইবেল বেদ
তোমার মাঝারে ভুলিল যে ভেদ,
ভবমন্দিরে সকল ধর্ম্ম
তুলিল যে শুভ শঙ্খরব!
জয় জয় জয় বীর সন্ন্যাসী,
মিলন-তীর্থ-উদ্বোধক,
আনন্দময়ী বিশ্বমাতার
নবীন যুগের নব সাধক!
তোমার অগ্নিমন্ত্রে ভুবন
নব নব রূপে লভিয়া জীবন,
মিলিছে মিলিবে যুগ যুগান্তে
বিধান-পতাকা-তলেতে সব।
শ্যাম ভারতের বুদ্ধ নিমাই,
মরু আরবের মহম্মদ,
হইল যে তব প্রাণের বাণীতে
সকল জাতির প্রেমাস্পদ।
সাম্যের গুরু বিশ্বের তুমি,
তীর্থ করিলে বাংলার ভূমি,
ধরারে ধন্য করিলে প্রচারি'
চিরবিকাশের মহোৎসব।

সমরেন্দ্র দত্ত রায়।

—০—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

(সিমলা শৈলে জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ; স্যার মন্মথনাথের সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা ; সিমলা, ২৯শে আগষ্ট।)

এখানে হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী আইন সচিব স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্তা কে রাধাবাঈ সুব্বারায়ন এম, এল, এ, ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জি এম, এল, এ, ডাঃ এস সি বসু এবং মিঃ নাইডু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

শ্রীযুক্তা কে রাধাবাঈ সুব্বারায়ন ব্রহ্মানন্দের নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ, তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মানন্দের উপদেশের ফলেই তিনি জীবনে উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, "আমি যে কেবল ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াছি, তাহা নয়—আমি সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া উপদেশলাভের সুযোগ লাভ করিয়াছি। ১৮৮১ সালে ৭ বৎসর বয়সে আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম এবং কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েই ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। আমি তিন বৎসর যাবৎ উক্ত বিদ্যালয়েই ছিলাম। ঐ সময় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে যাইতাম ও এলবার্টহলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম—সে সকল দিনের কথা এখনও আমার মনে আছে। এখনও আমার মনে হয় যে, কেশবচন্দ্র যেন আমার সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর এখনও যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।" অতঃপর তিনি কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেবের বন্ধুত্ব সম্পর্কে কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, "কেশবচন্দ্র দেশের নারীসমাজের বিভিন্ন স্তরে জাগরণ আনিয়াছিলেন। তিনি একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এক সময়ে তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন যে, পূর্ব্ব হইতে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, এত সুন্দর বক্তৃতা দেওয়া যায় না। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া এবং তাঁহাদের কৌতূহল দূর করার জন্য, একবার তাঁহাকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়। কি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হইবে, তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। কেশবচন্দ্র তথায় গিয়া বোর্ডটী বস্ত্রাচ্ছাদিত দেখিতে পান। উক্ত বোর্ডের উপর বক্তৃতার বিষয়টী লেখা ছিল। চেয়ারম্যান কেশবচন্দ্রকে সভাস্থ সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর বোর্ডের উপর হইতে আবরণ অপসারিত করা হইলে দেখা গেল যে, 'নাথিং' এই শব্দটী লেখা আছে। ইহাতে কেশবচন্দ্র ভড়কাইয়া যান নাই। তিনি উক্ত বিষয়টী সম্পর্কে এরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন যে, সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার মনে হয়, কেশবচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশভক্ত পুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮১৩ হইতে ১৮১৬ সালের মধ্যে * পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে সকল মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কেশবচন্দ্র ইংরাজদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য অনুরোধ করিয়া ছিলেন।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২।৯।৩৮)

* '১৮১৩ হইতে ১৮১৬ সালের মধ্যে'—ইহাতে সনের ভুল আছে ; কেননা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। (ধর্ম্মতত্ত্ব সং)

শ্রীহট্ট

কিছুদিন পূর্ব্বে আমার শ্রীহট্ট যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। ময়মনসিং হইয়া রেলপথে ভৈরব নদী পার হইয়া শ্রীহট্ট পৌঁছি। ইহা আসামের রাজধানী। সুরমা নদীর তীরে শ্যামল নিবিড় বৃক্ষরাজি-শোভিত, অনুন্নতপর্ব্বতমালা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র সহরটী ছবির মত সুন্দর। আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তা ছাড়া, এই সহরের সঙ্গে বহু দিনের আধ্যাত্মিক যোগ, তাই ইহাকে মনের মধ্যে চিরদিনই অতি উচ্চ স্থান দিয়া রাখিয়াছি। এইখানে প্রেরিত প্রচারক কেদারনাথ দের জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার রমণীকান্ত চন্দ বাস করিতেন। এই সেই বিধানভক্ত রমণীকান্তের কর্ম্মভূমি, স্বর্গগমনের পবিত্র স্থান, যাঁহার জীবন, চরিত্র ও কার্য্যের কথা বাল্যাবিধি শুনিয়া আসিতেছি এবং যাঁহার জন্যই এই শ্রীহট্ট সহরকে চিরদিন একটি তীর্থস্থানরূপে মনে করিয়াছি। তিনি এখানকার জেলের ডাক্তার ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের কথা, তাঁর বয়স তখন ২৪।২৫। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার জীবন মন নববিধানের নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সেই যৌবনকালে বিলাসবাসনা, কামনা প্রভৃতি ষড়রিপুর আক্রমণ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া, তিনি ধর্ম্মকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছিলেন এবং দেশের যুবকসম্প্রদায়ের নৈতিক জীবনকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন; সমস্তদিনের সরকারী কার্য্যসমাপনান্তে সন্ধ্যার সময় তাঁহার গৃহে যুবকদলের সভা হইত। সেখানে সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও সদালোচনা দ্বারা তিনি তথাকার যুবকগণের মনের গতি ধর্ম্মপথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ অল্প বয়সেই ধর্ম্মালোচনা ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিত না। ধর্ম্মসাধন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। জীবনটি তাঁহার অতি সুমিষ্ট ছিল, চরিত্র দৃঢ় ও সংগত ছিল, ব্যবহার উদার ও মাধুর্য্যময় ছিল, তাই বন্ধুদের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। তাঁহার আদর্শে নব শ্রীহট্ট গঠিত হইতেছিল, এমন সময় পরলোক হইতে আহ্বান আসিল, অল্পদিনের ভীষণ জ্বরে তিনি অল্পবয়স্কা পত্নী ও সকল বন্ধুবান্ধবগণকে কাঁদাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। রহিয়া গেল, তাঁহার চরিত্রের জ্যোতি, যাহাতে এখনও পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট বিমুগ্ধ। রোগের সময় ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যেও নাম গান করিলে তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিত এবং তিনি হাসিতেন। বন্ধুবান্ধবগণ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। এমন অপূর্ব্ব জীবন কি অধিকদিন পৃথিবীতে থাকিতে পারে? এখনও তাঁহার পরিচিত ২।৪জন ভদ্রলোক তাঁহার বিষয় অত্যন্ত ভক্তিসহকারে বলিলেন। আমরা তাঁহার বাড়ীখানি দেখিতে গেলাম। কত পুণ্যস্মৃতিতে পূর্ণ এই দেবভূমি। বর্ত্তমান জেলের ডাক্তার অতি যত্নের সহিত আমাদিগকে বাড়ী খানি দেখাইলেন।

ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, যৌবনেই পৃথিবীর কার্য্যশেষ করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ কলিকাতার সকল ব্রাহ্মকেই মর্ম্মাহত করিয়াছিল। ভাদ্রোৎসবের সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। তাই এই সময়ে তাঁহার জীবনের কথা কয়েকটি লিখিলাম, যাহাতে যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ধর্ম্মজীবন কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

শ্রীহট্ট সহরে আমাদের পরিচিত ৩টি পরিবার বাস করেন। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী স্বর্গগতা পুতচরিত্রা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবীর জামাতা। ইনি বহুবৎসর সপরিবারে এখানে অবস্থান করিয়া শিক্ষাদানকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এখানকার বিদ্যালয়-পরিদর্শক, ইঁহার স্ত্রী ৺প্রকাশচন্দ্র রায়ের পালিতা কন্যা, আমার পূর্ব্ব ছাত্রী শ্রীমতী শান্তিলতা। আমরা একদিন মহিমবাবুর বাড়ী থাকিয়া, ইঁহাদের বিশেষ আগ্রহে কয়েকদিন ইঁহাদের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করি এবং সতীশবাবুর ব্যবহারে, শান্তির সেবায় যথার্থ আরাম ও আনন্দ লাভ করি। সতীশবাবুর গৃহে প্রতি প্রভাতে নিয়মিত ভক্তির সহিত ব্রহ্মোপাসনা হইত এবং সতীশবাবু বাহিরের শত কর্ত্তব্যের মধ্যেও সময় করিয়া নিজে প্রতিদিন তাহাতে যোগ দিতেন।

এখানে একটি ব্রহ্মমন্দির আছে। আমরা থাকিতে রবিবারে সন্ধ্যায় সেখানে সামাজিক উপাসনা হইল। সকলের অনুরোধে দিদি উপাসনা করিলেন, শান্তি গান করিল, অনেক লোক হইয়াছিল। ওখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানকীবাবু এবং অন্য কয়েকজন ভদ্রলোক, যাঁহারা ভক্ত রমণীকান্তকে জানিতেন, তাঁহার বিষয় অতি ভক্তিভরে আলাপ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী এখানকার একজন পুরাতন ব্রাহ্ম। ইনি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতা এবং ইঁহার স্ত্রী সুপরিচিতা বক্তা ও লেখিকা শ্রীমতী হেমন্ত চৌধুরীর ভগিনী। ইঁহারা বহুদিন হইতে আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মহিমবাবু শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনা করেন। তাছাড়া চিকিৎসা দ্বারা গরিব দুঃখীর সেবা করিয়া সমাজের অনেক উপকার করিতেছেন।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার অপেক্ষা, এক এক সহরে এক একটি ব্রাহ্মপরিবার নিজ পুত্র কন্যাগণের ভিতরে আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম উজ্জ্বল করিতে পারেন। এক একটি সুন্দর ব্রাহ্মপরিবারকে কেন্দ্র করিয়া যদি চারিপাশের পরিবারগুলি গঠিত হয়, তবেই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সফল হইবে।

শ্রীহট্ট সহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। নিকটেই শিলং পাহাড়। এখন শ্রীহট্ট হইতে শিলং যাইবার জন্য সুন্দর রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ২।৩ ঘণ্টায় মোটর গাড়ীতে অনায়াসে শিলং

যাতায়াত করা যায়। ব্রাহ্মবন্ধুগণ, যাঁহারা প্রায়ই গ্রীষ্ম অথবা পূজাবকাশে শিলং গমন করেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্ট যাইয়া অনেক কাৰ্য্য করিতে পারেন। ইচ্ছা হয়, সেখানে নববিধানের যে বীজ একদিন রোপিত হইয়াছিল, তাহা আবার নূতন জীবন লাভ করিয়া পত্র-পুষ্প-শোভিত সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হউক।

শ্রীবনলতা দে।

—•—

উনসপ্ততিতম ভাদ্রোৎসব

কার্য্যবিবরণী

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট), সোমবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে (৭৮বি অপার সার্কুলার রোড) ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গাদি হয়। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন [I.M.S.] গিরিশচন্দ্রের লেখা বিশেষ পাঠ করেন ও তৎপর তাঁর বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়।

৩১শে শ্রাবণ, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয় নাই।

৩২শে শ্রাবণ, স্বর্গগত শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক, প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে ভাই অখিল চন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র সেন লিখিত পরমহংসের জীবনী ও উক্তি পাঠ করেন, তৎপর আলোচনা হয়।

১লা ভাদ্র, অপরাহ্ণ ৪॥টায় শান্তিকুটিরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী "জন্মাষ্টমী" উপলক্ষে "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

২রা ভাদ্র, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। আচার্য্যকর্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মণিকা দেবী উপাসনা করেন।

৩রা ভাদ্র, স্বর্গগত জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদল কর্ত্তৃক সঙ্গীত, প্রার্থনা বক্তৃতাদি হয়। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সুললিত ভাষায় ও সুন্দর ভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া ধন্যবাদ দান করেন।

৪ঠা ভাদ্র, রবিবার, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ও বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যার উপাসনার পূর্ব্বে লেঃ কঃ জ্যোতিলাল সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের জীবন বিষয়ে কিছু বলেন; তৎপর ৭টায় কান্তিচন্দ্র স্মৃতি-উৎসবে উপাসনা—ভিখারীর উৎসব—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

৫ই ভাদ্র, সন্ধ্যা ৭টায় শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীমান্ সমীরচন্দ্র দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্ত্তনান্তে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন।

৬ই ভাদ্র, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় ডাক্তার জগন্মোহন দাস উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন।

৭ই ভাদ্র, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ভ্রাতা হরিসুন্দর দাস উপাসনা করেন।

৮ই ভাদ্র, যুব-উৎসব। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে সুন্দর সুমিষ্ট সঙ্গীত করেন। লেঃ কঃ জ্যোতিলাল সেন প্রার্থনা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে "স্মৃতি-অর্ঘ্য" বিষয়ে সুন্দর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৯ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় "আধুনিক ভারতে শ্রীকেশবচন্দ্রের অবদান" বিষয়ে ভক্তি ও আবেগের সহিত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

১০ই ভাদ্র, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন ও সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অক্ষয়কুমার লধ, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তাঁহার জীবন বিষয়ে আলোচনা করেন।

১১ই ভাদ্র, (২৮শে আগষ্ট), রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় কীর্ত্তন, ৮॥টায় উপাসনা; ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে ৩টায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। তৎপর পাঠ ও আলোচনাদির পর প্রায় ৬॥টায় কীর্ত্তন হইয়া ৭টায় উপাসনা হয়। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

—•—

বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক উৎসব

গত ২৪শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ) ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীমতী স্নেহলতা দাস কন্যাসহ, শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়, বালেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সদলে ও শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশাল এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস উৎসবের যাত্রিরূপে তথায় গমন করেন।

২৪শে সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র করেন।

২৫শে প্রাতে পূর্ণচন্দ্রপুরের পাঠশালার বালকবালিকাদের উৎসবে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপদেশে "রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সকলের পাদধৌত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্য্যের" উচ্চাদর্শের কথা বলেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা উড়িয়াতে উপাসনা করেন। উপাসনান্তে প্রায় দুই শত বালক বালিকার প্রীতি-ভোজন হয়। একটি ভদ্রমহিলা স্বহস্তে পরমান্ন রন্ধন করিয়া প্রায় দুই মাইল পথ দূরে উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিয়া দরিদ্র হরিজন বালক বালিকাদের পরমান্ন ভোজন করাইয়া মাতৃস্নেহের পরিচয় দিয়াছিলেন। অনেকগুলি মহিলা ঐ উৎসবে যোগদান করেন। ঐদিন সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা ও ভাই নগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনোপাসনা হয়।

২৬শে প্রাতে ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। "চারিটি ভক্তজীবনতীর্থ" অর্থাৎ ঈশা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ ও শ্রীব্রহ্মানন্দের সাধন বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। সায়ংকালে সংকীর্ত্তনান্তে ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন।

২৭শে বেলা ১০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই নগেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। অদ্য সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে ভাই অখিলচন্দ্র প্রার্থনা করিলে, সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া হাই স্কুলের সম্মুখ দিয়া, "ও ভাই দেখরে অন্তরে বাহিরে চিদানন্দের লহরী" কীর্ত্তন করিতে করিতে বারিপদা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সম্মুখে যাইয়া বক্তৃতা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় নববিধানের অদ্ভুত শক্তি, স্বর্গ হতে নিমেষে স্বর্গরাজ্যের মধুর আহ্বান আসে এবং এই নববিধানে এক্ষণে অদ্ভুত লীলা হচ্ছে, বুদ্ধ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীব্রহ্মানন্দের ত্যাগ বৈরাগ্য ও হরিভক্তির এবং মাতৃভক্তির অপূর্ব্ব মিলনে ঘরে ঘরে স্বর্গরাজ্য স্থাপন হবে, ঐ বিষয়টি শ্রোতাগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপর কীর্ত্তনের দল রাজবাড়ীতে গেলে রাজ-বাড়ীর পুরমহিলাগণ ও মাননীয় রাউত রাও সাহেব আগ্রহপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। তৎপর মহারাণীর ধর্ম্মশালা ও হস্পিটালের সম্মুখ দিয়া ভাই নগেন্দ্রনাথের বাটিতে আসিয়া সমাপ্ত হয়। কীর্ত্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

২৮শে জুলাই প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। শেষে শান্তিবাচনসূচক প্রার্থনাদি হয়।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৭ই আগষ্ট, শান্তিকুটিরে, ৺লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের পুত্র শ্রীমান্ লাবণ্যচন্দ্র সিংহের জন্মদিন উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ২০শে ভাদ্র, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের শিশু পুত্র খোকনের জন্মদিনে, মঙ্গলবাড়ীস্থ ৮২।১নং আপার সার্কুলার রোড ভবনে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ব্রহ্মানন্দানুজ ভক্তিভাজন স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের পুত্র শ্রীমান্ আলোকের জন্মদিন উপলক্ষে প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও সন্ধ্যায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, তাঁহাদের কলুটোলাস্থ বাড়ীতে উপাসনা করেন।

বিলাত-যাত্রা—গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, হাইকোর্টের জজ জাষ্টিস মিঃ অমরনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সেন বি,এ, কেম্ব্রিজ ট্রাইপো পরীক্ষা ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ৪নং হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীট ভবনে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া, শুভযাত্রা ও শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়াছেন। মা সর্ব্বমঙ্গলা ইঁহার প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা বর্ষণ ও আশীর্ব্বাদ দান করুন।

প্রত্যাবর্ত্তন—গত ১৮ই আগষ্ট, ভাই প্রিয়নাথ হাঁসপাতাল হইতে পুনরাগমন করিলে, নবদেবালয়ে মাতৃচরণে কৃতজ্ঞতা-র্পণসূচক উপাসনা হয়। পরিবার ও মঙ্গলপাড়াস্থ কতিপয় আত্মজনকে লইয়া ভাই অখিলচন্দ্র উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র ও প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট), সাহেবগঞ্জ, ই, আই, রেলওয়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অকিঞ্চনপ্রাণ মল্লিকের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রতিভার পিতৃদেব স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর গৃহে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপাসনায় যোগদান ও তৎপরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করেন। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করা হইয়াছে:—

ভাগলপুর:—ব্রাহ্মসমাজে ৪৲, কুষ্ঠাশ্রম ২৲, জনৈক দুঃস্থ বিধবা ২৲; কলিকাতা:—নববিধান প্রচারভাণ্ডার ৪৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ২৲, অনাথাশ্রম ৪৲; সাহিবগঞ্জ হিতৈষিণী সভা ৪৲; দরিদ্র সেবা ও বিবিধ খুচরা দান ২০৲ টাকা। মোট ৪২৲ টাকা।

পরলোকগমন—আমরা গভীর শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ভক্তিভাজন ৺নবীনচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের প্রিয় ভাই ৺প্রমথলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন, ৮২ বৎসর বয়সে, তাঁহাদের পৈত্রিক কলুটোলাস্থিত বাসভবনে, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, পরম জননীর ক্রোড়ে শান্ত সমাহিতচিত্তে শান্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি এ পরিবারের প্রথম পুত্র ও সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার উন্নত চরিত্র, কার্য্যকুশলতা, নীতিপরায়ণতা ও শান্তস্বভাবের জন্য সর্ব্বজনের আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। কুচবিহারে তিনি অডিটার জেনারেলের কাজ করিয়া, কার্য্যদক্ষতার জন্য বিশেষ

কৃতিত্ব লাভ করেন। কয়েক বৎসর হইতে বার্দ্ধক্য ও শরীরের অসুস্থতাবশতঃ গৃহেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। ধৈর্য্যবলে ভীষণ রোগ পরীক্ষার অবস্থাতেও তাঁহার মনে চাঞ্চল্যের উদয় হইতে কেহ দেখে নাই। বরং রোগে শোকে যোগে নিমগ্নের ভাব দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিজন-কুমারকে ও তাঁহার কন্যা এবং পরিজনবর্গকে আমাদের অন্তরের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার দিব্য আত্মা, ভক্ত খুল্লতাত, পিতামাতা ও সহোদরগণের সঙ্গে নিত্যশান্তি লাভ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই আগষ্ট, ৺লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের ও পরদিন (১৯শে আগষ্ট) তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, শান্তিকুটীরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, কুচবিহারের মহারাজা রাজরাজেন্দ্র-নারায়ণের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, কুচবিহার কেশবাশ্রমস্থ সমাধিমণ্ডপে প্রাতে ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হয়। স্থানীয় ঠাকুর বাড়ীতেও বহুসংখ্যক দরিদ্রকে ভোজন করান হয়। উপাসনায় বহু গণ্যমান্য রাজকর্ম্মচারী যোগদান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় নবদেবালয়েও ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন।

গত ২০শে ভাদ্র, ভাই প্রিয়নাথের পিতৃদেব ৺গঙ্গানারায়ণ মল্লিকের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন।

স্বর্গগত সাধকরঞ্জন শ্রীকুঞ্জবিহারী দেবের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডে, ডাঃ কামাখ্যা-নাথ বানার্জির পত্নী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মণিকা দেবী উপাসনা করেন এবং উপাসনার পর কামাখ্যাবাবু পত্নীর উদ্দেশে আত্মনিবেদন করেন।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, কুচবিহারাধিপতি মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্র-নারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে, কুচবিহারে যথারীতি কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিমণ্ডপে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। অপরাহ্নে মহারাজার মর্ম্মরপ্রতিমূর্ত্তির পশ্চাতে স্মৃতি-সভা হয়। ঠাকুর বাড়ীতে দরিদ্র ভোজনাদি হয়। কুচবিহারের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, নবদেবালয়েও প্রাতে শ্রীদরবারস্থ ভাইদের সহিত সমযোগে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২রা আশ্বিন, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জি প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা, ৺কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহাদের ভবানীপুরস্থ ভবনে, প্রাতে ডাঃ সত্যানন্দ রায় পরিবারবর্গকে লইয়া উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় সন্তানসন্ততিগণ সহযোগে কমলকুটীরস্থ সমাধিমণ্ডপে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

চট্টগ্রামের সংবাদ—এই বৎসর চট্টগ্রামস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ সম্মিলিত কার্য্যপ্রণালী অনুযায়ী ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

৩রা ভাদ্র, শনিবার, সন্ধ্যায় রহমতগঞ্জ ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন উৎসবের উদ্বোধন করেন। ৪ঠা ভাদ্র, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ৬॥টায় রহমতগঞ্জ ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত উপাসনা করেন। ৮॥টায় কলেজ রোড মন্দিরে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাশ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে তথায় প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় রহমতগঞ্জ মন্দিরে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস এবং কলেজ রোড মন্দিরে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত উপাসনা করেন। ৫ই ভাদ্র, সোমবার সন্ধ্যায় রহমতগঞ্জ মন্দিরে শ্রীযুক্তা অনন্তময়ী দাস উপাসনা করেন। ৬ই ভাদ্র, প্রাতে কলেজ রোড মন্দিরে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাশ এবং সন্ধ্যায় রহমতগঞ্জ মন্দিরে অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত উপাসনা করেন। দুই সমাজের বন্ধুরা উৎসাহের সহিত উভয় মন্দিরে উপাসনাদিতে যোগদান করিয়া তৃপ্ত হন। শ্রীযুক্তা অনন্তময়ী দাস, শ্রীযুক্তা ফুল্লরাণী দাস, শ্রীমতী অঞ্জলি দাস, শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় দাশ গুপ্ত সঙ্গীত করেন।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র"

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ | 18th. October, 1938 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা

মা, তিন দিনের পূজা তিনদিনে ফুরাইল। হাতে গড়া মৃন্ময় দেব দেবীর রং কয়দিন বা থাকে। এত আড়ম্বরে, এত বাহ্য নানা উপচারে যাঁর পূজা হইল, তিন দিন পরে কেন তাঁর বিসর্জ্জন হইল? না, মৃন্ময় যাহা, কল্পনার পূজা যাহা, তাহা তিন দিনের অধিক থাকিবার নয়। তাই মৃন্ময়ী কল্পনার দেবীকে তিন দিন পরে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল, ইহাই ত ঠিক। হিন্দু শাস্ত্রকারও স্বীকার করেন, বাহ্যপূজা, প্রতিমা-পূজা অধমাধম। বাস্তবিক যে দেবতা মানবকল্পনায় গঠিত ও পূজিত, তাহা কি কখন সত্য পূজা হইতে পারে? তাই, যদিও এত পূজার আড়ম্বর ও এত উৎসবের ধূমধাম হইল, তাহাতে সাময়িক আমোদ আহ্লাদও যথেষ্ট হইল বটে, কিন্তু এ দুর্গোৎসবে কৈ আমাদের জাতি, পরিবারের বা ব্যক্তিগত জীবনের দুর্গতি দূর হইল? কৈ অসুর-নাশিনীর পূজায় অসুরের বা রিপুদলের দলন হইল? কৈ আদ্যাশক্তির সহযোগিনী লক্ষ্মী সরস্বতী—জ্ঞান প্রেম পুণ্য সিদ্ধি—আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিত হইল? পূজার উৎসবে আড়ম্বর যত হইল, জীবনে তেমন তাহার ফল লাভ কৈ হইল এবং কেনই বা তাহা হইবে? বাহিরের মৃন্ময়পূজায় যেমন, মনঃকল্পিত বা বিচারবুদ্ধিসিদ্ধ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মপূজাতেও তেমনই আড়ম্বরে উৎসব করিলে, জীবনে কৈ যথার্থ প্রসাদ লাভ হয়? তাই তুমি, মা, স্বয়ং চিন্ময়ী মাতৃরূপ ধারণ করিয়া নববিধানে নবদুর্গারূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও। তুমি আমাদের হস্তরচিত মৃন্ময়ী দেবীও নও, আমাদের মনঃকল্পিত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মও নও; কিন্তু জীবন্ত জাগ্রত বিধাতা হইয়া, তুমি নববিধান লইয়া, আমাদের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবে বলিয়া আসিয়াছ। এবং আমাদের আমিত্ব-অসুর বিনাশ করিবার জন্যই তুমি আসিয়াছ। আমাদের হাতে তোমার পূজা নয়। তুমি নিজে মা হইয়া, তোমার স্নেহ এবং পুণ্যবলে, সসন্তানে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে এবং পূজার মন্দিরে আবির্ভূত। আমাদের পূজা তিন দিনের পূজা নয়। তুমি নিত্য আমাদিগের দ্বারা নব নব দুর্গোৎসব সাধন করাইবার জন্য, তোমার নববিধানের আশ্রয়ে আনিয়াছ। তাই আমরা স্বজাতির সহিত এবং নবভক্তের সহিত সমযোগে দুর্গোৎসব করিয়া ধন্য হইলাম। তেমনি সমবিশ্বাসী ব্রাহ্মসমাজের ভাই ভগিনী-দিগকে লইয়াও এই শারদীয় উৎসব করিলাম। এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার জীবন্ত চিন্ময় দুর্গোৎসব-সাধনার ফলে, তোমার আদ্যাশক্তির প্রভাবে, আমাদের

পাপাসক্তি ও আমিত্ব অসুর নিধন হয়। তোমার কৃপায়, তোমার দিব্যজ্ঞানস্বরূপ সরস্বতী এবং প্রেমস্বরূপ লক্ষ্মী-শ্রী আমাদের গৃহে পরিবারে নিত্য বিরাজিত হউন। ষড়রিপুজয়ী ষড়ানন কার্ত্তিকের বল এবং তব সন্তান গণেশের সিদ্ধি আমাদের জীবনে যেন নিত্য লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা আমরা সকল দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। আমাদের স্বজাতির এবং সমগ্র মানবজাতির দুঃখ দুর্গতিও যেন দূর হয়। বাহিরের মৃন্ময়ী প্রতিমা যেমন তিনদিনের পর বিসর্জ্জিত হইল, তেমনই চিরদিনের জন্য সকল প্রকার কল্পনার পূজাও যেন বিসর্জ্জন হয়, এবং সর্ব্বত্র নব-বিধানের নিত্য দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তিত হয়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

শ্রীকেশবচন্দ্রের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়তা এবং সর্ব্বজাতীয়তা

শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "সর্ব্বম নব আমাতে, আমি সব মানবেতে।" "যে সদল অখণ্ড, কেউ কি তাকে বিদল করতে পারে? তাই কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি; মার ছাপ মারা দলিল আছে আমার কাছে।"

শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন হিন্দুর হিন্দুত্ব ও স্বজাতীয়তায় আত্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তেমনই সর্ব্বমানবের সহিত প্রেমযোগে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; এবং যেমন সর্ব্বধর্ম্ম জীবনে সাধন করিলেন, তেমনি সর্ব্ব-জাতীয় মানবের সহিত একাত্মতায় মূর্ত্তিমান বিশ্বমানব হইলেন।

তাই তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বলিলেন, "শ্রীঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়, সক্রেটিস আমার মস্তক, হিন্দু ঋষিগণ আমার আত্মা এবং পরোপকারী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" "আমাকে হিন্দু বলেন, আমি হিন্দু, খ্রীষ্টান বলেন, আমি খ্রীষ্টভক্ত, মুসলিম বলেন, আমি যথার্থ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বৌদ্ধ বলেন, আমি নির্ব্বাণসাধনে সিদ্ধ, বৈষ্ণব বলেন, আমি পরম বৈষ্ণব। এইরূপে সকলেই আমাকে নিজের লোক বলিয়া মনে করেন, আমি সবার কাছে সকল রকম।"

এ সব কথা তাঁর কেবল মুখের কথা বা ভাবের কথা নয়। তিনি যেমন এক জায়গায় বলিয়াছেন, "আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না", প্রকৃতই ইহা তাঁহার জীবনের উপলব্ধ সত্য কথা।

তিনি যখন বিলাতে গিয়া 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে এক মহাজনাকীর্ণ সভায় আত্মনিবেদন করেন, তখন আত্মপরিচয়ে বলেন, আমি হিন্দু, হিন্দু জাতির প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডের নিকট এই আত্ম-নিবেদন করিতেছি। তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন নাই। জাতীয় ভাবে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেন।

যখন শেষ জীবনে 'ইউরোপের প্রতি এসিয়ার সুসমাচার' (Assia's message to Europe) বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তখন তিনি বলেন, "যখন ছেলে মানুষ ছিলাম, তখন কলিকাতার সেবা করিয়াছি। যখন একটু বড় হ'লাম, তখন ভারতের সেবা করিলাম। ক্রমে এখন এসিয়ার প্রতিনিধিরূপে জগতের নিকট বিধানবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছি। তিনি আরো অন্যত্র বলিয়াছেন, এখন জগতের সুসমাচার জগৎকে দিতে হইবে। তারতে এক রকম সমন্বয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি আরো বলিয়াছেন, "পুকুর থেকে মাছকে ফেল নদীতে এবং ক্রমে তাহাকে মহাসাগরে ভাসাইয়া দাও"। ইহার অর্থ, শ্রীকেশবচন্দ্র কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডী বা ভাবে নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার উপাস্য, অনন্ত উন্নতি এবং নব নব প্রগতি ও অভিব্যক্তি তাঁহার জীবনের লক্ষণ; ইহাই তাঁহার নববিধানের সাধনা।

তিনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতীচ্যের কর্ম্ম-শীলতা জীবনে একাধারে সমন্বয় সমাধান করিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "এসিয়ার হৃদয় ইউরোপের মনে প্রবেশ করিবে এবং ইউরোপের মন এসিয়ার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইবে এবং ক্রমে এক এসিয়ো ইউরোপ এবং ইউরোপিয়ো এসিয়া নির্ম্মিত হইবে; তখন আর ইউর‍্যাল নদী ও ইউর‍্যাল পর্ব্বতের ব্যবধান থাকিবে না।"

বাস্তবিক এক অখণ্ড বিশ্ব গঠন করাই কেশবচন্দ্রের জীবনের মহা বার্ত্তা। তিনি যেমন আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের জন্য উপাসনা, প্রার্থনা, ব্রতাদি সাধন করিলেন, তেমনই পাশ্চাত্য ভাবের কতই কর্ম্মশীলতার পরিচয় দিলেন।

ধর্ম্মসাধনের জন্যও তিনি যেমন হিন্দুর হোম-সাধন প্রবর্ত্তন করিলেন, তেমনই খ্রীষ্টধর্ম্মের জলসংস্কার গ্রহণ করিলেন এবং মুসলমান ও শিখধর্ম্মের ঝণ্ডা উড়াইলেন। তিনি কর্ম্মশীলতা-সাধনের জন্য সুলভ সমাচার ও বালক-দের জন্য বালকবন্ধু প্রচার করিলেন। বালক বালিকা-দিগের উভয়ের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। নীতি-বিদ্যালয় এবং মাদকনিবারণী সভা গঠন করিলেন। দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং আপনার সোণার চেন চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিলেন। স্থায়ী দাতব্য বিভাগ খুলিলেন। অসবর্ণ বিবাহ, বাল্য-বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি কত সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিলেন। যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষা জন্য যুবসংঘ গঠন করিলেন। নারীজাতির উন্নতির জন্য আর্য্যনারীসমাজ এবং নববিধানধর্ম্মপ্রচারের জন্য শ্রীদরবার স্থাপন করিলেন। ধর্ম্মপরিবার-সংস্থাপনের জন্য প্রথম ভারতা-শ্রম, পরে মঙ্গলবাড়ী রচনা করিলেন। সাধনের জন্য সাধন-কানন, তপোবন ও কুটির নির্ম্মাণ করিলেন। যুবাদের শিক্ষার জন্য নিকেতন স্থাপন করিতে অবহেলা করেন নাই।

ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ায় যেমন হিন্দু, ইসলাম এবং খৃষ্টানের মিলনের নিদর্শন এবং নিশানের উপর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নিদর্শন গড়িলেন, তেমনই পারিবারিক স্মানা নাম-করণ অনুষ্ঠানেও তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব নিহিত দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

কেশবচন্দ্র যেমন হিন্দু আর্য্যনারীদিগের নামের অনু-করণে আপন প্রথম তিন কন্যার নামকরণ করিয়া সুনীতি, সাবিত্রী ও সুচারু নাম দিলেন, তেমনই শেষ দুই কন্যার মধ্যে সেণ্ট অগাষ্টিনের মাতৃদেবীর নামে এক কন্যার নাম মণিকা রাখিলেন ও বৌদ্ধ সুজাতার নামানুকরণে কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুজাতা দিলেন।

এখানে ইহা বলা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তিনি যেমন দেশে দেশে মিলনের জন্য ও জাতিভেদের উচ্ছেদের জন্য এবং রাজ্যে সুনীতি-সঞ্চারের জন্য কুচ-বিহারের রাজার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন, তেমনিই সেই রাজ্যের প্রজার প্রধানতম প্রতিনিধিকেও মধ্যমা কন্যা দান করিলেন। আবার আশ্চর্য্য এই, বিধাতার অভিপ্রায়ে শ্রীকেশবের অনুগমনে সতী জগন্মোহিনী দেবীও, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পুনর্ম্মিলন-সম্পাদন উদ্দেশ্যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক প্রতিনিধি সন্তানের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দান করিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের আলো বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

তাই শ্রীকেশবচন্দ্র মহাসমন্বয়কে ঈশ্বরালোকে যুগধর্ম্মবিধান নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নব-বিধান তাঁহার নিকট কেবল দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ মত নহে। ইহা তাঁহার জীবনে সাধিত মহাসমন্বয়বার্ত্তা। তাই যাঁহারা ইহাকে কেবল পাঁচ ফুলের তোড়া মনে করেন, ইহা তাহা নয়। ইহা সকল রকম ফুলের এক নব উদ্যান। বিভিন্ন মহাসাগর যেমন এক অখণ্ড সাগর, তেমনই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় জীবন্ত বিধাতার জীবন্ত নববিধান। ইহা নিত্য নব নব উন্নতির বিধান, এই জন্য ইহা নববিধান। ইহা সর্ব্বমানবের পরিত্রাণের এক অখণ্ড বিধান।

তাই শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমি কাপড়ের রিপু করিতে বা তালি দিতে আসি নাই, একখানা আস্ত নূতন কাপড়ের আগাগোড়া বুনিতে এসেছি"। শ্রীকেশবচন্দ্র এই নূতন বসন পরিধান করিয়া আদর্শ বিশ্বমানব, মূর্ত্তিমাননববিধান।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুরু কিসে?

শ্রীকেশবচন্দ্র এক জায়গায় বলিলেন, "গুরুগিরি অসার। গুরু হইয়া কাহারও ভার নিতে পারি নাই যে।" আরও এক জায়গায় বলিলেন, "আবার গুরু হইতে চলিলাম, সে আগেকার গুরু নয়, নববিধানের গুরু—এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে, এই বিশ্বাস।" এই দুই কথার সামঞ্জস্য কোথায়? ইহার নিগূঢ় অর্থই বা কি? শ্রীকেশবচন্দ্র চিরদিন স্বীকার করিয়াছেন, একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরই মানবের গুরু। এই জন্য তিনি ঈশা, গৌরাঙ্গকেও পূর্ণ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আবার শূকরাদি পশুকেও শিক্ষা-গুরু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীকেশবচন্দ্র কখনই আগেকার গুরুর ন্যায় গুরু হইতে চান নাই এবং সে গুরুগিরিকে অসার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, গুরুগিরি পাপ বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। কেননা, একমাত্র ঈশ্বর যাঁর গুরু, তিনি কেমন করিয়া ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া গুরু হইতে চাহিবেন? কিন্তু তিনি এই যে নববিধানের গুরু হইতে চাহিলেন, ইহার অর্থ এই, সম্পূর্ণরূপে গুরুগিরি অসার,

এই বিশ্বাস শিক্ষা দিবার গুরু হইলেন তিনি। মানুষ কখনই গুরু হইতে পারে না। মানুষ চিরশিষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহারই শিক্ষাগুরু তিনি। তিনি কখনই কাহাকেও কোন উপদেশ দিয়া, এই করো, কি এই করিও না, এইরূপ শব্দ কখনও ব্যবহার করিতেন না। সকলকার সহিত আপনাকে সমান সমযোগী বোধে, কখন কোন কথা বলিতে হইলে বলিতেন, "এইরূপ আমাদের করা উচিত", "আমরাও যেন অন্যের মত না হই" এই রূপ ভাষা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। নববিধান-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে 'উপদেশ' শব্দ ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু পরে তাহার পরিবর্ত্তে 'সেবকের নিবেদন' ইহাই প্রয়োগ করিলেন। চিরশিষ্যপ্রকৃতি তাঁর ছিল, তাই শূকরাদি পশুকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাদের কাছে শিক্ষা করিতেন। কাহাকেও শিক্ষা দিব, ইহা মনে করাও অহঙ্কার মনে করিতেন। জীবন্ত ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে জীবনের ভিতর দিয়া অভ্রান্ত সত্য শিক্ষা দেন, ইহাই শিক্ষা দিতে তাঁর সর্ব্বথা প্রয়াস। তাই গুরুগিরি যে অসার ও মানুষ চিরশিষ্য এবং সকলে মিলে নববিধানে আমরা একজন, ইহারই শিক্ষাগুরু বর্ত্তমান যুগের শ্রীকেশব।

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

আত্ম-জ্ঞান

তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপনিষদের পথ ধরিয়া সমাধি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া, আমরা আত্মজ্ঞানের পথ সম্পূর্ণভাবে জানিলাম। এক্ষণে এই পথের যাত্রীদিগের কিরূপ আত্মজ্ঞান হইল, তাহা বিবেচ্য। পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে :—"সুষুপ্তির অবস্থায় যখন আমাদের আত্মশক্তি অপ্রকাশে নিলীন থাকে, তখন আমরা নির্গুণ হই। জাগরিত অবস্থায় যখন আমাদের আত্মশক্তি প্রকাশে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন আমরা সগুণ হই। স্বপ্ন অবস্থায় আমরা প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে, সগুণ ও নির্গুণের মধ্যে দোলায়মান হই।" অতএব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আত্মসত্তার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আত্মজ্ঞানিগণ পাইয়া থাকেন। মোট কথা, সগুণ আত্মাকে আমরা জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থায় নানা ভাবে জানিয়া থাকি। এইভাবে সক্রেটিস যেমন বলিয়াছিলেন, "Know thyself" অর্থাৎ আত্মসত্তাকে জানো, তাহা সম্ভব। সুষুপ্তির অবস্থায় নির্গুণ আত্মার স্তরে সাধকের আত্মবোধ পৌঁছায়, তখন অভাবসূচক অবস্থায় জানিবার কিছু থাকে না এবং নির্গুণ আত্মাকে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই সমাধি হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মা নির্গুণ হইলেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব পূর্ণ আত্মজ্ঞান, যাহার জন্য সাধক প্রথম হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা হইল কি? তবে আত্ম-চেষ্টার দ্বারা যে ব্রহ্মসাক্ষাতের পথ নির্দ্ধারিত হইল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং চেষ্টার ফলেও যদি ব্রহ্মকে লাভ করা না যায়, অথবা তাঁর অনুগ্রহকণা-প্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে সুস্থ সবল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী মানবের উপায় থাকে কি? সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে এক জটিল রহস্য বলে মনে হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানী পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান পান না, কেবল ধর্ম্মজীবনে অধিষ্ঠিত থাকিবার মত আত্মজ্ঞান পাইয়া ব্রহ্মে বিশ্বাসী হইয়া তৃপ্ত হন। অপরদিকে আত্মজ্ঞানী পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান-অর্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার পরম সান্ত্বনার ধন ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উভয় সম্বন্ধেই সাধক যে কতটুকু মাত্র জানিতে পারেন, সে বিষয়ে কেশব বলিতেছেন, "অনেক দিন পর মনুষ্যের নিজের আত্মজ্ঞান সম্পর্কে যে এই অহঙ্কার, তাহাও চূর্ণ হয়। তখন মনুষ্য বলে, আমি যে কেবল ঈশ্বরকে চিনি না, তাহা নহে; কিন্তু আমাকেও আমি চিনি না।" (আচার্য্যের উপদেশ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১০৯—১০)। তবে কি উপনিষদেও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যাইবে না? অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণান্ লিখিয়াছেন :—

"The Upanishads do not contain any philosophic synthesis as such of the type of the system of Aristotle or of Kant or of Sankara, They have the consistency of intuition rather than of logic." (The Philosophy of the Upanishads—page 17.)

বিশেষ করিয়া আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণান্ সেই পুস্তকেই বলিয়াছেন :—"Contradictory doctrines of the nature of self are held by Buddha and Sankara, Kapila and Patanjal who all trace their views to the Upanishads" (page 38.)

শুধু যে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার বাণী আমরা উপনিষদে পাই, তাহা নহে। ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ের সম্পর্কের বিষয় যতপ্রকার অভিজ্ঞতা সম্ভব, তাহাও উপনিষদে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদভাব, ভেদাভেদভাব ও অভেদভাব, যাহা উত্তর কালে ভারতবর্ষের দার্শনিকগণ দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদে পরিণত করিয়া বাদানুবাদের বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই উপনিষদ হইতে গৃহীত; এবং আমাদের মনে হয়, ইহা সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ত হইতেই পারে, তা'ছাড়া একই সাধকের জীবনেও এই তিনটি ভাব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যথার্থভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। ব্রহ্ম যাহাকে যে ভাবে ধরা দেন বা যেভাবে আত্মজ্ঞান বিতরণ করেন, তাহাই প্রত্যেক সাধকের বরণীয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কাহারও

অভিজ্ঞতায় কিছু যায় আসে না, যেমন নিজের পেট না ভরিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা জমিয়া উঠিল, উপনিষদের ঋষিগণ সেইরূপ প্রকৃতিকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জানিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রকৃতির মধ্যে যে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানী জানিয়াছিলেন। আত্মজ্ঞানী এক্ষণে সমাধি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলিত হইলে, প্রকৃতির অন্তরালে (transcendantal ভাবে) যে ব্রহ্ম আছেন, তাহা না দেখিয়া, বরং সর্ব্বভূতে এক আত্মাই যে (immanent ভাবে) ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই জানাইলেন। সর্ব্বভূতে একই আত্মা এবং স্বীয় আত্মায় সর্ব্বভূতকে উপলব্ধি করিয়া ঋষিগণ জানাইয়া থাকেন :—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"
(ঈশোপনিষৎ)

কিন্তু যাঁহারা অভেদভাবে ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ধ্যানে কালাতিপাত করিতে চান, প্রকৃতি তাঁহাদের কাছে মিথ্যা বা মায়ার মত প্রতীয়মান হয়। এই প্রকৃতি যতদিন তাঁহাদের আত্মজ্ঞানের পথে উৎসাহ দিয়াছিল, ততদিন তাহার মায়া তাঁহাদের মন্দ লাগে নাই। এক্ষণে আর প্রকৃতির সঙ্গ তাঁহাদের প্রয়োজন নাই বলিয়া, উহা পরিত্যাজ্য হইল। প্রকৃতি চিরদিন মমতাময়ী, কাজেই তাহার সহ্যের সীমা নাই।

আমাদের ইচ্ছা করিতেছে, প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া ব্রহ্মপূজার নূতন পথ "যোগ" আবিষ্কার করি। কিন্তু আত্মজ্ঞানিগণ যখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলেন, তাঁহাদের অবস্থা আর একটু তলাইয়া বুঝিতে চাই। আত্মচেষ্টার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন হইলে, অহংকার ত হইবারই কথা! কিন্তু উপনিষদ হইতে যিনি এই পথ পরিষ্কারভাবে জানিয়া ইহার আচার্য্য হইয়াছেন, সেই শঙ্করাচার্য্যের রচনায় আমরা অহংকার খুঁজিয়া পাই না। বরং তিনি "আত্ম-বোধ" পুস্তকে লিখিতেছেন :—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ॥"

অর্থাৎ—"নির্ম্মলী ফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনই জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" তবেই ত বোঝা গেল, ব্রহ্মের সহিত সাধকের অভেদভাব তাঁহার অন্তরে উপলব্ধি হইলেই, সাধকের জ্ঞান ও অজ্ঞান এক সঙ্গে ভাসিয়া যায় অর্থাৎ কিছুই থাকে না, কিছুই থাকিবার প্রয়োজনও থাকে না; সাধক স্থির ধীর, মৌনী, বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমানের অতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান।

শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তির মধ্যে আমরা এক মহান্ সত্যের আভাস পাই। নির্গুণ ব্রহ্ম সাধককে চান বলিয়া ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব। আবার নির্গুণ আত্মা ব্রহ্মকে চান বলিয়া আত্মজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়। এই দুইটি সাধনমার্গকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে একজন যদি ক্রিয়াশীল [dynamic] হ'ন, তাহা হইলে অপরজন অক্রিয়মান [static] হইয়া, তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য নিরন্তর অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু যাত্রা-পথ ফুরাইয়া গেলে পর, উভয়েই মিলিত হইয়া, ক্রিয়া এবং অক্রিয়ার অতীত হইয়া, অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন। তখন অজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে সাধককে আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইতে হইবে। জ্ঞানও থাকা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহা হইলে সসীম জ্ঞানের সহিত অসীম ব্রহ্ম এক সঙ্গে থাকিতে পারেন না। কাজেই নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ আত্মা একাকার [atonement] হইলে, ব্রহ্ম, আত্মা বা প্রকৃতির সম্বন্ধে সকল অভিজ্ঞতার অন্ত হইয়া যায় ও সকল সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মানুভূতির দ্বারাও যে সাধক এই অবস্থায় পৌঁছাইতে পারেন, তাহার সাক্ষ্য বাইবেলের একটি শব্দ "atonement" চিরদিন দিবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, "যে স্থলে, মনে হয়, যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে একজন অপরজনকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জানে। কিন্তু যখন ইহার [ব্রহ্মবিদের] নিকট সমুদায় আত্মা হইয়া যায়—তখন সে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবে, এবং কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে মনন করিবে, এবং কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা এই সমুদায়কে জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? অয়ি! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে? (৩।৪।১৪)

এই অবস্থায় যে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হ'ন, তিনি ক্রিয়াশীল বা অক্রিয়মান কিছুই নহেন, অথচ আধ্যাত্মিক রাজ্যে যতকিছু দ্বৈত-ভাব আছে, যেমন সগুণ নির্গুণ, সরূপ ও অরূপ, সসীম ও অসীম, এ সমস্ত দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল তিনি। তিনি আছেন বলিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, এই সকল দুই প্রকারের অবস্থা বা বিশ্লেষণ বা অনুভূতি থাকিতে পারিয়াছে। শ্রুতির ভাষায় ইনি "পরব্রহ্ম"। গীতার ভাষায় ইনি "পুরুষোত্তম"। বাইবেলের ভাষায় "ইনি Holy Ghost"। নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের সহিত গীতার উক্ত অক্ষর ব্রহ্ম, ক্ষর ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম এবং বাইবেলে উল্লিখিত Father, Son ও Holy Ghost সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা চলে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া Trinity। ব্রহ্মকে যখন "সৎ" বলিয়া জানি, তখন ব্রহ্ম, আমি ও প্রকৃতি ভিন্ন। ব্রহ্মকে যখন "চিৎ" বলিয়া জানি, তখন ব্রহ্ম ও আমি আছি। ব্রহ্মকে যখন "আনন্দ" বলিয়া জানি, তখন কেবল মাত্র ব্রহ্মই আছেন।

আর যখন "সচ্চিদানন্দ" একযোগে (Organised whole হইয়া) থাকেন, তখন তিনি সাধকের জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত। তখন শ্রুতির ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে জানাইতে ইচ্ছা করে :—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬৮)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

কেশবচন্দ্রের শিষ্যপ্রকৃতি

"He that humbleth himself, shall be exalted."
(Luke)

"যে যত বিনীত হয়, সে তত উচ্চ স্থান পায়।"

যে গাছ যত বড় হয়, তার শিকড় তত বেশী মাটীর নীচে যায় ও তত বিস্তৃত হয় ; যে প্রাসাদ যত বড় ও যত উঁচু করা হয়, তার ভিত তত গভীর ও প্রশস্ত করতে হয় ; তেমনি, যে জীবন যত উন্নত ও মহৎ হয়, সে জীবনের মূলে তত গভীর বিনয় ও দীনতা থাকে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজগতে একজন অসাধারণ, অভূতপূর্ব্ব, অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্য, শিক্ষক, প্রচারক ও নেতা বলে গণ্য। তাঁর ধর্ম্মপ্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ভারতকে কম্পিত ও আন্দোলিত করেছিল, জগতে নব আলোক বিকীর্ণ করেছিল। সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সম্ভ্রমে মুখ তুলে তাঁর উন্নত সৌম্য-মূর্ত্তির পানে চেয়েছিলেন। তাঁর উদার গভীর বাণীতে বিশ্ববেদ ঝঙ্কৃত হয়েছিল। সে বাণী জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেরও পক্ষে বিস্ময়জনক হয়ে আছে ; তার প্রকৃত মর্ম্মবোধ ও অনুসরণ সুদূর ভবিষ্যতের বিষয়।

সেই সমুন্নত বিশাল জীবনের ভিত্তিস্থলে "চিরশিষ্যপ্রকৃতি" বর্ত্তমান।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যে কোন বিষয়ে যে যত নিজের অজ্ঞতা, অপূর্ণতা ও অক্ষমতা অনুভব করে, সে সেই পরিমাণে নিজের অভাব দূর করবার জন্যে ব্যাকুল হয়, এবং জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয় ও শিষ্যত্ব স্বীকার করে। যে প্রথমে ভাল শিষ্য, সেই হয় পরে বিজ্ঞ, সুদক্ষ শিক্ষক, কেশবচন্দ্রের জীবনে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

(১) জীবনবেদের শেষ অংশে তিনি বলেছেন—"আমি জন্ম-শিষ্য"। গুরুবাদের প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মদের নেতা কেশবচন্দ্র কার শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন? ধর্ম্মজীবনের উষা-কালে, ১৪—১৫ বছর বয়সে, অন্তরে শুনলেন অদৃশ্য অপরিচিত পরম গুরুর বাণী,—"প্রার্থনা কর"। কে বলছেন, কেন প্রার্থনা করবেন, সে সব প্রশ্ন মনে এলো না, ধরে বসলেন সেই উপদেশ ; প্রার্থনা করতে লাগলেন।

প্রার্থনা করতে করতে দেখতে পেলেন, তাঁর মধ্যেই "আর একজন" কথা বলছেন, পথ দেখাচ্ছেন, বল দিচ্ছেন। পরম গুরু যত স্পষ্টতর হতে লাগলেন, শিষ্যও আদেশপালনে তত তৎপর হওয়ার জন্য ব্যাকুল হলেন। (২) অন্তর-নিবাসী গুরুবাক্য বিবেকের প্রেরণায় নিজের মধ্যে কেবল পাপ অপূর্ণতা দুর্ব্বলতা আসক্তি দেখে দেখে, একদিকে বৈরাগ্য অবলম্বন, খেলাধূলা আমোদ আহ্লাদ বর্জ্জন, পান আহারে সংযম শুদ্ধাচার অবলম্বন ; (৩) অন্যদিকে "তোর কিছু হয় নাই" এই কথা গুরুর কাছে শুনে, জ্ঞানলাভের জন্য কত উপায় অবলম্বন—জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলীর অধ্যয়নে ও গভীর চিন্তায় দীর্ঘকাল যাপন এবং তৎকালীন কত বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহায়তায় ও বন্ধুগণের সঙ্গে কল্যাণ-কর বিষয় সকলের অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্যে "সোসাইটি" ও "ফ্রেটারনিটি" স্থাপন করলেন। ছোটদের জন্য "সান্ধ্যস্কুল" পরিচালন ও তাদের শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজে শিক্ষালাভ করবার প্রয়াস।

(৪) গুরুজনদের নির্দ্দেশে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করে ছিলেন ; তারপর পরম গুরুর ইঙ্গিতে জীবনে "দেবাসুরের যুদ্ধ" আরম্ভ হল, ঘর শ্মশান হ'ল। "আত্মপীড়নে ও ভার্য্যাপীড়নে" নতুন করে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হল। ছিলেন অনুগত শিষ্য, হলেন আজ্ঞাবহ ছেলে। সেই প্রাচীন ভারতের গুরু শিষ্যের আদর্শ আবার নবযুগে নব আকারে রূপান্তরিত হল,—শিষ্য কেবল শিক্ষার্থী নয়, গুরুর আজ্ঞাবহ সেবক ; "পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—প্রশ্ন করবেন—কি করতে হবে এবং সকল বিষয়ে গুরুর আদেশ পালন করবেন—তবে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হবে ; সেজন্য শিষ্যকে ব্রতধারী, ব্রহ্মচারী, সংযমী ও ত্যাগী হতে হবে। কেশবের জীবনে তাই হয়েছিল ; শিষ্যব্রত সজীব ও মূর্ত্তিমান হয়েছিল।

"এই পৃথিবী ব্রহ্মবিদ্যালয়" "কত গুরুর নিকট হইতে সত্য শিখিতেছি" কেশবচন্দ্রের পরিণত বয়সের কথা। পরম গুরু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে কত শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। ক্রমশঃ তাঁদের সঙ্গেও কেশবচন্দ্রের পরিচয় হতে লাগল, তাঁরাও শিক্ষা দিতে লাগলেন।

(৫) ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামে, সংশয়ে অন্ধকারে, ধর্ম্মবন্ধুগণের এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তার বড়ই প্রয়োজন, এই বোধ হতে কেশব-চন্দ্র সভা সমিতি স্থাপন করেন, সে সকল হতে উপকৃতও হন। কিন্তু বিয়ের পর, ক্রমশঃ তাঁর মন ধর্ম্মসমাজের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল ; একটি স্থায়ী সমাজের আশ্রয় না পেলে, ধর্ম্মজীবনের রক্ষা ও বিকাশ সাধন কঠিন। কিন্তু কোন্ সমাজে যাবেন? ঈশ্বর পরম পিতা এবং সকল মানুষ তাঁর সন্তান, এই উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ কোথায়? সেই সময় তাঁর হাতে পড়েছিল,

শ্রদ্ধের রাজনারায়ণ বসু-লিখিত "ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা।" সেই গ্রন্থে "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" শীর্ষক অধ্যায় পাঠ করে, কেশবচন্দ্র নতুন আলোক পেলেন,—জানতে পারলেন, এমন সমাজ আছে, যেখানে তাঁর ধর্ম্মাদর্শ গৃহীত হয়েছে। তখনও অন্তরে অনুভব করেছিলেন, এই তো আমার শিক্ষার স্থান, ধর্ম্মজীবনের আশ্রয়। সেই শিষ্যের ভাব দ্বারা চালিত হয়ে, অন্তরের আলোকের অনুবর্ত্তী হয়েই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন, নীরবে গোপনে।

(৬) ব্যক্তিগত জীবনে, চরিত্রে ও আচরণে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে, স্থায়ী ধর্ম্মসমাজের ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ ও সহায়তা একান্ত আবশ্যক, এই বোধ হতে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন; সেই ভাবই প্রবল হয়ে "সঙ্গতে" পরিণত হয়। ২০।২২ বছরের কয়জন যুবক, ধর্ম্মসাধনে, সত্যনির্ণয়ে, সত্যপালনে, চরিত্রগঠনে এবং জীবনকে নব আদর্শে পুনর্গঠনে পরস্পরের সহায় হতে কৃতসংকল্প? কেশবচন্দ্রের অন্তরে এই সকল ভাব আগুনের মত প্রজ্বলিত হয়েছিল, সেই অগ্নিশিখা তাঁর বন্ধুগণকেও উত্তপ্ত করেছিল। সকলেই শিষ্য, আবার সকলেই সহায় ও শিক্ষক। এই "সঙ্গত" জ্বলন্ত জীবনের অগ্নিকুণ্ড। সেখান হতে নব জীবনের আগুন ব্রাহ্মসমাজে এবং সমস্ত দেশে বিস্তৃত হয়েছিল। "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" কেশব ও তাঁর বন্ধুগণের শিষ্যব্রতপালনের নিদর্শন। সে শিষ্যমণ্ডলীর প্রধান শিষ্য কেশবচন্দ্র।

(৭) তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবের আত্মীয়তা। সে কি স্বর্গীয় ব্যাপার! প্রৌঢ়, জ্ঞানী, ধ্যানী, স্থিতপ্রজ্ঞ সমাজপতি দেবেন্দ্রনাথ তরুণ যুবক কেশবচন্দ্রের মধ্যে কি দেখলেন যে, বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আধ্যাত্মিক পুত্র—শিক্ষা ও সহায়তালাভের জন্যে ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত। একদিকে মহর্ষি কেশবকে ধর্ম্মপুত্র বলে বুকে ধরলেন, অন্যদিকে কেশব দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মপিতারূপে ধারণ করলেন। সে সম্বন্ধ চিরস্থায়ী। শ্রীকেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের পত্নী ও পুত্রকন্যাগণকেও ধর্ম্মমাতা ও ধর্ম্ম ভাইবোন রূপে স্বীকার করেছিলেন; এবং চিরশিষ্যরূপে বার বার মহর্ষির আধ্যাত্মিক সঙ্গ, সহায়তা ও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কত বিষয়ে ছাড়াছাড়ি ও পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্য্যন্ত কেশব ছিলেন মহর্ষির "হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ" এবং মহর্ষির কাছে কেশব নিজেকে রেখেছিলেন "সন্তান ও দাস" করে। মহর্ষির শিষ্য-প্রীতি এবং ব্রহ্মানন্দের গুরুভক্তি দুই অতুলনীয়। 'ব্রহ্মানন্দ' নাম দানের জন্য কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে কত কৃতজ্ঞতা দান করেছেন এবং চিরদিন তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেছেন। এই গুরুশিষ্যের মিলন ধর্ম্মজগতে কি অমৃত ফল উৎপন্ন করেছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। কেশবকে দেবেন্দ্রনাথের শেষ কথা—"কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হইয়াছিল।" এই কথা লিখবার সময় আনন্দে প্লাবিত হয়ে কেশবচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এবং তিনি সেই মানসমূর্ত্তিকেই 'প্রেমালিঙ্গন' দিয়েছিলেন। শিষ্যের নিকট হতে গুরুর কাছে হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ 'প্রণাম' প্রেরণ, এবং গুরুর দূর হতে 'প্রেমালিঙ্গন'—ব্রহ্মানন্দের শিষ্যত্বকে স্বর্গের শোভায় মণ্ডিত করেছে।

(৮) পরম গুরুর অনুরাগী শিষ্য কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবনের প্রথম হতেই প্রার্থনা-যোগে গুরুর উপদেশ ও আদেশ শুনতে আরম্ভ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা সেই পরম গুরুর সঙ্গে কিছুক্ষণ যাপন ও তাঁর আশীর্ব্বাদলাভের আর একটি পথ খুলে দিয়েছিলেন। সে উপাসনায় যোগদানের জন্য কেশবচন্দ্রের কি অনুরাগ! যখন তিনি সমাজের আচার্য্য, যুবক বন্ধুগণের নেতা, সেই সময় ঝড় বৃষ্টিতে কলিকাতা তোলপাড়, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়েছে, রাস্তা নদীতে পরিণত হয়েছে, কেহ বাড়ীর বাহির হতে পারে না; কিন্তু কেশব সেই অবস্থায় গেলেন, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করতে। সেদিন সমাজে উপাসনার সঙ্গী পেয়েছিলেন, একমাত্র ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে। কেশব ও বিজয়ের সেইদিনকার সমাজে গমন ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। তার মধ্যে দুজনেরই শিষ্যপ্রকৃতির এবং ব্রহ্মোপাসনার নিষ্ঠার পরিচয় অতি উজ্জ্বল।

(৯) আদি সমাজ পরিত্যাগ করে, স্বতন্ত্র সমাজ—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠার পর যখন তাঁর সঙ্গী ও সহায় মহাত্যাগী ধর্ম্মবন্ধুগণের মনে সংশয়ের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল,—সকল বিষয়ে উন্নতি, কৃতকার্য্যতা অগ্রগতি, তার মধ্যে সংশয়ের আবির্ভাব; যাঁকে নিয়ে সব, তাঁর সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত। তখন কেশবচন্দ্র কি করেছিলেন? অনুরাগী শিষ্যের মত ছুটে গিয়েছিলেন মহর্ষির কাছে, বসেছিলেন তাঁর পদতলে "ব্রহ্মদর্শন" বিষয়ে উপদেশ নেবার জন্যে, এবং মাথা পেতে সে উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছিলেন, আঁধারে আলো পেয়েছিলেন।

(১০) সেই সংশয় অন্ধকারে যেমন মানুষ-গুরুর কাছে গিয়েছিলেন, তেমনি বা ততোধিক ব্যাকুল হয়ে কেশবচন্দ্র গিয়েছিলেন পরমগুরুর কাছে—আরম্ভ করেছিলেন নিজগৃহে নিত্য উপাসনা, বন্ধুগণকে সঙ্গে নিয়ে। ভগবানের প্রিয় শিষ্যই তেমন ব্যাকুল হয়ে, তেমন অনুরাগভরে, নিত্য নিয়মিত ভাবে তাঁর কাছে গিয়ে বসে, শিক্ষালাভের জন্যে। নিত্য উপাসনায় অনুরাগ, শিষ্যপ্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। সেই নিত্য উপাসনা হতে কেশব ও তাঁর বন্ধুগণ নব নব আলোক ও প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তাতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারই ফল ব্রাহ্মসমাজের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ও বিস্তার।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনের পর, সকল বিভাগে ব্রাহ্মসমাজের বিস্ময়কর উন্নতি, বিস্তৃতি ও গভীরতার মূলে কেশবচন্দ্রের শিষ্যপ্রকৃতির ক্রিয়া বর্ত্তমান।

(১১) পরমাত্মা পরম গুরুর পরেই কেশবচন্দ্র দেখেছিলেন, মানুষ গুরুর কাছেও অনেক শিখবার আছে, সাধু ভক্তগণের সঙ্গ ও সহায়তার বড়ই প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে

এসে সেই শিষ্যভাব আরও প্রবলতর হয়েছিল। ক্রমশঃ খৃষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গুরুর স্থান অধিকার করলেন। সমসাময়িক মহাসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে গুরু বলে স্বীকার করলেন। ক্রমশঃ গুরুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শিষ্য-প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, দেশ বিদেশের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রকার, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রভৃতি সকলকেই গুরু বলে স্বীকার করতে লাগলেন। সে কেবল মতে স্বীকার নয়। গভীর ধর্ম্ম-সাধনে ধর্ম্মজীবনে তাঁদের স্থায়িভাবে স্থানদান করলেন। "সাধু-সমাগম" তাঁর শিষ্য-প্রকৃতির গুরু-বরণের অমৃতময় ফল, ধর্ম্ম-জগতে অপূর্ব্ব ব্যাপার।

(১২) সাধু ভক্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের পরেই কেশব শিক্ষার্থি-রূপে গেলেন শাস্ত্রের কাছে। কেবল উপনিষদে বা বাইবেলে তাঁর খেদ মিটল না। জগতের যত ধর্ম্মবিধানের যত প্রাচীন শাস্ত্র, সে সকলের মধ্যে কি কি রত্ন আছে, তার অনুসন্ধান করে, সে গুলিকে খুঁজে এনে সংগ্রহ করে, প্রথম উদ্যমে হয়েছিল "শ্লোকসংগ্রহ"; পরে সেই আকাঙ্ক্ষার আবেগে সকল শাস্ত্র পূর্ণতররূপে অধ্যয়ন ও গ্রহণের জন্তে বন্ধুগণকে নিযুক্ত করে-ছিলেন, প্রধান প্রধান শাস্ত্রগুলির বিশেষ অধ্যাপকরূপে। যে কাজ একা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সে কাজে অন্তরঙ্গ বন্ধুগণকে এমন ভাবে অনুপ্রাণিত করে নিযুক্ত করেছেন যে, তাঁরা যেন তাঁরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একই সত্যের পিপাসা যেন সকলের মধ্যে প্রজ্বলিত; সে উত্তাপে গলে, সকলে মিলেমিশে যেন একপ্রাণ হয়েছিলেন। একজনের শিষ্যপ্রকৃতি আর দশজনকেও শিষ্য করে তুলেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

একটি অমরাত্মার অমরধামে প্রয়াণ

আমার সহধর্ম্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী বরদাসুন্দরী দেবী, বিগত ৬ই আগষ্ট, শনিবার বেলা ১২॥টার সময়, ৭৫ বৎসর বয়সে, দেহ মুক্ত হইয়া অদৃশ্য অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন। ইদানীং রোগের প্রাবল্যে ও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানকার সিভিল সার্জ্জন ও এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদ্বয় ও অন্যান্য সকল প্রকারের চিকিৎসকগণই অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন। সরকারী এসিষ্টাণ্ট সার্জন মৃত্যুর ৪দিন পূর্ব্বে দেখিয়া বলিয়া গেলেন যে, ছেলেমেয়েদিগকে সংবাদ পাঠান। দেখা গেল, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারেই, চতুর্থ দিনে স্বাভাবিক নিদ্রাভিভূতের ন্যায়, নীরবে মুখের কোন বৈলক্ষণ্য না দেখাইয়া চলিয়া গেলেন এখানে কয়েকদিন অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল, শ্মশানও দূরে কখন যান, একটু ভয় হইতেছিল। কিন্তু বিপদভঞ্জন হরি অপার করুণায় এমন সুদিনে ও সুসময়ে তাঁহার প্রিয় কন্যাকে নিজক্রোড়ে টানিয়া লইলেন যে, তাতে কোন কষ্ট হয় নাই।

এখন তিনি শান্তিদাতার শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিতে থাকুন। প্রেমে, পুণ্যে ও আনন্দে দিন দিন তাঁহার অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করিতে থাকুক। পরলোক এখন আর দূরে নহে, অতি নিকটে। দশজন বিশ্বাসী ব্যক্তির ন্যায় বলিতে পারি যে, পরলোক আমার দেহের ভিতরে, আমার গৃহের ভিতরে, পরলোক আমার প্রাণের ভিতরে অবস্থিত, আমি এখন পর-লোকেই বাস করিতেছি। বিধাতার স্কুলে এতকাল যাহা যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি, সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাহা অন্যকে বলিয়া আসিয়াছি, আমার চলনোন্মুখ সময়ে তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইল, এই পরীক্ষা শেষ হইলেই আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমি চলিয়া যাইব।

পত্নীর দেহত্যাগের পরেই আমি কলেজের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপা-লের সমীপে উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ৮জন কলেজের ছাত্রকে পাঠাইয়া দিলেন; এদিকে এখানকার ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অন্যান্য ৭।৮জন সহ চলিয়া আসিলেন। যথানিয়মে দেহটি ধৌতকরতঃ, নূতন লাল পাড়ের শাড়ী পরাইয়া, কপালে সিন্দুর, পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা এবং সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি ছড়াইয়া দিয়া, শেষ প্রার্থনানন্তর শবদেহ নূতন শয্যায় স্থাপন করিয়া, শ্মশানে উপস্থিত হওয়া গেল। শ্মশানে সজ্জিত চিতায় সসম্মানে দেহ রক্ষিত হইলে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ প্রার্থনা-নন্তর শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে অগ্নি প্রদান করিল ও পরে অনে-কেই অগ্নি সংযোগ করিলেন। সব শেষ হইয়া গেলে, আমি শেষ প্রার্থনা করতঃ, কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া, বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা-বিসর্জ্জনান্তে গৃহে ফিরিবার ন্যায়ই, গৃহে প্রবর্ত্তন করিলাম।

বিগত ১৬ই আগষ্ট, তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানু-সারে সম্পন্ন হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র নবসংহিতার প্রার্থনাটি পাঠ করিয়াছিল। অনুষ্ঠানের পরে প্রায় ১৫০ নানা-শ্রেণীর ব্যক্তি আহারাদি করতঃ আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া-ছেন। এ উপলক্ষে কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ৮৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, কিশোরগঞ্জ নবপ্রতিষ্ঠিত প্রসূতি আগারে ১০৲ এবং এখানে ভিখারীদিগকে ৩মন চাউল ও কিছু পয়সা এবং অন্ধ ও দুঃখীদিগের জন্য ৫খানি নূতন বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছে।

আমার পত্নীর লেখাপড়া শিখিবার কোন সুযোগই ঘটে নাই। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে সুদূরবর্ত্তী অশিক্ষিত পল্লীগ্রামে তখন মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয় নাই। অতি গরিব পরিবারে, ময়মনসিংহ সহর হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি পল্লীতে, ১২৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ প্রতিবেশী মণ্ডলের আবেষ্টনে প্রতিপালিত হইয়াই যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নানা প্রকারের অভাব ও দুঃখ কষ্টের মধ্যেই থাকিতে হইত। অল্পে সন্তুষ্ট থাকাই আদর্শ ছিল। বিলাসিতা বলিয়া কোন ভাব ইঁহাতে ছিল না। সামান্য অন্ন বস্ত্রেই সন্তুষ্টি, সামান্য শয্যায় শয়ন, বাল্যকাল হইতেই ইঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ অন্যদিকে নানা কষ্টসাধ্য কর্ম্মে দক্ষতা লাভ করা, পরের জন্য খাটিয়া যাওয়া, অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া এবং সতীত্বের উচ্চ আদর্শগুলি তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইনি শৈশব কাল হইতেই পিতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত, ব্রহ্মসংগীত ও প্রার্থনায় নিরত দেখিবার ফলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পিতামাতাকে কখনও কোন পৌত্তলিক দেবদেবীর পূজা অর্চনা, পৌত্তলিক কোন অনুষ্ঠান করিতেই দেখেন নাই। ১৮৭৬ খৃঃ ২রা অক্টোবর, ১৭ই আশ্বিন, ১২৮৩ সালে ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে রেজিষ্ট্রারী হইয়া বিবাহ হইয়াছিল। এ বিবাহে ঢাকা হইতে ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু, দুর্গানাথবাবু ও গণেশবাবু সপরিবারে, কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ইটনা গ্রামে গিয়াছিলেন। পরলোকগত গোপীকৃষ্ণ সেন, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, দীননাথ কর্ম্মকার এবং সে সময়কার ঢাকার কবিরাজ মহাশয় সপরিবারে এবং আমি ও শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয় ইটনাতে গিয়াছিলাম। পরলোকগত সবল বিশ্বাসী পূতচরিত্র পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনী পরলোকগতা অন্নদাসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। সে বিবাহ সময়ে ইনি ১৩ বৎসরের ছিলেন, তখন হইতেই ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেকটা জানিবার শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ ঘটে। ৪ বৎসর পরে ১৮৮০ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর আমার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এ বিবাহেও ঢাকা হইতে বঙ্গবাবু, দুর্গানাথবাবু সপরিবারে গিয়াছিলেন, জঙ্গলবাড়ী হইতেও কর্ম্মকার মহাশয়ের চারি ভাই সেখানে গিয়াছিলেন। আমার বিবাহের ৪ বৎসর পরে ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত পরলোকগত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল; সে বিবাহেও বঙ্গবাবু, দুর্গানাথ বাবু সপরিবারে, প্যারীমোহন চৌধুরী, জগন্মোহন বীর ও জঙ্গলবাড়ীর ২জন ইটনাতে গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের এই ইটনা গ্রামটি পল্লীগ্রাম হইলেও, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে ও থাকিবে। কেন না বঙ্গদেশের বা অন্য কোন প্রদেশের কোন পল্লীগ্রামেই তিনটি ব্রাহ্মবিবাহ, চারিটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং বারটি বালকবালিকাগণের নামকরণ আর কোথাও হয় নাই। আমার পূজনীয় স্বর্গগত শ্বশুর মহাশয় একজন খ্যাতনামা বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। সুদৃঢ় বিশ্বাসী না হইলে কখনও পল্লীগ্রামে নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করতঃ এতগুলি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইঁহাকে একজন বিশ্বাসী জানিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। ভক্তিভাজন প্রচারকবর্গ প্রায় সকলেই ইঁহাকে জানিতেন, ইনি কোচবিহার বিবাহের কিছুদিন পরে 'বঙ্গবন্ধু' পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "মাননীয় কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের ইঙ্গিত বুঝিয়াই কোচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। ইহা লইয়া তুমুল ঝগড়া ও বাগ্‌বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন দেখি না; কেন না আমরা সকলে যখন ঈশ্বরের আদেশ বা ইঙ্গিত পাইবার অধিকারী, তখন প্রত্যেকেই কেন উপাসনা প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না, তিনি কেশবচন্দ্রকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন কি না। আমি উপাসনার সময়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন যে, এ বিবাহে তিনি কেশবচন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।"

আচার্য্য তখন বঙ্গবন্ধু হইতে এই পত্রখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করতঃ, সে সময়কার Sunday Mirror কাগজে বাহির করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতার বিশ্বাস হইতে আমার পত্নী উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন নববিধানে প্রগাঢ় বিশ্বাস রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে আমার সহিত বিবাহের পর হইতেই, আমার স্বভাবসিদ্ধ জাতিভেদের বিরুদ্ধ ভাবগুলিও ইঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। কখনও কার্য্যতঃ কোন ভাবেই জাতিভেদ রক্ষা করেন নাই। আমার সঙ্গে তিনি কলিকাতা ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শিলচর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, দারজিলিং, কোচবিহার, ধুবড়ী ও গৌরীপুরে গিয়াছিলেন এবং একবার বেজগাঁয়ের শারদীয় উৎসব উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের বাড়ীতেও গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার স্থিরতা, ধীরতা, ধর্ম্মভাব ও সাদাসিধে রকমের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া অনেকেই আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি আমার সহায় ছিলেন বলিয়াই আমি অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া এই সুদীর্ঘকাল বাঙ্গলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা প্রদেশের দূর দুরান্তরে ভ্রমণ করিতে পারিতাম। কোন প্রকারের দুঃখে কষ্টে ও অভাবে তিনি অবসন্ন হইতেন না, প্রার্থনা করিয়া প্রাণে বল লাভ করিতেন। বিধাতা আমাকে তাঁহার সহিত সম্মিলিত করতঃ সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর কাল দাম্পত্য-জীবন প্রতিপালন করিতে সক্ষম করিয়াছেন, আমার জীবনে তাঁহারই করুণার জয় নানাভাবেই সপ্রমাণীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মানুষ বিবাহিত না হইলে পূর্ণতা লাভ করে না। আমি শাস্ত্রীয় পূর্ণতা পূর্ণভাবেই লাভ করতঃ ধন্য হইয়া গিয়াছি। এখন আমা হইতে আমার শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়াদিলেন; জানিনা, অর্দ্ধভাবে আর কতকাল এখানে থাকিতে হইবে। বিধাতা যেন আমাকে ঐ সেই অমরধামে লইয়া গিয়া, পুনরায় পূর্ণতা-লাভের উপায় করিয়া দেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমার স্বর্গীয় পিতামহ অমৃতলাল

জীবন মৃত্যুর পরপারে আজ যিনি পৃথিবীকে নমস্কার কোরে চলে গেছেন—তাঁরি স্মৃতি-তর্পণের জন্যে এই শোকবাসরের আয়োজন। দীর্ঘ দিন এই পৃথিবীর বুকে তিনি বাস করে-ছিলেন—নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নানাভাবে, নানারূপে।—আত্মীয়তার নিবিড় সূত্রে আমাদের সঙ্গে তিনি আবদ্ধ, কারো কাছে বা রক্তের সম্পর্কে, কারো কাছে বা প্রাণের সম্বন্ধে। তাই আজ তিনি না থেকেও আছেন—বহির্জগতে তিনি লুপ্ত—কিন্তু অন্তর্জগতে, স্মৃতির জগতে, তিনি সেদিনকার মতই বিরাজ-মান—তাঁকে আমরা অনুভব করতে পারচি, অশরীরী তাঁকে মনের চক্ষে দেখতে পাচ্ছি তেমনি ভাবে, এতদিনের পরিচিত অভ্যাসের পরতে পরতে।

বিশ্বস্রষ্টার লীলায় যেখানে জন্ম ও মৃত্যু, তাঁরি তালে বাঁধা মানুষের জীবন-সঙ্গীত—একদা আরম্ভ হয় সৃষ্টির ভৈরবীতে—প্রভাতীর ঝাঁপে ঝোঁকে, আর একদিন শেষ হয়, সকরুণ পূরবীর মধ্যে দিয়ে—বৈকালীর ব্যথিত মূর্চ্ছনায়। কিন্তু সত্যিই কি তা শেষ হয়? ইন্দ্রিয়ময় জগতের মধ্যে যার অস্তিত্ব থাকে না, ভাবময় জগতের সঙ্গেও সে যে একীভূত হয়ে থাকে না, এমন তো কোনো যুক্তি নাই। তাই, চোখে যাঁকে আজকে দেখতে পাচ্ছিনে—মনে যে তাঁকে ঠিক তেমনি ভাবে দেখা যাচ্ছে, তেমনি স্পষ্ট, তেমনি উজ্জ্বল। সেই তো তাঁর সত্যি থাকা। বাইরে অবসান হয়েছে বলে সত্যিকারের অবসান আসেনি অন্তরে—যেমন আসেনা প্রতিদিনকার অস্তমান সূর্য্যের অবসানে।

মনে পড়ছে, যখন জ্ঞান হলো, এ বাড়ীতে আমরা তখন দুই ছেলেমেয়ে ত্রিপদী ছন্দের মতো। সহজ স্বাভাবিক ভাবে মাতাপিতাকে চিনলাম—আরো চিনলাম আমাদের পিতামহ পিতামহীকে, যাঁরা আজ পরলোকে। শুনেছি, আমার জন্মের পর বৎসর তিনি কুচবিহার রাজসরকার থেকে অবসর গ্রহণ করে, পিতৃপুরুষের ভিটেয় ফিরে এসেছেন। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের পর অবসর—মুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তায়। শোনা যায়, রাজসরকারে যে সব কর্ম্মচারিগণ কাজ করতেন, পিতামহের কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁদের তুলনায় ছিলো অতুলনীয়। কর্ম্মজীবনের কথা ঠিক জানিনে, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পর থেকে তাঁর যে কর্ম্ম-নিষ্ঠা দেখেছি, তাতে করে, কর্ম্মজীবনে যে তিনি প্রকৃত নিষ্ঠাবান ছিলেন, এ কথা স্বতঃই স্বীকার করতে হয়। রাত্রি প্রভাতের সংযোগে তিনি শয্যাত্যাগ করতেন—তখনো রাস্তার গ্যাসের আলো নিভতো না—মিউনিসিপ্যালিটির লোকে রাস্তায় জল দেবার আয়োজন করচে মাত্র, আকাশে ভোরের ইসারা পেয়ে পাখীরা জেগে উঠে সবে মাত্র কলরব করছে। শীত গ্রীষ্মের কোনো বিচার বালাই ছিলো না—প্রভাতের এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ীটার ঘুম ভাঙতো। দেখেছি; তিনি কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করতেন, 'আচার্য্যের উপদেশ', 'সেবকের নিবেদন', 'দৈনিক প্রার্থনা' এই ছিলো তাঁর পাঠ্য—এবং নিজের একটি প্রার্থনা লিখতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর প্রার্থনার কোন চিহ্ন আমাদের কাছে নেই, তিনি নিজে সেগুলোকে নষ্ট করে দিতেন। এইটেই তাঁর চরিত্রের বিশেষ লক্ষণীয় ছিলো যে, বাহিরে কোথাও তাঁর আয়োজন বা আড়ম্বর ছিল না। অন্তরের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রকৃত বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাসই তাঁকে সত্যের আলো দেখিয়েছে। আমরা ঘড়ির সঙ্গে তাঁর তুলনা করতাম। সারা দিনের কাজ যেন তাঁর ঘড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল—কোনো কারণে নিজে তিনি কোনো কাজের অবহেলা করতেন না। মনে পড়ে, যখন বর্ণ পরিচয় পড়ি, তখনো তিনি পড়াশুনো সম্বন্ধে যেমন আগ্রহ দেখাতেন, যখন উচ্চ শিক্ষার জন্যে কলেজের উচ্চতম বিভাগে পড়ি, তখনও তেমনি আগ্রহ। ফাঁকি তিনি সহ্য করতে পারেন নি—তেমনি পারেন নি অন্যায়কে মেনে নিতে। কতদিন দেখেছি, সংবাদ-পত্র পাঠ করে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন। এই সংবাদপত্র ছিল, তাঁর বিশেষ আগ্রহের বস্তু। গোড়ার পৃষ্ঠা থেকে শেষেরটা পর্য্যন্ত তিনি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন এবং সেই নিয়ে মনে মনে নিজের সঙ্গে নিজে আলোচনা করতেন। কোনো সংবাদে যখন বিশেষ ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হোতেন, সে বিষয়ে আলোচনা করতেন আমাদের সঙ্গে, নিজের মতামত জানাতেন স্পষ্ট ভাষায়। নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিলো তাঁর হাড়ে মজ্জায়, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা হওয়া চাই, কি নিজের, কি অপরের। কঠোর ছিল তাঁর নিয়ম। এর জন্যে নিজেদের মধ্যে নিজেরা কতবার বিরক্ত হয়েছি, সেটা আমাদের দুর্বুদ্ধি। বয়স তখন কম ছিল—তখন বড়দের দেখে, ছোটো আমরা, নিজে-দের সেই বড়ত্বের কোঠায় ফেলবার জন্যে লাফিয়ে বেড়াতাম। বড়রা মাষ্টারের কাছে বসে পড়তেন না দেখে, আমাদেরও সেই স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছা করতো—সেটা বয়সের ত্রুটি, তখন দূরের জিনিষকে কাছে, কাছের জিনিষকে দূরে করে দেখাটাই স্বধর্ম্ম। আজ বুঝতে পারচি, সেই কঠোর নিয়মের ফল কি? কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করচি তাঁর শাসনকে, তাঁর নিয়মকে।

কর্ম্মজগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কর্ম্মীজীবন ছিল অত্যন্ত শক্তিমান; তাই এই সংসারটার উপর তাঁর কর্ম্ম ও দায়িত্ব ছিল মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত। আমরা জানতাম পিতামহকে, আমাদের পূজনীয়েরাও জানতেন তাঁকেই। কোন্ কাজটা কার দ্বারা সম্পাদিত হবে, কার উপর কোন্ কাজের ভার থাকবে, সব তিনিই নির্দ্দেশ দিতেন, তাঁর উপর কারো কথা কইবার অধিকার ছিল না। বসে থাকতেন বটে সিঁড়ির ঘরটাতে—তাকিয়া হেলান দিয়ে, কিন্তু চোখ ছিল সর্ব্বত্র। কোথায় কে কি করচে, কে কোথায় গেল, কখন এলো,

প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁর জানা থাকতো। লাগলো বাড়ীতে মিস্ত্রি, তিনি নিলেন তাদারকের ভার। তিনেব কথা থেকে আরম্ভ করে মিস্ত্রি খাটানো পর্যাস্ত তাঁর নজরে—আর সকলে দায়হীন। এগারো বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয়া পিতামহী স্বর্গগমন করেন। বাড়ীতে সেই প্রথম শোকের রূপ দেখি। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর অপরিসীম রোগযন্ত্রণায় নানা অব্যক্ত কষ্ট পেয়ে, তিনি পরলোকে গেলেন। শোকের সেই প্রথম ঝাপটায় সেদিনে এ বাড়ীর সকলেই মুহ্যমান। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ব্বিকার অবিচল, স্থির-মূর্ত্তি,—সকলকে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যে প্রেরণা দিলেন অচঞ্চল-ভাবে। তারপর তাঁর জীবনে একে একে শোকের ঘা আসতে লাগলো। মেজ ঠাকুরদাদা গেলেন, ছোট ঠাকুরদাদা গেলেন, পিতৃদেব গেলেন, বড় ঠাকুমা গেলেন, ছোট ঠাকুমা গেলেন, আমার ভাগ্নে শিশু অবস্থায় গেল। লক্ষ্য করেছি, কোনো শোকেই কাতর হন নি। কি শক্তি যে তাঁর ছিলো, তা জানিনে; কিন্তু বিরাট মহীরুহের মত সমস্ত শোককে তিনি বুক পেতে সহ্য করে নিয়েছিলেন। মনে পড়ে, পিতৃদেবের মৃতদেহের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বোলেছিলেন, "যেখান থেকে এসেছিলি, সেখানে যা...—ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছিস্।" পুত্রহারা পিতার মুখ থেকে এমন অবিচল বিশ্বাসের দৃঢ় উক্তি কেমন করে বেরোয়, এ কথা ভাবতে হয়। কিন্তু ভাবলে সহজেই বোঝা যায়, মনকে যিনি গঠন করতে পেরেছিলেন, ঈশ্বরকে যিনি চিনতে পেরে-ছিলেন, মৃত্যুকে যিনি ভয়াবহ বিচ্ছেদ মনে না করে ঈশ্বরের জিনিষ ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া মনে করতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নয়। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বিরাট তাঁর ধারণা ছিল, সহজে তার দৃষ্টান্ত মেলে না। পরিবারবর্গের কোথায় কোন অসুবিধা হতে পারে, এমন কি দাসদাসীরা পর্য্যন্ত কোথায় অসন্তুষ্ট হতে পারে, এ বিষয়ে ছিল তাঁর কড়া নজর। কতদিন দেখেছি, বাড়ীর ভৃত্যবর্গ যখন তখন তাঁর কাছে থেকে পুরস্কার পেয়েছে। সন্ধ্যাবেলা তারা যখন তাঁর অঙ্গ মার্জ্জনা করতো, তিনি অসঙ্কোচে তাদের ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করতেন, নানা সুখ দুঃখের কাহিনী শুনতেন মনোযোগের সঙ্গে। এমনি করে তিনি সকলকার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন। ঈশ্বর তাঁকে এ সংসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ করে পাঠিয়েছিলেন। সম্ভ্রমে সম্পদে, আয়ুতে এবং সমস্ত আচার আচরণের মধ্যে তিনি সেই বড়ত্বের পরিচয় টুকু সকলের সামনে ধরে গেছেন।

গত ৪ঠা মে, তাঁর একাশী বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সমারোহ করে জন্মোৎসব হল, নানাজনের শুভেচ্ছা এসে লাগলো তাঁর ললাটে। কিন্তু যে তরীতে ভাঙন ধরেছে, তাকে যেমন শুভেচ্ছা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, তেমনি তাঁর আয়ুঃ-শেষ জীবনতরীও বেঁচে রইলো না, ডুবলো কালের অন্তহীন অপার সাগরের তলায়, তাঁর জীবন চলে গেল জীবনের পার থেকে মরণের তীরে, সেখানে কোনো চিন্তা নেই, কোনো ব্যাকুলতা নেই—যেখানে চির আনন্দ চিরদিনের পরিতৃপ্তির মধ্যে।

এ পরিবারে আজ তিনি নেই। কিন্তু সাজিয়ে গেছেন নিজের হাতে গড়া পরিপূর্ণ সংসার। চারিদিকে সকলেই জাজ্বল্যমান—তাঁর শিক্ষায়, তাঁর আদর্শে, তাঁর নীতিতে গড়ে উঠেছে, এ পরিবারের বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত। অন্তরের মধ্যে তিনি দিয়ে গেছেন কর্ম্মের অনুপ্রেরণা। তিনি বলতেন, যারা কর্ম্মহীন, অলস হয়ে বসে আছে, তারা ঈশ্বরের কাছে অপরাধী। বিদেশে কর্ম্মের জন্য যেদিনে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই, সেদিন তিনি বলেছিলেন, "পুরুষ জীবন কাজের জন্য, তার উপর নির্ভর করে সমগ্র পরিবার, তাই তাকে কঠিন হতে হয়, নির্ভীক হতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিস, উন্নতির সোপানে সোপানে এগিয়ে যাবি দিনে দিনে।" তাঁর ভয় ছিল, পাছে তাঁর পরিবারস্থ কেউ অক্ষম জীবন যাপন করে। সকলের জন্যেই ছিল তাঁর চিন্তা। মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্ব্বে এ বাড়ীর এক পুরাতন ভৃত্যের কাজের জন্যে তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও এক আত্মীয়কে অনুরোধ করে-ছিলেন, যেন তাকে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে দিন গুলোকে সচল করে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ জীবন ভোগ করার পর, আজ তিনি জীবন মরণের অতীত পারে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীয়মান। আজ দেবতার সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, সুখ দুঃখের সব অনুভূতির বাহিরে। যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, আমাদেরও পাঠিয়েছেন তিনি, তাই আজকে এই শোকের ও দুঃখের দিনে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাই, যেন আমাদের প্রিয়জনকে তিনি জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা থেকে চির আনন্দের অমর জীবনে নিয়ে গিয়ে, স্বর্গের জ্যোতিষ্ক লোকে শাশ্বত তৃপ্তির মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। স্বর্গগত প্রিয়জনের জন্যে আমরা প্রার্থনা করি :—

চির মঙ্গল অমৃতবারির অবিরাম সিঞ্চনে
জীবন তোমার লীন হয়ে যাক মঙ্গলময় সনে।
যেথায় তোমার অবিনশ্বর আত্মার হাসি ঝলে,
সেথা থাকো তুমি চিন্তাবিহীন চিরতৃপ্তির তলে॥

ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন।

সংবাদ।

নামকরণ—গত ৩রা অক্টোবর, ভাগলপুরে অনাবাংলায় ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের শুভনামকরণানুষ্ঠানে ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন এবং শিশুকে "সঞ্জয়" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা—গত ১৬ই আশ্বিন, (৩রা অক্টোবর), সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে ৮২।২ অপার সার্কুলার রোড গৃহে, শ্রীমান্ শশিমোহন চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী আহ্লাদী দেবী ও শ্রীমান্ মদন-মোহন চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী যমুনা দেবী নবসংহিতামতে

দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ অনুষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী সুধা দেবী সঙ্গীত করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতাদিগকে শুভাশীষ দান করুন।

বাগ্‌দানানুষ্ঠান—গত ১৪ই অক্টোবর, হাওড়া বাঁটরার ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, ৺বসন্তকুমার দাসের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের দৌহিত্রী, ৺বিনয়কুমার দাসের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মণিমালা দাসের সহিত, ময়মনসিংহ-নিবাসী ৺শ্রীনাথ চন্দের পৌত্র, শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ চন্দের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অমিতানন্দের শুভবিবাহের পৌর্ব্বাহ্নিক বাগ্‌দানানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধকে উপাসনার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল; তিনি সে দিনই গিরিধির উৎসবে যাওয়াতে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। কন্যার মাতামহ ওখানে থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতাবশতঃ অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার একটী প্রার্থনা পঠিত হয়। এই উপলক্ষে কন্যার মাতৃদেবী শ্রীমতী শান্তিদায়িনী প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে শুভাশীষদানে পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

শুভবিবাহ—গত ১১ই আশ্বিন, (২৮শে সেপ্টেম্বর), ১৪৮নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ কেশব একাডেমী স্কুল গৃহে, স্বর্গীয় কৃষ্ণধন দাসের সপ্তম পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথের সহিত, স্বর্গগত ভাই ঈশানচন্দ্র সেনের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ললিতার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন।

গত ২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর), ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, মাধীপুরা-নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণধন দাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত, শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেনের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রীতির শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। পরদিন ১১ই অক্টোবর, বর ও বধূর শুভাগমনে, আলিপুরে ২নং বেকার রোডে, লেঃ কঃ এম্ দাসের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং বর কন্যার জন্য শুভাশীষ ভিক্ষা করেন।

গত ৬ই অক্টোবর, পাটনায়, তত্রত্য ৺সূর্য্যকুমার পালের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীণার সহিত, কলিকাতার ৺সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ কৃপাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর ও বধূর শুভাগমনে, ৮ই অক্টোবর, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে ভাই অক্ষয়কুমার লধ তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করেন।

পরমজননী নব দম্পতিত্রয়কে শুভাশীষ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৩রা অক্টোবর, ২৮নং রামকমল সেন লেনে, ৺অ[illegible] সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্র শ্রীযুক্ত বিজনকুমার সেন কর্ত্তৃক ন[illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বা[illegible] মল্লিক, ভাই অক্ষয়কুমার লধ সমযোগে [illegible]। জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন [illegible] পিতামহদেবের আদর্শ জীবনের কথা [illegible] পুত্র নবসংহিতা হইতে প্রার্থ[illegible] করেন। [illegible]মান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] ক্ষিতীন্দ্রনাথ স্বরচিত শেষ ২টী সংগী[illegible] ১০০৲ টাকা দান এইরূপে উৎসর্গিত হইয়াছে:—যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ২০৲, কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে ১০৲, আসানসোল ই, আই, রেলওয়ে স্কুলে দরিদ্র ভাণ্ডারে ১০৲, কেশবচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিকী ফাণ্ডে ১০৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, বন্যার সাহায্যার্থ ১০৲, পুরী নববিধান আশ্রম ৫৲, গরিব পরিবার ১০৲, অন্যান্য ক্ষুদ্র দান ১৫ টাকা।

পরলোকগমন—আমরা গভীর শোকসন্তপ্তহৃদয়ে নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, কৃষ্ণনগরে, ভেটেরীনারী ইন্‌স্পেক্টর ডাঃ অমূল্যকুমার রায়ের সহধর্ম্মিণী, রায় সাহেব ৺বিপিনমোহন সেহানবিশের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পবিত্রা দেবী নিউমোনিয়া রোগে, স্বামী, দুই পুত্র, তিন কন্যা, ভাই বোন ও আত্মীয়স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রায় ৩৬ বৎসর বয়সে, অমরধামে পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রথমা ভাগিনেয়ী এবং কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ৺নরেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, টাউন্ডা ৪৭নং পটারি রোড ভবনে, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাই তিনি আচার্য্য ও তাঁর ভাই ভগিনীদিগের বিশেষ আদরের কন্যা ছিলেন। আচার্য্যমাতা সারদা দেবীর বিশেষ স্নেহ ও আদরে লালিতপালিত হন এবং যথার্থই তিনি বহুগুণসম্পন্না ছিলেন।

গত ৩রা অক্টোবর, বরিশালে, তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, সুকবি, সুগায়ক, সুবক্তা, ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ একনিষ্ঠ সেবক ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৭৬ বৎসর বয়সে অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

মা পরলোকগত আত্মা সকলকে তাঁর শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকসন্তপ্ত সন্তান সন্ততি ও পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, হাজারিবাগে, "চঞ্চলা-কুটীরে" ৺ব্রজকুমার নিয়োগীর প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন এবং কলিকাতা হইতে গিয়া শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসু মধুর সংগীত করেন। সন্ধ্যায়ও ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি-যোগে স্বর্গীয় আত্মার সহিত যোগানন্দ সম্ভোগ করা হয়। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৲ টাকা এইরূপে দান করিয়াছেন:—কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৫৲, অনাথাশ্রম ৫৲, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে দাতব্য ঔষধালয় ৫৲, হাজারিবাগ নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৫৲, অন্ধ ও আতুরদিগের জন্য কম্বলবিতরণার্থ ২৫৲।

গত ৪ঠা অক্টোবর, ২১২নং ডোবার রোডে, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাশ গুপ্তের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রকন্যাগণ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.
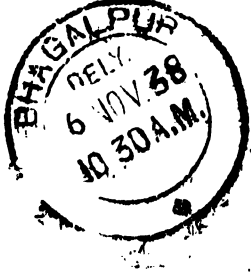
ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

2nd. November, 1938

প্রার্থনা

হে পরব্রহ্ম! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ কতই সাধ্য সাধনা করিয়া ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিলেন। তুমি বাক্য মনের অতীত, প্রবচন দ্বারা সাধ্য সাধনা দ্বারা অলভ্য. তুমি মনের দ্বারা অপ্রাপ্য, এই সিদ্ধান্ত করিয়া যখন তাঁহারা হার মানিয়া গেলেন, তুমি তাঁহাদিগের নিকট 'অহমস্মি' 'আমি আছি' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলে। হিমালয়ে যেমন, সিনা পর্ব্বতেও তুমি ঋষি মুষার নিকট 'আমি আছি, আমার নাম' এই বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলে। বর্ত্তমান যুগেও রাজর্ষি রামমোহন যখন সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া তোমার স্বরূপ নিরূপণ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইলেন, তুমি তাঁহার নিকট 'এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন' রূপে উপলব্ধ হইয়াছিলে। ধর্ম্মপিতা তোমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বেদান্ত শাস্ত্র যখন মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, তুমি তাঁহার নিকটে তোমারি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তোমার এক এক স্বরূপ চয়ন করিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম করিলে। এবং নিরাকার পরব্রহ্ম তোমাকে কেমন করিয়া উপাসনা করিতে হয়, তাহার মন্ত্রও শিখাইলে। সাধ্য সাধনা দ্বারা তোমার উপাসনা করিবার শক্তি আমাদের তেমন কই? তাই কি তুমি আরও সহজ হইয়া আমাদের ধর্ম্মাগ্রজ শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট চিন্ময়ী মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে এবং প্রত্যক্ষভাবে বলিলে, 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। প্রার্থনা করিলেই যা কিছু পাইবার, সকল পাইবে'। তাই মা যেমন স্বয়ং সন্তানকে লালনপালন করেন, রোগরুগ্ন শিশুকে নিজ স্নেহগুণে মানুষ করেন, তেমনি পাপরোগ-রুগ্ন, নানা প্রকার দোষ দুর্ব্বলতায় অক্ষম এবং সাধন ভজনে নিতান্ত অশক্ত আমাদের মতন যাহারা, তাহাদিগকে কেমন করিয়া তুমি নিজ কৃপাগুণে মানুষ কর, তুমি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে তাহারই তো পরিচয় দিলে। শ্রীকেশবচন্দ্র আপনাকে পাপী বোধে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিলেন। অজ্ঞানী শিশু এবং চির শিষ্য বলিয়া আপনার দীনতা উপলব্ধি করিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে মার হাতে গঠিত হইতে চাহিলেন, হইলেনও। 'একমাত্র প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা, তাহা'—ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। তাঁহার যাহা কিছু সকলই যে প্রার্থনা হইতে, ইহা তিনি বার বার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা একমাত্র তাঁহার সাধন-সম্বল। শিশু যেমন মার কাছে ক্রন্দন করে, আর মা যাহা কিছু শিশুর প্রয়োজন তাহা দেন, সেই ভাবেই

কেশব প্রার্থনা করিলেন এবং জীবনে যাহা কিছু ধর্ম্মবিধান লাভ করিলেন, তাহাতো কেবল এই প্রার্থনা হইতে। প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইলেন। প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি নূতন উপাসনা-সাধন পাইলেন। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, সাধুসঙ্গ, পরলোকদর্শন, এমন কি, জীবনের যাহা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম সেবা সাধন, সকলই তোমার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় করিলেন। এবং ক্রমে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সমন্বয়বিধান যে তোমার সর্ব্বমানবের পরিত্রাণপ্রদ নববিধান, তাহা তোমারই প্রত্যাদেশে ঘোষণা করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সব মহাপুরুষ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা তোমারই প্রেরিত সন্তানরূপে করিয়াছেন ; কিন্তু কেশবচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, সেই সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের পদরেণু লইতে অক্ষম হইলেও, পাপী মানুষ যে তোমার কৃপাগুণে বর্ত্তমান কলিযুগেও মহা মানবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার সাক্ষ্যদান করিলেন। বলিলেন, নারকী যে উদ্ধার হইতে পারে, ইহা যদি দেখিতে চাও, এই লোককে দেখ। কি আশার কথাই তিনি আমাদিগকে শুনাইলেন। কিন্তু ইহা যে কেবল তাঁহার একচেটিয়া নয়, ইহা সকলকারই পক্ষে সম্ভব, ইহা বার বার তিনি ঘোষণা করিলেন। তাই, তিনি চাহিলেন, আমরা যেন তাঁহার সেই 'সমযোগী সমভক্ত সমবিশ্বাসী' হইয়া, তাঁহার সহিত আত্মিক ঐক্যসমাধানে নববিধান-জীবনগত মানুষ হইতে পারি। তাই, কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী সাধনের জন্য, মা! তুমি যদি আমাদিগকে ডাকিতেছ, আমরা তাঁহার সহিত সমযোগে, সমবিশ্বাসে, সমদর্শনে এবং সমপ্রার্থনায় তোমাকে মা বলিয়া ডাকি ও দেখি। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত তেমনি করিয়া প্রার্থনা করিতে শিখাও এবং তদ্দ্বারা যাহাতে আমরা যথার্থ কেশবের সহযোগী হইয়া, কেশবের জন্মশতবার্ষিকীসাধনায় নূতন বিধানের নূতন মানুষজন্ম প্রাপ্ত হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর এবং সমগ্র মানবপরিবারকে এই আদর্শানুরূপ মানবজীবনদানে ধন্য কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

একে একতা, শ্রীকেশবচন্দ্রের নববারতা

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রাহ্মসমাজ বলেন স্বর্গে, মর্ত্ত্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঘোষণা করিলেন নববিধান।

ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপন করিলেন, তখন সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভাবন করিলেন, সর্ব্বধর্ম্মেরই উপাস্য এক ঈশ্বর। 'অন্যের বিষয়েই কেবল মতভেদ'। তাই, বিধান কহিলেন, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, যে কেহ যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করুন না, সকলেই এই গৃহে আসিয়া একত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। এবং পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনাদি করিবেন। ইহাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের পত্তন বা বীজবপন।

ধর্ম্মপিতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে শ্রীকেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন, এবং অব্যবহিত পরে অবসর লইলেন ; এবং আত্মজীবনীতে জীবনের পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, 'ইহার পর কেশবের আমল'। শ্রীকেশবচন্দ্র সেই একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা ও সাধনায় নিরত হইলেন। 'সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন' ক্রমে তাঁহার নিকটে ভগবান্ বিধাতারূপে, শ্রীহরিরূপে এবং পরে চিন্ময়ী মাতৃরূপে অভিব্যক্ত হইলেন এবং মা যেমন শিশু সন্তানের গঠন ও পুষ্টিবিধান করেন, তেমনি করিয়া তাঁহার জীবনকেও ক্রমোন্নত ও নব নব জীবনে প্রকট করিলেন। অনন্ত পরব্রহ্মের উপাসনায় অনন্ত কাল জীবনের উন্নতি, ইহাই যে মানবজীবনের নিয়তি, তাহা কেশবচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিলেন।

এজন্য তিনি কোনও একটী মতে বা সাধনায় নিবদ্ধ হইতে পারেন নাই। তিনি আত্মজীবনবেদে বলিয়াছেন, 'গোলদিঘি হইতে লালদিঘি, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে ক্রমাগত কে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ; একটা কালো ছেলে ক্রমাগত মার দিকে দৌড়াইতেছে।' ইহাই কেশবজীবনের প্রকৃত গতি।

স্রোতস্বতী যেমন ক্রমপ্রবাহিত, জীবন্ত বৃক্ষ যেমন

ক্রমবর্দ্ধমান, শ্রীকেশবের জীবনও ঠিক সেইরূপ। তাই, বিধাতা সত্যই মাতৃরূপে প্রকট হইয়া, শ্রীকেশব-শিশুকে ক্রমবিকশিত মানবজীবনের বিভিন্ন ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং শিক্ষা সাধনার গঠন দান করিয়া, নববিধানের সমন্বয়জীবনে সমুন্নত করিলেন।

তিনি এক ব্রহ্মের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া, যখন ব্রহ্ম তাঁহাকে মাতৃরূপে দেখা দিলেন, তখন মার সঙ্গে সঙ্গে, মা যেমন সসন্তানে সর্ব্বদাই বিরাজিত, তাই মার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তসন্তানদিগের সঙ্গও তিনি লাভ করিলেন এবং ক্রমে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন ধর্ম্মও যে সেই একই মার বিধান, তাহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিতও ভ্রাতৃভাবে মিলন লাভ করিলেন। এইরূপে সকল ধর্ম্ম, সকল মানব, সকল দেশ, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল সাধনা, সকল জ্ঞান বিজ্ঞান, সকল বিশ্বের মধ্যে একেরই প্রভাবে একতা উপলব্ধি করিয়া, মহা ঐক্যবন্ধনে ধর্ম্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিলেন। ইহারই নাম তিনি ঈশ্বরের প্রেরণায় নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

শ্রীরামমোহন যাহা জ্ঞানবিচারে উদ্ভাবন করিলেন, কেশবচন্দ্র জীবনের সাধনা দ্বারা তাহারই পূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। সকল ধর্ম্মই যে একই ঈশ্বরের ধর্ম্ম, এবং সকল মানব যে একই মানবত্বে গঠিত, ইহাই কেশবচন্দ্র নববিধানে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সাধনধারা আমরা যদি প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীকেশবচন্দ্র যে নববিধানে কি ভাবে একমেবা-দ্বিতীয়ম্ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। বাস্তবিক যদি আমরা ঈশ্বরকে সত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং উপাসনা করি, আমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, এক হইতে এক বই দুই হইতে পারে না। তাই, ঈশ্বর যদি একই ঈশ্বর হন, তাহা হইলে তাঁহার যাহা, তাহা তাঁহারই না হইয়া পারে না। তবে এক হইতে একের বিচিত্র ভাবরূপ হইলেও, সেই বিচিত্রতার মধ্যেও যে ঐক্য রহিয়াছে, ইহা কেন আমরা না স্বীকার করিব? একই সূর্য্যের রশ্মি প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইলেও, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণে তাহার মধ্যে ঐক্য নিশ্চয়ই উপলব্ধ হইবে।

তেমনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ, ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ধর্ম্মবার্ত্তা লইয়া পৃথিবীতে আসিলেও, তাঁহারা সেই একেরই প্রেরণায় প্রেরিত, ইহা স্বীকার কেন না করিব? তেমনি তাঁহারা যে যে ধর্ম্মবিধান লইয়া আসিয়াছেন, তাহা সেই এক বিধাতারই বিধান। তাই, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহার ভিতর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যে ঐক্য রহিয়াছে, ইহাই নববিধান-বিজ্ঞান আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মানবে মানবে বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা থাকিলেও, মানবতায় যে সকল মানব এক মানব, ইহা কেশবচন্দ্র শুধু উপলব্ধি করিলেন, তাহা নহে, সহানুভূতি-যোগে সবার সহিত ঐক্যবন্ধনে জীবনের একত্ব সমাধান করিলেন।

এই জন্যই স্বর্গে যেমন ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্, মর্ত্ত্যেও তেমনি মানব একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইহা কেশবচন্দ্র নববিধানে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শ্রীমৎ মহর্ষিদেব বলিয়াছেন, শ্রীকেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহা জীবনে করেন এবং যাহা নিজে করেন, তাহা অন্যকে দিয়া করান। বাস্তবিক, শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের সাধনা এই। তিনি কখনও এমন কোনও কথা বলেন নাই, যাহা জীবনের সাধনে উপলব্ধি করেন নাই। তাই, এই যে মানবে মানবে একত্ব, ইহা শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের সাধনোপলব্ধ সত্য।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ধর্ম্মের দুই অঙ্গ বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে নির্দ্দিষ্ট। কেশবচন্দ্র যেমন একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করিলেন, তেমনি ভক্তদিগকেও এক অখণ্ড ভক্তরূপে গ্রহণ করিলেন; এবং সকল ধর্ম্মবিধানকেও একই ধর্ম্মের বিভিন্ন স্বরূপমাত্র-রূপে, একই ধর্ম্মরূপে সমন্বয় সাধন করিলেন। এবং সমগ্র মানবকে কেবল ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ভাই ও আমি এক, এই বলিয়া সাধন-যোগে এক অখণ্ড মানবত্ব লাভ করিলেন। তাই বলিলেন, 'সকল মানব আমাতে, আমি সকল মানবে। আমি সকল অখণ্ড।' ইহাই মর্ত্তে একমেবাদ্বিতীয়মের মর্ম্ম।

ধর্ম্মতত্ত্ব

বিবাদ-ভঞ্জন

ঈশ্বর যে এক এবং অদ্বিতীয়, সকলেই ইহা স্বীকার করেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সবাই বলেন, ঈশ্বর এক।

কিন্তু ঈশ্বর নিরূপণ করিতে গিয়া পরস্পরের কতই বিবাদ এবং মতভেদ। একজনের ঈশ্বর, আর একজনের নন। এইরূপে এক ঈশ্বর মতে মানিয়াও কতই মতভেদ। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ বুদ্ধি বিচার অনুধাবন করিয়া এক এক কল্পিত ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া থাকেন। তাই, একজনের ঈশ্বরের সঙ্গে আর একজনের ঈশ্বরের মিল হয় না। হস্তরচিত মূর্ত্তি-গঠনে যাঁহার যেমন শিল্পনৈপুণ্য, তিনি তেমনি মূর্ত্তি গঠন করেন। তেমনি, এক এক ধর্ম্মাবলম্বী নিজ জ্ঞান বুদ্ধি বিচার অনুসারে ঈশ্বরের কল্পনা করে মাত্র। তাই, ঈশ্বরে ঈশ্বরে এত বিবাদ। বাস্তবিক, ঈশ্বর-নিরূপণ মানব-বুদ্ধি-বিচার-সিদ্ধ নয়। ইহাই ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদের করুন। তাই, হস্তরচিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির গঠনও যা, মনঃ-কল্পিত ঈশ্বর-নিরূপণও তাই। কেশবচন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর নিরূপণ মানুষের হাতে নয়। এইজন্য নববিধানে জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং মাতৃরূপে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছামত আমাদের জীবনে ধর্ম্ম সাধন করাইতে বর্ত্তমান। ইহাই বিশ্বাস করিতে হইবে। জীবন্ত ঈশ্বর মানিলে, তিনি যা, তাহাই সকলের নিকট উপলব্ধ হইবেন। কেবল এক ঈশ্বরবাদ নয়, কিন্তু একই জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা নববিধানে প্রতিষ্ঠিত। সবারই একই ঈশ্বর হইলে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, মতে মতে বিবাদ থাকিতে পারে না। তাই, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিবাদভঞ্জনের একমাত্র উপায়, সবারই সেই একই জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা; এবং তাহা করিয়া, নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি-প্রসূত ঈশ্বর-নিরূপণ ত্যাগ করতঃ, তাঁহারই পরিচালনাধীনে আত্মসমর্পণ, ইহাই নববিধানের শিক্ষা ও সাধন।

ধর্ম্ম-সমন্বয়

বিজ্ঞান বলেন, কিছুই বিনষ্ট হয় না; কিন্তু সকলই ক্রম-বিকশিত বা রূপান্তরিত হইতেছে মাত্র। নববিধান নববিজ্ঞানের বিধান। এ বিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসে নাই, কিন্তু সকলের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সম্পাদনের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিধাতা যে সকল বিধান করিয়াছেন, সে সকলকেই সমন্বয় করিতে নববিধান আবির্ভূত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানবাদিগণ, কি হিন্দু, কি ইসলাম, কি খৃষ্টান মনে করেন, সকল ধর্ম্মা লম্বী তাঁহাদেরই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে; নতুবা পরিত্রাণ পাইবে না। অর্থাৎ খ্রীষ্টান মনে করেন, সকলেই খ্রীষ্টান হইবে, তবে পরিত্রাণ পাইবে; মুসলমানও ঠিক সেই রকম বিশ্বাস করেন, সকলকেই মুসলমান হইতে হইবে। ইহার ভিতর কতকটা সত্য থাকিলেও, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু নববিধান বলেন, কোন ধর্ম্মই একেবারে লোপ হইয়া গিয়া অপর ধর্ম্মে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে তাহা নহে। কোনও ধর্ম্মবিধানই বিনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু পরস্পরের ধর্ম্মবিশেষত্ব পরস্পরকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ক্রমে সকলে মিলিয়া এক অখণ্ড ধর্ম্ম পরিবারে পরিণত হইবে। তাই, সকল ধর্ম্মবিধানের মিলনই নববিধান। ধর্ম্ম-সাধনে যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সকল সাধনার সাধন বিনা ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন হয় না। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, সাহিত্য সকলই সমভাবে শিক্ষা করিলে তবে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়, তেমনি হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকল ধর্ম্ম সমন্বিতভাবে সাধন এবং গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসাধনের পূর্ণতা হয়। কোনও ধর্ম্মভাবকে পরিত্যাগ বা উপেক্ষা করিলে, আমরা নববিধানের পূর্ণ মানবত্বলাভে সমর্থ হইতে পারিব না।

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

চতুর্থ প্রবন্ধ

উপনিষদে সার্ব্বজনীন সাধনপথ

সমস্ত জীবন ধর্ম্মাচরণ করিয়া ও যতপ্রকার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সেকালে প্রচলিত ছিল, তাহাদের যথাযথ বিচার ও সমন্বয় করিয়া ও এইভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে যাইতেছেন। এই সময়ে স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া বাক্যালাপ-প্রসঙ্গে তিনি যে উপদেশ দিলেন, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুইবার যৎসামান্য পার্থক্যের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর কোন কথোপকথন বা ধর্ম্ম-চর্চ্চা উপনিষদে একবারের বেশী উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই কথাবার্ত্তার ভিতর আমরা উপনিষদের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছি ও এই প্রবন্ধে তাহাই সাধ্যমত আলোচনা করিতে চাই।

যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মৈত্রেয়ী জানিতে চাহিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা দ্বারা অমৃত হইতে পারিবেন কি না। যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিলেন, "না, না, উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেমন, তোমার জীবনও তেমনই হইবে। বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের কোন আশা নাই।"

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিষয় সম্পত্তির সেবা মানবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে ধনৈশ্বর্য্য থাকিলে "উপকরণবান্" ব্যক্তির মত সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ ধনসম্পদ সেবার কার্য্যে অর্পণ করা যায়। সেইজন্য পার্থিব সম্পদের যথার্থ সার্থকতা সেবাব্রতে তাহা সমস্তই নিবেদন করা।

মৈত্রেয়ী বুঝিলেন যে, স্বামীর সম্পত্তি দ্বারা তিনি অমৃতত্ব পাইবেন না। তাই বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং

তেন কুর্য্যাম্ ?" এই বাণী মানব অন্তরে চিরদিন প্রতিধ্বনিত হইবে। ইহার অর্থ, "যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহা দ্বারা আমি কি করিব ?"

এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মহাখুসী হইলেন। তখন তিনি যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এতদিন স্ত্রী হিসাবে মৈত্রেয়ী তাঁহার প্রিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মৈত্রেয়ী যখন অমৃতত্বের সন্ধান করিতে চান, তখন তিনি প্রিয়তর হইলেন।

এ স্থলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে উচ্চতম সম্বন্ধের আদর্শ থাকা প্রয়োজন, তাহাই শুধু যাজ্ঞবল্ক্য বুঝাইতেছেন না, বরং জানাইতে চাহেন যে অর্দ্ধাঙ্গিনীর মধ্যেও যে আত্মার আহ্বানে তিনি চলিতে চাহেন, তাহারই স্পর্শ পাইতেছেন বলিয়া, স্ত্রী এত অধিক প্রিয় মনে হইতেছে।

এ কথাটি পরিষ্কার করিবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

"পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। বিত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়।" যাজ্ঞবল্ক্য আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, যে সকলের তাৎপর্য্য, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, লোকসমূহ, দেবগণ, বেদসমূহ, ভূতসমূহ ও সমুদায় বস্তু সমস্তই উপরি উক্ত প্রকারে আত্মপ্রীতির জন্যই প্রিয় হয়। এবং সেই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন করিলে ও অবগত হইলে এই সমুদায় বিদিত হয়।

আত্মাকে অনুভূতি অথবা জ্ঞানের দ্বারা কি করিয়া পাইতে হইবে, তাহা রাজা জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য নানা প্রসঙ্গে বারবার আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য "প্রীতি"র দ্বারা আত্মাকে কি করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন। মানুষের জীবনের সহজ বিকাশ তাহার প্রীতির সম্বন্ধের গভীরতা ও প্রসারতার উপর নির্ভর করে। স্ত্রীলোক এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। তাই বোধ করি, মৈত্রেয়ীর নিকট এই প্রীতিতত্ত্ব যাবার বেলা যাজ্ঞবল্ক্য প্রকাশ করিয়া গেলেন।

আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে প্রীতি-সাধনার তিনটি স্তর দেখিতে পাই। এই স্তরগুলি বুঝিলে পর, কেমন করিয়া অশুদ্ধ প্রীতি ক্রমশঃ শুদ্ধ প্রীতিতে পরিণত হয় ও আত্মার গভীরতা ও প্রসারতা সাধিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতে পারিব। প্রথম অবস্থায় মানুষ নিজেকে কেন্দ্র করিয়া প্রীতির অভিসারে বাহির হয়। এই সময়ে জগতের খোসাটার সঙ্গে মানুষের আত্মসত্তার আবরণটা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিচয়-জড়িত মন ও অহংকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আকৃষ্ট হয়। এই সুযোগে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মানব অন্তরে জন্মায় ও পরিণামে মানুষ বুঝিতে পারে যে, তাহার বাহ্য দেহ দ্বারা জগতের বাহ্যদেহ স্পর্শ করিলে গভীর বা স্থায়ী কোন সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। (কেহ মনে করিবেন না যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে হেয় করা হইতেছে। উপনিষদ বলেন, শুধু ইন্দ্রিয় কেন, মানুষের নখ পর্য্যন্ত আত্মার প্রবিষ্ট রহিয়াছে।) দ্বিতীয় স্তরে মানুষ নিজেকে কেন্দ্র না করিয়া, আপন প্রিয়জন বা প্রিয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া জীবন-কার্য্যে অগ্রসর হন। তখন সে অবস্থায় "কাম, ক্রোধ, লোভ" ইত্যাদি জন্মায় না, বরং "প্রেম, ক্ষমা, ত্যাগ" প্রভৃতি আসিয়া মানবের সত্তা অধিকার করে। চণ্ডীদাস সত্যই বলিয়াছেন, নিজ ইন্দ্রিয়ের সুখ জীবনের লক্ষ্য হইলে কাম জন্মায়, প্রেমাস্পদের সুখ যদি বাস্তবিক লক্ষ্য হয়, তবেই প্রেম জন্মায়। অতএব এক্ষণে মানুষ নিজ সত্তার চেয়ে যে সত্তাকে প্রেম করে, তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিয়া দেখিতে আরম্ভ করে। আরও একটি স্তর আছে, যাহাকে আমরা তৃতীয় বা উচ্চতম স্তর আখ্যা দিব। সেই তৃতীয় স্তরে আরোহণ করিলে পর, মানুষ প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রীতি সাধন করেন অর্থাৎ কোন জানা বস্তু তাঁহার প্রীতির কেন্দ্র হয় না, বরং কোন অজানা আকর্ষণ (ব্রহ্মের আকর্ষণ ?) যাহা বুঝিয়াও বোঝা যায় না এবং যাহা বোঝান অসম্ভব, এইরূপ আকর্ষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক তখন প্রীতিসাধন করেন। সে অবস্থায় যে কেহ কাছে আসুক, ভক্ত তাহাকে সকল বাক্যে ও সকল কর্ম্মে আপন প্রীতির আরাধনার পরিচয় দিবেন। পুষ্প যেমন সকলকে সুগন্ধ বিতরণ করে, নদী যেমন সবাইকে জল দেয়, ধরিত্রী যেমন সকল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করে, সেইরূপ প্রীতিসাধনের যিনি চরমে পৌঁছাইয়াছেন, তিনিও সকলের জন্য আপন জীবন অতিবাহিত করেন ও সকলকে সাধ্যমত প্রীতি করিয়া আত্মবোধ লাভ করেন। আর একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে সরল করিতে চাই। শিক্ষক অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, আবার ছাত্রদের কল্যাণের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করেন, অথবা আত্ম অর্জ্জিত জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিতে ও প্রচার করিতে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। কিন্তু যতই তিনি জীবনকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, ততই বুঝিবেন যে, নিজের স্বার্থ, পরের হিত ও জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সবই এক সঙ্গে সম্ভব, যদি উন্নতিশীল প্রীতিবশতঃ তিনি আত্মচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন।

অশুদ্ধ প্রীতি ক্রমশঃ নিষ্কল হইয়া শুদ্ধ প্রীতিতে পরিণত হয়, তাহা আমরা দেখিলাম। আবার শুদ্ধ প্রীতি একেবারে সাধকের অন্তঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া জগৎকে মহিমান্বিত করিতে পারে, তাহার সংবাদ উপনিষদের ঋষিগণের নিকট হইতে পাই। উপনিষদের ইঙ্গিত অনুসারে আত্মার রাজধানী মানবহৃদয়কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হৃদয়কে

ঋষিগণ আকাশের সহিত তুলনা করিয়াছেন। জাগতিক আকাশে যেমন সূর্য্য উদয় হয়, মেঘ আসে, বর্ষণ হয়, সেইরূপ হৃদয়-আকাশ আত্মার কিরণে সমুজ্জল হয়, অহংকারের দ্বারা রূপান্বিত হইয়া শত আশঙ্কা বা সন্দেহ প্রভৃতির মেঘ উদয় হয় ও সেই কারণে কত অশ্রুধারা হৃদয়কে বিগলিত করিয়া মানুষের জীবনে বর্ষিত হয়। উপনিষদের অনুসরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যেমন সূর্য্য হইতে উৎপন্ন মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ আত্মা হইতে উৎপন্ন অহংকার আত্মাকে গ্রাস করিয়া থাকে। অথচ এই হৃদয়ের আকাশে যে সূর্য্য অর্থাৎ আত্মা নিশি-দিন জাগ্রত রহিয়াছে, তাহারই পানে চাহিয়া যদি জীবন অতি-বাহিত করা যায়, কোন ভয় থাকে না, বিপদ থাকে না, বিলাপ থাকে না। গায়ত্রীমন্ত্রে এই "সবিতা"কে লক্ষ্য করিয়া "যিনি আমাদের বুদ্ধি সমূহকে প্রেরণা করিতেছেন" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব যে বুদ্ধি জগৎপথে প্রধান সহায়, তাহাও হৃদয়-আকাশে যে সূর্য্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই অনুগ্রহে পরিচালিত হয়। যদি আত্মার ইঙ্গিত মত বুদ্ধি বিচারের সহিত মানুষ কাজ করে, তাহা হইলে সে মিথ্যাচারী বা ভণ্ড হইতে পারে না, জগতের লোক তাহার সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন। জগতের লোকের কথায় কি যায় আসে? উপনিষদ বলেন, এই পৃথিবীর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি যখন লেশমাত্র সাহায্য করিতে পারে না, সেই সহায়হীন অবস্থায় মানুষ কেবল মাত্র আত্মার জ্যোতিতে আপন পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। সেইজন্য হৃদয়-আকাশে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, সেই আত্মারূপী সূর্য্যের শরণ লওয়াই মানবের কর্ত্তব্য। উপনিষদ আরও বলেন যে, হৃদয়স্থিত আত্মার সত্তায় ও জাগতিক আকাশের আদিত্যের সত্তায় কোন প্রভেদ নাই। এইরূপে সকল সত্তা যে আত্মায় অথবা ব্রহ্মের সত্তায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সাধক ক্রমশঃ আপন অন্তরে স্বীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিলে, এক আত্মায় সমস্তই একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থা ক্রমশঃ যত সহজ হইতে থাকে, ততই ব্যাবহারিক জীবনে জগতের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হয়, তাহাতে আত্মার জ্যোতির সৌজন্যে প্রীতির অংশ শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে। আলো যেমন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, সাধকের অন্তরের প্রীতি সেইরূপ জগতে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। ইহার মধ্যে তখন চাঞ্চল্য নাই, আসক্তি নাই, পরিণাম নাই, ভেদজ্ঞান নাই।

"প্রীতি"র পথ দিয়া অথবা "আত্মা"র পথ দিয়া কি করিয়া আত্মপ্রীতি পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়, তাহা দেখা গেল। এক্ষণে ভাষার দিক্ হইতে এই দুইটি শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিয়া লওয়া ভাল। বর্ত্তমান কালে যেভাবে মানবচিন্তার স্রোতের উপর socialismএর প্রভাব বাড়িতেছে, তাহাতে বলিতে ইচ্ছা করে যে, socialismএর পরাকাষ্ঠা উপনিষদের এই "আত্মপ্রীতি"র মধ্যে পাই। আত্মপ্রীতি বলিতে ইংরাজী ভাষায় আমরা বুঝি, Socialising of the self অথবা Giving away one's life into the life of others। বাঙ্গলার দরদী কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত একটি গানে এই ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"ভুলিয়ে যা'রে আত্মপর,
পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর,
আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ।"

এক্ষণে উপনিষদের আত্মপ্রীতি বুঝিতে হইলে, প্রীতি ও ভালবাসার প্রভেদ ভুলিলে চলিবে না। প্রীতির অর্থ কেবল 'দেওয়া', ভালবাসার মধ্যে 'দেওয়া' ও 'লওয়া' দুইই আছে। ভালবাসায় মানুষ জড়িত হয়, তাহাতে বন্ধন আছে। প্রীতিতে মানুষের হৃদয়ের পর্দাগুলি খুলিয়া যায়—ইহাই মুক্তির সোপান। তাই মানুষের জীবনে ভালবাসার চেয়ে প্রীতির স্থান অনেক পূর্ব্ব থেকে ও পরে পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্য আত্মবোধকে অক্ষররূপে পাওয়া।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেশবচন্দ্রের শিষ্যপ্রকৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবের প্রধানভাব, এই পৃথিবীতে একটি বৃহৎ 'সুখী-পরিবার' স্থাপন করে, 'পরিবার-সাধন' শিক্ষা করা; কতগুলি নরনারীকে একেবারে আপনার বলে গ্রহণ করে, সপ্রেমে তাঁদের সেবা করা; এ জগতেই "প্রেম-ধামের" আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার পথে অগ্রসর হওয়া। বহু পরিবারের সঙ্গে একত্রে বাস করে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মিক সেবা দ্বারা অন্তরের স্বর্গীয় আদর্শকে স্বীয় জীবনে লাভ করা, নিজেকে প্রেম-পরিবারের সুখ আস্বাদনের যোগ্য করে তোলা, প্রেমের সেবা গভীরতর রূপে শিক্ষা ও সাধন করা, "ভারতাশ্রম" স্থাপনের উদ্দেশ্য। যে স্বর্গীয় বস্তু নিজে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হতেন, সে বস্তু বন্ধুগণও লাভ করুন, সকলেই লাভ করুন—সে বস্তু সকলের হোক, তাও চাইতেন এবং যাতে সকলের হয়, সকলে পায়, সে জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী মনে করতেন। সেই দায়িত্ব-বোধ সর্ব্বাগ্রে কেশবচন্দ্রকে ব্যাকুল শিষ্যের ন্যায় পরিবার-সাধনে লিপ্ত করেছিল। একটি বৃহত্তর পরিবারের সেবার সুযোগ পেয়ে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সেই পরিবারের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা সাধন করে, সকলের সেবা করে, আমি পরিবার-সাধন শিক্ষা করি, আমার আত্মীয়তা-সাধনের ক্ষেত্র

বিস্তৃত হোক, আমি প্রেমের সেবায় অগ্রসর হই,—তা'হ'লে আমার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, অপরের পক্ষে পরিবার-সাধন ও প্রেমের সেবা প্রত্যক্ষ বিষয় হবে, পৃথিবীতে একটি ছোট "শান্তি-নিকেতন" প্রতিষ্ঠিত হবে, যার স্বর্গীয় শোভায় নরনারী ধর্ম্মরাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে,—যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে ও পরিবারে মূর্ত্তিমান হবে,—এই মহাভাবের প্রেরণায় কেশবচন্দ্র "ভারতাশ্রম" স্থাপন করেছিলেন,—প্রধানত: নিজের শিক্ষামন্দির ও সাধন-ক্ষেত্ররূপে। তা'হ'তে গড়েছিল ব্রাহ্মপরিবার, এবং প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ।

(১৪) কেশবচন্দ্র একদিকে যেমন ধর্ম্মজীবনকে বৃহত্তর পরিবারের আবেষ্টনের সহায়তা দ্বারা পরিপুষ্ট, বিকশিত ও প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে অন্তরঙ্গ সাধকদলের সঙ্গ ও সহায়তার দ্বারা ধর্ম্মজীবনকে গভীরতর ও পূর্ণতর করবার জন্য দিন দিন অধিকতর ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ক্রমান্বয়ে 'তপোবন' 'সাধনকুটীর' এবং 'সাধন-কাননের' ব্যবস্থা করেন। বারবার সমাজের বিশিষ্ট সভ্যগণের মধ্যে এবং বিশেষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু প্রচারকগণের মধ্যেও নিষ্ঠার ও প্রেমের অভাব দেখে, তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছে যে,—"এত হইল, অথচ কিছুই হইল না, এই দুঃখ।" ব্রাহ্মসমাজ এসেছে জগতে, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ভগবানকে কেন্দ্র করে, মানুষে মানুষে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ সজীব হয়ে ওঠার উপর স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সেই সম্বন্ধ-সাধনের জন্যই "ভারতাশ্রম" প্রভৃতির জন্ম। কিন্তু সে সকল প্রতিষ্ঠান কিছু দূর লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়ে বার বার থেমে গিয়েছে, কিছু পরিমাণে সকলে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন; আর কেশবচন্দ্র অধীর হয়ে উঠেছেন, আমার কিছু হল না, আমার দ্বারা সেবা হল না, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। এবং বার বার নব নব উপায় অবলম্বন করেছেন, সে অভাব-মোচনের জন্য।

(ক) কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধনের গতি কেন্দ্র হতে পরিধির দিকে, অন্তরতর প্রদেশ হতে বাহিরের দিকে। ধর্ম্মজীবন অন্তরঙ্গ মণ্ডলী হতে সমাজে ও দেশে প্রবাহিত হবে। উপাসকমণ্ডলী, ভারতাশ্রম প্রভৃতিতে আশার অনুরূপ সফলতা-লাভে বঞ্চিত হয়ে, তিনি আরও অন্তরতর মণ্ডলীতে ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র রচনা করেছেন। তাই বল্লেন, "আমি চির প্রচারকদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাই।" তাই গেলেন সাধক বন্ধুগণকে নিয়ে বেলঘরের বাগানে "তপোবনে", গভীরতররূপে বৈরাগ্য, সংযম, দীনতা, অধীনতা ও সেবা শিক্ষা করবার জন্য। সেখানে কত সাধন অবলম্বন করলেন,—স্নান, আহার, উপাসনা, ধ্যান, পরস্পরের সেবা,—ঘর ধোওয়া, রান্না করা, বাসনমাজা ইত্যাদি।

(খ) তারপর ভক্তি যোগ জ্ঞান সেবা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনের উচ্চতর অঙ্গগুলি গভীরতরভাবে সাধনের জন্য কেশবচন্দ্র নিজ গৃহে "সাধনকুটীর" নির্ম্মাণ করে, বিশেষ সাধনে লিপ্ত হলেন, এবং কয়েকজন অতি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধুকে বিভিন্ন সাধক-শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিজ সাধনের সহায় করে নিলেন। প্রথম দিন বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথকে ভক্তি ও যোগ সাধন বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন, তার মধ্যে বলেছেন—"আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান-বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

উক্ত ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে ভক্তি-শিক্ষার্থীকে বস্ত্রাদি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি ঈশ্বর-ভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি।" এবং সেবাশিক্ষার্থীকে সাম্নে দাঁড় করিয়ে নতমস্তকে জানুপেতে প্রণাম করে, "বস্ত্র ও পাদুকা উপহার দিলেন।" এবং প্রার্থনায় বল্লেন, "তোমার সন্তানেরা আমার প্রভু, সেই প্রভুদের চরণতলে আমার আসন বিস্তার করিতে দাও।"

(গ) আরও গভীরতর ধর্ম্মসাধনের জন্য কেশবচন্দ্র শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মোড়পুকুরে একটি বাগান কিনে, তার নাম দিলেন "সাধন-কানন"। নীরব নিস্তব্ধ স্থান, চারিদিকে ফুল ফলের গাছ, পাখীর গান, মাঝখানে পুকুর ইত্যাদি। প্রকৃতির সেই রম্য নিকেতন ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে গভীর সাধনের উপযুক্ত স্থান। সে সাধনকাননকে তিনি কি চোখে দেখেছিলেন? সেখানে বসে বলেছেন, "স্বর্গ উদ্যানের মত" "উদ্যান শিক্ষার স্থান" "ফুল যে তোমার গুরু", তার কাছে কোমলহৃদয় হতে শিখতে হবে; "তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে"; "আমরা ইহার পাখী তৃণ ফুল বৃক্ষ লতার নিকট শিক্ষা করিব।" আবার বলেছেন, সংসার-সমুদ্রে কৃত্রিম সভ্যতার ও বিলাসিতার ভীষণ তরঙ্গ মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে "সাধনকানন সেই আলোক-ঘর" যা পথিককে বিপথ হতে বাঁচায়, সুপথ দেখায়। "এখানে সপরিবারে সাধন করিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইব।"

(১৫) সাধন ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনের শেষভাগে, কেশবচন্দ্র আরও অন্তরতর প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং পত্নীর সঙ্গে "যুগলব্রত" গ্রহণ করেন। চিরদিন তাঁরা উভয়ে পরস্পরের সহায়রূপে জীবনপথে চলেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে কেশবচন্দ্র অনুভব করলেন, পত্নীর সঙ্গে আরও গভীর ও জীবন্ত আত্মিক যোগ না হলে, আরও বেশী করে পত্নীর সহায়তা না পেলে, দু'জনে 'একাত্মা' না হ'লে, জীবনের লক্ষ্য, বিবাহের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না, ধর্ম্মজীবন কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ, "স্বামী স্ত্রীকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য শিক্ষা দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য।" তাই পত্নীকে বল্লেন, "আমার সাধন ভজনের প্রিয় সঙ্গিনীরূপে ও অধ্যাত্ম জগতের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে তুমি বিরাজমান।" এবং ভগবানকে বল্লেন, "একা একা তো হবে না। * * আমরা

দুই জনে নারী হইয়া তোমাকে পতিরূপে সেবা করিব।" অসাধারণ শক্তিশালী কেশবচন্দ্র পত্নীর সহায়তা-লাভের জন্ত ব্যাকুল, না হলেই নয়, এই ভাব; এতে তাঁর শিষ্যপ্রকৃতির অপূর্ব্ব প্রকাশ।

(১৬) সাধু ভক্ত, শাস্ত্র, ধর্ম্মবন্ধু, সাধকদল, পত্নী ও পরিবার প্রভৃতির কাছ থেকে শিক্ষা ও সহায়তালাভের জন্ত কেশবচন্দ্র কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন, তার আভাস মাত্র দেওয়া হয়েছে। বহু স্থান এবং বাহ্য বস্তুকেও তিনি শিক্ষার সহায়রূপে বরণ করেছেন। ব্রহ্মমন্দির, সাধনকুটির, তপোধন, সাধনকানন, হিমালয় প্রভৃতি স্থানকে ধর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ স্থানরূপে ব্যবহার করেছেন। আকাশ পাখী, বৃক্ষ লতা, ফুল তৃণ, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। সেই শিষ্যভাব অতি উজ্জলরূপে ও স্থায়িভাবে প্রকাশিত 'নবদেবালয়'-প্রতিষ্ঠায়, (এবং তার পূর্ব্বে প্রত্যেকের উপাসনার স্থান আসন প্রভৃতির ব্যবস্থায়।) ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের গৃহে যোগ-ভক্তি-সাধনের জন্ত একটি স্বতন্ত্র অনুকূল নিভৃত ঘর না থাকলে, সাধন ভজন জমাট বাঁধে না, স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এবং পরমজননীর সঙ্গে তাঁর ভক্ত সন্তানগণের সঙ্গ-সুধা সপরিবারে সবান্ধবে পান করার পথে একটা গুরুতর অভাব থাকে। কেশবচন্দ্রের গৃহে উপাসনার ঘর এবং তাতে নিত্য উপাসনা ছিল; কিন্তু সে ঘরটি তাঁর মনের মত নয় বলে দুঃখ ছিল। সে অভাব-বোধ এত তীব্র যে, শয্যাগত অবস্থায় ভীষণ রোগ-যাতনার মধ্যে, নিজের রোগের কথা ভুলে, 'দেবালয়'নির্ম্মাণের চিন্তায় বিভোর হলেন। 'নবদেবালয়'-প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর অবস্থা অতি খারাপ, বিছানা হতে উঠবার মত অবস্থা নয়; চিকিৎসকগণের বারণ, সকলের নিষেধ, অনুরোধ উপরোধ ঠেলে ফেলে, তিনি উপরের ঘর হতে নীচে যেতে ব্যাকুল। সেই জীবনের শেষ কাজ। সে ঘরের কি মাহাত্ম্য! সে কি সামান্ত স্থান? সেদিন সেই ঘরে বেদীতে বসে বলেছিলেন—* * * "এই দেবালয় তোমার ঘর। * * * এই ঘরে দেশদেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে; এই সহরের কল্যাণ হইবে ও সমস্ত দেশও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। * * তুমি ইহার ভিতর বসিবে, আমরা তোমার পূজা করিব; তাহাতে আমার পাপ-শোণিত বিশুদ্ধ হইবে, আমার পরিবার ও ছেলেপিলে পবিত্র হইবে, বন্ধুগণ পরিত্রাণ পাইবে, সমস্ত পৃথিবীও উদ্ধার হইবে।" ভক্তের পক্ষে উপাসনার ঘর মহামিলন-ক্ষেত্র, স্বর্গের দ্বার, স্বর্গই; তাহাতেই সব সম্পদ, জ্ঞান ভক্তি যোগ লাভের আশা। 'নবদেবালয়' ভক্তের শিক্ষা মন্দির।

কেশবচন্দ্রের শিষ্যপ্রকৃতি ধর্ম্মজগতে অতি অপূর্ব্ব বস্তু। এমন শিষ্য কে কবে দেখেছে? তাঁর নিজের উক্তি দিয়ে তাঁর কথা বলি—"শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল।" "কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী গুরু, মৎস্য গুরু, সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি।" "জ্ঞানের শেষ নাই। কি ভক্তি সম্বন্ধে, কি ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে, শিক্ষার অন্ত হইল না।......যতই শিক্ষা করি, ততই অহংকার চূর্ণ হয়।...... দয়াল নাম কেমন করিয়া করিতে হয়, আজও সম্যক্ জানা হইল না।......প্রেম মানে কি? জানিয়া শেষ করা হইল না।" "কি দিলাম, কি শিখাইলাম, সে দিকে দৃষ্টি হয় না; কি শিখিলাম, কেবল তাহাই দেখি।" "আমি জন্মশিষ্য; জন্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর ফুরাইল না।"

পরম গুরুর পরম ভক্তের এই আদর্শ জীবন সামনে রেখে, কেশবের সঙ্গে প্রার্থনা করি,—"শিষ্য হইয়া চিরদিন তোমার বেদ বিদ্যালয়ে পড়িব।......যতদিন বাঁচিব, আমরা শিষ্যব্রত সাধন করিব, মুক্তিপ্রদ সত্য সকল লাভ করিয়া প্রাণকে সুশোভিত করিব; কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

আত্মনিবেদন

(স্বর্গীয়া দেবী ক্ষীরোদাসুন্দরীর ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে)

দেবি! আজ সেই দিন, যে দিন তুমি পৃথিবীর ঋণ পরিশোধ করে অমর ধামে প্রবেশ করলে! এ দিন আমার নিকট শুভদিন! মৃত্যু যদি অমৃতের সংবাদ বহন করে, যদি অক্ষয়ধামের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, তাকে আমি কেমন করে অশুভ বলব? তোমার চলে যাওয়া আমার নিকট নিরর্থক হয়নি। যে ঘটনার ভিতর দিয়া পরলোক আমার নিকট উজ্জ্বল হয়েছে, যাহার ভিতরে যোগের সন্ধান লাভ করেছি, তাকে অশুভ কেমন করে বলব? এই শুভ দিনের জন্য, হে বিধাতা, তোমাকে প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

এবার সারা বৎসর ধরে তোমার কর্ম্মজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি—তোমার কর্ম্মসাগর মন্থন করে যে দুই একটী উপলখণ্ড সংগ্রহ করেছি, তাকেই দুর্লভ রত্নজ্ঞানে, তার ভিতর তোমার কর্ম্মজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করি।

দেবি! তোমার ত মনে আছে, যেবার সাধু প্রকাশচন্দ্র নববিধান সমাজ, সাধারণ সমাজ, বহু ছাত্র ও ছাত্রী, ধর্ম্মবন্ধুদের নিয়ে মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন—আর সেই মহাযজ্ঞে তিনিই প্রধান হোতা, আর তুমি হলে সেবিকা। সেবাকে অর্চনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করলে। সাত দিন উৎসবের প্রবাহ চলল, তুমি স্বহস্তে রন্ধন করে, পরিবেশন করে, সাধক সাধিকাদের সেবা করলে। শেষ দিন সাধুর আধ্যাত্মিক বিবাহের দিন খগোলে সম্পন্ন হল। ভোজন করে সবাই যখন দানাপুরে রেলে উঠলেন, তুমিও উঠলে—গাড়ী ছাড়িবামাত্র তুমি অজ্ঞান হয়ে

পড়ে গেলে! বাঁকিপুরে রেল থামলে, তোমার অসাড় অচেতন দেহটাকে ষ্টেসন থেকে তোমার সন্তানের ন্যায় যামিনীকান্ত পিঠে করে গৃহে নিয়ে এলেন; কত সেবা, কত চিকিৎসা, কত প্রার্থনা চলতে লাগল। লুপ্ত চৈতন্য আর ফিরে এল না—এক মাস পরে একটু জ্ঞান হলো। একটু যখন কথা বলতে পারলে, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এমন সবল সুস্থ দেহ কিরূপে এমন করে অসাড় ও অচেতন হয়ে পড়ল? তুমি উত্তর করলে, সাত দিন কিছু খাইনি, সবাইকে খাইয়ে কিছু অবশিষ্ট থাকত না। আমি ত শুনে অবাক্! তুমি যে সেবার বেদীতলে তিল তিল করে, হাসিমুখে এমন করে জীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুকে উৎসর্গ করতে পার, শুনে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হলাম! দেবি! তুমি একজন মহানারী! জ্ঞানে নয়, কর্ম্মে! প্রতিভায় নয়, বিশ্বাসে! তপস্যায় নয়, অলৌকিক সেবায়! তুমি একজন মহানারী, এ ধারণা আমার হয়েছে; এ ধারণা আমার সাধনার সিদ্ধি! তোমার ধর্ম্ম ছিল নিষ্কাম কর্ম্ম।

তোমার সেবার আর একটী কথা উল্লেখ করি। যখন আমরা সাহনায়, তখন দুর্ভিক্ষ হল। কেবল খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নয়, জলেরও দুর্ভিক্ষ। চার বছর অনাবৃষ্টিতে নদী নালা পুকুর কুঁয়া সব শুকিয়ে গেছে; একটী মেয়ে পায়খানার ময়লা জল কুকুর বিড়ালের মত চেটে চেটে খাচ্ছে দেখে, শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপালকে লিখলাম। তিনি তিন চারটী সহকর্ম্মী নিয়ে সাহনায় তোমার গৃহে উপস্থিত হলেন। প্রাতঃকালে উঠে ভাই ব্রজগোপাল ও আমি কে কোথায় মৃতকল্প অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কুড়িয়ে আনতাম; একটী দুটী করে ৪০টী বালক বালিকা তোমার গৃহে আনা হল। তুমি একাকী কখন তাদের মলমূত্র পরিষ্কার করছ, কখন সাগু বার্লি তৈয়ারি করে পথ্য দিচ্ছ, কখন যাহারা রোগী তাহাদের পার্শ্বে বসে ঔষধ খাওয়াইতেছ, রাত জেগে সেবা করছ, যেন একা একশত হয়ে সেবায় উন্মত্ত হয়ে রয়েছ। ক্রমে দুই শত ছেলে মেয়ে হল, তখন শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল বল্লেন যে, আমাকে কাজ ছেড়ে কলকাতায় যেতে হবে। তিনি অনাথ আশ্রম খুলে নূতন আদর্শে ছেলে মেয়েদের মানুষ করবেন, আর তোমাকে বল্লেন যে, আপনাকে মা হয়ে এদের ভার নিতে হবে। তুমি বল্লে যে, উনি কাজ ছেড়ে দিলে আমার আপত্তি নাই, তবে আমিও সেবা করতে পারি; কিন্তু আমার ছেলেদের মত ওদের সমান ওজনে রাখতে না পারলে, ওরা আমাকে মা বলে গ্রহণ করবে না। দাদাজী বল্লেন যে, ওরা আপনার মত মা আর কোথায় পাবে? এই কথা শুনে তোমার মন গলে গেল, তুমি রাজী হলে। কিন্তু সাহনা স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত, পলিটিকেল এজেণ্ট আমাদের প্রস্তাব পণ্ড করে দিল। দেবি, এই ঘটনার ভিতর তোমার সেবা আত্মত্যাগ বৈরাগ্য দেখে, শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল, ভাই দীননাথ সবাই অবাক্ হলেন। তোমার মাতৃত্বের সাধনায় বালকবালিকারা নূতন জীবনে ফিরে এল। তারা যখন তোমাকে ঘিরে খাবার জন্য চিৎকার করত, তুমি সেই চিৎকারকে সুমিষ্ট সঙ্গীতের ন্যায় সম্ভোগ করতে। দেবি! আমি ইহার ভিতর তোমার দৈবীশক্তির পরিচয় পাই। দেবতার কৃপা বিনা কোন মানুষই এই অসাধারণ শক্তি লাভ করিতে পারে না।

দেবি! তোমার যেমন সেবা অলৌকিক, তোমার বিশ্বাসও সেইরূপ অসামান্য ছিল। যখন চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে বাঁকিপুরে চিকিৎসা করতে বসলাম, তখন আমাদের হাতে পয়সা ছিল না—প্রতিদিন প্রাতে উপাসনার পর আমরা প্রার্থনা করিতাম, ভগবান, অদ্য আমাদের জন্য অন্ন জল বিধান কর; তিনি আশ্চর্য্য ভাবে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। তোমার সংবেধন নীলমণি একটী স্বর্ণালঙ্কার ছিল, তুমি তাহা বিক্রয় করে এক খণ্ড জমি ক্রয় করলে, সেই জমিতে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলে। জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা নাই, গৃহ নির্ম্মাণ কেমন করে হবে? তুমি উত্তর করলে, যে ভগবান আমার ক্ষুধার্ত্ত সন্তানদের মুখে প্রতিদিন অন্নজল বিধান করছেন, তিনিই তাহাদের মাথা রাখিবার আশ্রয় দিবেন। ক্রমে অর্থাগম হতে লাগল। বাঁকিপুরে গৃহটী তোমার বিশ্বাসের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। প্রার্থনা যে কেবল মানুষকে ক্ষুধার অন্ন দেয় তাহা নয়, পরন্তু মাথা রাখিবার আশ্রয়ও দেয়। তুমি তাহা জীবনে সপ্রমাণ করে গেলে।

দেবি! তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে—মধুর হতে মধুরতর হচ্ছে—প্রথম যৌবনে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী, শেষ যৌবনে সহধর্ম্মিণী, প্রৌঢ়ে ধর্ম্মবন্ধু, বার্দ্ধক্যে সহসাধিকা। তুমি ছিলে আমার ভয়েতে অভয়া—আমার ক্ষীণ বিশ্বাসে দৃঢ় সংকল্প—আমার নিরাশায় আশার জ্যোতি—আমার নির্য্যাতনে শান্তিময়ী সান্ত্বনা—এখন তুমি পরলোকে আমার পথপ্রদর্শক! আমার উপাসনায় তুমি মধুর সংগীত! আমি পরলোকের অনেক রহস্য তোমার সহিত যোগের ভিতর উদ্‌ঘাটন করিয়াছি—উচ্চতর সেবা বন্দনার ভিতর তোমার সাহায্য ও সহানুভূতি আমি এখনও প্রাপ্ত হই। তোমার আত্মিক জীবনের দর্শন ও স্পর্শন এখনও আমার সঙ্গে তোমার নব নব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করছে। শরীরে বাস করে অশরীরী আত্মার সঙ্গে যোগ যে সম্ভব, এই পরলোকসাধনার ভিতরে তার আভাস পেয়েছি।

দেবি! তুমি যখন শরীরে বাস করতে, যখন সংসার করতে, তখন মনে হতো যে, তোমার সন্তানপালন ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই, ছেলেদের মঙ্গলচিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তার বিষয় নাই, সংসারে থাকিয়া গৃহধর্ম্মসাধন অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু তা নয়, যখন উচ্চতর কর্ত্তব্যের ডাক আসত, তখন তুমি সংসার ভুলে যেতে—ছেলে পুলের কথা ভুলে যেতে। যখন তুমি গাজীপুরে, তখন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অতিশয় পীড়িতা, সেবা করিবার কেহ নাই, শুনে তোমার চিত্ত ব্যাকুল হ'ল, তুমি তোমার শিশুপুত্র নব-

জীবনকে আমার কাছে রেখে বাঁকিপুরে চলে গেলে। সাত দিন, দিবসে সেবা, রাত্রিতে রোগীর কাছে বসে রাত্রিজাগরণ করে, অক্লান্ত শ্রম ও যত্ন করে তাঁকে একটু ভাল দেখে, গাজীপুরে ফিরে এলে। তুমি যেমন সংসারধর্ম্ম করতে জানতে, তেমনি সংসারের অতীত হয়ে উচ্চতর সেবার আহ্বান শুনে, নিজেকে উৎসর্গ করতেও অভ্যস্ত হয়েছিলে। সেবা তোমার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রবৃত্তি।

মধ্য রাত্রিতে বাঁকিপুরে একটা ট্রেণ থামত, মাঝে মধ্যে নিরাশ্রয় পথিক তোমার গৃহে আশ্রয়ভিক্ষা করত—অতিথি তোমার দ্বারে আশ্রয়ভিক্ষা করছে শুনে তুমি আর থাকতে পারতে না। কেবল আশ্রয় দিয়া ক্ষান্ত হতে না, সেই গভীর রাত্রে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তার সেবা করে নিশ্চিন্ত হতে। তোমার সময় অসময় জ্ঞান ছিল না—তোমার দিন রাত্রি ভেদ ছিল না—সেবার সুযোগ পেলেই সেবা সাধন করে তুমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করতে।

দেবি! এখন আমি প্রার্থনা করি, যেন তোমার বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবার ধারা তোমার পরিবারের বিশিষ্টতা রক্ষা করে। এই সেবার ধারা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হউক। এখন তুমি আমার প্রতিদিনের উপাসনার সঙ্গে রয়েছ, উপাসনার স্থানেই তোমার স্পষ্ট আবির্ভাব উপলব্ধি করি। অশব্দ কথা দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার ভাবের আদান প্রদান চলে। যে যোগের ভিতর ইহপরলোকের ভেদ চলে যায়, তোমার সঙ্গে একাকার হয়ে বাস করা যায়, তাহারই সিদ্ধি আমি কামনা করছি। এখন যে যোগ মধ্যে মধ্যে হয়, তাহা নিত্য হউক। এই অবিচ্ছিন্ন যোগের ভিতর আমিও নিজেকে ভুলে গিয়ে, যেন তোমাতে ও ভগবানেতে তন্ময় হয়ে, কটা অবশিষ্ট দিন কাটিয়ে যেতে পারি, ঈশ্বর আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একখানি পত্র

London,
C/o. Thomas Cook & Son Ltd.
Berkeley Street,
London W.I.
30-8-38.

শ্রীচরণেষু

অক্ষয়দাদা, পরম জননীর অপার করুণা ও আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে এই সমুদ্রের পরপারে আসিয়াছি। আমার জীবনে যে এ সৌভাগ্য আসিবে, তাহা কখনও তেমন করে ভাবি নাই। স্বপ্নের মত একটী আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে ছিল। তারপর অসুস্থতা সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দেবার মত আগ্রহ জাগিয়ে দিল—তাই আমার মত একজন সামান্য মানুষের এই সৌভাগ্য লাভ। যখন ওখানে ছিলাম, তখন আমরা এ দেশে এসে কি দেখব, তাহা ঠিক বুঝে ছিলাম না; কিন্তু যখন সমুদ্রের ভিতর একেবারে কূল হারিয়ে ভাসতে ছিলাম, তখন আমার পরম পূজনীয় বিনয়েন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব্ব উপাসনার কথা মনে হচ্ছিল—যে উপাসনায় তিনি "Nearer to Thee, Oh God, Nearer to Thee" এইটী উপদেশের বিষয় করে, সকলকে সমস্ত ভুলে এই ভাবটী হৃদয়ের মধ্যে মুদ্রিত করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন! সমুদ্রের ভিতর এসে সত্যই এই ভাবটি প্রাণের ভিতর বিশেষ করে জেগে উঠে। সমুদ্র পার হয়ে যখন ক্রমশঃ প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি মিশর দেশে গেলাম—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য—ভগবান্ মানুষকে নিয়ে কত খেলা করেন, তার বিরাট ব্যবস্থা! আমি লিখতে জানি না, তাই সব সময় ভয় হয়, কি লিখতে কি লিখে ফেলব—সুতরাং এ সব বর্ণনার ভিতর আমি যাব না, শুধু নিজের মনের ২।১টি কথা আপনাকে লিখছি। এই মিশর দেশের তখনকার মানুষরা কি বিশ্বাস করতেন, তা জানি না। তবে মনে হচ্ছিল, তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের দেহের মরণ হলেও আত্মার মরণ নিশ্চয় কখনও হয় না—সে আত্মা যখন ইচ্ছা দেহে ফিরে আসতে পারে—তাই তাঁরা এ দেহকে এত করে অনন্তকাল স্থায়ী করে রাখবার এত প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত টুটানখামানের কবর হতে যে সব দেহ ও বিরাট দ্রব্যসম্ভার অবিষ্কার করা হয়েছে, তা দেখে শুধু মানুষ অবাক্ হয়ে থাকতে পারে না, তাকে ভাবতেই হয়, কেন এত বিরাট আয়োজন? এর মূলে বোধ হয় তখনকার লোকেদের এই বিশ্বাস।

তারপর ইতালির পম্পাই দেশ দেখলাম, মানুষ কত আয়োজন করে বিরাট রাজত্ব নির্ম্মাণ করে, কিন্তু বিধাতার একটু আক্রোশ তা নিমেষে ধ্বংস করে দেয়—তাই সেই বিশাল ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে, মানুষের এই দর্প অহঙ্কার চূর্ণ হতে কতটুকু সময় লাগে?

সেখান হতে সুইজারল্যাণ্ডে—"স্বপ্নের দেশে" গিয়ে তাঁর কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখলাম, আমি কিছু লিখতে চেষ্টা করব না—কারণ সে দৃশ্য লেখা যায় না—শুধু তা ফুটে উঠে মনের পরদায়—অন্তরের অন্তরতম স্থানে তার ছবি যখন ফুটে উঠে, তখন ভাষা ফুরিয়ে যায়, ভাবরাজ্যের সে স্পর্শ মানুষকে কোথায় ডুবিয়ে নিয়ে যায়। তারপর এই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে এলাম—এখানে যা দেখলাম—সে সম্বন্ধেও সেই এক কথা—লিখে কেহ তা শেষ করতে পারে নাই, পারবেও না—সেই জন্য আপনাকে প্রথমে লিখলাম যে, যখন এখানে আমি, তখন কি দেখব—তাঁর লীলার কত প্রকাশ দেখব, তা ভাবতে পারি নাই—আজ যত দেখছি, ততই মাথা নত হয়ে পড়ছে।

জাহাজ হতেই মনে করেছিলাম, ২৭শে সেপ্টেম্বর নিশ্চয় যাব। সেই সংবাদটুকু যদি ধর্ম্মতত্ত্বে দেন, সেই জন্য

একটু লিখে দিচ্ছি। প্রিয় ধীরেন বিশেষ করে বল্লেন, সেই জন্যই আরো লিখছি।

ব্রিস্টলে ২৭শে সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমরা এদেশে আসার জন্য যাত্রা করলাম, তখনই আমাদের সকলের প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ছিল যে, ২৭শে সেপ্টেম্বর নিশ্চয় বৃষ্টলে যেতে হবে। সেদিন সকালেই আমরা প্রস্তুত হলাম—যদিও আমরা ব্রাহ্মসমাজের ৮জন ছেলেমেয়ে একত্রে এলাম, কিন্তু সকলের যাওয়া সম্ভব হল না—আমরা ৫জন একটী মোটরে করে যাত্রা করলাম, —হাওড়ার শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ দাস; তাঁর স্ত্রী ও কন্যা, শ্রীযুক্ত হিমাংশু চাটার্জ্জি ও আমি। লণ্ডন হতে ১২০ মাইল পথ যেতে হবে। সঙ্গে ফুল ও ধূপ নিলাম। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে আমরা ইংলণ্ডের যে বিশেষ গৌরবের জিনিষ—তাহার সুন্দর, সুবিন্যস্ত পল্লিগ্রাম, তাহার মনোরম দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেলাম—এই পথের মধ্যে অক্সফোর্ডের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম। অপরাহ্নে ৪টার সময় আমরা সেই সমাধিতীর্থে উপস্থিত হলাম। এই সুবিস্তৃত সমাধিক্ষেত্রে কত সহস্র সমাধি প্রোথিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আদি ঋষি—রাজা রামমোহনের এই সমাধি-মন্দির—যাহা এক নূতনত্বের ছবি, সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কুমারী আরতি নানা বর্ণের ফুল দিয়ে তাহা সাজিয়ে দিলেন—চারিদিকে ধূপের সুগন্ধে আমোদিত হইল, আমরা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একটী ব্রহ্মসংগীত গান করিলাম, প্রার্থনা করিলাম—"দয়াময়ী জননি, এই নূতন দেশে এনে তোমার কত লীলার প্রকাশ দেখবার সুযোগ দিয়ে তুমি আমাদের ধন্য করিতেছ; আজ এই পুণ্যতীর্থে আমাদিগকে যে সৌভাগ্য দিলে, তাহা যেন চিরদিন আমাদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হয়ে থাকে—তুমি তোমার সেই চিহ্নিত সন্তানকে আদরে ক্রোড়ে নিয়ে বসে আছ, এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে আজ আমরা ধন্য হলাম—সেই ভারতের ব্রাহ্মসমাজের কয়টী ছেলেমেয়ে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তির এই অর্ঘ তাঁর চরণতলে স্থাপন করে কৃতার্থ হলাম। তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর—আমাদের দেশকে, দেশের নরনারীকে আশীর্ব্বাদ কর—বিশেষ করে সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে, যাহা এখন তুমি সর্ব্বধর্ম্মের মিলনক্ষেত্র করে, নূতন করে সাজিয়ে নববিধানে পরিণত করেছ, সেই বিধানকে আশীর্ব্বাদ কর, গৌরবান্বিত কর। ভারতে তুমি তা প্রচার কর, এদেশে যেখানে তুমি তোমার প্রিয় সন্তানের দেহাবশেষ রক্ষা করেছ, এ দেশের লোকের মধ্যেও তা তুমি প্রতিষ্ঠিত কর, তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার নাম ধন্য হোক!"

প্রার্থনান্তে সকলে ভক্তিভরে প্রণত হয়ে আমরা ফিরলাম, এই ছবি আমাদের সকলের জীবনে চির মুদ্রিত হয়ে রহিল।

এখানেই আজ শেষ করি। সকল পূজনীয়গণকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবেন। জানিনা ভক্তিভাজন প্রিয়বাবু এখন কোথায় আছেন, তাঁকে বিশেষ করে আমার কথা বলবেন। শতবার্ষিকে যোগ দেবার জন্য প্রাণ বড় ব্যস্ত হয়েছে, জানি না, কি রকম করে তা সম্ভব হবে—তবে আমরা চেষ্টা করব, এ সুযোগ ছাড়তে কি কেও চায়?

আপনাদের স্নেহের—প্রবোধ।

(রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়)

নূতন সঙ্গীত

(৺অমৃতলাল সেনের শ্রাদ্ধবাসরে গীত)

(১)

তোমারে করিনে সংশয়,
জয় হে, জয় হে তব জয়।
যতই কঠিন করে হানো,
তবুও দু'হাত ভ'রে দানো,
তুমি সুন্দর, চির প্রশান্তিময়,—
তোমারে করিনে সংশয়।
আমার দুঃখ যেথা জাগে,
সেথা তুমি জাগো অনুরাগে;
বেদনা-ক্লান্ত প্রাণে এসে,
দাঁড়াও যে চিরমধু বেশে,
তব হাসি দেখে, প্রাণে জাগে নির্ভয়।
তোমারে করিনে সংশয়॥

(২)

এই ঘরে যে ছিলো আমার এতোদিনে,
সে যে তোমার কাছে চলে গেছে তোমায় চিনে।
দীর্ঘ দিনের মেলামেশা টুটে গেল,
তোমায় পাবার তরে সে যে ছুটে গেল,
সংসারের এই হাটের থেকে
তুমিই তারে নিলে কিনে।
নানা পরিচয়ের ডোরে হেথায় সে যে বাঁধা ছিলো,
তারি ফাঁকে সঙ্গোপনে প্রাণে তোমায় চিনে নিলো;
দিন গিয়েছে যতো তারে কোলের পানে
টান্‌লে তুমি তোমার আপন করার টানে,
চলে যাবার সুর বাজালে
তুমি তাহার প্রাণের বীণে॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন।

সংবাদ।

শারদীয় উৎসব—গত দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৫দিন নবদেবালয়ে সস্ত্রীক ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। মহা অষ্টমীর দিনে সন্ধ্যার বিশেষ ভাবে আরতি হয়। সেই দিন ফলাদি মঙ্গলপাড়ার বাড়ী বাড়ী কিছু বিতরণ করা হয়।

ঢাকা নগরে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্‌টোবর পর্য্যন্ত চারিদিন শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

গত শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে নবশ্রীক্ষেত্রে প্রেমাশ্রম হলের বারাণ্ডায় ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

বিশেষ উপাসনা—ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীদরবারস্থ সেবিতগণের সমযোগে শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে যে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" মহাগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, তাহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ, অনেক দিন হইল, অপ্রাপ্য হইয়াছে। এইজন্য শ্রীদরবারের অনুমতি লইয়া, এলাহাবাদের শ্রদ্ধাস্পদ অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহা আয়োজন করিয়া, কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন। মুদ্রণান্তে ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগে, ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা-অর্পণের জন্য এবং সাহায্যদাতাদিগকে ধন্যবাদ দিবার জন্য, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জি বিশেষ প্রার্থনা করেন।

উৎসব—গত ২৭শে আগষ্ট, চুঁচুড়ায় বিশেষ ভাবে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, শ্রীমান্ দিগিন্দ্রলাল সেন, শ্রীমান্ সুধাকুমার নাগ তথায় গিয়াছিলেন এবং তত্রত্য ডাঃ আত্মজ্যোতি সেন এম.বি. সস্ত্রীক ও সসন্তান এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এবং পাড়ার ২১জন লোক যোগ দিয়াছিলেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভক্তিভরে উপাসনাদি করেন। সকলেই উপাসনা ও কীর্ত্তনাদিতে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে, গত ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই ও ১৯শে অক্‌টোবর ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শততম জন্মোৎসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিবরণ পরে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৩শে অক্টোবর, কৃষ্ণনগরে, ভেটেরিনারী ইন্‌স্পেক্টর ডাঃ অমূল্যকুমার রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া পবিত্রা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাসুর শ্রীযুক্ত কুসুমকুমার রায় সতী লক্ষ্মী ভ্রাতৃবধূর সদ্‌গুণাবলী সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। মহিলাগণ সুমধুর সংগীত করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বন্ধুবান্ধবগণ এবং কলিকাতার আত্মীয়গণ যোগদান করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত ১৫ই অক্টোবর, কলিকাতায়, ৮নং লিটন্ ষ্ট্রাসেল ষ্ট্রীটে, মাননীয়া লেডি গোবিন্দমোহিনী সিংহ, ৬৯ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন। গত ৩০শে অক্টোবর উক্তভবনে সন্তানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। তিনি অনাসক্তি, পতিভক্তি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, সাহিত্যপ্রিয়তা, দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, অমায়িকতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা এবং সুমাতা ও সুগৃহিণী ছিলেন।

গত ২২শে অক্‌টোবর, কাঁথিতে, তত্রত্য বিশিষ্ট নেতা, ব্রাহ্মসমাজের ও 'নীহার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা, ৮৬ বৎসর বয়সে, নিঃসন্তান অবস্থায় রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি বড়ই অমায়িক, নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অভাবে দেশের ও ব্রাহ্মসমাজের বড়ই ক্ষতি হইল।

মা পরলোকগত আত্মা সকলকে তাঁর শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকসন্তপ্ত সন্তান সন্ততি ও পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই অক্টোবর, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দানুজ ৺কৃষ্ণবিহারী সেনের কন্যা ৺পরমা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বেলা দেবী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৯ই অক্টোবর, ৫ সি হরিপাল লেনে, শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসুর গৃহে, তাঁহার শ্বশুর ৺অনুকূলচন্দ্র রায়ের এবং জ্যেষ্ঠ শ্যালক ৺নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী সুষমা বসু পিতৃদেবের সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি দেবগুণ, দাদা নির্ম্মলচন্দ্রের জীবনের নির্ম্মলতা উল্লেখ করিয়া এবং নবপরিণীতা পতিবিধুরা সতীলক্ষ্মী বৌদির কল্যাণ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করেন।

অদ্য কুলটীতেও শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায়ের কর্ম্মস্থলে, বাবা ও দাদার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের শোকসভা এবং ছোট বালকবালিকাদের খাওয়ান হয়েছিল।

গত ১১ই অক্টোবর, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব সাধক ৺নৃত্যগোপাল মিত্রের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে।

গত ২৯শে অক্টোবর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দানুজ ৺কৃষ্ণবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৩০শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, ৺রমেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং ভাদ্রোৎসবে ১ টাকা দান করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। ১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ ব্রাহ্মাব্দ
17th. November, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা নববিধানবিধায়িনী, নবশিশু শ্রীকেশবের জননী, শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞ তুমি ত আরম্ভ করিলে। তুমি, মা, ভক্তকোলে ভগবতীরূপে সকল ভক্ত সন্তানকে লইয়া ইহা সম্পাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। এ যজ্ঞ কি ভাবে সম্পন্ন করিবে, আমরা জানি না, তুমিই জান। জানি, তুমি সন্তানবৎসলা মা, তুমি স্বয়ং শতবর্ষ পূর্ব্বে, ভারতের এবং জগতের সংশয় আঁধার, আমিত্বের অমানিশা দূর করিতে এবং মানবে মানবে অপ্রীতি, অপ্রেম, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি নিবারণের জন্য, বিশ্বাকাশে আশাচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে, পূর্ণ মা, তোমার কোলে উদয় করাইলে। জড়বাদ, ভেদবাদ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে ধরা যে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা তিরোহিত করিয়া, নববিধানের নব নব জীবনপ্রদ বসন্ত-সমীরণ বহাইলে। বিশ্বে, নবশ্রীক্ষেত্র নববৃন্দাবন দেখাইলে ও তাহার চির প্রতিষ্ঠা করিবে, আশা দিলে। এখন, মা, শতবর্ষ পূর্ণ হইল; তুমি যা আশা দিলে, তা পূর্ণ কর। অন্ধকে চক্ষু দিবে, তোমায় প্রত্যক্ষ দেখিতে। বধিরকে কর্ণ দিবে, তোমার আদেশবাণী শুনিতে। পাপা-হত নারকীকে নবজীবন দিয়া উদ্ধার করিবে এবং সমস্ত বিশ্বমানবকে পরিবর্ত্তিত জীবন দিয়া, তোমার এক অখণ্ড পরিবার গঠন করিবে। সকল ধর্ম্মের মিলন হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ধর্ম্মের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে এবং মানবে মানবে চিরমিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভাই ভাই, ভগ্নী ভগ্নীরূপে নরনারী পরস্পরকে তোমারই পুত্রকন্যা জানিয়া সংবর্দ্ধনা করিবে; শুধু তাহাই নয়, একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে বিশ্বাস করিয়া, এক অখণ্ড মানবত্বে রূপান্তরিত হইবে। যথার্থ মানবজন্মের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা প্রতি মানবজীবনে প্রতিফলিত হইবে। তাহাতে কেবল সকল প্রকার পাপ দুর্নীতি এবং ষড়রিপুর রাজ্য ধ্বংস হইবে, তাহা নহে, ধরায় তোমার স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্যই ত তুমি আমাদের ন্যায় সকল পাপী মানবকে কেশবচন্দ্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রথিত করিলে। তবে তাঁর এই শততম জন্মদিনে, আমাদিগকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে এই বিশ্বমানবজন্মদানে ধন্য কর। শ্রীকেশবচন্দ্র বিশেষভাবে আমাদের জন্য তাঁহার জন্মদিনে প্রার্থনা করিলেন, "আজ আমার জন্মদিন, ইহাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন।" মা, আশীর্ব্বাদ কর, শ্রীকেশবচন্দ্রের এই প্রার্থনা যেন এবার আমাদের জীবনে পূর্ণ হয়। যদি আমাদিগকে কেশবচন্দ্রের সহিত

এক অঙ্গ করিয়া নববিধানে জন্ম দিয়াছ, তবে আমাদের স্বতন্ত্রতা এবং আমিত্ব তাঁর এক অখণ্ড মানবত্বে নিমজ্জিত কর, এবং তাঁহার সহিত এক পরিবর্ত্তিত নব মানবজন্ম দান কর। আমরা সঙ্গতের নীতি অনুসরণ করিয়া, মুঙ্গেরের ভক্তি সাধন করিয়া, নববিধানের জীবন প্রতি-জীবনে প্রতিফলিত করিয়া, কেশব সঙ্গে এককায়মনপ্রাণ হই; এবং তিনি যেমন প্রার্থনা করিলেন, তেমনি তোমাতে, তোমার বিধানেতে, তোমার প্রত্যাদেশে এবং তোমার ভক্তে পূর্ণ ষোল আনা বিশ্বাস দিয়া, স্বর্গলাভের উপযুক্ত হই। যেন সমগ্র মানবপরিবারকে বুকে লইয়া তোমার ব্রহ্মানন্দে বিলীন হই। আমাদিগকে দয়া করিয়া এমন শুভ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

শ্রীকেশবচন্দ্রের নব শততম জন্মযজ্ঞ

শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষ দিন পূর্ণ হইল। এই দিন জগতের পক্ষে মহাদিন। সত্যই এমন বড়দিন জগতে আর হয় নাই। বিশ্বজননী তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কৃপাগুণে যদি এই মহাদিন আনিলেন, আমরা সমগ্র মানবপরিবারের সহিত সমযোগে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হই। এবং এই দিনে তিনি যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে যেন আহুদান করিয়া ধন্য হই। এবং প্রার্থনা করি, মা সমগ্র মানবপরিবারের ভাই ভগ্নীদিগকে এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিতে সম্মিলিত করুন এবং আমরাও সকলকে সাদর অন্তরে অভিনন্দনদানে আহ্বান করিতেছি।

সর্ব্বধর্ম্মবিধানই শিক্ষা দেন, ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ধর্ম্ম-বিধানকেই বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঈশ্বরের পিতৃত্বই সকল ধর্ম্মে সমাধান হইয়াছে। মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক ঈশ্বরের পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই জন্য নিরাকারে, দেবদেবীর আকারে, শাস্ত্রের আকারে, মানবাকারে যে ঈশ্বরের পূজা, তাহা ঈশ্বরের পিতৃত্বসাধন ভিন্ন আর কি?

তাই বিশেষভাবে মানবত্বে ভ্রাতৃত্ব-সমাধানের জন্য পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক নববিধান প্রেরিত। এবং কেশবচন্দ্রকে তাহাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পবিত্রাত্মা নববিধানে জন্মদান করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র ব্রহ্ম-প্রেরণায় যুগধর্ম্মবিধানকে নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং জীবনে তাহা সাধন করিয়া নববিধানে নূতন মানুষ হইলেন।

বিজ্ঞান যেমন কয়লা হইতেও চিনি বাহির করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, নববিধান-বলে শ্রীকেশবচন্দ্র তেমনই ব্রহ্মকৃপায় চিন্ময়, অনন্ত, জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বত্র মাতৃরূপে দর্শন করিলেন এবং মৃন্ময় দেবদেবী এবং শাস্ত্রাদির ভিতর হইতেও সেই চিন্ময় নিরাকার ঈশ্বরকে বাহির করিয়া পূজা করিলেন। সকল ধর্ম্মবিধানের ভিতর হইতে একেরই মহিমা উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু সকল যুগাবতারের ভিতর হইতে মানবত্ব বাহির করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব আত্মস্থ করিলেন এবং আপন জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিলেন।

এইরূপে নরনারীর ভিতরেও ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্যার রূপ দেখিয়া, ভ্রাতা ভগ্নী নির্ব্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করিলেন; এবং এক মানবত্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া সকলকে আত্মজীবনে গ্রথিত করিলেন। ইহাই যথার্থ মানবে মানবে ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠা।

মানবের পাপপ্রবণতা তাহার অপূর্ণতার ফল। শরীরের পক্ষে রোগ যেমন, মনের পক্ষে পাপ তেমন। রোগীর রোগ অস্থায়ী এবং চিকিৎসার দ্বারায় মোচন হয়; তেমনই রোগী সন্তানকে যেমন মা ভালবাসিয়া সুস্থ করেন, তেমনই ভাইবোনেরাও সেবা দ্বারায় সুস্থতাবিধানে সহায়তা করেন। তাই মানবের দোষ দুর্ব্বলতার বিচার করিলেন না, কেবল তাহাদের ঈশ্বর-পুত্রত্ব গ্রহণ করিয়া, কেশবচন্দ্র ভ্রাতৃযোগ সাধন করিলেন। মানবের অপূর্ণতা বা পাপপ্রবণতাও সহানুভূতি-যোগে আপনার বলিয়া, আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন।

তিনি কোন মানবকে নীচ মনে করা কিম্বা কাহারও বিচার করা অপরাধ মনে করিতেন। এবং সকল মানব আমাতে এবং আমি সকল মানবেতে, "আমার ভাই ও আমি এক" ইহা সাধন করিয়া তিনি এক অখণ্ড বিশ্বমানবত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভেদাভেদ, ধর্ম্ম ভেদ জাতিভেদ, দেশভেদ, বর্ণভেদ নিবারণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ইহাই ত যথার্থ মানবের ভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার উপায়। তাই কেশবচন্দ্রকে মানবত্ব ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ পুরুষ করিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে নববিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মনন্দন এবং অন্যান্য যুগাবতারগণ "আমি ও আমার পিতা এক" বলিয়া ব্রহ্মযোগের আদর্শ দেখাইলেন; তেমনই নববিধানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'আমি এবং আমার ভাই এক', ইহা সাধন করিয়া ভ্রাতৃযোগের পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। তাই পূর্ব্বে যেমন গীত হইয়াছিল, 'স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত হউক, মর্ত্তে মানবে মানবে প্রীতি এবং শান্তি সংস্থাপিত হউক', তাহা কেশবজীবনে সপ্রমাণিত হইল। শ্রীকেশবের শততম জন্মযজ্ঞে যেন আমরা তাঁহার সহিত এই বিশ্বমানব-জন্ম লাভ করিয়া, সমস্ত মানবজাতির সহিত একজাত হই। এবং তাঁহার সহিত, 'মা আমাদের, আমরা একই মার, ভাই আমি কাকার' এই গান বিশ্বমানবের সঙ্গে সমস্বরে ধ্বনিত করি। বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্রের এই শততম জন্মযজ্ঞ যেন সর্ব্বমানবের নবজন্মযজ্ঞ হয়। মা এমন শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীকেশবচন্দ্র এক মহান্ নববার্ত্তা লইয়া মানবদেহে জন্মলাভ করিলেন। এই নববার্ত্তাকে তিনি নববিধান নাম ঘোষণা করিলেন। ইহার অর্থ, নিত্য নবজীবন। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা বিনা জীবন হয় না, তাই তিনি জীবন্ত অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করিলেন, এবং জীবন্ত ঈশ্বর অনন্ত প্রেমরূপিণী মাতৃরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন। মা সন্তানবতী না হইলে মা হন না, তাই জীবন্ত মার পূজায় জীবন্ত সন্তানের জন্ম লাভ হয়। এইজন্য জীবন্ত মাতৃসন্তানত্ব বা বিশ্বমানবত্বের পরিচয় দেওয়াই যে মানবত্বের উদ্দেশ্য, তাহাই তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং মা যেমন প্রেমময়ী হইয়া সকল সন্তানকে ভালবাসেন, তেমনি মার সন্তান হইলে মার সকল সন্তানকেও ভালবাসিতে হয়। তাই শ্রীকেশবচন্দ্র জীবন্ত মার পূজা করিয়া যেমন জীবন্ত মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন, তেমনি সকল মানবকে একই মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং মানবভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ধর্ম্মই এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু ইহা মতে মানিয়াও যথার্থ কার্য্যে, জীবনে, চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিফলিত হয় নাই; তাই কেশবচন্দ্রের নববার্ত্তা এই, যা মানিব, তাহা জীবনে হইব ও দেখাইব এবং কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিব।

পূর্ব্বে ঈশা ঈশা মুখে বলিয়াও, ঈশা গৌরাঙ্গের পা ধরিয়া টানাটানি করিয়াও, এবং সব মানুষকে মতে ভাই স্বীকার করিয়াও, পৃথিবীতে মানুষের যে হীনতা, তাহাই রহিল। ধর্ম্মজগতেও ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ সংগ্রাম আনিল। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিয়া দূর পর ভাবিল, শুধু তাহাই নহে, একজন আর একজনকে দমন করিয়া, একজন আর একজনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, একজন আর একজনের অধিকার লোপ করিয়া, আপনি বড় হইয়া বাহাদুরি দেখাইল। একজাতি আর একজাতিকে পদদলিত করিল এবং তাহাই মানবের মানবত্ব বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র এই সকলের প্রতিবাদ করিবার জন্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বমানবরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ কেমন হইতে হয়, তাহাই দেখাইলেন।

তাই তিনি বলিলেন, ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলেই হইবে না। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, সেই আদর্শে পূর্ণ হইতে ও নিত্য নব উন্নতিতে প্রগত হইতে আকাঙ্ক্ষিত হওয়াই প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা।

ঈশা ঈশা, গৌর গৌর বলিলেই হইবে না, ঈশা গৌর হইতে হইবে। তাঁহারা যেমন বলিলেন, 'যে আমাকে দেখেছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে', তেমনি ঈশা, গৌরাঙ্গকে জীবনে দেখাইতে হইবে এবং ভাই ভাই কেবল মুখে বলিলে হইবে না, ভাই আমি এক হইতে হইবে। ভাই আমি যে একই মানবত্বে গঠিত, সেই ভাবে আত্মবৎ ভাই ভগ্নীকে এক মার ভালবাসায় ভালবাসিয়া, একাত্মা এককায়মন বলিয়া আদর করিতে হইবে।

ইহারই জন্য শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্ম। এই জন্মযজ্ঞে আমরাও যেন সেই একই মানবজন্ম লাভ করিয়া, তাঁহার সহিত এই মানবজন্মকে সার্থক করি এবং কেশবচন্দ্রের যে জীবনবার্ত্তা প্রকৃত মানবত্ব-প্রতিষ্ঠা এবং এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব-সমাধান, তাহাই জীবন দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারি।

—•—

শ্রবণ ও দর্শন

চক্ষু যাহার অন্ধ, সে কাহাকেও দেখিতে পায় না। কিন্তু কথা শুনিলে চিনিতে পারে। এই জন্যই শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন,

ব্রহ্মবাণী-শ্রবণই ব্রহ্মদর্শনের প্রমাণ। চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্মকে কেহ চক্ষে দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি প্রত্যেক মানবের ভিতরে বিবেকবাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার পরিচয় দিতেছেন; তাই সহজে প্রত্যেক মানুষই অন্তরে ব্রহ্মবাণী শুনিতে পায় এবং সেই মতে চলিলে ব্রহ্ম তাহার নিকট চিন্ময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই ভাবে ব্রহ্মবাণী-শ্রবণে সিদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মদর্শন শ্রবণ সহজ বলিয়া জীবনে প্রমাণ করিলেন।

মানবাত্মার জন্ম

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত; তাই নিরাকার ঈশ্বরকে জীবনে দেখাইবার জন্য, এই মানবজন্মে শ্রীঈশা বলিলেন, যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে। তিনি দেবমানবরূপে পরিচিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাতে দেবত্ব আরোপ করিয়া, তাঁহার মানবত্ব ভুলিয়া গেলেন। এইজন্য নববিধানে শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণরূপে দেখিলেন এবং দেখিতে শিখাইলেন, তেমনি ব্রহ্মনন্দনকে মানবসন্তানরূপে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, যে আমাকে দেখিয়াছে, সে আমার ভিতর ঈশা গৌরাঙ্গকে দেখিবে। তাঁহাদের মানবত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে জীবনে প্রদর্শন করিতে হইবে, ইহাই শিখাইলেন; শুধু তাহাই নহে, সকল নর নারীর মধ্যেও সেই ব্রহ্মসন্তানত্ব দেখিয়া, আপনার বক্ষে গ্রহণ করিলেন ও ভালবাসার দ্বারা সকলকার সঙ্গে এক হইলেন। ইহাই যথার্থ পূর্ণমানবত্বলাভের সাধন। ইহাতে মানবত্ব এবং মানব-ভ্রাতৃত্ব সমন্বিত।

—০—

উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব

চতুর্থ প্রবন্ধ

উপনিষদে সার্ব্বজনীন সাধনপথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই আত্মবোধ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য কত উদাহরণ দ্বারা মৈত্রেয়ীকে বুঝাইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য একথা বলিলেন না যে, স্ত্রীর মধ্যে স্বামী নিজেকে দেখিয়া বা স্বামীর মধ্যে স্ত্রী নিজেকে দেখিয়া প্রীতিসাধন করেন; বরং "নিজ"কে না বলিয়া "আত্মা"কে বলিলেন। এই 'আত্মা' শব্দটী 'নিজ' হইতে (আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনুরূপ হইলেও) সাধারণভাবে পৃথক। 'নিজ' শব্দ মানুষকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় ও আপন অভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। 'আত্মা' শব্দ সাধকের জীবন-কেন্দ্রকে ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া থাকে ও সকল অভাবের পূর্ণতার ক্ষেত্রকে দৃষ্টিগোচর করায়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে সর্ব্বশেষে বলিলেন, "এই আত্মা অবিনাশী এবং উচ্ছেদবিহীন"। অতএব সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহলোক, পরলোক, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত জুড়িয়া ও সকলের অতীত থাকিয়া, একই আত্মা ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে। তাহারই ইঙ্গিতে, তাহারই ভরসামত, তাহারই ধর্ম্মানুযায়ী (অর্থাৎ প্রীতির আকর্ষণ অনুসারে) প্রত্যেক মানুষের চলাই মানুষের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আত্মীয়বন্ধু হিসাবে যে সম্পর্ক সতত জন্মাইতেছে, তাহা স্বীকার করিয়া, প্রত্যেক মানুষকে তাহার ভিতর দিয়া, সর্ব্বকালের সকল জীবের জগন্মণ্ডলে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। দেশভ্রমণ, ইতিহাসপাঠ, বিজ্ঞানশিক্ষা, শাস্ত্র-পাঠ সমস্তই এই আত্মসত্তার পরিচয়লাভের জন্য মানুষের প্রয়াস। এই সমস্ত রকমে প্রয়াসী না হইলে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে যে পরিমাণে ক্ষতি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে-ছেন, "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করি, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি (স্বর্গাদি) লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, লোকসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি বেদ সমূহকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, বেদসমূহ তাহাকে পরি-ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ, এই বেদসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদায় বস্তু, এ সমুদায়ই আত্মা।"

তাহা হইলে ইহাই অনুভব করিতে হইবে যে, মানবজীবন বলিতে, মানুষের অন্তর জগতের আত্মার সহিত তাহার বহির্জ্জগতের আত্মার সংস্পর্শ বোঝায়। অথচ উভয় আত্মাই এক। জীবনে এই সংস্পর্শ পলে পলে বোঝা যায় ও বুঝাইতে ইচ্ছা করে বলিয়া, জীবন যাহা তাহা। কিন্তু এই ভিতর বাহিরের ওতপ্রোত আত্মাকে মানুষের নিকট কে প্রকাশিত করিয়া দেয়? ঐ একই শক্তি—আত্মা। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, রাত্রির অন্ধকারে যেমন কয়েকটি মুখ, কয়েকটি স্থান, জীবনের কতকটা অবসর সমস্ত অন্তর জুড়িয়া শান্তি দেয়, সেইরূপ এই আত্মার সাহায্যে পরিবারস্থ বা সমাজের কয়েকটি লোককে আপনার জানিয়া মানুষ সান্ত্বনা জুড়ায়; কিন্তু রাত্রি অবসান হইলে পর, নূতন জীবন আরম্ভ হইলে, আবার যেমন নূতন সব সত্তার পরিচয় লাভ করিতে থাকি, আরও কতকগুলি মুখ, আরও কয়েকটি স্থান, আরও খানিকটা জীবনের সময় বুকের মধ্যে স্থান জুড়িয়া লয় ও মানুষকে আনন্দ দেয়, সেইরূপ যাহা কিছু অব্যক্ত রহিয়াছে, তাহা সমস্তই ক্রমশঃ ব্যক্ত হয়, মানুষের প্রীতির মধ্যে স্থান পায় ও ব্যক্ত

আত্মার সাহায্য আত্মার অব্যক্ত অংশের স্ফুরণ হইলে, আত্মার ব্যাপ্তিকে অনুভূতির বিষয় করিয়া দিতে থাকে। আবার ব্যক্ত সত্তার টানে অব্যক্ত সত্তার প্রকাশ ক্রমশঃ জীবনে শেষ হইলে পর, আর এক অবস্থা জীবনে আসিয়া থাকে, যখন যাহা কিছু ব্যক্ত, তাহা সমস্তই অব্যক্তে বিলীন হয়। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ও ব্যক্ত হইতে পুনরায় অব্যক্তে পৌঁছান, এ সকলই আত্মার লীলা। এই প্রকার লীলার পরিণামে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়া, যাহা পাইয়াছি এবং যাহা পাই নাই, যাহা দেখিয়াছি ও দেখি নাই, যেখানে গিয়াছি ও যাই নাই, যে সময় থাকিয়াছি ও থাকি নাই, সমস্ত জুড়িয়া একই আত্মা সাধকের ভিতর বাহির অবলম্বন করিয়া নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, এইরূপ অনুভূতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, আত্মপ্রীতির অক্ষয় স্থিতি হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বমানবকে এই পথ দেখাইয়াছেন।

বহু শতাব্দীর পর অনুরূপ পথের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া খ্রীষ্ট বলিলেন, "আপন প্রতিবেশীকে আত্মতুল্য প্রীতি কর (Love thy neighbour like thyself)। এই উক্তির ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রতি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে এবং আমার বিশ্বাস, যে ভাবে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের বাণী বুঝিয়াছি, ঠিক সেই তাৎপর্য্যে না পৌঁছাইতে পারিলে, খৃষ্টের এই বাণী যথার্থভাবে গ্রহণ করা হইবে না। দার্শনিকগণ হয়ত বলিবেন, যাজ্ঞবল্ক্য এক আত্মার যে অখণ্ডভাবে অবস্থিতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টের বাণীতে পাই কৈ? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, খ্রীষ্টের বাণী বুঝিতে বুঝিতে ও সেইমত জীবনে অগ্রসর হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্যের উপলব্ধিতে পৌঁছান যায় ও উভয়ের মন্তব্যের ঐক্য তখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তবে একমাত্র সত্য যে, যাজ্ঞবল্ক্য মানবের পরিপূর্ণ উপলব্ধিকে চুম্বকে বলিয়া গেলেন ও খৃষ্ট সেই বাণী এমন সাধনোপযোগী (practical) করিয়া প্রচার করিলেন, যাহাতে সাধারণ মনুষ্যের জীবনে ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত সেই ইঙ্গিত হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্ট ও যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মপ্রীতির অনুশাসন সম্বন্ধে ঐক্য দেখিয়া, আর একটি বিষয়ে মন দিতে চাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলেই কিংবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়।" বীণার পূর্ব্বে দুন্দুভি ও শঙ্খের দৃষ্টান্তও তিনি লইয়াছেন এবং ঐ একই ভাবের কথা বলিয়াছেন। উপমার একটি দিকমাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতির জন্য যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা উহ্য রহিয়া গিয়াছে। মৈত্রেয়ী তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিয়া, বোধ করি, মৈত্রেয়ীর নিকট ইহার বেশী বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই উপমা হইতে নানাপ্রকার অর্থের সূচনা হওয়া মোটেই অসঙ্গত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপথের সাধকগণ যেরূপ অর্থ গ্রহণ করুন, আমরা কিন্তু এই উপমাগুলির মধ্যে একটি গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত পাইতেছি, যাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়িয়া যাজ্ঞবল্ক্য নিজ জীবন ও সাধনার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই তত্ত্বটি, "আত্মপ্রীতি" সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহারই সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।

প্রীতি মানবজীবনে যতই বাড়িতে থাকে, জ্ঞানও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সেই জ্ঞানের দুইটি পথ আছে, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের পথ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছান যায় ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথ দিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য এই সকল বিষয়ে নানাভাবে নানাস্থানে বলিয়াছেন ও আমরাও যথাসাধ্য পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তাহারই ইঙ্গিত যাজ্ঞবল্ক্য এই উপামাগুলিতে জানাইতেছেন। "বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না" অর্থাৎ এই জগৎ সংসার সমস্তই অজ্ঞাত রহিয়া যায়; কিন্তু "বীণাকে গ্রহণ করিলে' অথবা "বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়" অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিলে কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলিলে পর, সমস্ত জগৎ সংসারকে পরিষ্কারভাবে তাহার মর্য্যাদা মত জানা যায়। অতএব বীণা, শঙ্খ বা দুন্দুভি এই উপমাগুলির অর্থ আত্মা ও বীণাবাদক, শঙ্খবাদক ও দুন্দুভিবাদক শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বুঝায়, ইহাই আমরা নিজ অন্তরে বুঝিয়াছি।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম অনুশাসন ছিল, আত্মপ্রীতি। খৃষ্টের আদেশ "Love thy neighbour like thyself" এই সঙ্গে বিচার করিতে আমরা অনুরোধ করিয়াছি। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দ্দেশ অনুসারে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পথ লইলে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবে, এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া খ্রীষ্টের অপর আদেশ "Love thy God with all thy might" ইত্যাদি সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করি। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, খৃষ্ট কেবলমাত্র (ব্রহ্ম-অনুভূতিকে সার জানিয়া) ব্রহ্মসাধনার পথ অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মসাধনা বা আত্মার সাধনা যে পথ তোমার স্বাভাবিক, সেই পথে যাইতে পার। বলা বাহুল্য, যাজ্ঞবল্ক্যের বাণীতে জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের, সকল পথের সংবাদ আমরা পাইতেছি।

আর একস্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের ও খ্রীষ্টের বাণীর তুলনামূলক বিচার এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। খৃষ্ট বলিলেন, "Think not that I came to destroy the law or proph ts: I came not tot destroy, but to fulfil." অর্থাৎ "আমি ধর্ম্মরাজ্য ধ্বংসের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আসি নাই, বরং ত্রুটি-পূরণের জন্য আসিয়াছি।" অতীতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা হইলে খৃষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ও খুব সম্ভবতঃ ইহাই জানাইতে চাহিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার

জীবন ও বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছে। অপর দিকে যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে বিলুপ্ত রাখিয়া, জগৎ সংসারের সমস্ত অধ্যাত্ম বিদ্যা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সব মহাপুরুষমণ্ডলী যে সবই একই আত্মার অভিব্যক্তি, তাহা জানাইতে গিয়া বলেন, "যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক ধূম নির্গত হয়, তেমনই এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষদসমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যাসমূহ, ইষ্ট, হুত, অন্ন, পান, ইহলোক ও পরলোক এবং সমুদায়ভূত এই মহাভূত হইতে নিশ্বসিত হইয়াছে—এই সমুদায়ই ইহা হইতেই (আত্মা হইতে) নিশ্বসিত হইয়াছে।" আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একীভূত হওয়ার দরুণ, এস্থলে 'আত্মা' অর্থে জীবাত্মা যখন পরমাত্মাতে লীন হইয়াছে, তখনকার সেই পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

আবার জীবাত্মার সহিত সকল ধর্ম, সকল শাস্ত্র ও সকল মহাপুরুষের নিগূঢ় যোগ দেখাইতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন, "যেমন সমুদ্র সমুদায় জলের একায়ন, এইরূপ ত্বক্ সমুদায় স্পর্শের একায়ন, নাসিকাদ্বয় সমুদায় গন্ধের একায়ন, এইরূপ জিহ্বা সমুদায় রসের একায়ন, এইরূপ চক্ষু সমুদায় রূপের একায়ন, এইরূপ মন সমুদায় সঙ্কল্পের একায়ন, এইরূপ হৃদয় সমুদায় বিদ্যার একায়ন, এইরূপ হস্তদ্বয় সমুদায় কর্ম্মের একায়ন, এইরূপ উপস্থ সমুদায় আনন্দের একায়ন, এইরূপ পায়ু সমুদায় মলত্যাগের একায়ন, এইরূপ পদদ্বয় সমুদায় গতির (বা পথের) একায়ন, এইরূপ বাক্যসমূহ বেদের একায়ন (তেমনই এই আত্মা এই সমুদায়েরই একায়ন)।" (একায়ন শব্দের অর্থ মিলনস্থল।)

উপসংহারে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমাদের নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চাই :—

(১) বিষয় সম্পত্তিতে অমৃতত্ব নাই।

(২) আত্মপ্রীতির প্রসারণে অমৃতত্ব আছে। প্রীতি বাড়িলে আত্মার প্রসারণ হইবে অথবা আত্মার প্রসারণ হইলে প্রীতির কেন্দ্র বর্দ্ধিত হইবে।

(৩) প্রীতির সাধনে জ্ঞান জন্মাইবে। তাহা ব্রহ্মজ্ঞানই হউক, অথবা আত্মজ্ঞানই হউক, উভয়ই সম্পূর্ণ অধ্যাত্মজ্ঞানে পৌঁছাইবে।

(৪) জগতের সকল শাস্ত্র, সকল মহাপুরুষ, সকল সত্যজ্ঞান পরমাত্মায় অবস্থিতি করিয়া জীবাত্মায় মিলিত হইতেছে।

উপরি উক্ত বাণীগুলি নানাভাবে নানাদেশে পরবর্ত্তিকালে প্রচারিত হইল। প্রথমটি সকলেই স্বীকার করিবেন। শেষ তিনটি সম্বন্ধে আমাদের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন :—

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন,
এই তিন জেনো ধর্ম্ম পূর্ণ সনাতন।"

শ্রীচৈতন্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষার মধ্যে প্রভেদ অবশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুধু একটী বাক্য লইয়া আলোচনা করিলেই তাঁহাদের উভয়ের দৃষ্টির পার্থক্য বোঝা যাইবে। শ্রীচৈতন্য "জীবে দয়া" করিতে বলিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য জীবকে নিজ হইতে পৃথক সত্তা বলিয়া অনুভব করিতেও প্রস্তুত নহেন। কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "দয়া কেবল নিজের প্রতি হয়। এক জীব অপর জীবকে দয়া করিতে পারে না।.........যে আপনার হয়, তাহার প্রতি দয়া হয়। যিনি যে পরিমাণে আপনার হ'ন, তাঁহার সম্পর্কে সেই পরিমাণে প্রণয় কার্য্য করে।" (আচার্য্যের উপদেশ, অষ্টম খণ্ড, "জগৎ ব্রহ্মের পর নহে" উপদেশ।) কেশবচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্যের বাণী বুঝিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, সেই তাৎপর্য্যে পৌঁছান হইবে।

কেশবচন্দ্রের উল্লেখ যখন করিলাম, তখন একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, আধুনিক ব্রাহ্মসমাজেও যাজ্ঞবল্ক্যের কথিত বাণীগুলি নব নব ভাবে প্রচারিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু শেষ বাণী সম্বন্ধে অর্থাৎ জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে কেশব আরও স্পষ্টভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তিনি ব্রাহ্ম নহেন, যিনি বলেন, অমুক ধর্ম্মসম্প্রদায়, অমুক বিধান, অমুক শাস্ত্র আমার নহে। পৃথিবী যত সত্য প্রচার করিয়াছে, সমুদায় ব্রাহ্মদিগের। আমাদিগের নিকট খ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক ইত্যাদি পাঁচজন কিংবা দশজন সাধু নাই; কিন্তু জগতের সকল সাধুই আমাদের চক্ষে এক। আমাদের নিকট সকল বিধান এক বিধান। সকল বিধানের সমুদায় সত্য এবং সমুদায় সাধুদিগের সমস্ত রক্ত একত্র হইয়া এক নদী বহিতেছে।" (আচার্য্যের উপদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২২৮)

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কালে কালে জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে নব কলেবর লইয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহা জানিয়া, উপনিষদের ঋষিগণকে ও ঋষিপত্নীদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করি।

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকেশবচন্দ্র

প্রথম জীবনে দেখিনু তোমায় সত্য অন্বেষণ,
আকুল চিত্তে চেয়েছিলে কা'র দরশন পরশন!
মনেতে শুনিলে মন-দেবতার রবে বরাভয় বাণী,—
"প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর"—নতশিরে নিলে মানি।
বিশ্বাসে বুক বাঁধিলে তখন ভুলিলে বেদনা-ভার,
স্পষ্ট তখনো খোলেনি দৃষ্টি, পরশ পাওনি তাঁর!

তরুণ সঙ্ঘে ডাকিলে যখন ভাঙনের পথ ধরে,
বহুদিবসের জাতির জড়তা দাঁড়ালে চূর্ণ করে!
ভাঙনের পথে খুলিল তোমার গভীর উদার দৃষ্টি,
সৃজনের পথ ধরিলে তখন করিলে করুণা বৃষ্টি!
মর্ম্মরাজ্যে নামিল তখন মধুর ভক্তি ঢল,
নগরের পথে নাম বিলাইলে সঙ্গী ভক্তদল!
প্রচার-ব্রতেতে লইল দীক্ষা নবীন ত্যাগীর দল,
ভাবে নাই তারা তাদের ঘরেতে কে দিবে অন্নজল!
বিত্তেরে তাঁ'রা করিল তুচ্ছ চিত্ত সতত মুক্ত,
তোমার ভাবের ভাবুক তাহারা তোমাতে হইল যুক্ত!
ষোলজন শুধু ষোড়শোপচারে ধর্ম্মে উৎসর্গ,
ভাবে নাই তারা কোথা দাঁড়াইবে স্ত্রী পরিবারবর্গ!
নিছক সত্য ভূমিতে দাঁড়ালে বিজয়নিশান হাতে,
পালন করিলে বিধির আদেশ, ল'য়ে এই দল সাথে!
যে বার্ত্তা তুমি বহন করিলে, ওগো যুগ-অবতার,
সে তত্ত্ব আজ দিকে দিকে ছুটে—একি এ চমৎকার—
তোমারে ছাঁটিয়ে করিছে প্রচার তোমারই যেগো বাণী,
ধর্ম্মরঙ্গভূমিতে মিথ্যা যবনিকা দেছে টানি!
শিবহীন এই দক্ষযজ্ঞ টিকিবে কতক্ষণ?
মানুষ এখনো মনুষ্যত্বের দেয়নি বিসর্জ্জন!
সত্যেরে যাঁ'রা করিছে হত্যা মনুষ্যত্ব দলে',
তারাই আবার গোহত্যা হ'লে ভাসে নয়নের জলে!
দলে ভারী যাঁ'রা 'প্রোপাগাণ্ডায়' তারা যে করিতে চায়,
ধর্ম্মেরে আজ বিপণি-ক্ষেত্র লাভবান ব্যবসায়!
বিকৃত তাই ইতিহাস-ধারা প্রবল দলের জোরে,
কূটনীতি চালে বাঁধিল সত্যে কঠিন মিথ্যা ডোরে!
তোমার ন্যায্য প্রাপ্য তাইত আন্ জনে দিতে চায়,
সংখ্যা লঘুরা নীরব দাঁড়ায়ে শুধু দেখে নিরুপায়!
তবু ইতিহাস রবে অবিকার উড়ে যাবে ধূলিজাল,
সত্য সাক্ষ্য দিবে একদিন অনাগত মহাকাল!
তুমিই সদলে নবধর্ম্মের করিলে উদ্বোধন,
জাতির জীবনে আনিলে প্রভাত শুভ নবজাগরণ!
শ্রান্ত মানবযাত্রী শুনিল কোথাও নাহিক ভেদ,
জীবন-গ্রন্থ সবারি সত্য মানব-জীবনবেদ,
সমভূমি পরে দাঁড়াইল এসে যত নরনারীদল,
সম অধিকার সকল জনার এই সে পৃথ্বীতল!
বিচিত্র তব কর্ম্মের ধারা অতি বিচিত্র মন,
নব নব ব্রত সাধনার পথে পূজা নব আয়োজন!
সমুখের পথ ধরে চলেছিলে দেখনি পিছনে চেয়ে,
জীবন তোমার হইল ধন্য তাঁহার পরশ পেয়ে!
শেষেতে দেখিনু তোমার জীবন ফুল ফলে সুশোভন,
বাসগৃহ হোল নবদেবালয় নবযুগ তপোবন!
হোল সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী সাধিল যুগলব্রত,
দেখি একাসনে হরপার্ব্বতী যোগধ্যানে কিবা রত!
বিরোধ বিবাদে তুলেছিলে তুমি মহামিলনের সুর,
মহান্ সত্য করিলে প্রচার মিথ্যা করিলে দূর!
সেদিন তোমারে বোঝে নাই যাঁ'রা আজো তাই মনে হয়,
শত্রু মিত্র সকলের তুমি কি পরম বিস্ময়!
চিরদিন ছিলে সঙ্গিবিহীন সকলের মাঝে একা,
লক্ষ্য করিগো তব নিবেদন অশ্রুজলেতে লেখা!
বরণীয় করে যাঁ'রা রাখিয়াছে, ভুল যাঁ'রা করিয়াছে,—
হয়ত এখনো তেম্নিই আছ, আজো সকলের কাছে!
বিধাতার দূত এসেছিলে তুমি ফিরায়েছে যারা দান,
তোমারে ব্যর্থ করিতে করিল বিধাতার অপমান!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

বিশ্বের খোকা কেশবচন্দ্র

(গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সাম্বৎসরিক উৎসব ও কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, ১৫ই অক্টোবর, স্মৃতিসভায় পঠিত)

জন্মদিন সকলের জীবনেই এক পুণ্য তিথি। জন্মদিনে আমরা কত আনন্দ করি। ভগবান্ সকলের জন্মদিনকেই আলো, হাওয়ায়, প্রাণে পূর্ণ করে, তাঁ'র আনন্দদায়ক করেন। জন্মদিনের আনন্দ যে শুধু ছোটদের জন্য, তা নয়। আমাদের বড়দের জন্মদিন কেউ না করলেও, আমরা নিজেরাই তা করি না কি? জীবনের আর একটী অধ্যায়ের আরম্ভে, ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে আমাদের মাথা নত হয় না কি? সেদিনটী পবিত্র বলে মনে হয়। আর যে দিন যাই করি—সেই দিনটী পবিত্রভাবে ও আনন্দে কাটাতে ইচ্ছা হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা নূতন কাপড় পরে পায়েস খায় বা নূতন খেলনা নিয়ে খেলা করে। বড়দের কাছে সেই আনন্দ অন্তরের। ভিতরের দিকে বৎসরান্তে একবার আমরা ফিরে তাকাই। ছাত্রছাত্রীরা হয় ত সেদিন কত প্রতিজ্ঞা করে—আজ থেকে এই কর্ ব—সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হোক, আর না হোক—অন্ততঃ আরম্ভটা হয় বেশ গম্ভীরভাবে। মোটের উপর, জন্মদিনের আনন্দ উপভোগ করি আমরা সবাই। ছোটরা যেন মনে না করে যে, আনন্দ তাদেরই একচেটে। যাই হোক, এমনই এক পুণ্য জন্মতিথিতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি মায়ের স্নেহকোল আলো করে নতুন অতিথি বেশে এ ধরায় আসেন। কত আনন্দ তখন বাড়ীতে, কত শঙ্খ উলুধ্বনিতে, না জানি, বাড়ী মুখরিত হয়েছিল, খোকা হয়েছে বলে। আমাদের জন্মদিন, আমাদের মাতা পিতাই করেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের মত যে খোকা—তিনি দেশেরও খোকা, কেবল বাড়ীর খোকা নন। তিনি যে সকলের, সকলে

যে তাঁকে জানে, ভালবাসে; সকলের হৃদয়ে যে তিনি তাঁর জন্মদিনে গোপালমূর্ত্তিতে আনন্দ দেন, তাই তাঁর 'কেশব' নাম আজ সার্থক হয়েছে। যে সব ঋষি মনীষীদের জীবন থেকে আমরা জীবনীশক্তি পাই,—মৃত-সঞ্জীবনী সুধা পাই, যে সব খোকারা আর্ত্তপ্রাণ শীতল করে, যারা জন্মে মায়ের জীবন ধন্য ও সার্থক করে, সেই শিশুরা যে বিশ্বের শিশু। তারা তো বড় হয়ে শুধু নিজের মা বাবা ভাই বোনদের কথা ভাবে না, তারা যে বিশ্বমানবের কথা ভাবে। তাইতো বিশ্ব তাদের আপন করে নেয়। আজ একশ বছর আগে কোথায় কলিকাতার কোন এক বাড়ীতে একটী খোকা জন্মেছিল, আজও সেই খোকার জন্মতিথিতে, আমরা সেই খোকা কেশবচন্দ্রকে ভালবেসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। আজ এই যে সবাই সমবেত হয়ে, তাঁর গুণ বর্ণনা করে, তাঁর জন্মদিনের উলু ও শঙ্খধ্বনির সার্থকতা অনুভব করছি —কেন? তিনি যে আজ বিশ্ব শিশু, আদর্শ শিশু। এই আদর্শের মূলে কে? তাঁর মাতৃদেবী। যে ছেলেরা মায়ের শিক্ষামত চলে,—মাকে ভালবাসে, ভক্তি করে,—সেই ছেলেই কালে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মহসীন, মারসম্যান প্রভৃতি হয়ে উঠতে পারে,—সেই মেয়েই পণ্ডিতা রমাবাঈ, ফ্লরেন্স, নাইটিঙ্গেল ঐ সকল মনিষীদিগের জননীস্বরূপা হতে পারে। সব মহৎ চরিত্র জননীর প্রভাবে গড়ে ওঠে, তাই আজ সর্ব্বাগ্রে সেই পুণ্যশীলা জননীদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাই। এই সব কৃতী সন্তানেরা দেশের কাছে তাঁদের সকল অন্তর ঐশ্বর্য্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে, যা কিছু রত্ন সেখানে আছে—তা দান করে যান, দেশপ্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, নবজীবন দেবার জন্য।

দেশ তাঁর কাছে বাঁচবার জন্য আজ কি পেয়েছে ও তার কতটুকু রক্ষা করতে পেরেছে—এই যদি আমরা খতিয়ে দেখি, তা'হলে পাওয়ার চেয়ে হারিয়ে যাওয়ার দিকটাই বেশী করে দেখতে পাব। তিনি শৈশব থেকেই আত্মনির্ভরশীল ছিলেন বলেই, স্বাধীনতাপ্রিয় বলে তাঁর খ্যাতি। স্বাধীনতা যার বুকে বিরাজ করে, মৌলিকতা তার জীবনের কাজে পদে পদে প্রকাশ পায়। সেই মৌলিকতা ও স্বাধীনচিন্তার ফলে আজ নববিধানের সৃষ্টি। তিনি নতুন কিছু দিয়ে গেছেন—তাঁর সমসাময়িক সমাজ যার অভাব খুবই বোধ করেছিল। নৈতিক বলে শৈশব থেকেই তিনি বলীয়ান্ ছিলেন বলে, নির্ভীকচিত্ত ব্রহ্মানন্দ সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় যা কিছু দুর্ব্বলতা দেখেছেন—তার সংশোধনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, লোকের নিন্দা প্রশংসার দিকে দৃষ্টি না রেখে। জীবনে সততা, একতা ও সমপ্রাণতা যে মানুষকে সমাজে সংসারে একসূত্রে বেঁধে রাখে ও আনন্দ দেয়, তা তিনি বুঝেছিলেন বলে, এগুলির প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রার্থনা ও ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতাই যে আমাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনে অনেকখানি পথ এগিয়ে দেয়, তা বুঝেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টি নিয়েই সাংসারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়। সকলকে এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক আদর্শ নিয়ে চলতে হবে, নইলে তার ব্যত্যয় হয়, এ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন; তাই সংঘবদ্ধ জীবন ও প্রার্থনার মূল্য তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে কার্য্যতঃ অনুভব করে, অন্যকে তার অনুভূতির আনন্দ দিয়ে গেছেন আজ। যা কিছু বলে গেছেন, তা জীবনের কাজে প্রতিফলিত করে গেছেন, তাই তাঁর কথার এত দাম। জীবন প্রতিষ্ঠা করে যেতে পেরেছেন বলেই, তাঁর জীবনবেদের এত মূল্য। প্রত্যক্ষ জলন্তদৃষ্টান্তপূর্ণ চরিত্রগুলি ভগবান আমাদের সাম্‌নে ধরে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় বেদ আর কি আছে? প্রতি মানুষের নৈতিকজ্ঞান, ধর্ম্মভাব, তাদের চলন্ত জলন্ত জীবনের আদর্শ ও তদনুযায়ী চলার কলাফল সবইতো আমাদের সামনে রয়েছে। ভাবের আবেশে আমরা অনেক বড় কথা বলি ও ভাবি; কিন্তু কার্য্যতঃ তার কতটুকু করা সম্ভব, ও কেন সম্ভব নয়, তা তো সাধু জীবন অসাধু জীবন সকলের মধ্যেই দেখতে পাই। সত্যিই ত প্রকৃতির মত বড় শাস্ত্র আর কি আছে? নিজে দেখে নাও, বুঝে নাও। তবে অল্পবুদ্ধি আমরা, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে কতটুকু বুঝি, তাই এই সব ঋষি মনীষীদের দেখান পথগুলি দেখেশুনে নিতে হয়। ধর্ম্মসাধনার উদারতা-প্রদর্শনে তিনি শীর্ষস্থান লাভ করেছেন বলা যেতে পারে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ভাই বলে গ্রহণ করা ও সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের বাণীর সমাদর তাঁহাতেই সম্ভবে। যুগে যুগে যাঁদের যুগমানব বা অবতার বলা যেতে পারে, তাঁরাও সকল মানবকে ভাই বলে গ্রহণ করে দেখিয়ে গেছেন যে, মানুষ আমরা, কেউ পর বা উচ্চ নীচ নই কারো কাছে, ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধনে আমরা সবাই এক। তাই কেশবচন্দ্র ধনীর সন্তান হয়েও গরিবের ভাই হয়েছিলেন, গরিবকে ভালবেসে—তাদের মত একজন হয়ে দিন কাটিয়েছেন। খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে রচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাসের নিম্নলিখিত পদ্যাংশ কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্রের প্রতীক বল্লে অত্যুক্তি হয় না :—

বিশ্বেরে তুমি করিয়াছ ঘর,
সব মানবেরে ডেকেছো ভাই,
দু'হাত বাড়ায়ে বুকের মাঝেতে,
রাজা কাঙ্গালের করেছো ঠাঁই।
চাহ নাই পূজা বাপের ঘরের,
সব ছেলেদের চেয়েছ ইষ্ট,
সব ভাইদের বড় ভাই হয়ে
লহ গো প্রণাম হে দেব খৃষ্ট।

ব্রহ্মানন্দ তাঁর হৃদয়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যেটুকু সত্য বাংলা দেশকে দিয়ে গেছেন, তার মৃত্যু কখনো হতে পারে না। সমস্ত হৃদয় মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল, আজ তারই প্রভাবে নববিধান পুষ্ট। জীবনপথে মতের অনৈক্য অনেকের থাকতে

পারে, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের যে সার কথা, নৈতিক বলের যে উদ্দীপনা, সেখানে আমার মনে হয়, কোথাও পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষে পুরাকালে স্ত্রীজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন অধিকার ছিল না; কিন্তু এই যে স্ত্রীপুরুষে একত্রে বসে উপাসনা করবার অধিকারের পথ, তা কেশবচন্দ্রই পরিসর করে দিয়েছেন। তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা চারিদিকে ছড়িয়ে, ব্যক্তিগত জীবনে, সংসারে, সমাজে, দেশে যে নবযুগ আনয়ন করেছিলেন, সেই আলো কখনো নিভবে না। সত্য যা, তা চিরন্তন, শাশ্বত, তার ব্যতিক্রম হয় না। তাঁকে আজ স্মরণ করে, তাঁর সদ্‌গুণাবলী আর একবার হৃদয়ে গ্রহণ করে, সেই যুগপ্রবর্ত্তককে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে, সেই গরিব ভাইকে, সেই ধনীর দুলাল ছোটখোকাকে, আনন্দে পূর্ণ সেই ব্রহ্মানন্দকে, তাঁর জন্মদিনে নূতন অতিথিরূপে এই মন্দিরে আমাদের হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে, উলু ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা বরণ করে নিয়ে, নববিধানে আবার নতুন করে জীবন প্রতিষ্টা করা হোক। আজ আবার নতুন করে সেই শিশুর মর্ত্ত্যে আসা সার্থক হোক। আবার সবাই এক হউক, সবাই আবার জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নববিধানের একতা-পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে বলুক, জয়তু জয়তু পরমেশ্বর, জয়তু জয়তু রাজরাজেশ্বর। মঙ্গলময়ের জয় হউক।

শ্রীমতী লাবণ্যবালা ঘোষ।

কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্ম, ভারতে একটী মহাপুরুষের জন্ম; ক্রমেই বিশ্বের সকল মানব বুঝিতে পারিতেছেন, এ জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" মহাজীবন। তাঁর অমূল্য জীবনের কয়টী কথা আমরা জানি যে, এখানে উল্লেখ করিতে পারি? সে শক্তি ক্ষমতা নাই। তাঁর মহামূল্য উপদেশাবলী ও স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ প্রার্থনাগুলি এবং জীবনবেদ-পাঠে যে অমূল্য সত্যগুলি [গ্রহণ করতে পেরে, তাঁর জীবনের প্রভাব একটু লাভ করেছি, সেই টুকু মাত্র প্রকাশ করতে সাহস করেছি, সাক্ষ্য দিতেছি। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য ভবে বড় রকমের পাথেয় দরকার; খাঁটী নব-বিধানী হয়ে এ পথে চলা বড়ই কঠিন। কেশব যে ভাব, ভক্তি নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দেখিয়ে গেলেন, তাতে মনে হয়, অন্ধকার দিনে জীবনযাত্রার পথে তাঁর জীবনখানি আমাদের পাথেয়-স্বরূপ হয়েই রয়েছে। এই রকম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ জীবন সামনে না রাখতে পারলে, এ পথে চলা বড়ই কঠিন; তাই তিনি আমাদেরি জন্যে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে, দৈব শক্তি নিয়ে, অমিত তেজ নিয়ে, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, এই যুগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর দৈনিক পূজা আরাধনার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেলেন, কিরূপে সংসার গৃহ পরিবারকে তপোবন করতে হয়। ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণাদি মহাজনগণ সংসার-ত্যাগী হয়ে, ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার, এবং লোকহিতসাধন-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান করেছিলেন; শ্রীকেশব গৃহী সংসারী হয়ে, যোগ-ভক্তি-সাধন ও দেশের কল্যাণ কি ভাবে করতে হয়, এক নূতনতর পন্থায় দেখিয়ে গেলেন। তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হই। আজ সমস্ত সভ্যজগৎ ভাবছে, তার নৈতিক জীবনের, ধর্ম্মজীবনের কল্যাণ কোন পথে হবে? তিনি বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তার সূচনা করে গেছেন। মাসিক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকাগুলিতে, ধীর ও স্থিরবুদ্ধিযুক্ত, জাতীয়কল্যাণকামী লেখক ও লেখিকাগণের লেখা পাঠ করে বুঝা যায়, যে তাঁদের চিন্তা এখন দেশের তরুণসম্প্রদায়গণের অন্তরে ধর্ম্মের প্রেরণা দিতে আগ্রহান্বিত হয়েছে। শুধু পাশ্চাত্য ভাব এদেশের উপযোগী নয়, তাতে অনেক দিকে অনেক অনর্থ হয়ে যাচ্ছে; তাই না কেশব তাঁর অল্প বয়সে তরুণগণের জন্য স্থানে স্থানে প্রার্থনা-সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং জাতীয় জীবনের উপর সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবন, একখানি প্রকাণ্ড বেদ, এই বেদ অপূর্ব্ববেদ; প্রতিদিন পাঠ করলেও ফুরায় না; যত পড়ি, ততই পড়িবার ইচ্ছা হয়। ইহার ভাব, ভাষা লইয়া কত জীবন-গ্রন্থ যে রচনা হয়, তা বলা যায় না। মানবের জীবনে ভগবৎ-লীলার অন্ত নাই, কিন্তু সে সব কে বা লেখে, কে বা ভবিষ্যৎবংশীয়-গণের জন্যে সঞ্চিত করে যায়। সারা জীবনে ভগবানের কত প্রভাব যে এসে পড়ে, কে তার ছোট ছোট ভাবগুলি মনে রাখে? কিন্তু তিনি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, বন্ধুগণ সনে, আচারে, ব্যবহারে, প্রচারে, বক্তৃতায়, দৈনিকপূজা, উপাসনায়, কত বিচিত্র বিচিত্র মহাভাবে পূর্ণ হয়ে শ্রীহরির লীলারসরঙ্গ সম্ভোগ করলেন; তাই না চিরজীব সঙ্গীতে গাহিলেন,—"চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী, মহাভাবরসলীলা কি মাধুরী মরি মরি! বিবিধ বিলাসরসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ, ডুবিছে, উঠিছে, করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি (হরি হরি বলে)।" আবার পারিবারিক জীবন যাতে আদর্শ জীবনে পরিণত হয়, তাই তাঁর অপূর্ব্ব ভাষায় নবসংহিতা রচিত হলো, যে ভাষার তুলনা হয় না। ভগবদ্দর্শনে গৃহী সংসারী আপন গৃহধর্ম্ম পালন করিবেন, ভগবদাদর্শে তিনি তাহাই লিখিলেন; পারি-বারিক জীবন ও চরিত্র-গঠনে সংহিতার কথা এক মস্ত পাথেয় হয়ে রয়েছে। যাঁরা এই নবসংহিতার কথা মত দৈনিক জীবন গঠন করে গেছেন, তাঁরা নিজ সন্তানগণকে ধর্ম্মের পথে, নিষ্ঠার পথে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। এখন নৈতিক জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় কেন, ইহা সহজেই বোঝা যায়; সংহিতার বিধি পালন হয় না, আদেশ মত চলা হয় না, ইচ্ছামত চলা হয়। বিধি ও নিষেধ-গুলি না মানিলে সে সমাজ নিজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, এ বিষয়ে দেখি, কেশবচন্দ্রের কি চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি ছিল! চরিত্রবান, ধার্ম্মিক, তেজস্বী লোকের অভাবে সমাজ দুর্গতির পথে [illegible] যায়।

তাই বুঝি, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মণ্ডলী শুদ্ধ পূত ভাবে আর গড়ে উঠ্‌ছে না।

শ্রীকেশবের জন্মশতবার্ষিকী মহোৎসব করতে হলে, তাঁর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে, তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব ও মহত্ব জীবনে গ্রহণ করতে হবে।

বিধানভক্ত শ্রীকেশবের জননী তাঁর প্রিয়তম ভক্ত সন্তানের জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী সমারোহে সম্পন্ন করতে, আমাদের সহায় হউন। তিনি দেশ বিদেশস্থ সাধু বন্ধুগণকে লয়ে এই উৎসব করতে শক্তি বিধান করুন। ভক্তের জন্মোৎসব করে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে যাবো।

সেবিকা—নির্ম্মলা বসু।

কেশব-স্মৃতি

হে কেশব, তব স্মৃতি চিত্ত মাঝে যবে উঠে জাগি,
তখন যে প্রাণমন পৃথিবীর হাসি কান্না ভুলে,
অনন্ত জীবনের দীপ্ত দীপ হেরিবার লাগি,
নববিধানের নব সঙ্গীতের সুরখানি তুলে।
তখন যে ঈশা, মুষা, মহম্মদ, নানক, কবীর,
আরো কোটি কোটি ভক্ত জানা নেই যাঁহাদের নাম,
সকলের তরে মোর খুলে যায় পূজার মন্দির,
হৃদয় ব্যাকুল হয় তাঁহাদেরে করিতে প্রণাম।
বিবেকের বাণী শুনে দুর্গম মানবসমাজে,
বীরের মতন নিতি সম্মুখেতে হতে অগ্রসর,
প্রাণে পাই নবশক্তি; নিত্য নবদিবসের কাজে,
খুঁজে পাই পরিপূর্ণ জীবনের আলোক নির্ঝর।
সুবিশাল বিশ্বখানি হয়ে যায় পূজার দেউল,
সর্ব্ব সত্য মিলে যায় ধরণীর শান্তির তরে,
গভীর বিশ্বাস বিনে ফুটে না যে ধরমের ফুল,
এ কথাটি বারে বারে দোলা দেয় নীরবে অন্তরে।
হেরি যেন বিশ্ব-লোক ভেসে চলে প্রেম ঝরণায়,
নিখিলের বক্ষ হতে দূর হয় কলহ বিবাদ,
স্বর্গীয় পরিবার নেমে আসে স্বর্গসুষমায়,
মর্ত্তের ধূলিরে দিতে সদানন্দময়ীর প্রসাদ।
হে কেশব, তুমি যবে জেগে উঠ মোর কবি চিত্তে,
তখন যে প্রাণ চায় সকলেরই পদধূলি নিতে।

রেঙ্গুন। সমরেন্দ্র দত্তরায়।

সংবাদ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—গত ২৫শে অক্টোবর, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে প্রেমাশ্রম হলে, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি-ভাজনীয়া শ্রীমতী হেমলতা সভানেত্রীর আসনে বৃত হন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভাই প্রিয়নাথ সভার উদ্বোধন করেন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র দাস নবরচিত একটী গান সঙ্গীত করিয়া, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রার্থনা আবৃত্তি করিলে, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনাযোগে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞের উদ্দেশ্য বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। পরে মিঃ আনন্দ দাস শ্রীকেশবচন্দ্রের মহৎ জীবন সম্বন্ধে ইংরাজীতে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী সংক্ষেপে অভিভাষণ করিলে, কুমারী ছবি উপস্থিত ভাই ও ভগ্নীগণের কপালে ভাই ফোঁটা অর্পণ করেন।

গত ২৫শে অক্টোবর, ৮বসন্তকুমার দাসের বাঁটরাস্থ [হাবড়া] ভবনে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপলক্ষে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ৮ই কার্ত্তিক, ঢাকার Addl. Dist Magistrate S. K. Dey Esqr. I.C.S. এর মনোরম বাসভবনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সুপ্রভাতে পারিবারিক এবং সার্ব্বজনীন ভাবে বিশেষ উপাসনা শ্রীযুক্তা হেমলতা চন্দ করিয়াছিলেন।

নববিধানের নব সঙ্কীর্ত্তন—গত ৩০শে অক্টোবর, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে প্রেমাশ্রম হলে, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র দাস 'নববিধানের নব সংকীর্ত্তন' বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। শ্রদ্ধাভাজনীয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া সুললিত ভাষায় মধুর অভিভাষণ করেন। সভাপতি ও উপদেশদাতাকে ধন্যবাদ দিয়া ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কিছু বলেন ও ভাই প্রিয়নাথও কিছু নিবেদন করিয়া সভার শান্তিবাচন করেন।

চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান—গত ১লা নবেম্বর, জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে, নবশ্রীক্ষেত্রে প্রেমাশ্রমের বারাণ্ডায় প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র দাস সংগীত করেন। সেবিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। পরে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন দেহতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের সমন্বয় সমাধান করিয়া, অতি সুন্দররূপে আত্মনিবেদন করেন। উপাসনান্তে শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞের স্মৃতিরক্ষার্থ "শ্রীকেশব-প্রেমক্ষেত্র চিকিৎসা-সেবা-প্রতিষ্ঠান" প্রার্থনা-যোগে ভাই প্রিয়নাথ উদ্‌ঘাটন করেন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন অদ্য হইতে প্রতিদিন প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথী মতে রোগীদিগকে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীকেশব-

জননী মা জগদ্ধাত্রী এই প্রতিষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এখানে মহিলাদিগের জন্য একটী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। বহু বর্ষ ধরিয়া ডাক্তারি সকল বিষয়ের সিনিয়ার প্রফেসার ও প্রধান পরীক্ষকরূপে উৎকল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ও উৎকৃষ্ট মহিলা হোমিওপ্যাথিক কলেজে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে আরও এই শুভ সংকল্প পরমেশ্বর সাফল্য মণ্ডিত করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা নবেম্বর, ১৪০।বি হরিশ মুখার্জি রোডে, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হিমাদ্রিভূষণ বসুর [শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর প্রথম পুত্র] সাম্বৎসরিক দিনে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নবপর্ণ কুটীর

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধানের সাধনার্থীদিগের জন্য এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। সাধক সাধিকাগণ স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজনের জন্য যাঁহারা সময়ে সময়ে এখানে আসিতে চান, তাঁহারা আপাততঃ নবপর্ণকুটিরে অবস্থানের জন্য একখানি ঘর ও রান্নাঘর পাইতে পারেন। তবে পূর্ব্ব হইতে সম্পাদক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিককে পত্র দ্বারা যেন তাঁহারা জানান। কতদিন থাকিতে চান, তাহাও যেন লেখা হয় এবং কাহারও কোন গুরুতর পীড়া থাকিলে এখানে অবস্থানের নিয়ম নাই। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স্ এবং ভৃত্যের বেতন ও গৃহ মেরামতাদির জন্য তীর্থযাত্রীগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া 'আশ্রম ফাণ্ডে' যথাসাধ্য সাহায্য করেন, ইহা প্রার্থনীয়। সাধারণ বিশ্বাসিমণ্ডলীর নিকটেও এজন্য সাহায্য ভিক্ষা করি।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র"

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্ত ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪৪ সালের দানপ্রাপ্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার হিত স্বীকার করিতেছি:—

পূর্ব্বপ্রকাশিত দানপ্রাপ্তি ২৪১৪৲, মিঃ জে, এন, বসু ২৫, জনৈক হিতৈষী বন্ধু ২।৫, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ১৲, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় ২৫৲, শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার ২০৲, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বান্যার্জি (২য় দফা) ৫০৲, ডাক্তার রজতচন্দ্র সেন (পিতার ও ভ্রাতার সাম্বৎসরিক দিনে, ১৯৩৭) ২০৲ এবং (পিতার ও জ্যেষ্ঠতাতের সাম্বৎসরিক দিনে ১৯৩৮) ২০৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষ ফণ্ড ১০০৲, শ্রীযু অবিনাশচন্দ্র সেন (ঢাকা) ৭৲, শ্রীমতী কুমুদিনী সেন (স্বামীর সাম্বৎসরিক দিনে) ১০৲, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ২৫৲, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৮০৲। মোট ২৮৫৯।৫।

স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক সুবৃহৎ পুস্তকের নূতন শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য ১০৲ ধার্য্য হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ই নবেম্বর (১৯৩৮) হইতে ৩০শে নবেম্বর এবং ২০শে ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর এবং মাঘোৎসব উপলক্ষে, ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৯) হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

"জ্ঞানকুটীর"
এলাহাবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের শততম জন্মোৎসব, ১৯৩৮

কার্য্যপ্রণালী

(আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১৬ই নবেম্বর, ১৯৩৮; বুধবার; ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৫—পূর্ব্বাহ্ণে ৭৷৷টায় কলুটোলা ভবনে (৩৪নং রামকমল সেন লেন) উপাসনা—অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ। সন্ধ্যা ৬টায়—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে (১নং কলেজ স্কোয়ার) জন্মোৎসবের উদ্বোধন—স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্।

১৭ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১লা অগ্রহায়ণ—পূর্ব্বাহ্ণ ৭৷৷টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে (৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে) উপাসনা—ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু। সন্ধ্যা ৬৷৷টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে "কেশবচন্দ্রের দান" বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতা।

১৮ই নবেম্বর, শুক্রবার, ২রা অগ্রহায়ণ—পূর্ব্বাহ্ণ ৭৷৷টায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে (২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে) উপাসনা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অপরাহ্ণ ২টা—৪৷৷টা—স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিকট কেশবচন্দ্রের জীবনকথা। সন্ধ্যা ৬৷৷টায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বক্তৃতা—ডাক্তার প্রশান্তকুমার সেন।

১৯শে নভেম্বর, শনিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ—"কেশবচন্দ্রের শততম জন্মদিন"—পূর্ব্বাহ্ণ ৭৷৷টায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পূর্ব্বাহ্ণ ৮৷৷টা—কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক। অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৪টা—কেশব একাডেমী স্কুলে (১৪৮নং মানিকতলা ষ্ট্রীট) দীনসেবা। সন্ধ্যায় তিনটি স্মৃতি-সভা—৬৷৷টায় দেশবন্ধু পার্ক—সভাপতি—শ্রীযুক্ত

শরচ্চন্দ্র বসু, ৬াটায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন-সমাজমন্দির—সভাপতি—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৬াটায় এলবার্ট হল—সভাপতি—ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন।

২০শে নভেম্বর, রবিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ—"দিনব্যাপী উৎসব"—পূর্ব্বাহ্ণ ৭াটায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপাসনা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী। হৃষীকেশ পার্কে উৎসব-মণ্ডপে (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সিটি কলেজের নিকট) পূর্ব্বাহ্ণ ৮াটায় কীর্ত্তন, ৯টায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ। (উপাসনান্তে প্রীতিভোজন) অপরাহ্ণ ৩াটা হইতে ৫টায়—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের পূর্ব্বস্মৃতি—ভাই চন্দ্রমোহন দাস, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, রাজা জানকীনাথ রায়, মিঃ জে, এন, বসু, অধ্যাপক বিজয়-চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। সন্ধ্যা ৬টা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু। সন্ধ্যা ৬াটা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপাসনা—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সন্ধ্যা ৬াটা—ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলনসমাজে (১নং ডাঃ রাজেন্দ্র রোড) উপাসনা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস।

২১শে নবেম্বর, সোমবার, ৫ই অগ্রহায়ণ—পূর্ব্বাহ্ণ ৮াটা—কেশব একাডেমী স্কুলে উপাসনা—মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী। (উপাসনান্তে প্রীতিভোজন) অপরাহ্ণ ৪াটা হইতে ৬টা—এলবার্ট হলে সমাজ-সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মিবৃন্দের আলোচনা-সভা—সভাপতি—কলিকাতার লর্ড বিশপ। বক্তা—মিসেস এ, দী, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র, স্বামী প্রেমানন্দ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত হরিনারায়ন সেন, ডাক্তার সত্যানন্দ রায়, ডাঃ বি, সি, রায়। সন্ধ্যা ৬াটা—উৎসবমণ্ডপে সংকীর্ত্তনে উপাসনা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

২২শে নবেম্বর, মঙ্গলবার, ৬ই অগ্রহায়ণ—পূর্ব্বাহ্ণ ৭াটায় আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে (৫৫নং আপার চিৎপুর রোড) উপাসনা—অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন। সন্ধ্যা ৬াটা হইতে রাত্রি ৮াটা পর্য্যন্ত এলবার্ট হলে সংবাদপত্র-সেবিগণের আলোচনা-সভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বক্তা—মৌলানা আক্রাম খাঁ, শ্রীযুক্ত অমল হোম, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণ, মৌলভী মজিবর রহমান, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার। সন্ধ্যা ৬াটায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন-সমাজ-মন্দিরে "বিশ্বের কেশব" বিষয়ে হেমন্তকুমার মুখার্জ্জির বক্তৃতা।

২৩শে নবেম্বর, বুধবার, ৭ই অগ্রহায়ণ—উৎসবমণ্ডপে দিনব্যাপী যুব-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উষা-কীর্ত্তন। মণ্ডপে ৮াটায় কীর্ত্তন, ৯টায় উপাসনা। (উপাসনান্তে প্রীতিভোজন) অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪াটা পর্য্যন্ত আলোচনা-সভা। ৫টায় প্রীতি-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬াটায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন-সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ।

২৪শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ—পূর্ব্বাহ্ণ ৮টায়—ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজমন্দিরে উপাসনা—অধ্যাপক খড়্গ-সিংহ ঘোষ। অপরাহ্ণ ৩াটা হইতে রাত্রি ৬াটা—উৎসবমণ্ডপে বালকবালিকাগণের উৎসব ও কল্পতরু।

২৫শে নবেম্বর, শুক্রবার, ৯ই অগ্রহায়ণ—উৎসবমণ্ডপে মহিলাগণের দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণে ৯টায় উপাসনা—মহারাণী সুচারু দেবী। (উপাসনান্তে মহিলাগণের ও বালক-বালিকাগণের প্রীতিভোজন)। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আলোচনা-সভা।

২৬শে নবেম্বর, শনিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কর্ত্তৃক জন্মোৎসব"। পূর্ব্বাহ্ণে—কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের জন্মস্থানে তীর্থযাত্রা; কেশবচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত, স্যার যদুনাথ সরকার, এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়। মধ্যাহ্নে—সাহিত্য-পরিষদের "রমেশভবনে" প্রদর্শনী। অপরাহ্নে—সাহিত্য-পরিষদে সাধারণ সভা—সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী। বক্তা—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সুনীতিকুমার চাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি।

২৭শে নবেম্বর, রবিবার; ১১ই অগ্রহায়ণ—"নববিধান ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক জন্মোৎসব"—সন্ধ্যা ৬টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সং-কীর্ত্তন ও উপাসনা—ডাঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅক্ষয়-কুমার লধ—সম্পাদক, উৎসবকমিটী।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ—সম্পাদক, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।
শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী—সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস—সম্পাদক, ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন-সমাজ।
শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ—সম্পাদক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

দ্রষ্টব্য:—উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপে যিনি যাহা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইবেন, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮৪নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

বিদেশস্থ বন্ধুগণের কে কখন আসিবেন, ভাই [illegible]কুমার লধকে ৮৪নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সত্বর জানাইবেন। শীতবস্ত্র, বিছানা ও মশারি [illegible] সঙ্গে আনিবেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber new Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭৩ ভগ। ২২শ সংখ্যা।
১৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪৫ সাল, ১৮৬০ শক, ১০৯ব্রাহ্মাব্দ
2nd. December, 1938
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

জীবন্ত মা, ধন্য হও তুমি। তুমি তোমার অনির্ব্বচনীয় করুণা-গুণে, তোমার শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞ অপূর্ব্বরূপে সম্পাদন করিলে। শতবর্ষ পূর্ব্বে তুমি যে শিশুকে এই কলিকাতায় কলুটোলার একটি গৃহের অন্ধকারময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে জন্ম দিয়াছিলে, তাঁহাকে তুমি স্বয়ং কেমন আস্তে আস্তে আদর্শ শিশুরূপে, আদর্শ বালকরূপে, আদর্শ যুবারূপে, আদর্শ ছাত্ররূপে, আদর্শ গৃহস্থরূপে, আদর্শ কর্ম্মিরূপে এবং ক্রমে সর্ব্বাবয়বপূর্ণ নববিধান-মূর্ত্তিমান বিশ্বমানবাদর্শরূপে গঠন দান করিলে। পাপপ্রবণ মানবের পরিবর্ত্তিত জীবনলাভের আশা উদ্দীপনের জন্য, তাঁহাকে আবার আশাচন্দ্ররূপে বিশ্বাকাশে উদিত করিলে। সে আশাচন্দ্রের জীবন-জ্যোৎস্না একদিন পূর্ণিমার চন্দ্ররূপে-জগতে প্রতিভাত হইলেও, কিন্তু হায়! যেন সংসারের অবিশ্বাস, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার এবং নানাপ্রকার বিরুদ্ধতারূপ অমাবস্যার অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্নপ্রায় করিয়াছিল। তাই তুমি, মা, সকল অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়া, আবার যেন শতবর্ষ পরে, অমামেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্রকে ভারতের আকাশে পুনঃ উদিত করিলে। মা, অমামুক্ত নবচন্দ্রের উদয়দর্শনে আমাদের একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দ যেমন কতই আনন্দোৎসব করেন, তেমনি সমগ্র ব্রাহ্ম-সমাজের ভাই ভগিনীগণের সঙ্গে, শ্রীকেশবচন্দ্রের পুনর্জ্জন্মদিন-দর্শনে, আমাদিগকে উৎসবানন্দে কতই আনন্দিত করিলে। সত্যই সকল সম্প্রদায়স্থ ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে কেশব-জন্মযজ্ঞ-সাধনে কতই ধন্য হইলাম। সম্প্রদায়-ভেদ ভুলিয়া, মতভেদ তুচ্ছ করিয়া, কে কত ভক্তির অঞ্জলি দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহারই জন্য যেন সকলে প্রোৎসাহিত হইলেন। ধন্য, মা ভক্তবৎসলা, ভক্তের মান তুমি যে বাড়াও, ভক্তের প্রতি ভক্তি তুমি যে স্বয়ং উদ্দীপন কর, তাহারই পরিচয় তুমি এই কেশব-জন্মযজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলে। এখন আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, যেমন আকাশের পূর্ণচন্দ্রোদয়ে পৃথিবীর নদী সকলে বান ডাকে এবং খরতরবেগে জোয়ারে উজান বহিয়া যায়, তেমনি এবার আশাচন্দ্র কেশবচন্দ্রের পুণ্য জ্যোতি এমনি করিয়া আমাদের জীবনাকাশে প্রতিভাত কর যে, সকল মানবের জীবন-নদী যেন সত্য সত্যই খরতরবেগে তোমারই দিকে উজান বহিয়া যায়; যেন নব জীবনের জোয়ারে সকল সাম্প্রদায়িক বাঁধন আটন

ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমগ্র জগৎ নবজীবনে প্লাবিত হয়। দেখো দেখো, মা, যেজন্য তুমি শ্রীআশাচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে আমাদের জীবনে পুনরুদিত করিলে, তাহা যেন আমাদের জীবনে সার্থক হয়। যেন সমুদয় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ পরিহার করিয়া, সর্ব্বমানব-হৃদয়ে শ্রীকেশবের জীবনজ্যোতি পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হয়; এবং তাহাতে সকল মানবকে নববিধানের অনন্ত জীবন-স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সর্ব্বমানব এক অখণ্ড পরিবারে মিলিত হইয়া, আমরা তোমারই নব মানবত্বলাভে ধন্য হই, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—০—

জন্মযজ্ঞের মহাপ্রসাদ

শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞ মার কৃপাগুণে কি অলৌকিকরূপেই সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের সকল মণ্ডলী সকল প্রকার মতভেদ পরিহার করিয়া, কেমন এক অখণ্ড মণ্ডলীরূপে মিলিত হইলেন এবং সমযোগে এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ভাই ভগিনীগণও কেমন প্রাণগতভাবে এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান করিলেন এবং শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রতি কে কত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিতে পারেন, তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কলিকাতাস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্যগণ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, সাহিত্যপরিষদের সাহিত্যিক সুধীগণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ নেতৃগণ, শ্রীকেশবের আদর্শ জীবনের গুণাবলী স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার জীবনের সর্ব্বতোমুখীন আদর্শ স্মরণ করিয়া, কেমন উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র নাম তাঁহার দৈহিক জীবনাবস্থায় ঘরে ঘরে মুখরিত হইত। শ্রীমদ্ মহর্ষিদেবও একবার বলিয়াছিলেন, "লোকে তাঁহার স্তুতি করুক বা নিন্দা করুক, ব্রহ্মানন্দের নাম না করিয়া কেহ যেন জলগ্রহণ করে না।" কিন্তু হায়! শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর যেন নানা প্রকার বিরুদ্ধমত এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁহার নামকে ডুবাইয়া দেখার উপক্রম করিয়াছিল।

ধন্য মা কেশবজননী! তিনি স্বয়ং সকল বিরুদ্ধতার কুজ্ঝটিকা তিরোহিত করিলেন। সকল ভেদ-বুদ্ধি এবং অবিশ্বাসের অমানিশা দূর করিলেন এবং স্বয়ং সসন্তানে সকল ভক্তবৃন্দকে লইয়া, তাঁহার প্রিয় কেশবের জন্মযজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করিলেন। যাঁহারা ভাই ভাই হইয়া ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এক ঠাঁই করিলেন। একত্র উপাসনায় সমযোগ দান করিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপে একান্ন ভোজন করাইলেন। অখণ্ড যুবসঙ্ঘে যুবকযুবতীদিগকে মিলাইলেন। এক ভগিনীসঙ্ঘে সকল ভগিনীকে সমবেত করিলেন। এক কল্পতরুতলে সকল শিশুকে মিলিত করিয়া কল্পতরুর ফল বিলাইলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকেও এক কেশবের প্রেমবন্ধনে ও প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র যে সবারই আপনার, তিনি যে কাহাকেও পর ভাবেন নাই, সকলকেই আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে ভালবাসার বাঁধনে বাঁধিয়াছেন, তাহা মুক্ত-কণ্ঠে সকলকে স্বীকার করাইলেন।

আমাদের নিজ নিজ দোষ, ত্রুটি, দুর্ব্বলতা সত্বেও, আমাদিগকে যে এই মহাযজ্ঞে ব্যবহৃত হইতে অধিকার দিলেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাভরে মার চরণে অবনত হই।

শ্রীকেশবের দল হইয়াও, কেশবচন্দ্রকে যেমন করিয়া শ্রদ্ধা দিতে হয়, যেমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়, আমরা তাহা কৈ পারিলাম, তাহা কৈ করিলাম? তাই যেন আমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য, সমগ্র দেশবাসী আমাদের অপেক্ষাও শ্রীকেশবচন্দ্রকে কত ভালবাসেন, কত আদর করেন, কত শ্রদ্ধা করেন, তাহা দেখাইলেন।

এখন যদি মার অনির্ব্বচনীয় কৃপা-কৌশলে এমন অসম্ভব সম্ভাবিত হইল, শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনজ্যোতি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিভাত করিলেন, সে বিশ্বমানবের জীবনাদর্শের অনুসরণে সকলকে আকাঙ্ক্ষিত করিলেন, তবে এখন হইতে যেন এই মহাযজ্ঞের মহাপ্রসাদলাভে আমরা ধন্য হই, এবং শ্রীকেশবচন্দ্রকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি। এই শতবর্ষ পরে তাঁহার পুনরাগমন

স্বীকার করিয়া, আমরা তাঁহার প্রকৃত অনুগমনে স্থির-সংকল্প হই। মার চরণে ইহাই ভিক্ষা।

আকাশ হইতে বারিবর্ষণ হইল, শুষ্ক মরুসম ক্ষেত্র সিঞ্চিত হইল; কিন্তু যদি তাহা আটন দিয়া বাঁধিয়া রাখা না হয়, আকাশের বারি চলিয়া যাইবে, ক্ষেত্রে সুফসল ফলিবে না। তাই যদি শ্রীকেশবচন্দ্রের শত বর্ষ পরে পুনরাগমন হইল, তাঁহার চরিত্রের প্রেমবারি আমাদের শুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্রকে প্রভাবান্বিত ও সিঞ্চিত করিল, তবে আমরা যেন তাঁহার আদর্শ আমাদের জীবনে চির সংস্থিত রাখিতে আকাঙ্ক্ষিত হই। এত যে আমরা শ্রীকেশবের নামে প্রার্থনা করিলাম, গান করিলাম, অনুষ্ঠান করিলাম, আলোচনা করিলাম, পাঠ প্রসঙ্গ করিলাম, আমোদ আহ্লাদ করিলাম, ইহা যেন সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস না হয়।

মার কৃপা বিনা আমাদের আর সম্বল কি আছে। শ্রীকেশব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান সম্বল প্রার্থনা। তাই আমরা আকুলপ্রাণে সকল ভাই ভগিনী মিলিয়া মার কাছে কেবল এই প্রার্থনা করি, শ্রীকেশবের জন্মযজ্ঞে যে স্বর্গের অবতারণা মা করিলেন, যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাইলেন, তাহা যেন সাময়িক বা কাল্পনিক না হয়।

কথায় বলে, যখন লোহা অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া নরম হয়, তখন তাহাকে যেরূপ গঠন দান করিতে চাও, তাহা করিতে পারা যায়। তেমনি এই যে কেশব-চন্দ্রকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মনে উৎসাহাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে, আমাদের মনকে ভক্তি প্রেমে কোমল করিয়াছে, ইহা যেন চির রক্ষিত হয় এবং নব নব কার্য্যানুষ্ঠানে আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করে, তাহার জন্য মার কাছে সকলে প্রার্থনা করি।

আমাদের মনে হয়, এই যে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা মিলিত হইয়া শ্রীকেশবের জন্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, এবং ঐক্যবন্ধন যাহাতে এবার দৃঢ়ীভূত হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করা হউক। শ্রীকেশব-চন্দ্র দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে নববিধানের যে রিপোর্ট লিখিয়া গেলেন, তাহাতে স্পষ্ট লিখাইয়া-ছেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, এই তিন ব্রাহ্মসমাজই নব-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের যাহা যাহা বিশেষত্ব, তাহার প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া, পর-স্পরের মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃরূপে ঐক্যবন্ধন হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা শ্রীকেশবচন্দ্রের চির অনুমোদিত। তিনি কখনই বিরুদ্ধমতাবলম্বীকেও পর বা দূর মনে করেন নাই এবং কাহারো দোষ দুর্ব্বলতার বিচার করেন নাই। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিশিষ্ট কারণে বাহিরে বিচ্ছিন্ন হইলেও, তিনি তাঁহাকে দিয়াই ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। ১১ই মাঘের দিন প্রায়ই আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ-দান করিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন হইলে, সে সমাজ-মন্দিরগঠনের জন্যেও, "সত্যমেব জয়তে" নাম স্বাক্ষর করিয়া ১০৲ টাকা দিয়াছিলেন; এবং একবার নগর-সংকীর্ত্তন করিতে গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, ইঁহারা যদি সমাজগৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন, মিলন হইয়া যাইত। সুতরাং তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত চির মিলনের আকাঙ্ক্ষা কখনও ছাড়েন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়কেও শেষ শয্যায় কি প্রাণগতভাবে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন এবং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকেও কতই আদর করিয়াছিলেন।

আবার ইহা, বোধ হয়, সকলের জানা নাই, কেশবচন্দ্র যদিও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিলেন, তাঁহার আচার্য্যপদ স্বয়ং ঈশ্বর-প্রদত্ত, কোন মানুষের প্রদত্ত নহে, তথাপি ভ্রাতৃপ্রীতি-কামনায়, যখন সাধারণ ব্রাহ্মগণ চাহিয়াছিলেন, তিনি আচার্য্যপদ ত্যাগ করেন; তখন তিনি ঈশ্বর-প্রেরণায় 'আচার্য্যের উপদেশ' কাটিয়া, তাহার স্থানে 'সেবকের নিবেদন' মুদ্রিত করিয়া দিলেন এবং নববিধান পত্রে লিখিলেন, Minister অর্থে সেবক বই আর কি? এইরূপে তিনি 'আচার্য্য' নাম পরিহার করিয়া 'সেবক' নাম গ্রহণ করিলেন। এবং তখনকার আচার্য্যের বেদী মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিয়া, নূতন সেবকের গর্ত্তরূপে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী গঠন করেন। কি তাঁহার প্রেম এবং আদর্শ দীনতা! ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হই, ইহা তাঁহার প্রাণ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তাই এত করে সকল ভাইয়ের প্রীতি উদ্দীপন করিতে যাঁহার আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টা, তাঁহার জন্মযজ্ঞ যদি সমযোগে আমরা সম্পাদন করিলাম, তবে আর যেন আমরা ভাই

ভাই ঠাঁই ঠাঁই না রই। যাহাতে প্রত্যেকের বিশেষভাব সংরক্ষা করিয়া, প্রত্যেকের স্বাধীনতার মর্য্যাদা দান করিয়া, আমরা প্রেমযোগে পুনর্মিলন সম্পাদন করিতে পারি, তাহার জন্য বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত হই।

শ্রীকেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, সহস্র মতভেদ-সত্ত্বেও পরস্পরে চাকরের ন্যায় আমাদিগকে মিলিত হইতে হইবে। কাহারো দোষের বিচার না করিয়া, কেবল গুণ গ্রহণ করিয়া মিলিত হইতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মতত্ত্ব

ঈশ্বর-দর্শন

ঈশ্বর-দর্শন অলৌকিক, কঠোর সাধ্য-সাধনা-সিদ্ধ, ইহাই সকলকার ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কতই কাল্পনিক প্রচেষ্টা ও সাধনা লোকে অবলম্বন করিতে চায়। শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধানে এইরূপ সকল অস্বাভাবিক কাল্পনিক সাধন-প্রচেষ্টাকে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং সহজ ঈশ্বর-দর্শনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঈশ্বর-দর্শন বাহিরের চক্ষে দর্শন নয়। তাঁহার বাহিরে আকার নাই, তিনি নিরাকার চিৎস্বরূপ। বাতাসের যেমন আকার নাই, অথচ তাহাকে অনুভব করা যায়, তেমনই নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরকে জ্ঞান ও বিশ্বাস-চক্ষে দেখা যায়। তাই, ঈশ্বর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে সহজে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। এই বিশ্বাস যত আমাদের ঘন হইবে, তত ঈশ্বরদর্শন আমাদের উজ্জ্বল হইবে। তাই ঈশ্বরকে দর্শন করা অতি সহজ; তিনি এখানে এখনি আছেন, ইহা বিশ্বাস করিবামাত্র আমরা তাঁহার দর্শন পাই। কোন ব্যক্তির সহিত চেনা পরিচয় না থাকিলে, তিনি সামনে দিয়া চলিয়া গেলেও, আমরা তাহাকে দেখিয়াও দেখি না; সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত আমাদের চেনা পরিচয় হয় না বলিয়া, আমরা তাঁহাকে চোখের সামনে থাকিলেও দেখি না। তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেই দেখা যায়, ইহা অধিক কষ্টসাধ্য নয়। শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধানে এইরূপে সহজে ব্রহ্মদর্শন করিলেন এবং আমাদিগকেও দেখিতে শিখাইলেন।

কল্পতরু

শ্রীকেশবচন্দ্রের শততম জন্মযজ্ঞ উপলক্ষে শিশুদের উৎসবে কল্পতরু প্রদর্শিত হইল। এ প্রদর্শনের মর্ম্মকে কি উপলব্ধি করিলেন, জানি না। ইহা কি কেবল শিশুদের আমোদ উদ্দীপন করিবার জন্য? যেমন হাস্যোদ্দীপক আবৃত্তি শুনান হইল, কিম্বা তামাসা দেখান হইল, ইহাও কি তাই? না, ইহার অর্থ অতি গভীর; স্বয়ং ঈশ্বর কল্পতরু, অর্থাৎ যে যাহা চায়, সে তাঁহার নিকট তাহাই পায়। কিন্তু তিনি চিন্ময় নিরাকার, তাই তিনি এই বিশ্বসংসারকেও কল্পতরুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বিশ্বজননীর শিশু যে, সেই কেবল এই কল্পতরু হইতে সকল ফল পাইয়া থাকে। এ কল্পতরুতে কত ভক্ত-ফল, কত ভক্ষ্য ভোজ্য, মানবশিশুর যাহা কিছু চাই, তাহাই ইহাতে আছে। কিন্তু মার সরল শিশু বিনা কেহ সে সকল ফল পায় না। তাই শিশুদের জন্য, এই বিশ্বসংসারের নিদর্শনস্বরূপ এই কল্পতরু দেখান হয়। নববিধানের নিদর্শনও এই কল্পতরু। নববিধানে সকলই পাওয়া যায়; মার শিশু হইলে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি। ইহাই শিখাইবার জন্য কল্পতরুর প্রদর্শন।

—০—

নবেম্বর মাস ধন্য কেন?

(৬ই নবেম্বর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিবেদনের সারাংশ)

নবেম্বর মাস ধন্য। এই মাসকে আমি অত্যন্ত পবিত্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করি। এই মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পৃথিবীর বক্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমি যে কেন নবেম্বর মাসকে ধন্য মনে করি, কেন যে পবিত্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, এ বিষয়ে আমার মনোভাব আপনাদের নিকট তাঁহার জন্মের এই শতবার্ষিকী মাসে নিবেদন করিতেছি।

যৌবনের আরম্ভে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, একখানা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানা আমার নিকটে ছিল, আজ আর নাই; এবং যতদূর আমি অবগত আছি, এক্ষণে আর গ্রন্থখানা ছাপান হয় না। এখানা Out of print। গ্রন্থখানার নাম ছিল, "What India can teach us"। গ্রন্থকার ছিলেন, স্বনামধন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলার। এই গ্রন্থে অধ্যাপক মহাশয়, কেশবচন্দ্র-সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন, "I have not seen a greater hero than Keshub Chunder Sen." তাঁহার সেই লেখা আমার মনের উপরে একটি বিশেষ ছাপ দিয়াছিল। যৌবনসুলভ অনেক উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় তখন মন পূর্ণ ছিল। যদিও সেই সময়ে আমি কি খাইব এবং কোথায় থাকিব, তাহার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু তবুও মনে সাধ ছিল, যদি কোনও দিন ইউরোপে যাইতে পারি, তাহা হইলে এই প্রাচ্য ভাষাবিদ্ মহাজ্ঞানীর সহিত কেশবচন্দ্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু আমার সেই সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

ইউরোপে যদিও অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সঙ্গে আমি কেশব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য অনেক মনীষিগণের সহিত আলোচনা করি। এই অল্প সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। অল্পদিন পরেই কেশবচন্দ্রের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। আপনারা শুনিতে পাইবেন, বিভিন্ন চিন্তাশীল কেশবচন্দ্রকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিতেছেন। আমার এই দীর্ঘ জীবনে কেশবকে বিভিন্ন

প্রকারে বিবৃত হইতে এবং সমালোচিত হইতে শুনিয়াছি। কেশবচন্দ্র সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী, পরোপকারী কর্ম্মী, ভক্ত, বিশ্বাসী, বক্তা, সাধক এইরূপ বিভিন্ন আখ্যায় বর্ণিত হইয়াছেন এবং হইবেনও। প্রত্যেক চিন্তাশীলের চিন্তার সহিত কেশবচন্দ্রের কোনও না কোনও চিন্তার সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য আছে; এজন্য বিভিন্ন চিন্তাশীল তাঁহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। আমার যৌবনে কেশবকে অধ্যয়ন করিবার একটি বিশেষ সুবিধা এই ছিল যে, সেই সময়ে যুবক বন্ধুগণ হয়তো ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন, অথবা ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিল; এজন্য তখনকার ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইত। আবার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্নদিগের মধ্যেও একদল কেশবচন্দ্রের ভক্ত এবং অন্যদল কেশবের তিক্ত সমালোচক ছিলেন; কাজেই কেশবচন্দ্রের লেখা এবং কেশবচন্দ্র-বিষয়ক লেখা বিশেষ রূপে পঠিত হইত। আমি ছিলাম কেশবচন্দ্রের ভক্ত, কাজেই অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সেই লেখা,—"I have not seen a greater hero than Keshub Chunder Sen."—অন্য পক্ষের সহিত তর্কের সময় আমার বিশেষ মূল্যমান নজির ছিল। এইজন্যও ইহা আমার মনের উপরে খুব ছাপ দিয়াছিল।

ইউরোপে যাইয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। এই বিষয়টি অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রাথমিক অবস্থায়, আমার সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপরে সন্দেহের একখানা পাতলা মেঘ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে একদিন জীবতত্ত্বের (Zoologyর) ক্লাসে অধ্যাপক ইওয়ার্ট (Ewart) সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় এই ছিল যে, প্রকৃতি কেমন তাঁহার প্রেমেতে প্রতি জীবকে রক্ষা করিতেছেন এবং জীবশ্রেণীকেও রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন প্রজাপতি অতি নিরীহ জীব। পাখীগুলি প্রজাপতি আহার করে। পাখী এবং প্রজাপতি এই উভয়ই প্রকৃতির সৃষ্ট। কিন্তু প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার প্রকৃতি নিরীহ প্রজাপতিকে পাখীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতি প্রজাপতিকে এমন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন যে, পাখীর আগমনের সাড়া পাইলেই প্রজাপতি তৃণরাজির মধ্যে আত্মগোপন করে। তৃণের বর্ণ ও প্রজাপতির দেহের বর্ণ মধ্যে এত নিকট সাদৃশ্য আছে যে, পাখী আর প্রজাপতির সন্ধান পায় না; এইরূপে পাখীর গ্রাস হইতে প্রজাপতি রক্ষা পায়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া এক সময়ে মহাদেশের অংশ-বিশেষ ছিল। নিরীহ কাঙ্গারু মনের সুখে অষ্ট্রেলিয়ার বনে বিচরণ করিত। প্রকৃতি দেবী কাঙ্গারুকে আত্মরক্ষা করিবার কোনও যন্ত্র দেন নাই। কাঙ্গারু কেবল দ্রুত দৌড়াইতে পারে, এই মাত্র তাহার আত্মরক্ষার সম্বল। কালেতে প্রকৃতি দেবী নিরীহ কাঙ্গারুর দেশে মাংসভোজী সিংহ, শার্দ্দূলের জন্ম দিলেন। মাংসাশী জন্তু-নিচয় নিরীহ কাঙ্গারুকে বধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী দেখিলেন যে, নিরীহ কাঙ্গারুর বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। তখন প্রকৃতি দেবী একদিন আনিলেন ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পেতে ভূমি ভেঙ্গে সাগর হইল। এই সাগরের একদিকে গেল সমস্ত মাংসাশী জীব-নিচয়, অন্য দিকে সাগর দ্বারায় রক্ষিত ভূমিখণ্ডে রহিল নিরীহ কাঙ্গারুবৃন্দ। প্রকৃতি দেবী ভূমিকম্প দ্বারা কাঙ্গারুর বংশ রক্ষা করিলেন। জীবতত্ত্বের (Zoologyর) ভাষায় সাগরের এই অংশকে বলা হয়, ওয়ালেসের রেখা (Line of Walles)। বক্তৃতার পরে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়। আলোচনার সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিবার সময় এস্থানে নাই। কিন্তু আলোচনান্তে তিনি স্বীকার করিলেন যে, প্রকৃতির জ্ঞান আছে, এবং সেই জ্ঞান অনন্ত;—The nature is full of wisdom and that wisdom is infinite. অধ্যাপক ইওয়ার্ট (prof. Ewart) তাঁহার সৃষ্টি-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন যে, "এই সৃষ্টি যে কোনও ঈশ্বর দ্বারায় সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ধারণা করা বাতুলতা মাত্র; এই বাতুলতার জন্য, তোমরা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকট যাইতে পার। সৃষ্টি হইয়াছে ক্রমবিকাশের (Evolution) ধারায়। এস্থানে ঈশ্বর কোথায় হইতে কি করিবেন।" তাঁহার সঙ্গে আলোচনার পরে যখন তিনি স্বীকার করিলেন যে, Nature is full of wisdom, and that wisdom is infinite, তখন আমি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বলিয়াছিলাম, মহাশয়! এই প্রকৃতিই তাহা হইলে আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তাও। ইনিই ঈশ্বর।

আমার সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসে যে ক্ষুদ্র সন্দেহের মেঘ আসিয়াছিল, ঈশ্বরের দয়ায় তাহা কাটিয়া গেল। আমার প্রাণে আবার আনন্দ আসিল। যেই প্রকৃতি শত শত জীব জন্তু রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অন্তহীন জ্ঞান প্রেম প্রদর্শন করেন, তাঁহার সেই অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমে তিনি নির্ম্মল মানবাত্মাকেও রক্ষা করেন। ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম-প্রভাবে মানবসমাজে ভূমিকম্পের ন্যায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া, ওয়ালেসের রেখার ন্যায় এক একটি মহাপ্রাণের সৃষ্টি করেন, যাঁহার আদর্শ ও সাধনা-প্রভাবে মানবাত্মা হিংস্রজন্তু-সদৃশ নানাবিধ অপ্রেম, অসত্য ও অপবিত্রতা হইতে রক্ষা পাইয়া, আবার অনন্তের মধ্যে বিচরণ করে। কেশবচন্দ্র জীবতত্ত্ব-শাস্ত্রের ওয়ালেসের রেখার ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার সাধনা-প্রভাবে মানবাত্মার সম্মুখে অনন্তের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

১৮৮১ সনের ২২শে নবেম্বর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "বংশস্মরণ"

নামে যে প্রার্থনা করেন, তাহাতে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, "ঈশা, মুসা কোথায় গেলেন? আমরা যে তাঁদের বংশ, তা আর বিশ্বাস হয় না।.........অনন্ত যেখানে, সেখানে আমাদের ঘর। সেখানে নীচ ছিলাম না, বিবাদ করিতাম না, পবিত্র বাড়ীতে বাস করিতাম।......তারপর পৃথিবীতে এলাম। ......তারপর জন্মের পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ হয়ে গেলাম।" এই যে সাম্য ও মৈত্র-মন্ত্রের সাধনা, ইহাই কেশব-জীবনের একটি বড় সাধনা।

কেশবচন্দ্রের শিক্ষা এই যে, প্রতি মানব জন্মিবার পূর্ব্বে পবিত্র ছিলেন এবং পবিত্ররূপেই জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পৃথিবীর স্পর্শে আসিয়া মানব অপবিত্র হয়। প্রতি মানবাত্মা ঈশ্বরের পবিত্র সন্তান, অনন্তের সন্তান, অনন্ত উন্নতির অধিকারী। মানবজীবনে যে অপবিত্রতা, অপ্রেম, হিংসা দ্বেষ, ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি হিংস্র ভাব দেখা যায়, ইহা মানবাত্মার স্বাভাবিকতা নহে; ইহা পৃথিবীতে জন্মের পরে মানবাত্মাকে আক্রমণ করে। যে বংশে পৃথিবীর মহত্তেরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতি মানব সেই বংশে জন্মিতেছেন; অতএব প্রতি মানব মহত্ত্বের অধিকারী, ইহাতে উচ্চ নীচ নাই, ইহাতে বংশ ভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত বর্ণ নাই। সকল মানুষ সমান একই ঈশ্বরের সন্তান, এবং পরস্পর ভ্রাতা ও ভগ্নী। এই যে সাম্য ও মৈত্র-ভাব, ইহার মধ্যেই প্রতি মানবাত্মার স্বাধীনতার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এই যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ, খৃষ্টধর্ম ও মুসলমান-ধর্ম্মের মধ্যে এবং মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে ধর্মযুদ্ধ, এই যে শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায় ও পীতকায় প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পর হিংসা ও ঘৃণা, এই যে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে জাতিগত এবং জন্মগত পার্থক্য, এই সমস্তই সিংহ শার্দ্দূলের ন্যায়, পবিত্র ভগবৎ-প্রেমিক মানবাত্মাকে বধ করিবার জন্য পৃথিবীর বলে উৎপন্ন। মানবাত্মা যখন এরূপ ভাবে বিপন্ন, তখন তাহার রক্ষার জন্য অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার উদ্যম স্বাভাবিক। অনন্তশক্তির এই উদ্যম হইতে কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। তাঁহাদের জীবন, ভূমিকম্পের ন্যায় সমস্ত পুরাতন জঞ্জালের ধ্বংস করিয়া, সত্যকে রক্ষা করেন এবং নূতন ইতিহাস রচনা করেন।

কেশবচন্দ্রের জন্ম-সময়ে এই দেশের ইতিহাস, এই দেশের কেন, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস ভ্রাতৃবিরোধের ইতিহাস। এই দেশে জাতিভেদ নামক দুর্দ্দান্ত দানব সমস্ত সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছিল। চণ্ডালকে অস্পৃশ্য, ঘৃণিত বলাই ছিল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল যেন দুই বংশের লোক। ব্রাহ্মণ জন্ম হইতে পবিত্র এবং চণ্ডাল জন্ম হইতে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য। ইহাই ছিল এই দেশের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণই সমস্ত ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য আরাধ্য দেবতার পূজার অধিকারী। এ দেশে যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল, একমাত্র ব্রাহ্মণই সেই সমস্তের পূজারী, অন্যজাতি-সমূহ শুধু প্রসাদের অধিকারী। হিন্দু আত্মা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সমস্ত মানব একই অনন্তের সন্তান এবং সকলেই ভ্রাতা ভগ্নী। এই যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, যাহাতে সকল মানবের সমান অধিকার, হিন্দু-সমাজে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অন্যান্য দেশের ইতিহাসও যে খুব গৌরবের ছিল, তাহা নহে। খৃষ্ট জগতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টে বিবাদ ছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে ছিল ধর্ম্মান্ধতা; এক কোরাণ ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা এবং মুসলমানধর্ম্ম ভিন্ন সকল ধর্ম কাফেরের ধর্ম এই শিক্ষা দ্বারায় জগতের মানব-সমাজকে ভ্রাতৃবিরোধের শ্মশানভূমি করিয়াছিল। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও, পাশবিক বলে বলীয়ান্ শ্বেতকায়গণ জগতের শ্রেষ্ঠ-মানব ছিলেন; কৃষ্ণকায় ও পীতকায়গণ কেবল শ্বেতকায়ের সেবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজ-নীতি, সর্ব্বত্রই এইরূপে মানবাত্মা নিত্য ভীত ও শঙ্কিত ছিল। এরূপ অবস্থায় মানবাত্মার রক্ষার জন্য মহাশক্তির মহাবিকাশের প্রয়োজন, প্রয়োজন ভূমিকম্পের, প্রয়োজন ঝড়ের। কেশবচন্দ্র সেই প্রকৃতির মহাশক্তির মহাবিকাশ। ঝড় ও ভূমিকম্পরূপে তাঁহার জন্ম। তাই তিনি ভাঙ্গিলেন সমস্ত পুরাতন। ভাঙ্গিলেন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, ভাঙ্গিলেন বর্ণের প্রাধান্য, ভাঙ্গিলেন ধর্ম্মের বিবাদ। তাঁহার জীবনের সাধনায়, এই সমস্ত দানবীয় প্রকৃতি বিশুদ্ধ মানবাত্মাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ভীত, শঙ্কিত মানবাত্মা ভয় পরিহার করিয়া জাগ্রত হইল। মানব সমাজের নূতন ইতিবৃত্ত আরম্ভ হইল। তিনি নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, সমস্ত মানুষ এক অনন্ত ঈশ্বরের সন্তান। সমস্ত মানব ভ্রাতা ও ভগ্নী। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, কেশব মানবসমাজের সেবায় মত্ত হইলেন। তাই যেখানে প্লাবন, দুর্ভিক্ষে মানব কষ্ট পাইতেছে, সেখানে কেশবের সেবার কার্য্য; তাই মানবজাতির অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য কেশবচন্দ্র সংবাদপত্রের সেবক; দুঃখী মানবাত্মাকে অনন্তের সন্তান দিবার জন্য, কেশব প্রেমেতে বিভোর। অনন্তের সহিত নিত্য যুক্ত থাকিবার জন্য ভক্ত কেশব উপাসনায় রত। তিনি বলিলেন, সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল বিধানই ঈশ্বরের বিধান এবং মানবজাতির মুক্তির জন্য। আজ তাঁহার জীবন যদিও সম্যকরূপে গৃহীত হয় নাই, তবুও মানবজাতি তাঁহার জীবন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ যে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ মিলিত হইয়া Religious Congress করিতেছেন, ইহা কেশব-জীবনেরই সাধনার বিষয় ছিল। আজ যে বিভিন্ন জাতিগণ রাজনৈতিক শান্তির প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহাও কেশবচন্দ্রেরই সাধনার বিষয়। তাই আবার বলিতেছি, মহতী শক্তি যেমন ওয়ালেসের লাইন সৃষ্টি করিয়া নিরীহ কেঙ্গারুকে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র

অজগর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি সেই মহাশক্তি কেশবকে সৃষ্টি করিয়া, মানবাত্মার সম্মুখে মহান্ আদর্শ অঙ্কন করিয়া, মানবাত্মাকে অসত্য, অপ্রেম, অপবিত্রতা, ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি হিংস্র ভাব হইতে রক্ষা পাইবার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। যৌবনের আরম্ভে অধ্যাপক মোক্ষমূলারের যে লেখা পাঠ করিয়াছিলাম, "I have not seen a greater hero than Keshub Chunder Sen", জীবনের অপরাহ্ণে ইহার অর্থ অনুভব করিতেছি।

কেশবচন্দ্র-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, যদি রাজর্ষি রামমোহনসম্বন্ধে কিছুই বলা না যায়, তবে খাঁটি সত্য বলা হবে না। কেশব যাহা সাধনবলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামমোহন তাহা জ্ঞানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে মহামিলন এবং সমস্ত জাতির মধ্যে মহামিলন, রামমোহন তাঁহার জ্ঞানযোগে দর্শন করিয়া, পৃথিবীতে এই মহামিলনের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের জন্মের শতবার্ষিক যজ্ঞের বিরাট আয়োজন হইতেছে। তাঁহার তৈলচিত্র, তাঁহার নামে পুস্তকাগার প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে, তাঁহার নামকে অমর করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাঁহার নামে একটি রাস্তা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের সাধনাকে গ্রহণ না করিয়া এবং কেশবের সাধনাকে মানবসমাজের গ্রহণের জন্য জীবন উৎসর্গ না করিয়া, যদি ওসমস্ত করা যায়, তাহা হইবে ছেলেখেলা। যেমন শৈশবে আমরা মাটির অন্ন, ঘাসের তরকারি করিয়া নিমন্ত্রণের খেলা খেলিয়া, নিমন্ত্রণের সাধ মিটাইতাম, তেমনি আমরা কেশবের সাধনা গ্রহণ না করিয়া, যদি আমরা তাঁহার নামে রাস্তা, তাঁহার তৈলচিত্র প্রভৃতি দ্বারায় তাঁহাকে অমর করিতে চেষ্টা করি, তাহাও হইবে ছেলেখেলা। আজ দুঃখী মানবাত্মা কাতরে কেশবের সাধনা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে যদি শত শত নরনারী, প্রচারক ও প্রচারিকার ব্রত গ্রহণ করিয়া, এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করিতে প্রস্তুত হন, তবেই এই শতবার্ষিকীর মহাযজ্ঞ সিদ্ধ হইবে। প্রচারক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, প্রচারাশ্রমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। কেশব স্বয়ং দশ সন্তানের পিতা ছিলেন, রাজপ্রাসাদের প্রায় স্বীয় অট্টালিকায় বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহার সংসার-ভোগ ছিল, পদ্মপত্রের জলের ন্যায়। পদ্মপত্রের জল যেমন পদ্মপত্রকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি সংসার কেশবের আত্মাকে কলুষিত করিতে পারিত না। প্রতিমানব আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, এই নূতন বিধান সাধন ও প্রচার করিতে পারেন। চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষিত, দোকানদার, কৃষক, মজুর প্রত্যেকে এই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন। আপন পরিবারে, আপন বন্ধুদের মধ্যে, আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শত শত তৃষিত মানবাত্মাকে অনন্তের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা আজ কাতরকণ্ঠে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য নিবেদন করিতেছেন। যদি শত শত নরনারী ভূমিকম্পজাত কেশবের সাধনা গ্রহণ করিয়া, জগতের উৎকণ্ঠিত মানবাত্মার নিকটে মুক্তির সংবাদ বলিতে পারেন, তবেই কেশবের জন্মের শতবার্ষিকী সার্থক হইবে। অনন্ত মহাশক্তি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা এই সাধনা গ্রহণ করিতে ও প্রচার করিতে শক্তি লাভ করি।

শ্রীজগন্মোহন দাস।

—•—

ব্রহ্মানন্দ-পরিচিতি

প্রায় চুয়ান্ন বছর আগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অন্যতম সুহৃদ্ বিখ্যাত মনীষী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে লিখিয়াছেন: Many little things must be forgotten b fore his true greatness can be realised. মহাপুরুষ হইলেও কেশবচন্দ্র মানুষই ছিলেন—দেবতা নয়। মানুষের অসম্পূর্ণতা, ছোট খাটো দোষ ত্রুটিও তাঁহার নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু মানুষের সত্যিকারের বিচার হয়, তাঁহার মহত্ত্বের মাপকাঠিতে—ক্ষণিকের ভুল ভ্রান্তির দ্বারা নয়। মহাসমুদ্রের পরিমাপ হয় তাহার বিশালতা, তাহার গভীরতা দিয়া, তাহার সীমাহীন নীলের সম্পদ্ দিয়া; সাগরবুকে কোথায় আছে বহু দিনের বিকৃত শৈবালদল, কোথায় আছে হিংস্র জলচর প্রাণী, কবে সমুদ্রের বুকে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল প্রলয় ঝড়,—দুরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া মানুষ সে কথা বিচার করিতে বসে না। পরম বিস্ময়ে অপরূপ নীলসমুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়। আজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুণ্য শতবার্ষিকী দিনে, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদনের ক্ষণে, এই পরম সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই; অকপটকণ্ঠে আমরা যেন বলিতে পারি:

> যাহা মরণীয় যাক মরে,
> জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যান-মূর্ত্তি ধরে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বাঙালীর জীবনে যখন চারিদিক হইতে ঝড়ের বাতাস গর্জ্জিয়া উঠিল,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার বিপুল সংঘাতে বাঙালীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল,—সেই মহাসন্ধিক্ষণে কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব। কৈশোর অতিক্রম করিয়া যতই তিনি তারুণ্যের পথে—যৌবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন, চারিদিকের এই সব ধ্বংসপ্রবণতা ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। নব ভাবধারায় পাগল বাতাস ঝড়ের আক্রোশে তখন অবিরাম আঘাত হানিতেছে সমাজজীবনের যুগজীর্ণ কুটিরের গায়ে। কিন্তু সম্মুখে তাহার রহিয়াছে বহুসম্ভাবনাপূর্ণ নতুন উষার দীপ্ত আলোকরেখা। সেই আলোর

সন্ধানে কেশবচন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রাত্রির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথে। যাত্রাপথে কত কণ্টকের বাধা, গোঁড়ামীর গুপ্তসর্প কতবার তুলিল ক্রূর ফণা, কিন্তু তরুণ যাত্রী বাধা মানিল না—ছুটিয়া চলিল নব-জীবনের সন্ধানে। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছেন :—

"হে আত্মন্, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, প্রথম জীবনে কোন্ মন্ত্রে তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়—অগ্নিমন্ত্রে। অগ্নি-ধর্ম্মের উপাসক আমি, উৎসাহের নীতির প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব। আমার নিকটে আগুনের বুকে বসাই মুক্তি। ······যখনই জীবনে অনুভব করি শীতলতা, আমার অন্তর কাঁপিয়া ওঠে। দেহ শীতল হইলেই তাহার মৃত্যু ঘটে; ধর্ম্ম যদি শীতলতার আশ্রয় নেয়, সেও তাহার মৃত্যু।······নব নব ভাবধারা, নব নব সম্পদ্ লাভ, নব নব আনন্দভোগের উদ্দেশ্যে অবিরাম যাত্রা—এই আমার জীবন।"

কেশবচন্দ্রের সংগ্রাম ছিল শেষহীন। কি নিজের, কি অপরের, প্রত্যেক সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মগত অভাব তাঁহার মনকে উন্মাদ করিয়া তুলিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক সমাজ, প্রতিটি নর-নারীর কল্যাণসাধন ছিল তাঁহার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার অনির্ব্বাণ অগ্নির মাঝে ছিল তাঁহার আসন। যে পথে তাঁহার পদ-চিহ্ন পড়িয়াছে, যাহাকে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, সেখানেই সে অগ্নি-শিখার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। তাঁহার সংস্কার-কার্য্যের ছিল না কোন সীমা; তাহার গতি ছিল অস্থির ও অবিরাম। He wanted to change the very of the earth. দেশে ও বিদেশে তাঁহার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা ও বাণীতে সমবেত জনতার বুকে নবভাবের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। তাঁহার সেবা ও উপাসনার একাগ্রতায় সমবেত ধার্ম্মিকমণ্ডলীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিত—সবল শিশুর মত তাঁহারা কাঁদিয়া উঠিতেন। যে কার্য্যে তিনি হাত দিতেন, তাহাতেই জানা ও অজানা শত মানুষের সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নগ্ন-পদে ও নগ্নশিরে তিনি সাধারণ সেবকের মত রাজপথে আসিয়া শোভাযাত্রায় যখন যোগ দিতেন, শত শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি তখন লজ্জা-ভয় দূরে ফেলিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। উচ্চ শিক্ষিত ও আত্মনির্ভর তরুণগণ দলে দলে আসিয়া কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, ধনীর দুলালসব ভিক্ষুকের জীবনকে বরণ করিল, তাঁহারই অপূর্ব্ব শক্তির মহিমায়। কিন্তু কেশবচন্দ্রের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ঘটিল না। আরো জীবন, আরো আগুন, আরো সেবা তাঁহার চাই। এক বিস্ময়কর আগুনে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব ছিল পরিব্যাপ্ত। সেই আগুনে তাঁহার অন্তরতম ধাতুটি গলিয়া নব নব আদর্শের সৃষ্টি করিত। সেই আদর্শের মিছিল বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিত নানা কর্ম্মধারা ও সংস্কারের ভিতর দিয়া। তাঁহার ঐ আকর্ষণে মুগ্ধ হইল সমগ্রদেশ—সমগ্র জাতি।

ভগবানের উপাসনা কেশব-চরিত্রের আর একটি দিক। শিশুকালেই ধর্ম্মোপাসনার গোপন বীজ তাঁহার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাঁহার এ প্রবৃত্তি ছিল স্বাভাবিক—স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কেহ তাঁহাকে শিখায় নাই ভগবানের পূজা-পদ্ধতি, অদৃশ্য ঈশ্বরের পূজার অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল না। তবুও মাত্র পনের বৎসর বয়স হইতেই তিনি উপাসনা আরম্ভ করেন। কেন? কে বলিয়া দিবে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন :—"আমার জীবনবেদের প্রথম পাঠ উপাসনা। কাহারো সাহায্য আমি পাই নাই; কোন ধর্ম্ম-সমিতিতেও কোন দিন প্রবেশ করি নাই, কোন্ ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বন করিব, তাহারো ঠিক নাই।······কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের সেই প্রথম প্রভাতেই একটি ধ্বনি আমার কাণে অবিরাম বাজিত,—'উপাসনা কর! উপাসনা কর! উপাসনা ভিন্ন অন্য পথ নাই।' কেন—কিসের জন্য উপাসনা করিব জানি না, বিচার করিবার বয়স তখনো হয় নাই, উপাসনা করিতে কেউ আমাকে উপদেশ দেয় নাই।······প্রাতঃকালে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আমি উপাসনা করিতাম।···যাহা কিছু অন্ধকার ছিল, উজ্জ্বল হইয়া উঠিত; চারিদিকের জিনিষ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিত; উপাসনার চর্চ্চায় আমি লাভ করিলাম অসীম, অপ্রতিহত শক্তি—সিংহের বিক্রম।"

ধর্ম্ম-জীবনের এই যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা—ইহাকে তো অস্বীকার করা চলে না। এই মানুষটি অতি দীন সাধারণ উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে নিজ জীবনে এমন এক আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাহার বিশালতা সমগ্র দেশ, তথা সমগ্র বিশ্বকেও আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেমের ঠাকুরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনার সহজ পথে যে আত্মার দুর্ব্বার তেজস্বিতা ও সর্ব্বোচ্চ ঐক্য লাভ করা সম্ভব—কেশবচন্দ্র সেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাহা কিছু সৎ ও সুন্দর তিনি জীবনে লাভ করিছিলেন, সবই উপাসনার সহ[illegible]। কেশবচন্দ্র জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা এই শিক্ষাই মানুষকে দিয়া গিয়াছেন যে, ভগবানের সহিত মানুষের দৈনন্দিন মিলন বাস্তব সত্য। অদৃশ্য ঈশ্বরকে তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শিষ্যদেরকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা[illegible] একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ভগবদ্দর্শন। অবশ্য তিনি আধ্যাত্মিক অনু-ভূতির কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্তরে পরম পুরুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিকে অনুভব করিবার কথা। তিনি লিখিয়াছেন "দেহের পক্ষে দেখা ও শোনা যেমন সহজ, আত্মার পক্ষেও দেখা ও শুনা তেমনি সহজ হওয়া উচিত। ভগবানে[illegible] দর্শনলাভের জন্য আত্মাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় [illegible] আত্মাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আন, অমনি সফলতা আসিবে।" 'Lectures in India' গ্রন্থেও তিনি লিখিয়াছেন, "অদৃশ্য এক ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর আমাদের নিকট এক অবিরাম প্রত্যক্ষ দেবতা। আমি যখন দেখিলাম আমার ঈশ্বরকে, তখন স্বভাবতঃই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—জীবন-ধারণের ব্যবস্থা এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য আমি কোথায় যাইব? ব্যাঙ্কে? (কেশবচন্দ্র 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল'এ চাকুরী করিতেন) সদাগরী আপীসে? না। পরিষ্কার ও অভ্রান্ত ভাষায় ঈশ্বর আমাকে

সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কাজ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু আমি বলিলাম, 'প্রভু, জীবনধারণের সমস্ত পথ এইভাবে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলে, আমার পরিবারবর্গ কি অনাহারে মরিবে না?' উত্তর আসিল, 'অবিশ্বাসীর মত কথা বলিও না।' আমার সন্দেহবাদে আমি লজ্জিত হইলাম। আমাকে তিনি আশ্বাস দিলেন, 'তোমার জন্য সকল জিনিষের ব্যবস্থা হইবে'।"

কেশবচন্দ্রের অন্য সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তবুও এই মহান্ অবদান তাঁহার চরিত্রের বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

মিলন-সাধনের একনিষ্ঠ কামনা ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনের আর একটি উজ্জ্বল দিক। যে অগ্নিশিখা যুবক কেশব সেনকে করিয়াছিল পরিবার-বিদ্রোহী, সমাজ-বিদ্রোহী, গতানুগতিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, সেই আগুনই তাঁহার বুকে জ্বালাইল মিলনের কামনাশিখা। এই কামনাই তাঁহার ধর্ম্মসাধনের মূলমন্ত্র, তাঁহার নববিধানমন্ত্রের গোড়ার কথা। তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য। বহু মানুষের, বহু সাধকের অন্তর-সম্পদকে তিনি একটি মালায় গাথিয়া লইতে প্রয়াসী হইলেন। 'I am continually abvancing towards perfection. আংশিক অগ্রগতির মাঝে নিজেকে আমি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। দেশমাতৃকার কল্যাণের জন্য বলিতেছি, ভগবানের দান এই নববিধান পরিপূর্ণ মিলনেরই প্রতীক।'

তিনি আরো লিখিয়াছেন:—"এই নববিধান। সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মগুরু ও বিধানের ইহা মিলনক্ষেত্র।......নববিধান বিভিন্ন যন্ত্রের মধুর সঙ্গীত। সকল যুগের ও সকল দেশের মণিমাণিক্য দিয়া গাঁথা একটী কণ্ঠহার।......এই বিরাট মিলনসাগরে বাহ্যিক জগতের যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর সব এক হইয়া গিয়াছে।"

এই সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত ধর্ম্মমতের ভিতর দিয়া একটি চরম শক্তির আত্মপ্রকাশের সত্যকে প্রচার—কেশবচন্দ্রের জীবন-সাধনার অমর অবদান

মানুষের মাঝে থাকিয়া মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনই ছিল কেশবচন্দ্রের আদর্শ। নির্জ্জন বনচারীর ভগবৎ উপাসনা তাঁহার ধর্ম্ম নয়। মানুষকে ছাড়িয়া দূর অরণ্যে তিনি কুটীর বাঁধেন নাই। আধ্যাত্মিক সাধনার নির্ব্বিকল্প সাধনার মাঝে তিনি বিসর্জ্জিত করেন নাই বাহিরের কোটি কোটি মানুষ ভাইকে—মানুষের সমাজকে। তাই লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। তরুণগণের সহায়তায় 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্ম এসোসিয়েশনকে নবভাবে সংগঠিত করিলেন; উহাকে ৫টি বিভিন্ন শাখায় ভাগ করিলেন—নারীসমাজের উন্নতি, শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য, মিতাচার ও দান। শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার জন্য নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল। 'সুলভ-সমাচার' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শিল্প-বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি খোলা হইল। ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মবিবাহ বিলও পাশ হইয়া গেল।

কেশবচন্দ্র তখন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বস্বীকৃত নেতা। কাজেই যে কাজে তিনি হাত দিলেন, তাহাই সাধিত হইয়া চলিল। অনুদিন তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিরোধিতার একটি একটি মনোভাবও আত্মপ্রকাশিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি গতানুগতিক সমাজের বিরোধিতার ফলে এই অসন্তোষের আগুন যখন অনেকেরই মনে ধূমায়িত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কেশবচন্দ্র কুচবিহারের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহের কথা ঘোষণা করিলেন। চারিদিক হইতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। দীর্ঘদিনের ধূমায়িত অসন্তোষ-বহ্নি লেলিহান শিখায় আত্মপ্রকাশ করিল। বহু অনুরাগী বন্ধু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৮৭৮-এর ১৫ই মে)।

বন্ধুবিচ্ছেদের এই আঘাত কেশবচন্দ্র সহিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর ছিল রুগ্ন—জরাজীর্ণ। এই আঘাতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু সিংহের অপরাজেয় বিক্রম ছিল তাঁহার মনে; তিনি বন্ধুজনের আঘাতের নিকটেও পরাভব মানিলেন না—মরিয়া হইয়া উঠিলেন।

কেশব-জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায় তীব্র যাতনা ও বহু ব্যর্থতার কাহিনী। যুদ্ধাহত বীর সৈন্যের মত তবু তিনি সংগ্রাম করিয়া চলিলেন। এই দুঃসহ বেদনার পঙ্ক হইতেই সৃষ্টি হইল নববিধানের লীলা-কমল—ব্রহ্মানন্দের শেষ জীবনের অমর দান। পরম দুঃখে তিনি লাভ করিলেন ঋষির অন্তর্দৃষ্টি: "মানুষ যখন আশাহীনভাবে দুঃখ ও ধ্বংসের পথে আসিয়া নামে,......মানুষের দৃষ্টিশক্তি যখন সত্যপথ খুঁজিয়া পায় না, তখন ভগবান এমন একজন কাউকে পাঠাইয়া দেন, যাহার জীবন তাঁহারই শক্তিশালী ইচ্ছার নিকট বিক্রীত।" সেই পরম পুরুষের আহ্বান বুঝি বাজিল কেশবচন্দ্রের কাণে। অপ্রত্যাশিত না হইলেও আকস্মিকভাবে ব্রহ্মানন্দ মহামিলনের পথে যাত্রা করিলেন। ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী চিরস্মরণীয় হইল।

আজিকার দিনে ব্রহ্মানন্দের জীবনের অপরিমেয় কাজের বিচার করিতে বসিব না। আত্ম-দ্বন্দ্বের যে শেলাঘাত তাঁহার জীবনে মর্ম্মান্তিক হইয়া দেখা দিল, তাহাতে সত্যিকারের অন্যায় তাঁহার ছিল কি না, সে সমস্যা-সমাধানের দিনও আজ নয়। তবু আজ তাঁহার শতবার্ষিকী দিনে মনীষী মাক্সমূলারের দরদভরা কথা কয়টী বার বার মনে পড়িতেছে:—"If his friends had been more forbearing, if they remembered his past services, ...Kashub Chundra Sen might have recovered his health, his intellectual balance and his power for doing good. But we are all very exacting with men whom we love and honour and our friend is only another instance of an idol, first worshipped and then broken."

(৩রা অগ্রহায়ণ, "যুগান্তর" দৈনিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

কেশবচন্দ্র

(গত ২৩শে মে, পুরীতে কেশব শতবার্ষিকীর উৎসবে, 'সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন সংঘে' শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন-প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম)

বাংলা দেশে যে যুগসন্ধিক্ষণে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শুধু বাংলা দেশের নয়—সমগ্র ভারতের তা একটা মহাবিপ্লবের যুগ—মহাসন্ধিক্ষণ। একদিকে প্রতীচ্য তার সংস্কৃতির সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে ; সমগ্র পাশ্চাত্য আচার, ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞান বিতরণের ফলে ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতি দিন দিন পরিম্লান হচ্ছিল—ভারতের সনাতন আদর্শ ও ধর্ম্ম শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে উপহাসের সামগ্রী হয়েছিল এবং ইউরোপীয় অনুকরণে সমগ্রজাতি—পোষাক পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, বিবাহে ও আচার ব্যবহারে—সামাজিক প্রথা না গঠন করলে ভারতের আর গতি নাই—উন্নতির আর আশা নাই—ইহা ছিল শিক্ষিত যুবকদের দৃঢ় পণ। তাঁরা অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষায় যুক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্থান দিলেন এবং প্রতিদিন নিজেদের কার্য্যকলাপে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য বিশেষ যত্নবান হলেন। এর জন্য সভা সমিতি, সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও সংঘ গঠন করতে লাগলেন ; অনেকে প্রকাশ্যে মদ্যপান, অখাদ্য ভোজন এবং সাহেবিয়ানার হুবহু নকল করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। অপর দিকে প্রাচীনপন্থী হিন্দু-সমাজে নানাবিধ জড়তা অলসতা, অনাচার, কদর্য্য শিক্ষা, কুসংস্কার এবং সংকীর্ণ ধর্ম্মান্ধতা প্রচলিত ছিল। একদিকে খ্রীষ্টধর্ম্মের নীতি ও পাশ্চাত্য মনস্বী দার্শনিকদের মতবাদ, অন্যদিকে হিন্দুর প্রাণহীন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ এবং তামসিক ভাবে উৎসবাদির অনুষ্ঠান। এই সন্ধিক্ষণে কেশবচন্দ্র প্রাচ্য প্রতীচের সমন্বয় ঘটাইতে ব্রতী হইলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ ও প্রার্থনার সঙ্গে ভারতীয় সাধনাকে যোগ করিয়া দিলেন। তাঁহার নিরাকার ব্রহ্মবাদের সঙ্গে হিন্দুর উৎসবানুষ্ঠানের যোগ করিলেন। ভারতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্য যুক্তিমূলক জ্ঞান বিজ্ঞানের মিলন করিয়া দিলেন। ইহাতে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়মূলক আলোক সম্পাত করিলেন। সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল সভ্যতা ও সকল সংস্কৃতিকে তিনি বক্ষে ধারণ করিয়া, এক নবীন সভ্যতা ও নবযুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা করিয়া দিয়া, সমগ্র মানব ও সমাজকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার অগ্নিমন্ত্রে দলে দলে যুবকেরা দীক্ষিত হইল। কেশবচন্দ্র শুধু নবযুগের স্রষ্টা নন—মানবজাতির ঐক্যবন্ধনের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য।

সাহিত্যেও তাঁহার দান অসীম। বাংলা ভাষা তাঁহার জ্বালা-ময়ী বক্তৃতায় এবং তাঁহার সরল প্রার্থনায় এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। 'বন্দে মাতরমের' মন্ত্রদ্রষ্টা, ঋষি, সাহিত্যসম্রাট, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে নিয়মিত ভাবে যাইতেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, "কেশব-চন্দ্রের ভাষা শিখিতে আমি বক্তৃতা শুনিতে যাই।" কি শ্রদ্ধার চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবকে দেখিতেন, তাহা তাঁহার 'অনুশীলনের' নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র পাঠ করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন :—

"এই মহাত্মা (কেশবচন্দ্র সেন) সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।"

তিনি বাংলা ভাষায় "সুলভ-সমাচার", "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রভৃতি পত্রিকা প্রচার করিয়া জনসমাজে বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁহার প্রেরণায় অনুবাদ-সাহিত্যের সূত্রপাত্র হয়। বাস্তবিকই বিচার করে দেখতে গেলে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, কেশবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন গঠন-কর্ত্তা। তাঁহার নিকট বাঙ্গালীর ঋণ অপরিশোধ্য।

রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি নির্ভীক স্পষ্ট বক্তা। "মিরর" তাঁহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। যদিও তিনি নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ছিলেন না—তবুও ধর্ম্মভিত্তিতে যে রাষ্ট্রীয় মিলনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন—তাহাই কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি। তাঁহার 'England's duties to India' তাঁহার দেশাত্মবোধের অগ্নিময় অভিব্যক্তি। তিনি ব্রিটিশ জাতিকে যাহা তখন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—আজ তা প্রযোজ্য।

সমাজ-সংস্কারেও তিনি অগ্রদূত ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষা। কেশবচন্দ্রের মধ্যে দুইটী প্রকৃতির পূর্ণ সমন্বয় ছিল। একদিকে তিনি আচার্য্য, গুরু ও নেতা, অপরদিকে তিনি শিক্ষার্থী, শিষ্য ও সেবক।

আজ এস, শিক্ষিত ভারতবাসী, আজ দ্বেষ, ঈর্ষা, কলহ ও নীচ সংকীর্ণতা ভুলে, কেশবচন্দ্রের পদানুসরণ করে, মানবজাতির সেবা-ব্রতে ব্রতী হয়ে জীবন ধন্য করি। কেশবচন্দ্র শুধু বাঙ্গালীর ছিলেন না, শুধু ভারতবাসীর ছিলেন না, কেশবচন্দ্র ছিলেন সমগ্র জগতের। যেখানে নরনারীর সমাজ, কেশব সেইখানে তাদের আত্মীয়—পরমাত্মীয়। কেশবচন্দ্র বঙ্গদেশে জন্মেছিলেন—সেই গৌরবে আজ আমরা সমগ্র জগতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী—বাঙ্গালী জাতির শতবার্ষিকী—মহা সমন্বয়া-চার্যের শতবার্ষিকী—সমন্বয়বাসীর শতবার্ষিকী !

—০—

শ্রীকেশবের জন্মশতবার্ষিকী

পুরী, তৃতীয় দিন—১৯৩৮

তৃতীয় দিনে (২৩শে মে) "সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-সঙ্ঘ" হয়।

আরম্ভিক সঙ্গীতান্তে ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করিয়া সঙ্ঘের উদ্বোধন করেন। উৎকলের জমীদার রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হয়।

অদ্যকার সভাপতিবরণ প্রস্তাব করিয়া, ভাই প্রিয়নাথ বলেন, শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞের আজ শান্তিবার্ত্তাদিন। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ এবং সংগ্রাম ধর্ম্ম-পরিবারে যেমন অশান্তি আনিয়াছে, এমন কিছুতেই নয়। যুগে যুগে মানব-

জীবনে শান্তিবিধানের জন্য ধর্ম্মবিধান প্রেরিত। কিন্তু হায়! ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের অনুবর্ত্তিগণ পরম্পরের মধ্যে মতভেদ বা অনুষ্ঠানাদি লইয়া পরস্পরের মধ্যে এতই বিরোধানল প্রজ্বলিত করিলেন যে, শান্তির স্থানে ধর্ম্মে অশান্তি মানব-পরিবারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিল এবং তজ্জন্য ধর্ম্মের নামে মানবে মানবে যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত কতই না হইয়াছে। তাই বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপায়, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও অশান্তি নির্ব্বাণ করিয়া, সর্ব্বধর্ম্মে মিলন ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বিধান নববিধান বিধাতা প্রেরণ করিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র সেই শান্তিবার্ত্তা, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বার্ত্তা লইয়াই মানবজীবনে জন্মগ্রহণ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তাঁহার নিকট কেবল দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ মত মাত্র নয়; তিনি জীবনের আচরণে ও সাধনে সকল ধর্ম্মের সত্য এবং বিশেষত্ব সকল সাধন ও আত্মস্থ করিয়া সমন্বয়ের মূর্ত্তিমান জীবন প্রদর্শন করিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "হিন্দু আমাকে হিন্দু বলিয়া সম্মান করেন, খ্রীষ্টান আমাকে খ্রীষ্টান বলিয়া আদর করেন, ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী বলেন, আমি তাঁহাদেরই ধর্ম্মবিশ্বাসী; বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলেন, আমি নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইতে দূর নই; বৈষ্ণব আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করেন। এইরূপে সকল সম্প্রদায়ই আমাকে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া পরিচিত করিতে চান। আমি সবার সহিত সবার রকম।" বাস্তবিক শ্রীকেশবচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মই যে এক বিধাতারই বিধান, ইহা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। যুগে যুগে দেশকাল ভেদে একই ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া, প্রাচীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ দেশকাল ও মানবের ধর্ম্মাধিকারের উপযোগী ধর্ম্ম বিভিন্ন নামে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও সেই জীবন্ত ঈশ্বর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া, সর্ব্বমানবের মহাপ্রেমের মিলন ও একত্ব সমাধানের জন্য, এই যুগধর্ম্মবিধান নববিধান নামে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা নবযুগের বিধান বলিয়া কেশবচন্দ্র ঘোষণা করিলেন, তাহা নহে; নিত্য নব নব ধর্ম্মজীবন অভিব্যক্ত করিবার জন্যই ইহা বিধাতার ধর্ম্মবিধান। তাই, যে বিধান-বিশ্বাসে মানবাত্মা কোনও গণ্ডীতে, কিম্বা কোনও মতে, কিম্বা কোনও সম্প্রদায়ে চির আবদ্ধ না হইয়া, নিত্য নব নব জীবন-লাভে ধন্য হয়, এই জন্যই কেশবচন্দ্র বিধাতার প্রেরণায় ইহাকে নববিধান নামে ঘোষণা করিলেন। তাই, শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট সকলধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মভ্রাতৃরূপে আদৃত এবং সকল সত্যই বিধাতার সত্যরূপে অবলম্বিত ও আচরিত। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও General Booth তাঁহার নিকট সমভাবে আদৃত ও সম্মানিত। আজ তাই, তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ভক্তগণকে আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রের সেই ভ্রাতৃপ্রেমালিঙ্গনে আলিঙ্গন দিয়া অভিবাদন করিতেছি। বিশেষভাবে অদ্যকার সভায় সভাপতি গ্রহণের জন্য, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। তাঁহার ন্যায় উদার, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকেই এই যজ্ঞের উপযুক্ত হোতারূপে বরণ করিতেছি।

পরিশেষে শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি এবং বক্তা মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া ভাই প্রিয়নাথ নিবেদন করিলেন:—মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় বক্তা মহাশয়গণ শ্রীকেশবচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের যিনি যেদিক দেখিয়াছেন, তাহাই বলিলেন। এজন্য তাঁহাদের সবারই চরণে লুণ্ঠিত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন করিতেছি। শ্রীকেশবচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, "ইঁহারা এক এক জন আমার এক এক ভাব কেবল লইলে হইবে না। সবশুদ্ধ মাছটা লইতে হইবে। জলছাড়া মাছ লইলে হইবে না। প্রশান্ত সাগরে এ মাছ খেলা করিবে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের জীবন দেখাইতে চাই।" আজ আমরা এই কথাগুলির মর্ম্ম যেন হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারি। তিনি বলিলেন, জীবনের জীবন যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে জীবিত থাকেন ভক্তমীন। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ভক্তকে গ্রহণ করিলে, জল ছাড়া মাছ যেমন মরা মাছ হয়, তেমনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ভক্তগণকে মৃত বা ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত করিয়া লোকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে, তাই যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে অমানুষ বা ঈশ্বরস্থানীয়রূপে পূজা করিয়াছে। এ যুগে তাহা করিলে চলিবে না; কিংবা তাঁহাদের এক এক দিক বা এক এক ভাব লইলে পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ হইবে না। এই জন্য এবার নূতন বিধানে ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তিতা বিধানের মানুষকে গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া আমরা কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ভুল ভ্রান্তিতে পড়িব এবং আমাদের আংশিক দৃষ্টি অনুসারে যাহার যেটুকু ভাল বোধ হইবে, তাহাই লইব, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিব না। সেইজন্য বিশেষভাবে কেশবচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, যেন আমরা ব্রহ্মকে ছাড়িয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষিত না হই। এবং সত্য সত্য তাঁহার বিচিত্র জীবনের এক এক ভাব লইলেও কেমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ণভাবে লওয়া হইবে। তিনি সকল ধর্ম্মভাব সাধন করিয়া, বিশ্বমানবধর্ম্ম জীবনে প্রদর্শন করিবার জন্যই নববিধান-মূর্ত্তিমানরূপে গঠিত। আমরা সেই ভাবে যেন তাঁহাকে মার বক্ষস্থ চিরজীবিত মার সন্তানরূপে গ্রহণ করি। ধর্ম্মে ধর্ম্মে চিরবিবাদ রহিয়াছে, তাহার মীমাংসার এক নূতন সাধনা কেশবচন্দ্র নিজ জীবনে প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুর সহিত হিন্দু এবং মুসলমানের সহিত মুসলমান যদি আমি একই জন হইতে পারি, তবে আমি আমার সহিত কেমন করিয়া বিবাদ করিব? এইভাবে শ্রীকেশবচন্দ্র সকল ধর্ম্মকে একই জীবনে সাধন করিয়া, বিশ্বমানব-ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের বিবাদ মীমাংসা করিয়া, একতা-সমাধানের আদর্শ দেখাইবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই ভাবে আমরা প্রতিজনে যদি এই আদর্শের অনুসরণে বিশ্বমানবত্ব প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মভেদ চলিয়া যায় এবং মহাধর্ম্মসমন্বয় জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যজ্ঞে বিধাতার

কৃপায় ইহাই যেন আমাদের সাধনা হয়, এবং তদ্দ্বারা আমরা যেন বিশ্বমানবজন্মলাভে ধন্য হই।

—০—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৫ই অগ্রহায়ণ, ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি মল্লিকের জন্মদিন উপলক্ষে সন্ধ্যায় শান্তি-কুটীরে এবং ৭ই অগ্রহায়ণ, প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রীতি সিংহের জন্মদিনে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ৩০শে নভেম্বর ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধা দেবীর একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় প্রেমেন্দ্রনাথের শুভজন্মদিন উপলক্ষে, ৭৬নং নিউ থিয়েটার রোডস্থ ভবনে, শান্তিকুটীরে এবং পুরী প্রেমাশ্রমে উপাসনা হইয়াছিল।

প্রতিমূর্ত্তি-রক্ষা—গত ১৪ই নবেম্বর, সংস্কৃত কলেজ হলে, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এস্, এন্ দাস গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।

প্রত্যাবর্ত্তন—গত ১৩ই নভেম্বর, ১৬নং বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেনে, স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসুর বিলাত হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতাদান সূচক উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পত্নী শ্রীমতী অরণ্যশোভা অনাথাশ্রমে মিষ্টান্নের জন্য ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৭শে নভেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণে, ৫৭।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, অধ্যাপক পরেশনাথ সেন, ৮২ বৎসর বয়সে, সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতে ব্রতী থাকিয়া, চরিত্রের পবিত্রতা, মধুরতা ও একনিষ্ঠ ধর্ম্মভাবের স্নিগ্ধতায় সকলকে আকৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এহেন ব্রাহ্মসমাজের মুখোজ্জ্বলকারী স্তম্ভ সকল ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়াতে, সমাজদেহ দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেছে। ভগবান্ সমাজ রক্ষার জন্য এরূপ জীবন সকল এঁদের দৃষ্টান্তে পুনর্গঠন করুন। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ উন্নতমনা তাঁর সন্তানকে বাঞ্ছিত লোকে স্থানদান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ৭ই নবেম্বর, মহারাজকুমার স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে, কেশবাশ্রমে সমাধিপার্শ্বে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে দরিদ্রবিদায় হয়। গত ১০ই নবেম্বর, মাননীয়া মহারাণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবীর (সি, আই) সাম্বৎসরিক দিনে, কেশবাশ্রমে স্বর্গগত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমাধিপার্শ্বে প্রাতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে দরিদ্রবিদায় ও সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনান্তে মহেশবাবু প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই নবেম্বর, ২।৩বি, পণ্ডিতিয়া রোডে, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পত্নী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই নবেম্বর, স্বর্গীয়া মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর সাম্বৎসরিক নবদেবালয়ে সম্পন্ন হয়। ভক্তপরিবারস্থ ও মণ্ডলীস্থ অনেকগুলি ভাই ভগ্নী যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভ্রাতা সরলচন্দ্র সেন শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের ও আচার্য্যপত্নীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ও আচার্য্যের প্রার্থনা-পাঠ ভাই অক্ষয়কুমার লধ করেন।

গত ১৫ই নবেম্বর, বালীগঞ্জে ৪৩নং ফার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গগত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন; এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১৯শে নবেম্বর, ১৩নং পদ্মনাথ লেনে, শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২০শে নবেম্বর, ৮৫বি লান্সডাউন রোডে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতা, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জিতেন্দ্রবাবু প্রচার-ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে নবেম্বর, কলিকাতা অনাথাশ্রমে স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, এবং শ্রীযুক্ত হরিসুখ গুপ্তের নেতৃত্বে আশ্রমস্থ বালকগণ সঙ্গীত করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Dur[illegible]er new Dispensation Church, by Rev. Bhai P[illegible]ya Nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Cha[illegible]dra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান [illegible]"

শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।